উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

২৮শ বর্ষ

(১৩৩২ মাঘ হইতে ১৩৩৩ পৌষ পর্য্যন্ত)

উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১ নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২॥০ টাকা

Printed by MANMATHA NATH DASS
SRI GOURANGA PRESS 71/1, Mirzapur Street, Calcutta
Published by BRAHMACHARI KAPILA
Udbodhan Office 1 Mukherji Lane Calcutta

উদ্বোধন সূচী

(২৮শ বর্ষ—মাঘ ১৩৩২ হইতে পৌষ ১৩৩৩)

উদ্বোধন

নবীন উষার তরুণ আলোকে উদ্বোধনের মাঙ্গলিক
হতাশ পরাণে ঢালে উৎসাহ, ধ্বনিয়া তুলিছে দিগ্বিদিক .
সুপ্তিমগন নিখিল বিশ্ব ত্যজিয়া উঠিছে তন্দ্রাঘোর
নিশার আঁধার লুকাল কোথায় গভীরা যামিনী হইল ভোর,
আগুয়ান সবে কর্ম্মের পথে তুচ্ছ করিয়া বিঘ্ন শত
ত্যাগের মন্ত্র দীক্ষা লইয়া দলিলা চরণে বাসনা যত।

শঙ্কাহরণ শঙ্খ বাজে ঐ উদ্বোধনের গভীর ভেরী,
শক্তি লভুক তরুণ পরাণ প্রভাত হউক এ শর্ব্বরী;
ত্যাগের বিজয়-কেতন উড়াও, কাঁপিয়া উঠুক সকল লোক,
কোলাহল যত হোক অবসান বিলাস বাসনা চূর্ণ হোক।
এসো গো সবাই মিলি একসাথে কণ্ঠে লইয়া মিলন গান
মহামিলনের সিন্ধুর তীরে—সিদ্ধি লভুক তরুণ প্রাণ।

শ্রীজগদিন্দু বাগচী।

স্বামী বিবেকানন্দের পত্র

আমেরিকা।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকাল।

প্রিয়—

আমাদের কোন সংঘ নাই—আমরা কোন সংঘ গড়তেও চাই না। আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক) যা কিছু শিক্ষা দিতে, যা কিছু প্রচার করতে চায় তদ্বিষয়ে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

যদি তোমার ভিতরে ভাব থাকে, তবে অপর পাঁচজনকে তোমার দিকে আকৃষ্ট করবার কোন বাধাই হবে না। থিওসফিষ্টদের কার্য্যপ্রণালীর অনুসরণ আমরা কখনই করতে পারি না—তার সোজা কারণ এই যে, তারা একটি সংঘবদ্ধ সম্প্রদায়, আর আমরা তা নই।

আমার মূলমন্ত্র হচ্ছে—ব্যক্তিত্বের বিকাশ। এক একটি ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা ছাড়া আমার অন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর নাই। আমি অতি অল্পই জানি—সেই অল্পসল্প যা জানি, তার কিছু চেপে না রেখেই আমি শিক্ষা দিয়ে যাই। যে বিষয়টা জানি না, সেটা স্পষ্ট স্বীকারই করি যে উহা আমার জানা নাই; আর থিওসফিষ্ট, খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান বা জগতের অপর যার কাছ থেকেই হোক, লোক কিছু সাহায্য পাচ্ছে জানলে আমার এত আনন্দ হয় তা কি বলবো। আমি ত একজন সন্ন্যাসী—সুতরাং এ জগতে আমি ত কারও গুরু বা প্রভু নই, আমি ত সকলেরই দাস। যদি লোকে আমায় ভালবাসে বাসুক তাদের খুসি, ঘৃণা করে করুক—তাদের খুসি।

প্রত্যেককেই নিজের উদ্ধারসাধন নিজেকেই করতে হবে—প্রত্যেক-কেই নিজের কাজ নিজে করতে হবে। আমি কারও সাহায্য খুঁজি না, কেউ সাহায্য করতে এলে ত্যাগও করবো না, আর

জগতে কেউ আমার সাহায্য করুক, এ দাবী করবারও আমার অধিকার নাই। যে কেউ আমায় সাহায্য করেছে বা করবে, সে আমার প্রতি তার দয়া; উহাতে আমার দাবীদাওয়া কিছু নাই, সুতরাং উহার জন্য তার কাছে আমি চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞ।

যখন আমি সন্ন্যাসী হলাম, তখন আমি বুঝেসুঝেই ঐ পথ নিয়েছিলাম, বুঝেছিলাম শরীরটা অনাহারে মরবে তার জন্য আমায় প্রস্তুত থাকতে হবে। তাতে কি হয়েছে? আমি ত ভিখারী। আমার বন্ধুরা সব গরিব। আমি গরিবদের ভালবাসি। আমি দারিদ্র্যকে সাদরে বরণ করে নিই। কখনও কখনও যে আমায় উপবাস করে কাটাতে হয় তাতে আমি খুসী। আমি কারও সাহায্য চাই না—তাতে ফল কি? সত্য নিজের প্রচার নিজেই করবে, আমার সাহায্যের অভাবে সত্য নষ্ট হয়ে যাবে না।

শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন,—

"সুখেদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ—
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব·· ··· ।"

সুখদুঃখ, লাভ অলাভ, জয় অজয় সমান করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

এইরূপ অনন্ত ভালবাসা, সর্ব্বাবস্থায় এইরূপ অবিচলিত সাম্যভাব থাকলে এবং ঈর্ষ্যা দ্বেষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হলে তবে কাজ হয়। তাতেই কেবল কাজ হয়, আর কিছুতেই হয় না।

তোমাদের—
বিবেকানন্দ।

ভারতীয় ধর্ম্মে বিবেকানন্দ

বেদভূমি ভারতবর্ষে প্রাগ্ ঐতিহাসিক কাল হইতে সকল দুঃখের হেতুভূত এই ভববন্ধন ছিন্ন করিবার নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার ব্যাকুল ধারা বেশ উজ্জ্বল ভাবে জাতীয় সাহিত্যে, দর্শনে ও নানাবিধ ধর্ম্মগ্রন্থে, নীতিশাস্ত্রে পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এই চেষ্টা কেবলমাত্র গ্রন্থেই নিবদ্ধ হইত না। ভারতের সর্ব্বজাতিনির্ব্বিশেষে হিন্দু মাত্রেরই দৈনিক জীবনে এই চেষ্টার সার্থক রূপ অনবরত ক্রিয়মান হইয়া সমস্ত জীবনটাকেই যেন সেই মহান উদ্দেশ্যের দিকে অজ্ঞাতসারে টানিয়া লইয়া গিয়া দেশব্যাপী এক বিশেষ অভিনব সংস্কার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। এই অভিনব সংস্কারবশে কত বিপুল পার্থিব ঐশ্বর্য্যশালী রাজাধিরাজ বৈভবের শত প্রলোভন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নিষ্ঠুর দরিদ্রতা বরণ পূর্ব্বক বিজন অরণ্যবাসী হইয়াছেন, কত বিপুল শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান, অশেষ প্রতিভামণ্ডিত যশস্বী কত ভুবন বিজয়ী বীর নিজ প্রতিভালব্ধ ঐশ্বর্য্যকে একান্ত ক্ষুদ্র মনে করিয়া মহৎ হইতে মহত্তর এক অপূর্ব্ব অজানা অনন্ত গৌরব লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া দীনহীন কানন-বিহারী যতি পুরুষের চরণাশ্রয় লাভ করিয়া নিজকে সার্থক মনে করিয়াছে। এই সংস্কারের অনুকূল প্রেরণায় সুদূর অতীতে কপিলাচার্য্য দুঃখত্রয়াভিঘাতার্ত্ত হইয়া তাহার অবঘাতক-হেতু জিজ্ঞাসায় তাঁহার যে অপরিসীম জ্ঞান ভাণ্ডার, আর্ত্ত বিশ্বজনমণ্ডলীর সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন তাহারই পরিপোষণে কতরূপ বিভিন্নভাবে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় কল্পনা, পরবর্ত্তী মহাপুরুষগণের হৃদয়ে উদিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব সম্ভব করিয়াছে। সকল সম্প্রদায়েরই সেই এক চরম লক্ষ্য—দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি অথবা নিত্য অত্যন্ত সুখপ্রাপ্তি। উপায়ের বিভিন্নতায় চরম আদর্শের কোনরূপ বিঘ্ন হয় নাই, স্বল্প দৃষ্টি মানবের আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধ ভ্রম জন্মিবার যথেষ্টই কারণ রহিয়াছে এবং বিরোধ জ্ঞান না হওয়াই অহেতুক বিশ্বাসের অন্ধ পরিণাম বলিয়া নিশ্চয়ই সমালোচিত হইবার যোগ্য, কিন্তু কত সহস্র

বৎসর পরে বাঙ্গলার সামান্য নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণের মুখারবিন্দ হইতে জগতের বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মর্ম্মন্তুদ বিরোধ-বেদনের নিরাময়ক অমৃতধারা বহির্গত হইয়া যে সত্য জগতের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে তাহাতে আর সাম্প্রদায়িক ভেদ দৃষ্ট ও কোন ভক্তের হৃদয় অবিশ্বাসের নিবিড় ছায়ায় কলঙ্কিত হইবে না। বীরভক্ত বিবেকানন্দ সেই মহাপুরুষের সার্ব্বজনীন অমৃত বাণীর প্রচারক হইয়া পৃথিবীর অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ন্যায়ানুমোদিত বিশিষ্ট তর্কজালের দ্বারা জনহিতকর গভীর তত্ত্ব সমূহ অতিশয় প্রাঞ্জলভাবে সুধিগণের বোধায়ত্ত করিয়া যে অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন তাহার পরিণাম ইতিমধ্যেই আমরা সকলেই স্পষ্ট লক্ষ্য করিতেছি। স্বামিজী কেবলমাত্র আমাদের ন্যায় অনভিজ্ঞ অজ্ঞানীর উদ্ধার সাধন করেন নাই, পরন্তু যে সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণ নিজ নিজ প্রাধান্য স্থাপন জন্য যশোলিপ্সার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে না পারিয়া ন্যায় ও শিষ্টাচারের সীমা অতিক্রম করিতে কুণ্ঠিত হন নাই তাঁহাদেরও হীন জ্যোতিঃ-গৌরবের নবীন গরিমা পুনরানয়ন করিয়া গিয়াছেন, ভারতীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের মধ্যে স্বামিজীর স্থান কোথায় ইহাতেই আশা করি সকলেরই সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

পঞ্চবিংশতি তত্ত্বসমন্বিত ভারতীয় দর্শনের মূলভিত্তি সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিলাচার্য্যের পশ্চাতে যেরূপ বাসনাবিজয়ী নির্ব্বাণমুক্ত শান্তোজ্জ্বল প্রিয়দর্শন জ্ঞান-বুদ্ধ বুদ্ধদেব, সেইরূপ পৃথিবীর সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়কারী মানব ইতিহাসের অচিন্ত্য শান্তিবিধাতা ভগবৎ প্রেমাপ্লুত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পশ্চাতে শঙ্করকল্প নিবিড় সত্বোজ্জ্বল জ্ঞান-কর্ম্ম-সমন্বয়-ব্রতচারী বীরভক্ত বিবেকানন্দ। যেরূপ সাংখ্যের চরম পরিণতি গৌতম বুদ্ধে, তদ্রূপ রামকৃষ্ণের পূর্ণ পরিণাম বিবেকানন্দে। প্রকৃতি পুরুষের ভেদ-জ্ঞান অবলম্বন করিয়া যেরূপ সিদ্ধার্থ বাসনাধ্বংশপূর্ব্বক নির্ব্বাণ মুক্তিলাভের উপায় উদ্ভাবন দ্বারা জগতের যাবতীয় জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জীবনের ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সাকার নিরাকার, সগুণ নিগুর্ণ, সসীম অসীম, বিরাট ক্ষুদ্র, পাপ পুণ্য সকল দ্বন্দ্বসমন্বিত পরব্রহ্মের প্রত্যক্ষানুভূতি, তাঁহারি দ্বারা অনুপ্রাণিত তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য

বিবেকানন্দ ছন্দ ও অলঙ্কারযুক্ত মর্ম্মস্পর্শী ভাষার ভিতর দিয়া সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত ও উপনিষদের গভীরতম রহস্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বাস্তব সত্যস্বরূপ এ পৃথিবীর সম্মুখে উদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছেন। স্বামিজীর মত বিরাট প্রতিভাশালী জ্ঞানী জন্মগ্রহণ না করিলে কে বলিতে পারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নীরব ভাবোন্মাদনা এতদিন বাঙ্গলার স্মৃতি হইতে মুছিয়া যাইত কি না।

বৈদিক কাল হইতে ঈশ্বর সম্বন্ধে নানারূপ ধারণা চলিয়া আসিতেছে, অতিশয় সংক্ষিপ্ত ভাবে উহার সন্নিবেশ হইল :—

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥

ঋগ্বেদ—১ম, ১৬৪।

যিনি সকল দিব্যগুণ, কর্ম্ম এবং স্বভাব ও বিদ্যাযুক্ত, যাঁহাতে পৃথিবী সূর্য্য আদিলোক সংস্থিত আছে যিনি আকাশের তুল্য ব্যাপক এবং দেবগণেরও দেবতা, যে মনুষ্য সেই পরমেশ্বরকে জানে না এবং তাঁহার ধ্যান করে না সেই নাস্তিক সর্ব্বদা দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হয়।

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ

যিনি এই সংসারে যত প্রকার জগৎ আছে তাহাদের সকলে ব্যাপ্ত আছেন তিনিই ঈশ্বর।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ

যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে সূর্য্যাদি সমস্ত তেজোবিশিষ্ট লোকের উৎপত্তি স্থান এবং আধার এবং যিনি একমাত্র পতি, তিনিই ঈশ্বর।

উপনিষদ্—শুদ্ধ বুদ্ধ স্বভাবঃ "কুসুমাঞ্জলী ধৃতবাক্য"

কপিল—আদিবিজ্ঞানসিদ্ধঃ। আদি বিজ্ঞান কপিলই ঈশ্বর।

পাতঞ্জল—ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈঃ অপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।
অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ রূপ এই ক্লেশ, জাতি, আয়ু ও ভোগ এবং সংস্কার এই সমস্ত যাহাতে নাই এরূপ পুরুষবিশেষ ঈশ্বর।

শৈব—শিবঃ (ত্রিগুণের অতীত)

বৈষ্ণব—পুরুষোত্তমঃ

পৌরাণিক—পিতামহঃ

যাজ্ঞিক—যজ্ঞপুরুষঃ

দিগম্বর—নিবারণঃ অজ্ঞান অদৃষ্ট ও দেহাদিরহিত

মীমাংসা—উপাস্যত্বেনঃ দেশিতঃ প্রমাণদ্বারা যতদূর সম্ভব ধর্ম্মযুক্ত

চার্ব্বাক—লোকব্যবহার সিদ্ধঃ রাজা প্রভৃতি ।

ইহা ব্যতীত ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা রহিয়াছে। যথা—

'প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম 'অহং ব্রহ্মাস্মি' 'তত্ত্বমসি' 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'

স্বামিজীর ধারণা উপনিষদের সূত্রের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণ গ্রন্থের যে চারিটি লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে সেই ভাবটিই তাঁহার সমস্ত চিন্তার কেন্দ্র স্বরূপ হইয়া ভারতবর্ষে ও বহিঃপ্রদেশে অদ্বৈতবাদের একটি অভিনব ধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। আচার্য্য শঙ্কর ব্রাহ্মণ গ্রন্থের উল্লিখিত সূত্র অবলম্বনে যে অদ্বৈতবাদের দুর্ভেদ্য প্রাকার গড়িয়া তুলিয়াছিলেন এতদ উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ না থাকিলেও স্বামিজী স্বীয় ঈশ্বরবাদ এইরূপ ভাবে সর্ব্বসাধারণের দৈনিক জীবনে কার্য্যকরী ও ফলপ্রসূ করিয়া দিবার ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা ধর্ম্ম-জগতে সম্পূর্ণ নূতন বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে।

সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং (ছান্দোগ্য) এই বিশ্বে অগ্রে অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ছিল এই মহাসত্যের বিশ্লেষণে স্বামিজী চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে জগতের যা কিছু সবই একমাত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কিছুই নহে। তিনিই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, তিনি কেবল মাত্র স্রষ্টা নহেন তিনি সৃষ্টিও বটেন—

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ (মুণ্ডকোপনিষদ্)

পৃথিবীর যাহা কিছু দৃষ্ট, শ্রুত, স্পর্শিত, আস্বাদিত, আঘ্রাত ও কল্পিত সমস্তই সেই পরব্রহ্ম। তিনিই পুত্রে, তিনিই স্ত্রী ও স্বামীতে, তিনি কল্যাণে, তিনি অকল্যাণে, তিনিই পাপে এবং পাপীতে, জন্মে তিনি, মৃত্যুতে তিনি, স্বর্গে তিনি, নরকে তিনি, চিত্ত তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। তিনি অনন্ত, বেদান্তের গভীর রহস্যের ইহাই

গভীরতম রহস্যময় সৃজন, আর স্বামিজীই ইহার একমাত্র উদ্বোধক ও উপাসক।

যে দিন তিনি জলদ গম্ভীর ধ্বনিতে বলিয়াছিলেন—হে মানব, তোমরা সকলে অমৃতের পুত্র তোমরাই ঈশ্বর সেই পরব্রহ্ম, সেদিন সমস্ত জগৎ যেন স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার বাণী হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। আজ পর্য্যন্ত তাহার প্রতিধ্বনি মানব হৃদয়ের অন্তরতম দেশে বাজিয়া উঠিয়া উৎসাহ, আশা ও আনন্দে দুর্ব্বল হৃদয়গ্রন্থি সতেজ করিয়া তুলিতেছে। কে বলে তোমরা দুর্ব্বল, শক্তিহীন, হে অনন্ত শক্তিমান! কে বলে তোমরা পাপী। হে অনন্ত পুণ্য নিকেতন, তোমারি বিরাট রাজ্য, তুমি রাজাধিরাজ। কে আর এমন করিয়া জলন্ত ভাষায় অটল বিশ্বাসে চারিদিক মুখরিত করিয়াছে?

বৈদিকযুগ হইতে মায়া শব্দটি বিভিন্নার্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে মায়া শব্দটি ইন্দ্রজালের সহিত একার্থ-বোধকরূপে স্থানে স্থানে উল্লিখিত হইত। ইন্দ্রদেব মায়া দ্বারা বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিতেন এইরূপ উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই মায়া দার্শনিকগণের চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে প্রকৃতিকে মায়া নামে অভিহিত করা হইয়াছিল এবং এই মায়ার অধীশ্বর স্বয়ং মহেশ্বর।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥

ক্রমশঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক আলোচনায় মায়া শব্দ পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। বৌদ্ধ দর্শনের মায়াবাদ—বিজ্ঞানবাদ ভিন্ন আর কিছু নহে। Berkeleyর Idealism ও Humeএর Nihilism এর সহিত বৌদ্ধ মায়াবাদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

বেদান্তসার গ্রন্থে মায়ার যে সংজ্ঞা লিখিত হইয়াছে তাহা বিশেষ আলোচনার যোগ্য। সমস্ত অদ্বৈতবাদিগণের ইহা অনুমোদিত।

অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি, ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ ইতি বদন্তি। (বেদান্ত-সার)।

অবিদ্যা সৎও নহে অসৎও নহে উহা অনির্ব্বচনীয়, অবিদ্যা অসৎ

হইলে উহা কারণ স্বরূপ হইতে পারে না অথচ ইহাই জগতের আদি কারণ। অবিদ্যা সৎ হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে অবিদ্যার কখন নাশ হইত না। সৎ পদার্থের কখন জ্ঞানের দ্বারা বাধা হয় না, বা হইতে পারে না। শত সহস্র লোক একত্রিত হইয়াও আলোককে অন্ধকার বলিয়া চিন্তা করিলেও আলোকের অন্যথা হয় না অথচ দেখা যায় জ্ঞানোদয় হইবামাত্র অবিদ্যা অন্তর্হিত হইয়া যায়। সুতরাং তাহাকে সৎ বলা চলে না। অবিদ্যা ভাবরূপ অর্থাৎ শূন্যাবস্থা নহে। উহা জ্ঞানের অভাব নহে, বরং জ্ঞানবিরোধী একটি সুনিশ্চিত ভাব পদার্থ, যাহার বর্ত্তমানে পদার্থ স্বরূপাচ্ছাদিত ও বিক্ষিপ্ত হয়। বেদান্তসারে মায়া ও অবিদ্যা অভেদ ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে মায়া একটু বিশেষ ভাবে উপসংজ্ঞিত হইয়াছে—

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥

২।৯।৩৩

পরমার্থভূত আমি ছাড়া তাহার প্রতীতি হয় অথচ আমার আশ্রয় ব্যতিরেকে যাহার প্রতীতি হয় না তাহাকে মায়া-শক্তি বলে। শ্রীমদ্ভাগবতের এই সংজ্ঞা অতিশয় প্রাঞ্জল এবং ভাবব্যঞ্জক। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বর্ণনার সহিত বিশেষ ঐক্য রহিয়াছে. স্বামিজী মায়াকে ঠিক এই ভাবেই বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার মতে মায়া কোন একটি বাদ নহে। জগতে দৃশ্যতঃ যাহা অনুভব করা যায় তাহাই মায়া। ইহা দার্শনিকের ভাষায় বলিতে গেলে অনুবাদমাত্র। এই বিশাল দ্বন্দ্বপূর্ণ সৃষ্টিরাজ্যই মায়া—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ—

তথাপি প্রত্যেকেই জীবনটাকে জীবনের অসীম ব্যাকুলতা দিয়া অনন্ত কালের জন্য ঘিরিয়া রাখিবার প্রাণান্ত চেষ্টা করিতে দ্বিধা বোধ করিতেছে না—ইহাই মায়া। মাতা মনে করিতেছে প্রেমেই বুঝি তাহার স্নায়ুমণ্ডলীকে উন্মেষিত করিয়া দুর্ব্বৃত্ত পুত্রকে আকর্ষণ করিয়া রহিয়াছে—ইহাই মায়া। বলবান বলহীনের সর্ব্বনাশ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ

করিতেছে—ইহাই মায়া। যেখানে পুণ্য প্রায় সেখানেই পাপ। অনন্ত পুণ্য অনন্ত পাপ কোন অবস্থায় সম্ভব নহে, যাহা আনন্দের বিধানকর্ত্তা তাহাই আবার শত বেদনার উৎস। যেখানে জীবন সেইখানেই মৃত্যু। মৃত্যু রোধ করিতে হইলে জন্ম রোধ করিতে হইবে—ইহাই মায়া। এই যে বিশ্বব্যাপী সভ্য জগতের আন্তর্জাতিক দুঃখ অপনোদনের একান্ত চেষ্টা, কাল্পনিক সুরম্য শান্তি-রাজ্যস্থাপনের ব্যাকুলতা—ইহাই মায়া। এক স্থানে শান্তি রক্ষা করিতে গিয়া অন্যত্র দুঃখের সূচনা অপরিহার্য্য। Emerson এর Principle of Compensation ইহার অতি সুন্দর বিবৃতি। বিশ্ব-সংসারের তুলাদণ্ড কখনও ভারকেন্দ্রচ্যুত হয় না। জাগতিক অব্যতিক্রমা-নিয়মের প্রতিরোধ চেষ্টাই মায়া। এই মায়াবিজৃম্ভিত সংসারে একমাত্র সত্য—সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, উৎসব রোদন, সব সেই অনন্ত ব্রহ্ম-সমুদ্রের উদ্দেশ্যে পাগলের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া ধাবমান হইতেছে। কেবল সময় সাপেক্ষ। স্থাবর জঙ্গম, মনুষ্য কীট পতঙ্গ সকলেই এক অদ্বিতীয় পূর্ণতার স্বরূপ লাভ করিবে। বেদান্ত এই চরম শিক্ষা কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রচার করিয়াছিলেন, অক্ষতভাবে সেই ভাব পুনরায় এই জড়বাদের সমুন্নত বিকাশকালে বাঙ্গালার বক্ষ হইতে শ্রীস্বামিজী কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

(ক্রমশঃ) শ্রীকালীরঞ্জন লাহিড়ী।

বিবেক-বন্দনা

মৌন হয়ে আসে আজ বন্দন-গীতিকা,
কণ্ঠহারা সংগীতের মুখর ভাষণ ;
কে গাঁথিবে আজ হায় ছন্দের মালিকা,
কে করিবে আজ তব অর্ঘ্য বিরচন !
কে করিবে পূজা তব যোগ্য উপচারে,
এ বিশাল বিশ্ব মাঝে নাই কেহ নাই :

বহিয়া এনেছি ওগো দীন উপহারে
পূজার অরঘ তব, লহ আজ তাই।
চলে গেছ কবে তুমি মর্ত্ত্যলোক ত্যজি,
বারেক এ বিশ্বপানে চাহনি তো ফিবে।
বিলায়েছ সর্ব্বধন দীনহীন সাজি,
হৃদয়-শোণিত তব বক্ষ চিরে চিরে।
তোমার এ যোগ্যস্থান নহে ক্ষুদ্র ধরা,
স্বার্থ নিয়ে হেথা সদা শকুনির মত
অবিশ্রাম কাড়াকাড়ি; নির্ম্মমতা-ভরা
বঞ্চনার অট্টহাসি, দীনতার শত
ব্যর্থ অভিশাপ-বাণী, নিস্ফল ক্রন্দন,
কুটিলের বক্রগতি হীন পরিহাস,
আচ্ছন্ন করিয়া আছে এ বিশ্বগগন,—
—বিষাক্ত করিয়া দেছে বিশ্বের বাতাস।
তাই তোমা এ ধরণী পারেনি বাঁধিতে,
ধরণীর ধূলি রাশি চরণেতে দলি,
অসীমের শিশু তুমি দূর অসীমেতে
অভিমান-রুদ্ধ-প্রাণে গেছ কবে চলি।
সাধ্ব ধরা, হে মহান! বাঁধিবে কি দিয়া
তোমার হৃদয়খানি বাধা-বন্ধ-হীন
অসীম শূন্যের মত। তাই তব হিয়া
করেনি কটাক্ষ কভু ধরণীর দীন
পঙ্কিলতা ভরা এই আবর্জ্জনা চাহি,
বুভুক্ষিত দীনতার চাহনির মত!
এ ধরণী মাঝে হায়, নাহি—কিছু নাহি
তব যোগ্য প্রতিদান সুন্দর, অক্ষত!
ভিক্ষাবৃত্তি, হে মহান্! তোমারে কি সাজে,
অন্তহীন প্রেম-সিন্ধু হৃদয়ে তোমার।

তাই বুঝি দীনহীন ধরণীর মাঝে,
কোনো দিন চাহনিকো কোনো উপহার।
দেশে দেশে বিলায়েছ প্রেমের অমিয়,
ঝরিত নয়ন তব মানবের লাগি ;
প্রেমময় রূপে কিগো হে পরাণ-প্রিয়,
আজিও ও-নীলাম্বরে রহিয়াছ জাগি ?
চলে গেছ দূরে আজ তাই শত হিয়া
আজি মাগে হে স্বামিজী দরশন তব,
তোমা লাগি শোন ওই উঠিছে কাঁদিয়া
নিখিল ধরণী হায় কত নব নব
গীতছন্দে প্রতিদিন। চাহিয়া অম্বর
স্বপ্নময় সুপ্তশান্ত নীরব নিশায়,
তোমা লাগি হে মহান। হে চির-সুন্দর,
ধরণী চাহিয়া থাকে কী নীরবে হায়।
অবহেলে হৃদয়ের পরম রতন,
মানবের মূঢ় প্রাণ অনাদর ভরে,
অতলের তলে হায় দিয়ায় বিসর্জ্জন,
ক্ষণিক ভ্রান্তির মোহে চির দিন তরে।
কোন্ যুগ হতে ওরে মানব-হৃদয়।
শিখেছিস এই মত মূঢ় অবহেলা,
কবে হতে ওরে তুই আপনার ক্ষয়
সাধিতে শিখিলি নিজে করি এই খেলা ?
আজি হায়, রে অবোধ ! বিফল ক্রন্দন,
বিফল আজি রে তোর যত উপহার,
স্বপ্নসম শূন্য আজ সকল সাধন,—
—সহস্র গীতিকা তোর শত ফুল হার।
শূন্য গেহ মাঝে কেহ আসিবে না আর,
রে অবোধ। অন্তহীন বিরহ কেবল,

আজি হ'তে হ'বে তোর হৃদয়ের হার ;
যুগান্ত ধরিয়া শুধু তপ্ত অশ্রুজল
নির্ঝরের ধারা সম ঝরিবে নয়নে
সারাবর্ষ ব্যাপি ; ওরে তোর ও-পরাণ
গাহিবে রে চিরদিন তন্দ্রা জাগরণে
যুগান্তের সকরুণ বিরহের গান।
তবু আজ জ্বাল দীপ রে অবোধ প্রাণ।
অন্তর-মন্দিরে তোর তারি লাগি তবু,
যদি হায়। আসে ফিরে ত্যজি অভিমান,
আর যেন নাহি যায় ফিরিয়া সে কভু।

শ্রীজগদিন্দু বাগচী।

শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার বিচার

কোন কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি বলেন—আচার্য্য শঙ্কর মতে যখন বর্ণাশ্রমাচারই ব্রহ্মজ্ঞান বা মুক্তির প্রতি পরম্পরা-সম্বন্ধে কারণ, আর তাহা যখন বৈদিকবিধিমূলক, তখন বেদহীন জনসাধারণ কি করিয়া আচার্য্যমতের আশ্রয়লাভ করিতে পারে? জন্ম হইতে যাহারা বেদাধ্যয়নে অনধিকারী তাহাদের পক্ষে বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান কি করিয়া সম্ভব হয়? বেদ হইতে যে ব্রহ্মজ্ঞান হয় তাহাই সুদৃঢ়; সুতরাং তাহাই শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞান, তাহা ত আচার্য্যেরই মত। অতএব আচার্য্যমতবাদকে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম কথনই বলা যায় না।

কেহ বলেন, আচার্য্য যখন শূদ্রের বেদাধ্যয়নে অনধিকার-জ্ঞাপনার্থ—"শূদ্র বেদাধ্যয়ন করিলে বা বেদশ্রবণ করিলে তাহাদের কর্ণে গলিত সীসক ঢালিয়া দিবে"—এতাদৃশ শাস্ত্রীয় বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন,

তখন তাঁহার মত সার্ব্বভৌমিক হওয়া দূরে থাকুক, তাহা অতি সঙ্কীর্ণ মতই বলিতে হইবে। তিনি কি অনুরূপ নিষেধবাক্য উদ্ধৃত করিতে পারিতেন না? অতএব শূদ্রের বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই এবং আচার্য্যমতের সার্ব্বভৌমিকত্ব কল্পনাও বৃথা। এজন্য বেদান্তদর্শন অপশূদ্র-প্রকরণ অর্থাৎ ১।৩।২৮ হইতে ৩৩ সূত্র দ্রষ্টব্য।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, বর্ণশ্রমাচার কখনই ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকত্বের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, প্রত্যুত যে ধর্ম্মে বর্ণশ্রমাচার বিহিত তাহাই সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম হইবার যোগ্য। যেহেতু অধিকার বা সামর্থ্যই বর্ণ ও আশ্রমভেদের কারণ। অধিকার বা সামর্থ্য বিবেচনা করিয়া বর্ণাশ্রমাচাররূপ মার্গ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাই যে স্বাভাবিক পথ এ বিষয় কোন মনীষীই সন্দেহ করেন নাই। যে ধর্ম্মে সকলের অধিকার অর্থাৎ সামর্থ্যানুরূপ ব্যবস্থা থাকে, তাহাই সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম হইবার যোগ্য। যে ধর্ম্মে সামর্থ্যের অনুরূপ ব্যবস্থা নাই, পক্ষান্তরে সকলেরই একরূপ ব্যবস্থা দেওয়া হয় তাহা কখন স্থায়ী হইতে পারে না, এবং সকলের গ্রহণীয়ও হইতে পারে না; সুতরাং সার্ব্বভৌমও হয় না। ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, এতাদৃশ বহু ধর্ম্ম তাদৃশ ব্যবস্থার অভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে বা মৃতকল্প হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু বৈদিকধর্ম্মে এই ব্যবস্থা থাকায় তাহা অসংখ্য তাদৃশ ধর্ম্ম আত্মসাৎ করিয়া অদ্যাবধি মস্তক উত্তোলন করিয়া স্বমহিমায় বিরাজিত। বস্তুতঃ প্রকৃতির অনুসরণ করিয়াই প্রকৃতিকে বশীভূত করিতে হয়; প্রথম হইতেই প্রকৃতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কেহই জয়ী হইতে পারে না। এই কারণে বর্ণাশ্রমাচার অনুসরণ করিতে করিতে যেমন সামর্থ্যবৃদ্ধি হইতে থাকে, তেমনই কর্ত্তব্যেরও পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। শেষে বর্ণাশ্রমের অতীত অবস্থাই লব্ধ হয় এবং মুক্তি অধিগত হইয়া থাকে। এই কারণে আর্য্যমতবাদ বর্ণাশ্রমাচার অবলম্বন করায় অসার্ব্বভৌম-মতবাদ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

তাহার পর, বেদাধ্যয়ন না হইলে যে ব্রহ্মজ্ঞান বা মুক্তি হয় না—তাহা কে বলিল? ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারাও ব্রহ্মজ্ঞান হইতে

পারে। বেদমধ্যে যাহা বীজাকারে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, ইতিহাস ও পুরাণাদিতে তাহাই সহজ ও বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে। স্ত্রী ও শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানের জন্যই ইতিহাস ও পুরাণের আবির্ভাব। দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভিন্ন যে বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই বলা হইয়াছে, তাহা স্ত্রী ও শূদ্রকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে নহে, প্রত্যুত তাহাদিগের উপকারার্থই বুঝিতে হইবে। তাহাদের স্বভাবানুরূপ কার্য্যের অনুরোধে বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক জ্ঞানলাভ তাহাদের পক্ষে সুবিধাকর হয় না। বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক জ্ঞানলাভ করিতে যত পরিশ্রম ও সময় আবশ্যক, তাহা স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে সম্ভব হয় না। ইহা বিবেচনা করিয়াই অথবা স্বভাবতঃই তাহাদের বেদাধ্যয়ন প্রবৃত্তি হয় না বলিয়াই তাহাদিগের জন্য সহজবোধ্য ইতিহাস পুরাণাদির দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বিধান প্রদান করা হইয়াছে, বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক জ্ঞান লাভের বিধান প্রদান করা হয় নাই। বস্তুতঃ আচার্য্য বেদান্তদর্শনের ভাষ্যমধ্যে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে শূদ্রাদির বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার না থাকিলেও ইতিহাস ও পুরাণাদিপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে, যথা—

"শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান" ইতি চ ইতিহাস পুরাণাধিগমে চাতুর্ব্বর্ণস্য অধিকার-স্মরণাৎ বেদপূর্ব্বকস্তু নাস্ত্যধিকার শূদ্রানাম্ ইতি স্থিতম্।" (১।৩।৩৮ সূত্র ভাষ্য)।

আর এই অধিকার এক বিজ্ঞানভিক্ষু ভিন্ন অপর কোন আচার্য্য দেন নাই, সুতরাং আচার্য্যের মতে সার্ব্বভৌমিকত্বের বাধা নাই। কর্ণে-গলিত শীষক ঢালিয়া দিবার বিধায়ক বাক্য যে তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা বেদে শূদ্রের অধিকার নাই ইহা শাস্ত্র বিশেষে কত দৃঢ়তাসহকারে বলা হইয়াছে, তাহার প্রমাণ প্রদর্শনার্থ অন্য কোন অভিপ্রায়ে নহে। বস্তুতঃ কর্ণে গলিত শীষক ঢালিয়া দিবার ব্যবস্থা দিয়া যদি কোন কঠোরতা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা গৌতম-সংহিতাকারের হইয়াছে, তাহা আচার্য্যের নহে। যিনি সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম বা নিজেকেই দেখেন, তাঁহার অনুদারতা কখনই সম্ভবপর নহে।

কিন্তু,—সাধারণতঃ বলা হয়, আচার্য্যমতে শূদ্রাদির বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য ইচ্ছা, বেদে অভ্রান্ত বুদ্ধিরূপা শ্রদ্ধা এবং বেদার্থগ্রহণ ও ধারণের উপযোগী বুদ্ধিবলরূপ যে সামর্থ্য, সেই সামর্থ্য নাই বলিয়াই যে তাহাদিগকে বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যার অনধিকারী বলা হয়, তাহা নহে। কারণ, তাহা হইলে তাহাও সঙ্গত হইবে না। যেহেতু কেহ কেহ বলেন—শূদ্রের মধ্যে এরূপ শূদ্রও দেখা যায়, যাহাদের বিবিদিষা, শ্রদ্ধা এবং তাদৃশ বুদ্ধির বল রূপ সামর্থ্য আছে, সুতরাং এরূপ বলিলে প্রত্যক্ষবিরোধ হইবে। কেহ কেহ বলেন "ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ" "শূদ্রসমীপে নাধ্যেতব্যম্" "স্ত্রীশূদ্রৌ যদি জানীয়াৎ স মৃতঃ সন্ অধোগচ্ছতি'

ইত্যাদি কতিপয় শাস্ত্রবিশেষবলে শূদ্রকুলে জন্মনিবন্ধনই লোকে বেদাধ্যয়নে অনধিকারী হয়। তাহারা চলন্ত-শ্মশানসদৃশ, তাহারা একজাতি, তাহাদের কোন সংস্কার নাই, তাহাদিগকে বেদাধ্যয়ন করাইলে গুরুশিষ্য উভয়ের নরক ও অধোগতি হয়—ইহাই আচার্য্যের মত।

টীকাকারগণ আচার্য্যের ভাষ্য হইতেই প্রমাণ করেন যে, যে ব্যক্তি শূদ্রকুলে জন্মিয়াছে, তাহার সেই জন্মনিবন্ধনই সে বেদাধ্যয়নে অনধিকারী। জাতি শূদ্রের বেদে অধিকার নাই। ইহাদের মধ্যে আনন্দগিরি উক্ত ভাষ্যের ব্যাখ্যায় আচার্য্যবাক্যের পুনরুক্তি করিয়া বলিয়াছেন-

"অর্থবাদিকশূদ্রশব্দস্য উক্তনীত্যা ক্ষত্রিয়ে অন্বয়াৎ ন জাতিশূদ্রস্য বেদদ্বারা অধিকারো বিদ্যায়াম্ ইতি উপসংহরতি—'ইতি স্থিতম্" ইতি।"

অর্থাৎ নিন্দাবোধক শূদ্র শব্দের উক্ত প্রকারে ক্ষত্রিয়ে প্রয়োগ হওয়ায় জাতিশূদ্রের বেদদ্বারা ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই ইহাই উপসংহার করিয়া ভাষ্যকার বলিতেছেন—"ইতি স্থিতম্" ইত্যাদি।

কিন্তু ভামতীটীকাকার পরিমলকার অপ্পয়দীক্ষিত পরিমলে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারই নাই, যথা—

ননু শূদ্রাণাং বেদশ্রবণাদিষু দণ্ডবিধানেন নিষেধাগমেঽপি বেদবিদ্যোঽবগত্য বেদাধ্যয়নরহিতানাং স্ত্রীণামিব বিদ্যানুষ্ঠানং কিংনস্যাৎ। তস্মাৎ— ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্।

ন চাস্যোপদিশেদ্ ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ॥

যো হ্যস্য ধর্ম্মমাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতি ব্রতম্।
সোঽসংবৃতং নাম তমঃ সহ তেনৈব গচ্ছতি॥

ইতি শূদ্রাণাং যে বৈশেষিকধর্ম্মাঃ যে চ সামান্যধর্ম্মাঃ শূদ্রাসাধারণাঃ তদ্ব্যতিরিক্তবৈদিকার্থগ্রাহণে সহ তেনৈব শূদ্রেণ গুরোর্নরকপাতোক্তেঃ। কথং তর্হি ভাষ্যে তেষাং পুরাণেতিহাসাদিমূলবিদ্যানুষ্ঠানাভ্যুপগমঃ? "শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্" ইতি স্মরণাৎ। তস্য দৃষ্টার্থত্বায় পুরাণেতিহাস-শৈববৈষ্ণবাদ্যাগমবর্ণিতযজমানকর্তৃকবৈদিকমন্ত্রাদ্যুচ্চারণানপেক্ষব্রতনিয়মো-পাসনাদি সম্ভবতি ইতি তদভিপ্রায়ঃ।"

এস্থলে পরিমলকার ইতিহাসপুরাণোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান হয়—ইহা স্বীকার করিলেন না। কিন্তু তদুক্ত বেদমন্ত্রবর্জ্জিত ব্রতনিয়মোপাসনাদিই হয় এইমাত্র স্বীকার করিলেন। এমন কি ব্রহ্মজ্ঞান হয় কিনা তাহা আর বলিলেন না।

এইরূপ ইঁহাদের মতে আচার্য্যের মতও এই যে, ভগবান্ শূদ্রাদি-কুলকে বেদাধ্যয়নের অনধিকারী করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। কারণ, তাঁর "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" অর্থাৎ গুণ ও কর্ম্মের বিভাগসংস্কারে চারিবর্ণের চারি প্রকার মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং "পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্" অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের পরিচর্য্যারূপ কর্ম্ম শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম ইত্যাদি বাক্যে ইহাই বলা হইয়াছে। বেদেও "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ ঊরুঃ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়তঃ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ মুখ, বাহু ক্ষত্রিয়, ঊরু বৈশ্য, এবং পদ শূদ্র এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণ হয় গোত্ব অশ্বত্বের ন্যায় ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি পৃথক্ পৃথক্ জাতি। শূদ্রাদি জন্মবশতঃই অনধিকারী, ব্রাহ্মণাদি জন্মবশতঃই অধিকারী। গুণ ও কর্ম্মদ্বারা একজন্মে শূদ্র দ্বিজ হইতে পারে না। যথাশাস্ত্র কর্ম্ম করিলে জন্মান্তরে শূদ্র দ্বিজ হইতে পারে। বেদাধ্যয়ন উপনীতেরই বিহিত, উপনয়ন দ্বিজেরই বিহিত, এই দ্বিজত্ব দ্বিজকুলে জন্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। শাস্ত্রেও আছে "ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যান্ন সংশয়" (অনুশাসন পর্ব্ব ৪৭।২৮) অর্থাৎ ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতব্যক্তি ব্রাহ্মণই হন, এবং

"সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ সজাতয়ঃ" (যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি) অর্থাৎ সজাতীয় পত্নীতে সজাতীয়ের সন্তান সজাতীয় হয়। সুতরাং শূদ্রের বেদাধ্যয়ন একেবারেই অসম্ভব ও অসঙ্গত, এবং গুণকর্ম্মজন্য যে জাতি তাহা বেদাধ্যয়নের অধিকার দান করে না। জন্মগত যে ব্রাহ্মণাদি জাতিত্রয় তাহাই সেই অধিকার দান করে। আর তাহাই বেদাধ্যয়নাদির প্রতি মুখ্য কারণ। অতএব বেদাধ্যয়ন করিলে শূদ্রাদির উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের পাপই হইবে, তাহাদের নরক এবং অধোগতিই অনিবার্য্য। সুতরাং শূদ্রকুলে যে জন্মিয়াছে, তাহার বেদাধ্যয়নে যে ইচ্ছাদি, তাহা প্রকৃত ইচ্ছাদিই নহে, তাহা লোভ বা ঈর্ষ্যাবিশেষ। যদি তাহার প্রকৃত কল্যাণে ইচ্ছাদিই থাকিবে, তবে সে শূদ্রকুলে জন্মিবে কেন? আর যদি কদাচিৎ কোন শূদ্রের এইরূপ ইচ্ছাদি জন্মে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি তদনুসারে বেদাধ্যয়নাদি দ্বিজকর্ম্ম যেন না করে, পরন্তু শূদ্রোচিত কর্ম্মই করে, আর তাহা হইলে পরজন্মে তাহার সেই ইচ্ছাদির ফলে সে বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবে। অতএব আচার্য্যমতে অসার্ব্বভৌমিকত্ব দোষ দুরপনেয়।

কিন্তু ইহা আচার্য্যের মত নহে। সুতরাং তন্মতের অসার্ব্বভৌমিকত্ব দোষ দুরপনেয় নহে। প্রথম কারণ—তিনি যখন ব্রহ্মবিদ্যায় ইতিহাস, পুরাণাদিপূর্ব্বক শূদ্রকে অধিকার দিয়াছেন, তখন ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য উপযুক্ত শূদ্রকে, অর্থাৎ যে শূদ্রের বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানের ইচ্ছা আছে, বেদে অভ্রান্ত বুদ্ধিরূপা শ্রদ্ধা আছে এবং বেদার্থগ্রহণ ও ধারণা উপযোগী বিদ্যা ও বুদ্ধিবলরূপ সামর্থ্য আছে, সে শূদ্রকে বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যারও অধিকার দিয়াছেন। যখন সুদুর্ল্লভ ব্রহ্মবিদ্যারূপ অমূল্য রত্নকে তিনি শূদ্রাদিকে দিলেন, তখন যে তাহার উপায়ভূত বেদাধ্যয়নকে তিনি তাহাদিগকে দিবেন না, তাহা কি কখন সম্ভব হয়? যেখানে সকলে সমান, সেস্থলে যাইতে দেওয়া হইল, কিন্তু তথায় যাইবার দুইটি পথের মধ্যে একটি পথে যাইতে দেওয়া হইবে না, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। যদি কদাচিৎ এরূপ ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, সামর্থ্যের তারতম্যানুসারে এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, নচেৎ অন্য কোন

কারণে বা অলৌকিক কোন কারণে এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিলে উহা কখন বুদ্ধিমানের আস্থেয় হইতে পারে না। সুতরাং স্ত্রী ও শূদ্রাদিকে ইতিহাসপুরাণাদিপূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য যে ব্যবস্থা, তাহা তাহাদের সুবিধার জন্য, তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্য নহে বা বেদাধ্যয়ন করিলে পাপ হইবে বলিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নহে।

তাহার পর ইতিহাস ও পুরাণাদির দ্বারা যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহাতে ভেদ কোথায়? উপনিষদে যে সকল শ্লোক আছে, সেই সকল শ্লোকই ত গীতা প্রভৃতি গ্রন্থে আছে। পার্থক্য কেবল ছুটি একটি শব্দে বা বর্ণে। যথা, কঠোপনিষদে আছে "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ, নায়ং কুতশ্চিন্নবভূব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥" (২।১৮) আর গীতায় আছে "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥" (২।২০) এইরূপ বহু ঐক্য দেখা যায়। অতএব এই যে ভেদ, ইহা সামাজিক ভেদ মাত্র, ইহার দ্বারা জ্ঞানের কোন বিশেষত্ব লক্ষ্য করা হয় নাই।

যদি বলা যায় ইতিহাসপুরাণপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যা ও বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে পার্থক্য আছে। তাহা হইলে বলিব, তাহার ফল যে মুক্তি তাহাতেও কি তাহা হইলে পার্থক্য আছে? তাহা বোধ হয় কেহই স্বীকার করিবেন না। পূর্ব্বে যে এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশেষ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা জ্ঞানের বিষয়গত নহে, কিন্তু সংশয় ও বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনাশূন্যতার মাত্রাসংক্রান্ত। বাস্তবিক ব্রহ্মজ্ঞান ও মুক্তি একই বস্তু। ব্রহ্মস্বরূপতাই মুক্তি। অতএব যদি পার্থক্য থাকিত, তাহা হইলে "বেদপূর্ব্বক হয় না, ইতিহাসপুরাণপূর্ব্বক হয়" এই কথাই অসঙ্গত হইত। সুতরাং মার্গভেদে ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার দিবার লক্ষ্য—সামর্থ্য ও সুবিধামাত্র, অন্য কিছু নহে।

শূদ্র বেদাধ্যয়ন বা শ্রবণ মাত্র করিলে যে পাপ হয় বলা হইয়াছে, তাহা নিম্নাধিকারী শূদ্রকে অনধিকার চর্চ্চা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য ভয়প্রদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ, তাহাকে এ কার্য্য হইতে

বিরত করিবার জন্য বলা হইয়াছে যে, তাহার কর্ণে গলিত শীষক বা গালা ঢালিয়া দিবে, তাহার জিহ্বা কাটিয়া লইবে, তাহার শরীর ভেদ করিয়া দিবে ইত্যাদি। বস্তুতঃ এসব কার্য্যের ফল প্রাণবধ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং এক কথায় প্রাণদণ্ড হইবে এ কথা না বলিয়া যখন ঐরূপ ভাবে বলা হইয়াছে, তখন ইহা ভয়প্রদর্শন ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে ?

যদি বলা যায় নৃসিংহপূর্ব্বতাপনায় উপনিষদে আছে—"সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রায় নেচ্ছান্তি, দ্বাত্রিংশদক্ষরং সাম জানীয়াৎ যো জানাতি সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি সাবিত্রীং লক্ষ্মীং যজুঃ প্রণবং যদি জানীয়াৎ স্ত্রীশূদ্রঃ স মৃতোঽধোগচ্ছতি, তস্মাৎ সর্ব্বদা না চষ্টে, যদি আচষ্টে স আচার্য্যঃ তেনৈব মৃতোঽধোগচ্ছতি।"

অর্থাৎ সাবিত্রী, প্রণব, যজুঃ এবং লক্ষ্মী স্ত্রীশূদ্রকে দিবে না, দ্বাত্রিংশৎ অক্ষর সামকে জানিবে, যে জানে সে অমৃতকে প্রাপ্ত হয়। স্ত্রী ও শূদ্র যদি সাবিত্রী লক্ষ্মী যজুঃ ও প্রণব জানে, সে মরিয়া অধোগমন করে। সেই হেতু সর্ব্বদা বলিবে না, যদি কেহ আচার্য্য বলেন, তবে সেই আচার্য্য মরিয়া তাহার সহিত অধোগমন করেন, ইত্যাদি। ইহাতেও স্ত্রী ও শূদ্রের নরক প্রাপ্তি কর্ণে শীসকাদি ঢালিয়া দিবার মত করিয়া ভয় দেখান কিছু বলা হয় নাই। কেবল অধোগতির কথা, সুতরাং তাহার কারণ পাপের কথাই আছে। তাহার উত্তর এই যে, এস্থলে স্ত্রীশূদ্র শব্দের অর্থ স্ত্রীজাতি বা শূদ্রজাতি নহে, পরন্তু স্ত্রীশব্দে স্ত্রীগুণযুক্ত ব্যক্তি, এবং শূদ্র শব্দে শূদ্রভাবাপন্ন ব্যক্তি। অর্থাৎ অনধিকারী স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে এই নিষেধ। কারণ, তাহারা উহা শ্রবণ করিলে উহার অর্থ বুঝিতে পারিবে না, এবং উহার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইবে এবং অপরের হৃদয়ে অশ্রদ্ধা উৎপাদন করিবে। এই সকল কার্য্যের ফল অধোগতি ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? এইজন্য তাহাদের পক্ষে এই নিষেধ, সুতরাং এই পাপ শ্রবণ অধ্যয়ন বা উচ্চারণ মাত্র জন্য নহে, পরন্তু বেদের অপব্যবহার জন্য। বস্তুতঃ স্ত্রীদিগের মধ্যে আত্রেয় বংশসম্ভূতা স্ত্রীগণের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে, ইহা শাস্ত্রেই বলিয়াছেন। আর ইহা এতাদৃশ পাপ বলিয়া যে ব্যক্তি

বেদের এতাদৃশ অপব্যবহার করিবে না, তাহার সে পাপও হইবে না। অতএব শূদ্র বেদ শ্রবণ করিলেই যে পাপ হয়, তাহা নহে।

তাহার পর আর এক কথা—এস্থলে যে পাপের কথা বলা হইয়াছে, তাহা এক্ষেত্রে পাপ হয় বলিবার উদ্দেশ্যে বলা হয় নাই। কারণ, এস্থলে যে প্রণব সাবিত্রী যজুঃ প্রভৃতির জ্ঞানে অধোগমনের কথা আছে, সেই প্রণবাদি যে সামের অঙ্গ তাহার জ্ঞানে স্ত্রীশূদ্রেরও অধিকার আছে—ইহা উক্ত উপনিষদ্ ভাগ পড়িলেই বুঝা যায় এবং আচার্য্য ইহার ভাষ্য মধ্যেও এই কথাই বলিয়াছেন। প্রণব বেদের অঙ্গ বলিয়া যদি শূদ্রের বেদশ্রবণ পাপ হয় তবে সামও বেদের অঙ্গ বলিয়া বেদ শ্রবণে পাপ হয় না বলিতে হইবে। ইহা কিন্তু বিরুদ্ধ কথা, অতএব ইহার অভিপ্রায় অন্য—ইহাই বলিতে হইবে। আর অঙ্গ শ্রবণে পাপ হয় কিন্তু অঙ্গী শ্রবণে পাপ হয় না—ইহা যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে প্রণবাদি মন্ত্রের অর্থের গহনতাই কারণ, অর্থাৎ অনধিকারীকে অনধিকার চর্চ্চা হইতে নিবৃত্ত করাই উদ্দেশ্য ; সুতরাং এইস্থলে অধোগমনের উল্লেখমধ্যে যে ভয়প্রদর্শনউদ্দেশ্যও নিহিত আছে তাহা বেশ বুঝা যায়। এস্থলে যে ভাষ্য, তাহা এই—

সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রায়—স্ত্রীচ শূদ্রশ্চ স্ত্রীশূদ্রং তস্মৈ স্ত্রীশূদ্রায়, নেচ্ছন্তি ইতি নিষেধং কুর্ব্বন্ প্রধানোপাসনায়াং স্ত্রীশূদ্রস্যাপি অধিকারং দর্শয়তি।

এস্থলে নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদ্ মধ্যে ইহা যে ভাবে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা এই—

> "সর্ব্বে বেদাঃ প্রণবাদিকাঃ, তং প্রণবং তৎসাম্নোঽঙ্গং বেদ, স ত্রীন্ লোকান্ জয়তি, চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা মহালক্ষ্মীর্যজুঃ তৎসাম্নোঽঙ্গং বেদ স আয়ুর্যশঃ কীর্ত্তিজ্ঞানৈশ্বর্য্যবান্ ভবতি, তস্মাৎ ইদং সাঙ্গং সাম জানীয়াৎ, যো জানীতে সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি, সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রায় নেচ্ছন্তি, দ্বাত্রিংশদক্ষরং সাম জানীয়াৎ, যো জানীতে সোঽমৃতত্বং চ গচ্ছতি, সাবিত্রীং লক্ষ্মীং যজুঃ প্রণবং যদি জানীয়াৎ স্ত্রীশূদ্রঃ স মৃতোঽধোগচ্ছতি, তস্মাৎ সর্ব্বদা নাচষ্টে, যদি আচষ্টে স আচার্য্যঃ তেনৈব মৃতোঽধো গচ্ছতি॥"

ক্রমশঃ)   শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

ওমার-প্রসাদ

[পারসীক ওমার খায়েমের উপবনে ফুল ফুটিত, পাপিয়া ডাকিত, সাকী সুরাপাত্র পূর্ণ করিত। কবি ও জ্যোতিষী ওমার বহু দিন হইল জমী লইয়াছেন। বৃটিশ মালাকর ফিট্‌জেরাল্‌ড ওমারের পুষ্পবন হইতে ফুল চয়ন করিয়া মাল্য গ্রন্থন করিয়াছিলেন। একদিন সেই মাল্য আমার হাতে পড়ে। মালা দেখিয়া আমারও মালা গাঁথিবার সখ চাপিল। 'মেড-ইন-বৃটেন' মাল্য ছিন্ন করিয়া, বহুমূল্য হেম-তারের পরিবর্ত্তে দেশী দেব-কাপাসের সূত্রে ছিন্ন মাল্যের পুষ্প দিয়া মালা গাঁথিলাম। কিন্তু এ মালা কি তেমন হইবে? হউক বা না'ই হউক, আমার কিন্তু মালা গাঁথিয়া আনন্দ হইল। ইহাই যথেষ্ট।]

১।

কপোতের করুণ কাকলী
ওই আসে বাঁশবন হতে,
অতীতের কত তীব্র ব্যথা
ভেসে ওঠে ওই গীত স্রোতে।

২।

প্রদোষের স্বচ্ছ নীলাকাশ
ধীরে হয় নিষ্প্রভ মলিন,
প্রতীচীতে জবাপুষ্প আভা
ধীরে হয় আকাশে বিলীন।

৩।

দূর গ্রামে উঠে শঙ্খ রোল
গৃহস্থের দেবতা মন্দিরে;
এক মাত্র সঙ্গীহীন তারা
জ্বলে ঊর্দ্ধে সায়াহ্ন তিমিরে।

৪ ।

বকুলের গন্ধে ভরা বায়ু,
অন্তরীক্ষে নক্ষত্রের মেলা,
বিশ্ব স্তব্ধ গভীর আনন্দে
নিরানন্দ আমিই একেলা ।

৫ ।

ও কি শব্দ ? সাকী বুঝি আসে ?
রুণু ঝুনু নূপুর নিক্কণ ,
জাগাও আনন্দ ; চন্দ্রোদয়ে
অন্ধকার থাকে কতক্ষণ ?

৬ ।

ছায়া মূর্ত্তি, ওই আসে সাকী,
সুরাভাণ্ড শোভে ডান হাতে,
লক্ষ্মী যেন সমুদ্র আলোড়ি
উঠিতেছে সৃষ্টির প্রভাতে ।

৭ ।

এস সাকি, বোসো তৃণাসনে,
শিরোপরি শতলক্ষ তারা ;
ঢালো মদ , এতক্ষণ ধরে,
বিনা মদে আছি মৃত পারা ।

৮ ।

কি সুন্দর পুরাণ মদিরা
নব ভাণ্ডে লভিয়াছে স্থান !
ধন্য তুমি, ধন্য সুরা, ধন্য—
ভাণ্ড যেবা করেছে নির্ম্মাণ ।

৯ ।

শোন সাকি, কহি পূর্ব্ব কথা—
পূর্ণগ্রাস গ্রহণ সে দিন,
বৃদ্ধ এক কুম্ভকার গৃহে
দাঁড়ায়ে ছিলাম সঙ্গিহীন ।

১০ ।

চারি ধারে কুম্ভ কুম্ভী ঘট
কত কি যে ছিল থাকে থাক ;
কুম্ভগ্রামে সহসা শুনিনু
কথাবার্ত্তা , আমি তো অবাক ।

১১ ।

কেহ মৌন শ্রোতা, কেহ বক্তা,
কেহ করে মীমাংসা বিচার ;
এক কুম্ভ কহিল রুষি ।—
"কেবা কুম্ভ ? কেবা কুম্ভকার ?"

১২ ।

অন্য কুম্ভ কহে অতঃপর,—
"মাথা নাই, শুধু গলাবাজি .
"সার কথা শোন মোর কাছে—
"বড তিনি দয়াবান কাজী—

১৩ ।

"সামান্য মৃত্তিকা হতে যিনি
"তুলেছেন মম উপাদান ,
এত যত্ন সহ যিনি মোরে
"করেছেন আকার প্রদান ,

১৪ ।

"সে কি শুধু মৃত্তিকায় পুনঃ
"পদাঘাতে নিক্ষেপের তরে ?—
"হেন চিন্তা আহাম্মক বিনা
"নাহি জাগে কাহারো অন্তরে ,

১৫ ।

"দুষ্ট শিশু সেও যে ভাঙ্গে না
"যে পাত্রে তুষ্টিতে করে পান ,

"প্রেমবশে করেছেন যিনি
"কুম্ভ কুম্ভী ঘটাদি নির্ম্মাণ,

১৬।

"কাঁধ তিনি,—এও কি সম্ভব ?—
"করিবেন স্বকীর্ত্তি বিনষ্ট ;
"নষ্ট শিশু চেয়ে তিনি কি বে—
"এত নীচ, এত বুদ্ধিভ্রষ্ট।"

১৭।

কেহ নাহি করিল উত্তর
কৃষ্ণগামে কিছুক্ষণ ধরে ;
পরে কৃষ্ণ কদাকার এক
কহিয়া উঠিল তারস্বরে—

১৮।

"অষ্টাবক্র দেখিয়া আমায়
"সবে করে নাসিকা কুঞ্চিত,
"আমার বেলায় হাত তাঁর
"হয়েছিল কবে কি কম্পিত ?"

১৯।

"শুনিয়াছি"—কহে অন্য ঘট—
"হবে নাকি কি এক বিচার,
"হাকিমের চক্ষে ধূমপ্রভা,
"কারো তথা নাহিক নিস্তার।"

২০।

শুনি ইহা কহে প্রতিবাসী—
"আরে ভাই তুমিও যেমন,
"দুষ্ট লোকে রটায় কলঙ্ক,
"অতি তিনি মহৎ সজ্জন।"

২১।

অতঃপর শুষ্ক কুম্ভ এক
সকাতরে কহে, তুলি হাই—
"বহু দিন আছি 'ভোলা' হয়ে,
"দেহে আর রসকষ নাই।

২২।

"কেহ যদি, তবু মনে হয়,
"দ্রাক্ষারসে করে মোরে পূর্ণ,
"মঞ্জুরিবে শুষ্ক জীর্ণ তরু,
"নব তেজ দেখা দিবে তূর্ণ।"

২৩।

মুখরিত সর্ব্ব কুম্ভগ্রাম,
হেনকালে এক কুম্ভ বলে,—
"ওই হের দীপ্ত যুক্তরবি,
"বাহু নাই, বাহু গেছে চলে।

২৪।

"হাটে আজি বিপুল জনতা
"নব নব ঘটাদি কিনিতে,
"ওই শোন, ঝাঁকা লয়ে মুটে
"আসিতেছে আমাদের নিতে।"

২৫।

শুষ্ক ঘট, গ্রহণের দিনে,
কহে ছিল মরমের বাণী;
দাও সাকি, এক পাত্র মদ,
শুষ্ক প্রাণে নব তেজ আনি।

২৬।

শাস্ত্র বলে—"পানে তুষানল;"
একমিব নহে শাস্ত্র, সাকি,—

স্বর্গে মদ্য, মদ্য রক্তস্রোতে,
মদ্যহীন তন্ত্রচক্র ফাঁকি।

২৭।

লোক নিন্দা ?—কহ 'লোক' কারে ?
তুমি আছো তাই আছে লোক,
কোথা রবে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী
নিভে গেলে তোমার আলোক ?

২৮।

লোকলজ্জা দলিয়া চরণে,
কি করিল গোকুলে আভীরা ?
ধর্ম্মভয়ে কে ছেড়েছে প্রেম ?
তবে কেন ছাড়িব মদিরা ?

২৯।

দেহ ভেঙ্গে যাবে ? যাক ভেঙ্গে ;
চিরস্থায়ী কি বস্তু জগতে ?
সুরা মাখা এক কুহূ * শ্রেয়ঃ
সুরাশূন্য শত রাকা † হতে।

৩০।

আয়ু নহে কাহারো অধীন,—
আগে থেকে আয়ু আছে ঠিক—
নড়ে না সে, লক্ষ স্বস্ত্যয়নে
তিল কম কিংবা তিলাধিক।

৩১

যারা আছে, অথবা আসিবে
কিংবা যারা আজি পলাতক,
গোড়া হতে সবারি মৃত্তিকা
করা ছিল, পৃথক পৃথক।

* কুহূ = অহোরাত্র অমাবস্যা তিথি।
† রাকা = অহোরাত্র পূর্ণিমা তিথি।

৩২ ।

বৃহস্পতি ওই যে হোথায়
জ্বলিতেছে তারা-ভরা মীনে,
তারো মাটি হয়েছিল স্থির
মোর সাথে, সেই এক দিনে ।

৩৩ ।

তবে কিনা আমার মাটিতে
ছিল লেগে দ্রাক্ষালতা মূল,
পিউ পিউ ডাকলে পাপিয়া
তাই হয় হৃদয় আকুল ।

৩৪ ।

কোথা আজ মিথিলার সভা ?
কোথায় বত্রিশ সিংহাসন ।
দ্রাক্ষাগুচ্ছ এখনও কি দোলে ?
লতা কোলে, আগেও যেমন !

৩৫ ।

মনু পরাশর—কোথা তারা ?
বোবা হয়ে রয়েছে মাটিতে ;
কিন্তু কুঞ্জে আজিও পাপিয়া
পিও পিও কুহরে নিশীথে ।

৩৬ ।

পাণ্ডু করে রক্তিম কপোল
রসহীন স্মৃতির বচন ,
পিউ রবে গোলাপ পেলব
ধরে আভা অরুণ বরণ ।

৩৭ ।

অরুণ বরণ দাও সুরা,
অরুণ মদিরা কর পান ;

আনো বীণা, শুনাও আমারে
আশা ভরা বিরহের গান।

৩৮।

দাস প্রভু ভেদজ্ঞান যথা
ভাবিবার নাহি অবকাশ,
নহে মরু, অথবা নগর,
চলো তথা করি গিয়া বাস।

৩৯।

নদীতীরে বাঁধিব কুটীর
জনহীন বনভূমি মাঝে,
শুধু তুমি এক সঙ্গী, সাকি।
জীবনের সঙ্গীহীন সাঁঝে।

(ক্রমশঃ)　　　　শ্রীসুরেন রায়

জিজ্ঞাসা *

১) কিরূপে হিন্দু ও মুসলমানের স্থায়ী মিলন সাধন করিয়া একটি বিরাট ভারতীয় জাতি গড়িয়া তোলা যাইতে পারে?

(২) কি উপায়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যের প্রত্যাশা না করিয়া, অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের নরনারীকে শিক্ষিত করা যায়?

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম-এ।

---

* "উদ্বোধনের" পাঠক পাঠিকাগণকে আমরা উপরোক্ত প্রশ্নের মীমাংসার জন্ম আহ্বান করিতেছি। উত্তর সংক্ষেপ ও সরল হওয়া বাঞ্ছনীয়।—সম্পাদক।

পৃথিবীর শান্তি-সমস্যায় ভারতের দান

ভুলভ্রান্তির সহিত অনবরত সংগ্রামের মধ্য দিয়াই আমাদের জীবন সিদ্ধিলাভ করে। মনের তৎকালীন অবস্থা ও সংস্কার অনুসারে আমরা উপায়বিশেষকে সিদ্ধিলাভের একমাত্র পন্থা বলিয়া মনে করি এবং তাহাকে জীবনে কার্য্যকরী করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। কিন্তু কিছুকাল পরে প্রতীয়মান হয় যে উক্ত উপায় সিদ্ধির চরম সোপানে আমাদিগকে আরোহণ করাইতে অসমর্থ, বরং যাহাকে আমরা দৈনন্দিন জীবনে সত্য বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহাও একটা ভুলভ্রান্তি মাত্র, তখন সেই উপায়কে পরিত্যাগ করিয়া আমরা নূতন পথ গ্রহণ করি এবং উহাকে জীবনে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টিত হই। সিদ্ধিলাভের উদ্দেশ্যে উপায়সমূহের ক্রমপরিবর্ত্তনের নামই জীবন-সংগ্রাম। সিদ্ধির সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়া আমরা অবশেষে বুঝিতে পারি যে পূর্ব্ব পরিত্যক্ত এবং সত্যরূপে প্রতীয়মান উপায়সমূহ বাস্তবিক ভুল নহে—ঐগুলি সিদ্ধি লাভের সোপান মাত্র।

ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে যাহা সত্য একটা জাতির বা সমগ্র মনুষ্য জাতির পক্ষেও তাহা সত্য। ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভ হইতে মানব জাতি পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের আদর্শকে কার্য্যকরী করিতে চেষ্টা করিতেছে। এই আদর্শ-সিদ্ধির জন্য অনেক উপায় অবলম্বিত হইয়াছে এবং সেই সমস্তই অবশেষে শান্তি স্থাপনে অসমর্থ বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। পৃথিবীতে সম্যক্ শান্তি স্থাপনের আদর্শ-টা-ই মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবনের মত একটা ভুল কি না জানি না। মানব হৃদয়ের এই প্রিয়তম আশা কখনো ফলবতী হইবে কি না বলিতে পারি না। কিন্তু এই প্রচেষ্টা আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং যতদিন মানবজাতি পৃথিবীতে জীবিত থাকিবে ততদিন

এই আশাও তাহার হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে, ইহা নিশ্চিত। যে সকল উপায় পৃথিবীতে শান্তিস্থাপন উদ্দেশ্যে পরীক্ষিত হইয়া অবশেষে ব্যর্থ বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহার সমালোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ভারতের সাধনা এই আদর্শ-সিদ্ধির জন্য কোনো উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারে কি না উপসংহারে তাহা আলোচনা করিব।

রাজনীতি ও ধর্ম্ম প্রধানতঃ এই দুই উপায় সহায়ে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল এবং এখনো হইতেছে। প্রথমতঃ আমরা রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। অনেক দিন মানুষ মনে করিয়াছিল যে পৃথিবীতে এক অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপন দ্বারা শান্তির রাজ্য স্থাপিত হইবে পিতৃতুল্য এক রাজচক্রবর্ত্তীর অধীনে সমস্ত মানবজাতি এক পরিবারবর্গ ভ্রাতার ন্যায় শান্তির সহিত অবস্থান করিবে। এই প্রকার শুভকর একছত্র সাম্রাজ্যে হিংসা, দ্বেষ, কলহ অথবা বাদ-বিসম্বাদের কোন কারণ থাকিবে না আলেকজেণ্ডার ও সীজার বোধ হয় এই মহৎ-উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া পৃথিবী-জয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। য়ুরোপের মধ্যযুগের ইতিহাসে অষ্ট্রীয়ার সম্রাট্‌গণ এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া নিজদিগকে ভগবানের পার্থিব প্রতিনিধিরূপে (Viceroy of God on earth on secular matter) মনে করিতেন এবং তরবারি দ্বারা য়ুরোপ জয় করিয়া তথায় শান্তি স্থাপনরূপ আশা-মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিলেন। অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের সহিত পোপ (Pope) এবং য়ুরোপের খণ্ডরাজ্য সমূহের বিরামবিহীন সংগ্রামের রক্তমসী দ্বারা য়ুরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। অস্ত্রের ঝনঝনা, মুমূর্ষের কাতরধ্বনি, বালকবালিকার আর্তনাদ এবং বিধবার হাহাকারের মধ্য দিয়া য়ুরোপে শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে আলেকজেণ্ডার, সীজার বা নেপোলিয়নের আশার সফলতা সম্বন্ধে বলিতে ইচ্ছা করে—

"উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ।
বারিবাতবিনির্ম্মুক্তা ক্ষণস্থাং চপলা যথা॥" (শকুন্তলা)

ভগবান প্রত্যেক জাতির নিমিত্ত একটি ভৌগলিক সীমা

(Geographical boundery) নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কোনে শক্তিশালী জাতি যখনই উক্ত সীমা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অপর জাতির অধিকৃত স্থানের উপর লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়াছে তখনই উহা বিষময় ফল প্রদান করিয়াছে। ইহা ত পৃথিবীর ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় অঙ্কিত রহিয়াছে। আজ বোধ হয় আর মানুষকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে হইবে না যে সাম্রাজ্য স্থাপনের দ্বারা পৃথিবীতে শান্তি-প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা একটা প্রকাণ্ড ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

পরস্পরের মধ্যে সালিসী দ্বারা অনেক সময়ে আমরা বিবাদ-বিসম্বাদের নিষ্পত্তি করি। এই উপায় দ্বারাও একবার য়ুরোপে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল। য়ুরোপীয় জাতি একতান হইয়া (Concert of Europe) হেগ সহরে সালিসী সভার (Arbitration-Court) জন্য শান্তি-মন্দির (Temple of Peace) প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসক্রমে যে রাষ্ট্রশক্তি সর্ব্বপ্রথমে উক্ত শান্তি বৈঠকের কল্পনা করে, সেই আবার সর্ব্বপ্রথমে স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অপর জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। য়ুরোপের গত বৎসরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে হেগের সালিসী সভার শান্তি স্থাপনের নিরর্থক চেষ্টার বিষয় পরিষ্কাররূপে প্রতীয়মান হয়। বিগত মহাসমরের শান্তিসভায় কল্পিত জাতিসংঘ (League of Nations) হেগের শান্তি-সভা অপেক্ষা আর অধিক শুভকর ফল প্রসব করিবে কি না জানি না। আইন কানুনের দ্বারা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির গতি রোধ করা বাস্তবিকই অসম্ভব।

"সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥" গীতা।

পরে য়ুরোপের রাজনীতিবিশারদগণ মনে করিয়াছিলেন যে বিভিন্ন জাতির স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিলে পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ কলহ হইবার সম্ভাবনা কম। বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির সমতা ও সামঞ্জস্য দ্বারা য়ুরোপে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে। ইহাকে ইংরাজীতে Balance of Power বলে। উনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপের জাতিসমূহ এই নীতি

অনুসরণ করিয়াছিলেন কিন্তু ফরাসী বিপ্লব হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত য়ুরোপ শান্তি-সুখ অনুভব করিতে পারে নাই। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যে সকল কৃত্রিম উপায়ে এবং গোঁজামিল দ্বারা ফরাসী ও জার্ম্মন জাতির মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল তাহার মধ্যেই একটি ভবিষ্যৎ যুদ্ধের বীজ লুক্কায়িত ছিল। ঐ বীজ ই পরে বিগত মহাসংগ্রামে মহামহীরুহরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

গত অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ য়ুরোপের রাজনীতি-তত্ত্ববিদ্‌গণ শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত অন্য কতকগুলি উপায়ও উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তি সমূহের অস্ত্রবল বৃদ্ধি, বিভিন্ন জাতির মধ্যে বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও প্রজাতন্ত্র শাসনের উৎকর্ষ, এই উপায়সমূহের মধ্যে বিশিষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে; কিন্তু দেবতার পরিহাসে এই সমস্ত উপায়ই ব্যর্থ হইয়াছে। য়ুরোপের বিগত মহাসমরে এই উপায়গুলির ব্যর্থতা অতি পরিষ্কার রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। মানুষ মনে করিয়াছিল যে বিভিন্ন জাতিসমূহ যদি পাশবিক শক্তিতে সমৃদ্ধ হয় তবে কেহ পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে সাহসী হইবে না। এই ভুল ধারণার নিমিত্ত বিগত মহাযুদ্ধ বোধ হয় দশ বৎসর পিছাইয়া গিয়াছিল; কিন্তু যখন উহা আরম্ভ হইল তখন ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির অন্তর্নিহিত পাশবিক প্রবৃত্তিগুলি এইরূপ জঘন্যভাবে আত্মপ্রকাশ করিল যে তাহার ফলে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী মহা অশান্তি ও অনর্থের সূত্রপাত হইয়াছে। শান্তি-প্রয়াসী য়ুরোপীয় রাজ্যসমূহের শাসনসচিবগণ আবার ভাবিয়াছিলেন যে বিভিন্নদেশ যদি বাণিজ্যসূত্রে পরস্পর গ্রথিত হয় তবে অন্ততঃ স্বীয় স্বার্থ-সিদ্ধির নিমিত্তও তাহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না। কারণ, এইরূপ স্থলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে পরস্পরের আর্থিক স্বার্থনাশের সম্ভাবনা-ই অধিক। কিন্তু আজ ইহা স্পষ্টই মনে হইতেছে যে বিগত মহাসমর য়ুরোপের মহা-শক্তি সমূহের বাণিজ্য-স্বার্থ-সংরক্ষণের নিমিত্তই প্রধানতঃ আরব্ধ হইয়া-ছিল। সর্ব্বশেষে প্রজাতন্ত্র-শাসন জাতীয় সুপ্ত জিঘাংসা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে কিরূপ অসমর্থ তাহাও আমরা বিগত যুদ্ধের ইতিহাস হইতে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। ফরাসী দেশে ত প্রজাতন্ত্র শাসনই প্রচলিত

আছে। আজও মনে হইতেছে যেন ফরাসী দেশের জনসংঘরূপ প্রবল দানবের প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্য য়ুরোপের শান্তির প্রতিবন্ধক হইয়াছে। এমন কি আমেরিকার গর্ব্বিত প্রজাতন্ত্র-শাসনও এই মহা আহবে নানারূপে ইন্ধন যোগাইয়াছিল। উক্ত প্রজাতন্ত্রের প্রধানসচিব যদিও স্বীয় দেশকে য়ুরোপের কলহ হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাকার জনসংঘ স্বাধীনতার নামে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং অবশেষে শকুনির ন্যায় পক্ষ বিস্তারপূর্ব্বক পূতি মাংসখণ্ডের লালসায় রণাঙ্গনে পতিত হইয়াছিল।

অনেকের আবার এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা আছে যে যুদ্ধ দ্বারা যুদ্ধের নিষ্পত্তি হইবে। যুদ্ধের আনুসঙ্গিক নিষ্ঠুরতা ও বর্ব্বরতা, যুদ্ধলিপ্ত জাতি-সমূহের দৈনন্দিন জীবনের অশান্তি, শিল্প ও বাণিজ্যের ধ্বংস, জাতির ভবিষ্যৎ আশাস্থল যুবকবৃন্দের সংগ্রামানলে আত্মাবসর্জ্জন প্রভৃতি যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল, মানবজাতির যুদ্ধের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইবে বলিয়া অনেকে ভুল ধারণা পোষণ করেন, কিন্তু যুদ্ধের দ্বারা যুদ্ধের বিরতি কখনও সম্ভবপর নহে। ঘৃতাহুতি দ্বারা কখনও অনল নির্ব্বাপিত হইতে পারে না; বরং উহা বৃদ্ধি হ পাইয়া থাকে। সত্য বটে বর্ব্বরতা ও নিষ্ঠুরতা মানবের মনে যুদ্ধের উপর একটা সাময়িক বিতৃষ্ণা আনিয়া দেয় কিন্তু উহা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। পরাজিত জাতি পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিবামাত্র সমরানল দ্বিগুণবেগে প্রজ্জ্বলিত হয়।

রাজনৈতিক চেষ্টার সহিত সমান্তরালভাবে ধর্ম্মের দ্বারাও পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি-স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে।

বহু শতাব্দী হইতে খৃষ্ট-ধর্ম্ম জগতে শান্তি-স্থাপনের প্রয়াস পাইতেছে। ঈশ্বরের পিতৃত্ব (Fatherhood of God) ও মানবের ভ্রাতৃত্ব (Brotherhood of man) দ্বারা পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য (Kingdom of heaven on earth) স্থাপনের অভিলাস প্রত্যেক স্বধর্ম্মনিষ্ঠ খৃষ্টানের হৃদয়ে বহু শতাব্দী যাবৎ পোষিত হইতেছে। প্রায় সমস্ত খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে সমগ্র মানবজাতি তাঁহাদের ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে জগতে চিরশান্তি বিরাজ করিবে। যীশুখৃষ্টের শাসনে—অবশ্য তাঁহার ধর্ম্মের পুরোহিত

গণের দ্বারা পৃথিবীতে কোনও বিবাদ-বিসংবাদ অথবা হিংসাদ্বেষ থাকিতে পারে না—এইরূপ উন্মাদ আশা পোষণ দ্বারা প্রকৃতিদত্ত মানব মনের বিভিন্ন গঠনোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হয়। সমগ্র মানব জাতির খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বনের সম্ভাবনা স্বীকার করিলেও তদ্দ্বারা পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তিস্থাপনের আশা সুদূর পরাহত বলিয়াই মনে হয়। য়ুরোপের বিভিন্নদেশের জাতিসমূহ ত এক-ই ধর্ম্মে দীক্ষিত আছেন। তাঁহারা ত এক-ই পিতার উদ্দেশ্যে জানু পাতিয়া প্রার্থনা করেন, কিন্তু ইহা সত্বেও য়ুরোপ শান্তি-সুখ কখনও আস্বাদন করে নাই; বরং য়ুরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে তথায় ধর্ম্মের জন্য যত রক্তপাত হইয়াছিল অন্য কোনও রাজনৈতিক কারণে তত হয় নাই। এমন কি বিগত মহাসমরেও সংগ্রামলিপ্ত খৃষ্টান জাতিসমূহ পরস্পরের স্বধর্ম্মাবলম্বী আততায়িগণের ধ্বংসের নিমিত্ত সর্ব্বদাই তাহাদের ধর্ম্মমন্দিরে প্রার্থনা করিতেন। ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত ভ্রাতৃভাবও যে কত ক্ষণ-স্থায়ী তাহার অন্য বিশদ উদাহরণের বোধ হয় আর প্রয়োজন হইবে না।

বর্ত্তমানে সাধারণে প্রচলিত ধর্ম্মসমূহ প্রধানতঃ মানবের মধ্যে ভ্রাতৃ-ভাবই আনয়নের চেষ্টা করিতেছে। ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব বা পিতৃত্ব ঘোষণা করিয়া উক্ত ধর্ম্মমতগুলি সমগ্র মানবজাতির মধ্যে একটি ভ্রাতৃভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। খৃষ্টধর্ম্ম, ইসলামধর্ম্ম, ইহুদিধর্ম্ম এবং ভারতে প্রচলিত ঈশ্বরবাদে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসমূহ দ্বৈতবাদমূলক। আপাতদৃষ্টে মনে হয় যে এই সকল ধর্ম্মমত সমূহের আলোচনা ও বিস্তার-সহায়ে মানবজাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ় হইতে পারে, কিন্তু ইহাও অতীব সত্য যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন অতিশয় দৃঢ় বন্ধন নহে; বরং উহা সহজেই শিথিল হইয়া যায়। স্বার্থে স্বার্থে সংঘর্ষণ উপস্থিত হইলে ভাই ভায়ের বুকে ছুরি বসাইতে দ্বিধা বোধ করে না। প্রতিদিনই আমাদের জীবন-নাটকে ইহা অভিনীত হইতেছে এবং ইহা অতীব স্বাভাবিক। আমি যদি অপরকে প্রবঞ্চনা বা ধ্বংস করিয়া স্বীয় স্বার্থ-সিদ্ধি করিতে পারি তবে ধর্ম্ম বা প্রেমের দোহাই দিয়া কেহ আমাকে উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিবে না। বিশ্ব-প্রেমের অজুহাতে সাধারণ মানুষ স্বীয় স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারে না।

এক রক্তমাংস সম্বন্ধে জড়িত ভ্রাতাগণের মধ্যেও যখন হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি পাশবিক ভাবের দৃষ্টান্ত বিরল নহে, তখন কল্পিত ঈশ্বরের সন্তানগণের মধ্যে উক্ত ভাবের অপ্রাচুর্য্যের সম্ভাবনা কোথায় ?

তাহা হইলে কি মানবজাতির মধ্যে শান্তি-স্থাপনের কল্পনাও অসম্ভব ? ধর্ম্ম কি বাস্তবিক-ই এই কল্পনা বাস্তব আকারে পরিণত করিতে একান্ত অসমর্থ ? আমাদের মনে হয়, সর্ব্বধর্ম্মসার ভারতীয় বেদান্ত-ধর্ম্ম এই মহা সমস্যার মীমাংসা করিতে একমাত্র সমর্থ। এই মাত্র আমরা দেখিলাম যে ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধের দ্বারা পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হইতে পারে না। ভ্রাতাও ভ্রাতার প্রতি হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি ভাব পোষণ করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন, কিন্তু বোধ হয় নিতান্ত উন্মাদ ব্যতীত কেহ নিজের উপর হিংসা বা দ্বেষ করিতে পারে না. নিজস্ব কেহ অপহরণ করিতে পারে না, নিজশ্রীতে কেহ কাতর হইতে পারে না, নিজকে ধ্বংস করিয়া নিজের বর্দ্ধিত হওয়ার কল্পনাও অসম্ভব। যদি বিশ্বচরাচরের যাবতীয় প্রাণিনিচয়কে আমি নিজের আত্মস্বরূপ মনে করি তবে আমার দ্বারা হিংসা বা দ্বেষ অসম্ভব হইয়া উঠে।

"যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ
তত্র কো মোহঃ কঃ শোকমেকত্বমনুপশ্যতঃ।" কাঠোপনিষদ্।

যাহার সমস্ত ভূত সমূহে আত্মদৃষ্টি হইয়াছে সেইরূপ একদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে শোক বা মোহ সম্ভব হয় না।

"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।" (কঠ)।

যিনি এই পৃথিবীতে বিভিন্নভাব দর্শন করেন তিনি মৃত্যুই প্রাপ্ত হন।

বেদান্তোপদিষ্ট ধর্ম্ম এই একত্বভাব-ই প্রচার করে। একত্বভাব উপলব্ধি করা-ই বেদান্তের চরম লক্ষ্য। এই একত্ব উপলব্ধি দ্বারা-ই ব্যক্তিগত জীবনে বা সমগ্র মানবজাতির মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে।

"নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥"

(কঠ)।

মানবজাতি ত্যাগের সহায়ে যত এই একত্ব উপলব্ধির অভিমুখে

অগ্রসর হইবে ততই সে হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি পশুভাব ভুলিয়া যাইবে। মানব যত আত্মার গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইবে ততই তাহার দৃষ্টি বাহ্যিক সুখ সম্পদের প্রলোভন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে। মানব যতই আত্মার অপরিসীম শক্তি অনুভব করিবে ততই সে বাহ্যিক অস্ত্র শস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস বিহীন হইবে, ক্রমশঃই তাহার মন অন্তর্মুখীন হইবে। এবং অবশেষে সে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাইয়া বিশ্ব-জগতে আপনার-ই প্রকাশ দেখিবে।

বাস্তবিক ই প্রেমের দ্বারা জগতে শান্তি স্থাপন হইতে পারে; কিন্তু ভ্রাতৃভাবের উপর এই প্রেম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। একত্ব ভাবকেই অবলম্বন করিয়া এই প্রেমের উৎকর্ষ ও চরম পরিণতি হইতে পারে। মানুষ তখনই জগৎকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতে পারে এবং জগতের নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর প্রাণার নিমিত্তও আত্ম-বিসর্জন করিতে পারে, যখন সে নিজের ক্ষুদ্র আমিত্ব ভুলিয়া গিয়া বিরাট আমির মধ্য দিয়া নিজেকে জগতের সহিত অভিন্ন ভাবে দর্শন করে, তখন তাহার প্রেম কেবল মানব জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। জড় ও চেতন সমগ্র বিশ্ব-চরাচর তাহার প্রেমের পাত্র হয়। "অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যঃ মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে"—আমা হইতেই সমস্ত জীবজগৎ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ইহা উপলব্ধি করিয়া তিনি সর্ব্ব জীবে অভয় প্রদান করেন।

অনেকে হয় ত বলিবেন যে ব্যক্তিগত জীবনে সম্ভবপর হইলেও সমগ্র মানব জাতির পক্ষে এইরূপ একত্ব অনুভব একটা কল্পনা মাত্র; এই আশা পোষণ করাও একটা প্রহেলিকা মাত্র। বোধহয় ইহা কতক পরিমাণে সত্য। সমগ্র মানবজাতি কখনো এই উচ্চ আদর্শে উপনীত হইতে পারিবে কি না জানি না, পৃথিবীতেও কদাপি চির-শান্তি বিরাজ করিবে কি না বলিতে পারি না। পৃথিবী ত সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই কুকুরের লেজের মতন-ই মনে হইতেছে। একবার টানিয়া সরল করিয়া আবার ছাড়িয়া দিলে উহা পুনরায় পূর্ব্ব-বক্রভাব প্রাপ্ত হয়।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে মানব ভুল ও ভ্রান্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া-ই অবশেষে চরম আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়। জগতে শান্তি স্থাপনের

নিমিত্ত অবলম্বিত উপায় সমূহের আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া উহাদের নিরর্থকতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, অন্ততঃ পৃথিবীর ইতিহাস ত ঐগুলির ব্যর্থতা প্রমাণ করিয়াছে। বেদান্তোপদিষ্ট উপায় পরীক্ষা করিবার এখন এক অপূর্ব্ব সুযোগ আসিয়াছে। বৈজ্ঞানিক ও মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ ইতিপূর্ব্বেই জড়ের ভিতর দিয়া জগতের একত্ব প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় ও মনের সহায়ে বাহ্য জগতের একত্ব স্বীকার করিলেই চলিবে না। আত্মপ্রতিষ্ঠিত একত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলে-ই আমাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধ হইবে। সমগ্র জগৎ এই ভাব গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইলেও ইহা নিশ্চিত সত্য যে মানুষ যতই এই আদর্শ উপলব্ধির অভিমুখে অগ্রসর হইবে ততই সে পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য নিকটতম করিবে।

—নিখিলানন্দ।

জগৎ-কারণ—ঈশ্বরকৃষ্ণ ও শঙ্কর

Design Theory by Inductive method

রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্‌॥ অ ২, পা ২, সূ ১॥

শঙ্করানন্দকৃতা-দীপিকা—অনুমীয়তে ইত্যনুমানং প্রধানং জগৎ-কারণং ন, কুতঃ, তস্যাচেতনত্বেন জগতো গিরিনদীসমুদ্রাদেঃ রচনায়াঃ সন্নিবেশকরণস্যানুপপত্তেঃ।

সূত্রার্থ—"যে হেতু চেতনের প্রেরণা ব্যতীত এরূপ বিচিত্র ও সুশৃঙ্খল জগৎ রচনা করা অচেতন প্রধানের পক্ষে অসিদ্ধ বা অসম্ভব, সেই হেতু জগৎকার্য্য দেখিয়া অচেতন প্রধানের অনুমান অসিদ্ধ অর্থাৎ হয় না।"

ভাষ্য-তাৎপর্য্য :—ভিন্ন পূর্ব্ব-পক্ষ—তোমাদের উত্তর মীমাংসা (ব্রহ্মসূত্র) বেদান্ত (উপনিষৎ) বাক্যের অর্থ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত, তর্ক শাস্ত্রের ন্যায় যুক্তি মাত্র অবলম্বন করিয়া কোন সিদ্ধান্ত করা বা কোন সিদ্ধান্তের দোষানুসন্ধান করা উচিত নহে।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—তথাপি স্বপক্ষ ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য সম্যকজ্ঞানের বিরোধী সাংখ্যাদি দর্শনের নিরাশ করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই হেতু বেদ-ব্যাস এই তর্কপাদের অবতারণা করিয়াছেন। পূর্ব্বে তোমাদের আপত্তি সত্ত্বেও বেদান্তের যথার্থ তাৎপর্য্য উদ্ধার করা হইয়াছে এক্ষণে যুক্তির দ্বারা তোমাদের মত খণ্ডন করিয়া স্বীয় মতের পোষণ করিব।

ভিন্ন পূর্ব্ব-পক্ষ—মুক্তির নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞান (কি উপায়ে লাভ করা যায় তাহার) নিরূপণ ও স্বপক্ষ (জীব ও জগৎ সম্বন্ধীয় ধারণা) স্থাপন করিলেই ত চলে, তবে পর-বিদ্বেষাত্মক পর-মত খণ্ডনের প্রয়োজন কি?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—প্রয়োজন আছে। সে সকল মতের অসারতা দেখান একান্ত কর্ত্তব্য। সাংখ্যাদি শাস্ত্রের মাহাত্ম্য আছে। আপাতঃ যুক্তিতে বোধ হয় ঐ সকল শাস্ত্রও মহাজন পরিগৃহীত এবং উহার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মিতে পারে। ইহাতে অবিচক্ষণ লোক প্রলুব্ধ হইতে পারে। সর্ব্বজ্ঞ কপিলের কথিত এবং যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই মিথ্যাজ্ঞানে লোকে অবিচারিত ভাবে উহা গ্রহণ করিবে। অতএব মুমুক্ষুগণের হিতের জন্য ঐ সকল শাস্ত্রের অসারতা দেখান একান্ত কর্ত্তব্য।

ভিন্ন-পূর্ব্ব-পক্ষ—সাংখ্য মতের খণ্ডন পূর্ব্বে ত হইয়াছে, আবার কেন?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—সাংখ্য নিজের মত স্থাপনের জন্য শ্রুতিবাক্যের কদর্থ করিয়াছিল, সেগুলি আমরা পূর্ব্ব সূত্রে অসঙ্গত দেখাইয়াছি। অধুনা আমরা অনুমানকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ মানিয়া বিচার করিব। এক্ষণে সাংখ্যবাদীরা তাঁহাদের মত বর্ণনা করুন।

পূর্ব্ব-পক্ষ—যেমন ঘটটি মৃন্ময় পদার্থে (মৃত্তিকা বিশেষে) মৃত্তিকা অন্বিত (ব্যাপ্ত) থাকায় মৃত্তিকা (সামান্য) সে সকলের কারণ, সেইরূপ সমস্ত বাহ্যিক (ক্ষিত্যাদি) ও আন্তর (বুদ্ধ্যাদি) ভাব (পদার্থে) সুখ, দুঃখ, মোহাদি অন্বিত থাকায় সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক কোন এক

সামান্য সমষ্টি। কারণের অনুমান করিতে হয়। সেই পদার্থটি ত্রিগুণ (সত্বাদি) ও মৃত্তিকারই ন্যায় অচেতন। বাহ্য-জগৎ-রূপ কার্য্য যখন অচেতন তখন তাহার কারণও অচেতন। চেতন পুরুষের প্রয়োজনের নিমিত্ত সেই জড় সামান্য বিচিত্র বিবিধ বিকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। বাহ্য বস্তুর পরিণাম দেখিয়াও সেই জড় সামান্যের কল্পনা করিতে হয় (অর্থাৎ যাহার পরিণাম আছে তাহার কারণও আছে। এই-রূপে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে করিতে অনবস্থা দোষ [Regresus ad Infinitum] হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আদি কারণ প্রধানের কল্পনা করিতে হয়)।

Design Theory

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—১। দৃষ্টান্ত অসিদ্ধি দোষ। সাংখ্য কেবলমাত্র দৃষ্টান্ত বলে জগৎ কারণ জড়-প্রধানের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু দৃষ্টান্ত যুক্তি নহে, যুক্তির সমর্থক হইতে পারে। ২। বিরোধ হেত্বাভাস দোষ। তিনি, চেতন কর্তৃক অনধিষ্ঠিত (অর্থাৎ চেতন কর্তৃক প্রেরিত না হইয়া) কোনও অচেতন পদার্থকে কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিকার (বস্তুভেদ) রচনা করিতে দেখেন নাই। গৃহ, অট্টালিকা, শয্যা, আসন ও ক্রীড়াভূমি প্রভৃতি যাহা কিছু সুখ দুঃখ প্রাপ্তি, পরিহার যোগ্য (যে সকল বস্তুতে সুখ হয় তাহার সংগ্রহ এবং যাহাতে দুঃখ হয় তাহার পরিহার) বস্তুভেদ (বিভিন্ন পদার্থ) সমস্তই চেতন শিল্পীর দ্বারা বিরচিত হইতে দেখা যায়। কেবল একখানি জড় প্রস্তর নিজে পুরুষের ভোগের জন্য বিভিন্ন ভোগ্য বস্তুতে পরিণমিত হইতে পারে না। মৃত্তিকা-পাষাণাদি জড় পদার্থ যখন চেতন কর্তৃক প্রেরিত না হইয়া অল্পমাত্রও বৈচিত্র্য রচনা করিতে পারে না, তখন অচেতন প্রধান কিরূপে এই পৃথিব্যাদি লোক, তদন্তর্বর্ত্তী কর্ম্মফল ভোগ জন্য নানা স্থান, বাহ্য (স্থূল) ও আধ্যাত্মিক (সূক্ষ্ম) শরীরাদি মনুষ্যাদি জাতি, অসাধারণ কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধে বিন্যস্ত জগৎ (Inorganic world) ও রচনা পারিপাট্যযুক্ত নানা কর্ম্মফল অনুভব করিবার উপযুক্ত আশ্রয় (Organic world)—যাহা অতি বড় বুদ্ধিমান শিল্পীরও দুর্ব্বোধ্য ও কল্পনার

অতীত—এই অদ্ভুত জগৎ রচনা করিবে ? আমরা দেখিতে পাই মৃত্তিকাদি দ্রব্য কুম্ভকারাদি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া নানারূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। এই দৃষ্টান্তে জড় প্রধানেরও কোনও এক চেতন অধিষ্ঠাতা আছে স্বীকার করিতে হয়। ৩। সৎ প্রতিপক্ষ হেত্বাভাষ দোষ। এ কথা কি করিয়া স্বীকার করি, যে জড় মৃত্তিকাতে যে ধর্ম্ম আছে, জড়-প্রধানে তাহার অতিরিক্ত (জগৎ রচনা শক্তি) ধর্ম্ম আছে বা মৃত্তিকায় কুম্ভকারাদির ন্যায় প্রধানের অধিষ্ঠাতাকে পরিত্যাগ করিয়াও সৃষ্টি কার্য্য হইতে পারে। (অর্থাৎ মূল-প্রকৃতিতে অচেতনত্ব ধর্ম্ম আছে অথচ উহা সৃষ্টিবিষয়ে নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র। মৃত্তিকা কুম্ভকার কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ঘটাদি আকারে পরিণত হয়। কিন্তু মূল প্রকৃতি সৃষ্টিকার্য্যে সেরূপ কোনও অধিষ্ঠানের অপেক্ষা করে না ইহা কিরূপে স্বীকার করি ?)। দেখা যায় অচেতন মাত্রই চেতনের দ্বারা অধিষ্ঠিত। এইরূপ হইলে শ্রুতি-বিরোধও হয় না এবং যুক্তিতেও দোষ হয় না। ৪। স্বরূপ-অসিদ্ধি দোষ। ঈশ্বর কৃষ্ণ তাঁহার কারিকায় বলিতেছেন,—

ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াচ্ছক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণকার্য্যবিভাগাদবিভাগাদ্বৈশ্বরূপ্যস্য ॥ ১৫।

মহত্তত্ত্ব হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সকল কার্য্যেরই অব্যক্ত কারণ আছে, যেহেতু—কারণ হইতে কার্য্যের ভেদ ও অভেদ ব্যবহার হইয়া থাকে—সর্ব্ববিধ কার্য্যেরই ভেদ ও অভেদ ব্যবহার আছে। (কুণ্ডল ও স্বর্ণে ভেদ আছে, কিন্তু কুণ্ডলত্ব নাশ হইলে উহা স্বর্ণ হইতে অভেদ)। দ্বিতীয় হেতু—কারণশক্তি হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে (তিলের মধ্যে তৈল নির্গমনের শক্তি আছে বলিয়া তৈল বাহির হয়। তিল হইতে কালি বাহির হয় না)। তৃতীয় হেতু—সকল কার্য্যের পরিমাণ আছে অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন বা সাবয়ব পদার্থ। চতুর্থ, সকল কার্য্যের একটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে।

ইহাই যদি হয় তাহা হইলে সত্ত্বরজস্তমোগুণেরও, পূর্ব্বোক্ত কারণ হেতু, সংসর্গপূর্ব্বকত্ব (কারণ স্বীকার করিতে হয়। কারণ, উক্ত গুণত্রয় পরিচ্ছিন্ন (পরিমাণ বিশিষ্ট) ও এক একটি বিশেষ ধর্ম্মযুক্ত।

যাহা পরিচ্ছিন্ন ও বিশেষ ধর্ম্মযুক্ত তাহার নিশ্চয়ই কারণ স্বীকার করিতে হইবে এবং সেই কারণকে আমরা চেতন বলিব।

প্রবৃত্তেশ্চ ॥ অ ২, পা ২, সূ ২ ॥

দীপিকা—আস্তাং তাবদিয়ং রচনা তৎসিদ্ধ্যর্থায়া প্রবৃত্তিঃ সাম্যাবস্থাতঃ প্রচ্যুতিস্তস্যাঃ অচেতনস্য প্রধানস্য চেতনানধিষ্ঠিতস্যানুপপত্তেঃ।

সূত্রার্থ—"অচেতন-কারণত্ব-পক্ষে প্রবৃত্তির অনুপপত্তি আছে। কার্য্যোন্মুখ হওয়াকে প্রবৃত্তি বলে, তাহা স্বতন্ত্ররূপে অচেতনের সম্বন্ধে অসম্ভব।"

ভাষ্য-তাৎপর্য্য। সিদ্ধান্ত-পক্ষ—রচনা ত দূরের কথা, রচনা সিদ্ধির জন্য যে প্রবৃত্তি তাহাও অচেতন প্রধানের পক্ষে স্বাধীন ভাবে করা সম্ভব নহে। বিশেষরূপে কোনও বস্তুর বিন্যাসের নাম রচনা এবং সেই বিন্যাসকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে যে চেতনের ইচ্ছা সম্বলিত যত্ন তাহার নাম প্রবৃত্তি। সৃষ্টি করণোদ্দেশে প্রধানের যখন প্রবৃত্তি হয় তখন তাহার সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয়। এই বৈষম্যাবস্থায় গুণত্রয় পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব প্রাপ্ত হয়। তাহার পর কোনও এক বিশিষ্টাকার কার্য্যে উন্মুখ হওয়াই প্রধানের প্রবৃত্তি। কিন্তু এরূপ প্রবৃত্তি চেতনের দ্বারা অধিষ্ঠিত না হইয়া অচেতন প্রধানের পক্ষে সম্ভব নহে। দৃষ্টাচ্চাদৃষ্টসিদ্ধিঃ—দৃষ্ট পদার্থ দেখিয়াই আমরা অদৃষ্ট বিষয়ে অনুমান করিয়া থাকি (Inductions from lower truth to higher truths)। উদাহরণ—মৃত্তিকার বা রথাদি অচেতন পদার্থের সেরূপ প্রবৃত্তি দেখা যায় না। কুম্ভকার বা রথবাহকের অধিষ্ঠান ছাড়া কেহ কখনও মৃত্তিকা বা রথকে বিশেষ কার্য্যাভিমুখী হইতে দেখে নাই। এই হেতু আমরা নিম্ন প্রকারে অনুমান (Sorites) করিতে পারি—

দৃষ্টান্ত দেখিয়া অজ্ঞাত বা অদৃষ্ট বিষয়ে জ্ঞান হইতে পারে,

কিন্তু এখানে কোনও রূপ দৃষ্টান্ত নাই।

যে হেতু অনুমান উৎপাদক দৃষ্টান্ত নাই সেই হেতু অচেতনের প্রবৃত্তি অসম্ভব।

সেই হেতু অচেতনের প্রবৃত্তি দুর্ঘট।

সেই হেতু অচেতন-প্রধানের জগৎ-সৃষ্টি-প্রবৃত্তি অসিদ্ধ।

পূর্ব্ব-পক্ষ—কেবল চেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায় কি?

সিদ্ধান্ত পক্ষ—যদিও কেবল চেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায় না সত্য, কিন্তু চেতনের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইলে অচেতন-রথাদির প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। পক্ষান্তরে অচেতন সংযুক্ত চেতনের প্রবৃত্তি দেখা যায় না।

পূর্ব্ব-পক্ষ—যে আধারে প্রবৃত্তি (রথে গমন-প্রবৃত্তি) দৃষ্ট হয়, উহা কি সেই আধারের প্রবৃত্তি? না যাহার (চেতনের) সংযোগ হেতু আধারে প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে সেই অধিষ্ঠানের প্রবৃত্তি? এক্ষণে নিম্নলিখিত (Dilema) অনুমান আমরা করিতে পারি—

যদি বল চেতনের প্রবৃত্তি, তাহা হইলে তোমাদের নির্গুণ ব্রহ্মবাদ খণ্ডিত হইবে।

যদি বল অচেতন আধারের (রথের বা দেহের) প্রবৃত্তি, তাহা হইলে আমাদের অচেতন প্রধানের প্রবৃত্তি সম্ভব হইল।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—যাহাতে প্রবৃত্তি দেখা যায় তাহারই প্রবৃত্তি। জড় আধারও প্রত্যক্ষ এবং তাহার প্রবৃত্তিও প্রত্যক্ষ। শুদ্ধচেতন প্রবৃত্তির আশ্রয় কিন্তু তাহা রথাদির ন্যায় প্রত্যক্ষ নহে। প্রবৃত্তিযুক্ত দেহেই চৈতন্যের অস্তিত্ব অনুমান হয়, মৃতদেহে হয় না। সেই হেতু বলিতে হয় অচেতন রথাদি জীব-দেহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। দেহ চলে, কারণ তাহাতে চৈতন্য আছে। কেবল রথ বা দেহ বা প্রধান কখনও চলিতে পারে না।

পূর্ব্ব-পক্ষ—যদি বলি প্রবৃত্তিও যেমন দেহের ধর্ম্ম চৈতন্যও সেইরূপ দেহের ধর্ম্ম হউক।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—তাহা তোমরা বলিতে পার না; কারণ তাহা হইলে তোমাদিগকে চার্ব্বাকদিগের ন্যায় যুক্তি করিতে হইবে। প্রবৃত্তিযুক্ত দেহের জ্ঞানে চৈতন্যের সদ্ভাব (অস্তিত্ব) অনুমান হয় এবং সেই দেহের অভাবে চৈতন্যেরও অভাব হয় Joint-method of Agreement and Difference। অতএব চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম। এ কথা কপিল কোথায়ও স্বীকার করিয়াছেন কি? (চার্ব্বাক মত ৩ অ, ৩ পা ৫৩।৫৪ সূত্র বিচারিত হইবে)

অচেতনে যে প্রবৃত্তি দেখা যায়, সে প্রবৃত্তি অচেতনের বটে কিন্তু তাহা চেতন হইতে হয়। চেতনই জড় দেহের প্রবৃত্তির কারণ। হেতু এই, চৈতন্য থাকিলেই দেহের প্রবৃত্তি, চৈতন্য না থাকিলে দেহের প্রবৃত্তি থাকে না Joint-method of Agreement and Difference)। কাষ্ঠের আশ্রয় ব্যতীত দাহাদি কার্য্য সম্ভব নহে বটে কিন্তু অগ্নি সংযোগ ব্যতীত দাহাদি কার্য্য কে কবে দেখিয়াছে? অগ্নি-সংযোগে কাষ্ঠে জ্বলনাদি বিকার যেরূপ, চেতন কর্ত্তৃক জড়ের প্রবৃত্তি সম্পাদনও সেইরূপ।

চার্ব্বাক মত সম্বন্ধে আমরা ৩ অধ্যায়ে ৩ পাদে ৫৩ সূত্রে আলোচনা করিব, তথাপি বলিয়া রাখি তাঁহারা যে স্বপক্ষসাধনার্থ রথাদির প্রবৃত্তি দেখান, তাহাতেও চেতন দেহের কারণতা আছে। চেতন যোগে জীব-দেহের প্রবৃত্তি এবং সেই জীব দেহ সংযোগে রথাদির প্রবৃত্তি দেখা যায়, কেবল রথের প্রবৃত্তি সম্ভব নহে।

পূর্ব্ব-পক্ষ—আত্মা দেহাদিতে সংযুক্ত সত্য, কিন্তু তাহার নিজের কোন প্রবৃত্তি নাই। কেবল জ্ঞানস্বরূপ যে, তাহার আবার প্রবৃত্তি কি? যাহার প্রবৃত্তি নাই তাহার প্রবর্ত্তকতাও থাকিতে পারে না। নিম্নলিখিতরূপে আমরা এই ন্যায়টি ফলিত করিতে পারি—

যে প্রবর্ত্তক, তাহার প্রবৃত্তিও দেখা যায়—যেমন অশ্ব

ঘন বিজ্ঞানাত্মা প্রবৃত্তি বিহীন, সেই হেতু তিনি প্রবর্ত্তক নহেন।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—অয়স্কান্তমণির ও রূপাদির দৃষ্টান্তে কিন্তু অন্যরূপ দেখা যায়—প্রবৃত্তি হীনেরও প্রবর্ত্তকতা সিদ্ধ হয়। অয়স্কান্তমণি নিজে স্থির কিন্তু লোহার কণাগুলি ছুটাছুটি করে। প্রবৃত্তিহীনা নিদ্রিতা পর্য্যঙ্কস্থা রূপসীকে দেখিয়া অন্যত্র কত কাণ্ড ঘটিয়া গেল। শিশু রাজকুমারের রাজকার্য্যে প্রবৃত্তি নাই, কিন্তু তাহাকে হেতু করিয়া কত যুদ্ধ ঘটিয়া গেল। গোলাপের গন্ধে মাদকতা আছে, স্পর্শে কোমলতা আছে, রূপে ঔজ্জ্বল্য আছে কিন্তু প্রবৃত্তি নাই তথাপি নাসিকা, ত্বক ও চক্ষু তাহাকে অনুভব করিলেই চঞ্চল হইয়া তাহাকে অভিলাষ করে। এই ভাবে সর্ব্বগত, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি ঈশ্বর সমুদয় জগতের প্রবর্ত্তক।

পূর্ব্ব-পক্ষ—তোমরা বল এক আত্মাই আছেন, জগৎ বা অন্য কিছু নাই। অতএব প্রবর্ত্ত্য (যাহাতে প্রবৃত্তির সঞ্চার হয়) জগৎ না থাকায় প্রবর্ত্তক আত্মাও অনুপপন্ন হয়।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—অবিদ্যাকল্পিত নামরূপাত্মিকা মায়ার আবেশ থাকাতে প্রবর্ত্ত্যের অভাব ঘটে না। ঈশ্বর—চৈতন্য-প্রবর্ত্তক এবং মায়া—প্রবর্ত্ত্য।

পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি ॥ অ ২, পা ২, সূ ৩॥

দীপিকা—পয়ো যথা অচেতনং বৎসবিবৃদ্ধ্যৈ অম্বু বা নিম্নদেশ-গমনায় প্রবর্ত্ততে তদ্বৎ প্রধানমপি প্রবর্ত্স্যতে ইতি চেদেবং যদি তন্ন, তত্রাপি পয়সি বৎসস্য অম্বুনি ভেদভেদকস্য ঈশ্বরস্য সমাশ্রয়নং যতঃ।

সূত্রার্থ—"যেমন দুগ্ধ আপনা আপনি বৎস মুখে ক্ষরিত হয়, যেমন জল স্বভাববশে বৃষ্টিরূপে স্যন্দিত হয়, সেইরূপ প্রধানও পুরুষার্থসিদ্ধির উদ্দেশে আপনা আপনি প্রবৃত্ত হয়, এরূপ বলিলে আমরা বলিব, দেখাইব, প্রদর্শিত স্থলগুলিতেও চেতনের নিমিত্ততা আছে। দুগ্ধের প্রবর্ত্তন বৎসের অধীন ইহা প্রত্যক্ষ, তদ্দৃষ্টান্তে জলেরও চেতনাধীন প্রবর্ত্তন অনুমেয়।"

ভাষ্য-তাৎপর্য্য। পূর্ব্ব-পক্ষ—গো দুগ্ধ অচেতন হইলেও তাহা নিজ স্বভাববশতঃ বৎসমুখে ক্ষরিত হয়। অচেতন জল স্বীয় স্বভাব বশতঃ লোককল্যাণে স্যন্দিত হয়। তাহারা চেতনের অপেক্ষা রাখে না। সেইরূপ অচেতন প্রধানও স্বভাব বশতঃ পুরুষার্থ সাধনে প্রবৃত্ত হয়।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—ইহাও সাধীয়সী (সিদ্ধান্তের যোগ্য) নহে। উক্তস্থল-দ্বয়েও আমাদের চেতনের অনুমান করিতে হয়। চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত যেমন জড় রথাদির প্রবৃত্তি কোনও উদ্দেশ্য বিষয়ে গতি সম্পন্ন হয় না, তেমনি উক্তস্থলদ্বয়েও চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত প্রবৃত্তি (পুরুষার্থ বিষয়ে গতি) সম্ভব নহে। এই হেতু আমাদিগকে শাস্ত্র-বাক্যের অধীন হইয়া সমস্ত লোকের পরিস্পন্দন (গতি) সম্বন্ধে ঈশ্বর বা চেতন-কারণতা স্বীকার করিতে হয়।

জলের উদাহরণ সাধ্য (সিদ্ধান্ত) মধ্যেই নিহিত অর্থাৎ দশটি

জড়ের প্রবৃত্তির হেতু যখন চেতনের অধিষ্ঠান—জল যখন জড়—তখন তাহারও প্রবৃত্তির হেতু চেতনের অধিষ্ঠান। আরও দেখ ধেনু চেতন, তাহার ইচ্ছা ও বৎসের প্রতি স্নেহ থাকাতে দুগ্ধের স্যন্দন হয় অতএব উহাও সাংখ্য-পক্ষ-সমর্থক উদাহরণ নহে। বৎসের চোষণে দুগ্ধ ক্ষরিত হয়, ইহাও দুগ্ধের প্রবৃত্তির কারণ। এবং সাধারণ দৃষ্টিতেও জলের গতি একেবারে নিরপেক্ষ নহে, ভূমির নিম্নতাকে অপেক্ষা করে। "উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি:" (২ অ, ১ পা, ২৪ সূ) সূত্রে যে বিনা বাহ্যিক কারণেও স্বাশ্রয়নিষ্ঠ-কার্য্য হওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা লৌকিক দৃষ্টিতে, প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বত্র বা সমুদয় কার্যাই ঈশ্বর সাপেক্ষ।

ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥ অ ২, পা ২, সূ ৪ ॥

দীপিকা—সত্ত্বপ্রধান ব্যতিরেকেণানবস্থিতেরনবস্থানাৎবাহ্যস্যানপেক্ষত্বাৎ সাতন্ত্র্যেন মহদাদীনামুৎপাদং স্যাদিতিশেষঃ।

সূত্রার্থ—"কর্ম্মও প্রধানের ক্রোড়স্থ (অর্থাৎ প্রধানের ব্যতিরেকে অবস্থান করিতে পারে না) প্রধানের রূপবিশেষ, সেজন্য তাহার নিয়মিত প্রবর্ত্তকতা নাই। পুরুষ নিত্য, সনাতন, সুতরাং তিনিও নিয়মিত প্রবৃত্তির কারণ নহেন। কর্ম্মাদির যদি নিয়ামকতা না থাকিল, তাহা হইলে কখন সৃষ্টি, কখন প্রলয়, এরূপ হয় কেন? উক্ত কারণে সাংখ্যমতে সৃষ্টি ও প্রলয় অসম্ভব হয়।

ভাষ্য-তাৎপর্য্য। সিদ্ধান্ত-পক্ষ—তোমরা বল সত্ত্বাদিগুণের সাম্যাবস্থাই প্রধান। গুণত্রয় ব্যতীত অপর কিছুই নাই। সেই জড় প্রধানকে সৃষ্ট্যুন্মুখ (কার্য্যে প্রবৃত্ত) এবং প্রলয়োন্মুখ (কার্য্যে নিবৃত্ত) করার এমন কিছুই নাই। পূর্ব্ব-পক্ষ—কেন পুরুষের অধিষ্ঠান আমরা স্বীকার করি, তিনিই প্রধানের প্রবর্ত্তক হউন?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—তিনি ত উদাসীন, নিষ্ক্রিয়, সেজন্য তিনি কাহারও প্রবর্ত্তক নহেন, নিবর্ত্তকও নহেন। এই হেতু প্রধানকে অনপেক্ষ বা স্বতন্ত্র স্বীকার করিতে হয় এবং উহা স্বাধীন ভাবে কাহারও অপেক্ষা না করিয়া প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু চৈতন্যে অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে জড়ের প্রবৃত্তি

অসম্ভব ইহা আমরা পূর্ব্বেই বিচার করিয়াছি। কিন্তু ঈশ্বরবাদীদের পক্ষে ঐরূপ প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তি অন্যায় নহে। হেতু—ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি ও মায়াসহায়।

অন্যত্রাঽভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥ অ ২, পা ২, সূ ৫ ॥

দীপিকা নায়ং তৃণপল্লবাদিদৃষ্টান্তোপ্যচেতনং জগৎ কারণং সাক্ষাৎ কারণং সাধয়তি যতোঽচেতনস্য তৃণপল্লবাদেঃ স্বতন্ত্রস্য ন ক্ষীরং পরিণামোঽপি, কুতঃ, অন্যত্র বলীবর্দ্দাদি ভক্ষিতে পবিত্যক্তে বা ক্ষীর পরিণামস্যাভাবাৎ।

সূত্রার্থ—"যেমন তৃণাদি আপন স্বভাবে ক্ষারাকাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রধান ও মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত হয়, এ কথা বলিতে পার না। তৃণও ধেনুভুক্ত না হইলে দুগ্ধাকারে পরিণত হয় না। ধেনুভুক্ত ব্যতীত অন্য তৃণে ক্ষাব পবিণামেব অভাব দৃষ্ট হয়।"

পূর্ব্ব পক্ষ—তৃণ পল্লব জল প্রভৃতি জড় পদার্থ কাহারও সাহায্য না লইয়া যেমন দুগ্ধ, রক্তাদি আকারে পরিণত হয় সেইরূপ প্রধানও স্বভাবে মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত হয়—কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা করে না। যদি তৃণ জলাদির সহকারী নিমিত্ত কাবণ থাকিত, উপলব্ধ বা জ্ঞান গোচর হইত তাহা হইলে আমরাও সেই সেই নিমিত্তের ও প্রণালীর অনুসরণ করিয়া তৃণাদি হইতে দুগ্ধাদি প্রস্তুত করিতে পারিতাম। যেহেতু তাহা পারি না সেহেতু প্রধানের স্বাভাবিক পবিণাম স্বীকার করিতে হইবে।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—কিন্তু আমরা তৃণাদির দুগ্ধাদিতে পারিণামেব বহু সহকারী চেতন নিমিত্ত কারণ দেখিতে পাই। জরায়ুজ স্ত্রী শরীব (mammel) ব্যতীত অন্য আধারে ঐরূপ পরিণাম দৃষ্ট হয় না। ধেনু কর্ত্তৃক ভক্ষিত তৃণাদি দুগ্ধরূপে পরিণত হয় বৃষ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে ঐরূপ পরিণাম ঘটে না। জরায়ুজ পুরুষ শরীরে কদাচ দেখা যায় বটে তাহারও কারণ বিশেষ আছে। যদি নির্দ্দিষ্ট সহকারী কারণের অপেক্ষা না থাকিত তাহা হইলে তৃণাদি খাইলেই সর্ব্বত্র দুগ্ধাদি দৃষ্ট হইত। মানুষ আপন ইচ্ছায় দুগ্ধ উৎপাদন করিতে পারে না বলিয়া তাহারও নিমিত্ত নাই—স্বাভাবিক ইহা বলিতে পার না। মানুষ অনেক

জিনিষ পূর্ব্বে করিতে পারে নাই, পরে করিয়াছে। দেখাও যায় বুদ্ধি-বলে নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্যের সাহায্যে ধেনুর দুগ্ধ প্রচুর ভাবে বৃদ্ধি করিতে পারে। কাজেকাজেই ঐ দৃষ্টান্ত ঠিক নয়।

অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ॥ অ ২, পা ২, সূ ৬ ॥

দীপিকা—পূর্ব্বং প্রধানস্য প্রবৃত্তির্নোপপদ্যতে ইতি স্থিতং ইদানীং তৎপ্রবৃত্তেরভ্যুপগমেঽপি অর্থস্য প্রয়োজনস্য নিমিত্তান্তরাভাবাৎ পুরুষে ভোগাদেরসম্ভাবে নাভাবাৎ।

সূত্রার্থ—প্রধান আপন-স্বভাবে মহত্তত্ত্বাদি আকারে পরিণত হয়, তাহাতে অন্য কিছুর নিমিত্ততা নাই, ইহা স্বীকার করিলেও সাংখ্য দোষ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন না। তাহাতেও প্রতিজ্ঞাহানি দোষ আছে।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—জড়-প্রধানের স্বতঃ প্রবৃত্তি হইতে পারে না। তবুও যদি বাদীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অনুরোধে মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও তাহাতে প্রতিজ্ঞা-হানি দোষ হয়।

পূর্ব্ব-পক্ষ—সে কিরূপ ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—প্রধান যদি স্বতন্ত্র হয়, যদি আপনা আপনি প্রবৃত্ত হয়, কাহারও অপেক্ষা না রাখে, তাহা হইলে ইহাও মানিতে হইবে যে প্রধান যেমন সহকারীর অপেক্ষা রাখে না তেমনি কোনও প্রয়োজনেরও অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু প্রধানের এইরূপ স্বাধীন-স্বতঃ-প্রবৃত্তি মানিলে তোমাদের যে প্রতিজ্ঞা যে প্রধানের পুরুষার্থসম্পাদনরূপ প্রয়োজন আছে তাহার হানি (বিরুদ্ধ) হয়।

পূর্ব্ব-পক্ষ—যদি বলি প্রধান সহকারীর অপেক্ষা করে না বটে কিন্তু প্রয়োজনের অপেক্ষা করে।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—তাহা হইলে বিচারপূর্ব্বক প্রয়োজনের নির্দ্দেশ কর। কিরূপ প্রয়োজন ? ভোগ ?—অপবর্গ—না ভোগাপবর্গ উভয়ই ?

পূর্ব্ব-পক্ষ—যদি বলি ভোগ।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—প্রধানের প্রয়োজন যদি পুরুষকে ভোগ করান হয় তাহা হইলে অপবর্গের আশা নাই।

পূর্ব্ব-পক্ষ—কিন্তু প্রধানকে অবলম্বন করিয়াই ত পুরুষে ভোগ ইহা প্রত্যক্ষ।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—ইহা বলিলে তোমাদের পুনরায় প্রতিজ্ঞাহানি দোষ হয়। পুরুষের ভোগ ইহা অসিদ্ধ। পুরুষ নিগুর্ণ, নিষ্ক্রিয়, তাঁহাতে কোনরূপ অতিশয় (বিকার বিশেষ) হইতে পারে না (আহিত হয় না) —কাজেই ভোগ অসিদ্ধ।

পূর্ব্ব-পক্ষ—যদি বলি অপবর্গই (মুক্তি) প্রয়োজন ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—তাহা ত পুরুষের, প্রধানের পুরুষার্থ সাধনের প্রবৃত্তির পূর্ব্বেও ছিল। সুতবাং সে প্রয়োজনের সার্থকতা থাকে না।

পূর্ব্ব-পক্ষ—পুরুষ নিত্য-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব বটে কিন্তু অবিবেক হেতু দুঃখত্রয় ভোগ করে। প্রধান তাহাকে নানা বিষয়ের মধ্য দিয়া মুক্তির (অপবর্গ) পথে লইয়া যায়, ইহাই প্রধানের প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—প্রধানের অপবর্গ-প্রয়োজনা প্রবৃত্তি হইলে বন্ধজনক শব্দাদি জ্ঞানের পুরুষের অনুভব হইবে কেন ? অর্থাৎ প্রধানই যখন পুরুষের মোক্ষ সাধন করিতেছে এবং চিত্ত বৃত্তির নিরোধের দ্বারাই যখন উহা সাধিত হয় তখন প্রধান পুরুষের সমক্ষে রূপ রস গন্ধাদি ধারণ করে কেন ?—এবং পুরুষ উহাতে বদ্ধই বা হয় কেন ?

পূর্ব্ব-পক্ষ—তাহা হইলে আমরা বলিব ভোগ ও অপবর্গ উভয়ই প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—প্রকৃতির অনন্ত ভোগের সীমা নাই। সে ভোগে তৃপ্ত হইয়া কোন কালেও মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না।

পূর্ব্ব-পক্ষ—অনন্ত বিষয় ভোগ করিতে হইবে কেন ? দশটা জিনিষ ভোগ করিয়া তাহার অসারতা বুঝিয়া ঔৎসুক্যের (আকাঙ্ক্ষার) নিবৃত্তি করিলেই ভোগ শেষ হইবে।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—ভোগ-দান যদি জড়প্রধানের ধর্ম্ম হয় তাহার ব্যতিক্রম কোন কালেও হইবে না। যে জড়-বস্তুর যে ধর্ম্ম তাহা কোন কালেও পরিবর্ত্তিত হয় না। অগ্নি চিরকাল দহনই করিবে, শীতল করিবে না। জড়ে চেতনের ন্যায় ঔৎসুক্য ও তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না।

প্রধান—জড়, তাহার আবার ঔৎসুক্য কি? ইচ্ছা বিশেষের নামই ঔৎসুক্য, জড়ে তাহা অসম্ভব। অপরদিকে পুরুষ নির্ম্মল স্বভাব, সুতরাং পুরুষের ঔৎসুক্য অসম্ভব।

পূর্ব্ব-পক্ষ—কিন্তু প্রধানের এইরূপ ভোগাপর্গ-সম্পাদন-প্রবৃত্তি না মানিলে পুরুষের দৃক শক্তি (জ্ঞান শক্তি) এবং প্রধানের সৃষ্টি শক্তির সার্থকতা কিরূপে হইবে? প্রধান স্বীয় প্রবৃত্তির দ্বারা ভোক্তা বা জ্ঞাতা পুরুষের ভোগ্য (সৃষ্টি) নির্ম্মান করিয়া ঐ উভয় শক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—উভয় শক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিতে গেলেও মুক্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে। সৃষ্টি-শক্তি (Object) যেমন অনন্ত, দৃক্-শক্তিও (Subject) তেমনি অনন্ত। সৃষ্টি-শক্তি দৃক্ শক্তি ছাড়া থাকিতেই পারে না। এক্ষণে সৃষ্টি-শক্তি যদি অনন্ত-কাল থাকিয়া যায় তাহার সহিত *দৃক-শক্তিকেও অনন্তকাল থাকিয়া যাইতে হইবে। কাজেকাজেই সংসার* নিত্য, মুক্তি কথাটি মিথ্যা। অতএব প্রধানের স্বতঃ-প্রবৃত্তি মিথ্যা।

[ফলিতার্থ—পুরুষ চিদ্রূপ বলিয়া দৃক্-শক্তি সম্পন্ন এবং প্রধান ত্রিগুণাত্মক এই হেতু সৃষ্টি-শক্তি সম্পন্ন। দৃশ্য বা সৃষ্টি ব্যতীত উক্ত উভয় শক্তি ব্যর্থ হইয়া যায়। দৃশ্য যদি না থাকে দৃক্-শক্তি থাকা না থাকা সমান হইয়া পড়ে, দর্শক যদি না থাকে দৃক্-শক্তি থাকিবে কোথায়, অতএব দর্শক না থাকিলে দৃশ্যের অর্থ নাই। এক্ষণে প্রধানের পুরুষকে ভোগাপবর্গদাতৃরূপ স্বতঃপ্রবৃত্তি মানিলেই পুরুষ ও প্রধানের শক্তিদ্বয় আর নিরর্থক হয় না। কিন্তু ইহাতে দোষ হয় এই, শক্তিদ্বয় নিত্য বলিয়া সৃষ্টি নিত্য, সৃষ্টি নিত্য বলিয়া সংসার নিত্য, সংসার নিত্য হইলে সংসারীও নিত্য, সংসারী যদি নিত্য হয় তাহা হইলে তাহার সংসার কখনও ঘুচিবে না বা সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না।]

পুরুষাশ্মবদিতি চেৎ তথাপি ॥ অ ২, পা ২, সূ ৭ ॥

দীপিকা—পুরুষাবন্ধপঙ্গু। তত্রান্ধমধিষ্ঠায় প্রবর্ত্ততে। প্রবর্ত্তকো-ঽয়স্কান্তো বা যথা স্বয়ং প্রবৃত্তস্তদ্বদপ্রবৃত্তোঽপি পুরুষঃ প্রবর্ত্তয়িষ্যতীতি চেৎ তত্রাপি সান্নিধ্যাদয়শ্চ দোষাঃ প্রসজ্যেরন্।

সূত্রার্থ—"পঙ্গুর ও অন্ধের অথবা লৌহের ও চুম্বকের দৃষ্টান্তে প্রধানের প্রবৃত্তি অনুমান করিতে গেলেও নির্দ্দোষ অনুমান হইবে না।"

ভাষ্য-তাৎপর্য্য। পূর্ব্ব-পক্ষ—যদি বলি এক পুরুষ দৃকশক্তি সম্পন্ন কিন্তু তাহার প্রবৃত্তি নাই এবং আর একজন পুরুষ প্রবৃত্তি সম্পন্ন (গতি-শক্তি বিশিষ্ট) কিন্তু তাহার দৃক্ শক্তি নাই অন্ধ, এইরূপ পঙ্গু অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে, কিংবা চুম্বক পাথর যেমন নিজে গতি বিশিষ্ট না হইয়া লোহকে গতি বিশিষ্ট করে, সেইরূপে পুরুষও প্রধানকে প্রবর্ত্তিত করে।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—ইহাতে দোষ হয় পুরুষ প্রবর্ত্তক হইয়া পড়েন এবং প্রধানও পরাধীন হইয়া পড়ে—ইহাতে স্বীকৃতহানি দোষ হয়। নির্গুণ নিষ্ক্রিয় পুরুষ কিরূপে প্রধানকে প্রেরণ করিবে। পঙ্গুর বাকশক্তি আছে তদ্দ্বারা সে অন্ধকে চালাইতে পারে। পুরুষের এমন কোন প্রবর্ত্তক শক্তি নাই যদ্দ্বারা তিনি প্রধানকে চালিত করিতে পারেন—কারণ তিনি সর্ব্ব বিষয়ে উদাসীন। আর যদি স্বীকার করা যায় অন্ধের গতির ন্যায় প্রধানের গতি পঙ্গু বা পুরুষের প্রবর্ত্তক-শক্তি-সাপেক্ষ তাহা হইলে স্বতন্ত্র প্রধান আবার পরতন্ত্র হইয়া পড়ে। চুম্বকের দৃষ্টান্তও দিতে পার না। চুম্বক যে লৌহকে আকর্ষণ করে তাহাও কতকগুলি অবস্থা সাপেক্ষ। চুম্বক পরিমার্জন অপেক্ষা করে, মার্জ্জিত না হইলে তাহার আকর্ষণ-শক্তি প্রকাশ পায় না, এবং সমসূত্রে স্থাপিত না হইলে লৌহে তাহার ক্রিয়া হয় না। এই কারণে পুরুষের সহিত চুম্বকের তুলনা করা অনুপন্যাস হয় অর্থাৎ অযোগ্য দৃষ্টান্ত হয়। পুরুষের প্রধানের নিকট সন্নিধান নিত্য—চিরকালই সমান—তদনুসারে প্রধানের প্রবৃত্তিও ত্রিকালে একই অবস্থায় থাকা উচিত, কখনও সৃষ্টি, কখনও প্রলয়, এরূপ হয় কেন? চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে কিন্তু বিকর্ষণ ত করে না। তাহার প্রবৃত্তির বৈচিত্র্য ও নাই।

পূর্ব্ব-পক্ষ—কিন্তু প্রধানে বৈচিত্র্য প্রবৃত্তি-শক্তি আছে। পুরুষের সন্নিধান বশতঃ তাহার বিচিত্র-প্রবৃত্তি প্রকাশ পায়।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—কিন্তু প্রধান অচেতন এবং পুরুষ উদাসীন ইহাদের

মধ্যে সম্বন্ধ ঘটায় কে ? মার্জ্জন ও সমসূত্রতারূপ আকর্ষণের যোগ্যতা সম্পাদন করিবে কে ?

পূর্ব্ব-পক্ষ—যদি যোগ্যতা-শক্তি স্বীকার করি।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—প্রতিজ্ঞাহানি দোষ হইবে। তোমরা পুরুষ ও প্রধান মান কিন্তু এই উভয়ের সম্বন্ধ ঘটাইবার যোগ্যতারূপ তৃতীয় পদার্থ তোমরা স্বীকার কর নাই। এই যোগ্যতাকে যদি নিত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর তাহা হইলে পুরুষ ও প্রধানের বিচ্ছেদ কোন কালেও হইবে না, কাজেকাজেই নির্মোক্ষ বা চির-বন্ধন স্বীকার করিতে হয়।

[সাংখ্যের অপরাপর দোষ আছে। ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা ভঙ্গ করে কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে কোন কোনও সাংখ্যাচার্য্য বলিয়াছেন, প্রধান একেবারে স্বতন্ত্র নহে, যেরূপ স্বভাবে কার্য্যোৎপত্তি সঙ্গত হয়, যুক্তি সিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়, গুণ সকলের সেইরূপ স্বভাব অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু অচেতন প্রধানের এই বিবেচনা শক্তি থাকিতে পারে না। আর যদি স্বীকার করা যায় তাহা হইলে সাংখ্যবাদীদের প্রধান-বাদিত্ব ত্যাগ করিতে হইবে। কারণ, মায়াবাদীর মায়াও এক জ্ঞান-শক্তি এবং এই জ্ঞান শক্তিকে স্বীকার করিলে শক্তিমানকেও স্বীকার করিতে হইবে।

এই অধ্যায়ে পরমত খণ্ডিত হইল। পর অধ্যায়ে স্বীয়মত সমর্থিত হইবে। সাংখ্যাচার্য্যগণ যুক্তির দ্বারা মায়াবাদ খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিলে আচার্য্য কি প্রকারে সকল দোষ পরিহার করিয়াছেন তাহা আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেখাইব।]

—বাসুদেবানন্দ।

তুচ্ছ কথা

একদিকে গত বিশ বছর ধরিয়া 'আমার দেশ', 'স্বাধীন ভারত', 'স্বায়ত্ত শাসন' এবং শেষ 'স্বরাজ' কথাগুলি নানা ভাষাতে, নানা ভাষ্যে শুনিয়া আসিতেছি। আর দেশের দিকে চাহিয়া দেখিতেছি—বোমা ফাটা, পিস্তলের আওয়াজ, রক্তাক্ত দেহে পুলিশ কর্ম্মচারী রাস্তায় লুটিতেছে, ডাকাতিতে বন্দুকের ব্যবহার, অরক্ষিতদের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন, পরিশেষে ধরপাকড়, বিচারে ফাঁসী, দ্বীপান্তর, জেল, বিনা বিচারে আটক তার পরে দলাদলি, খবরের কাগজে বিরুদ্ধ দলকে গালাগালি কত কি হইয়া গেল এবং এখনও হইতেছে দেখিয়াছি—এক দলের মধ্যে দশ দলের সৃষ্টি, এক নেতার প্রতি অপর নেতার বিশ্বাসঘাতকতা, অযথা নিন্দার প্রচার। এ সব ভাব জেলে এবং দ্বীপান্তরবাসে উদ্গত হইয়া বাংলা তথা ভারতে ব্যাপ্ত হইয়াছে। সকলেই একতা চায় কিন্তু কেহ কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিতে চায় না। প্রত্যহ কত যে দল হইতেছে, ইহার পর বোধ হয় প্রত্যেকে এক একটি বিভিন্ন দলের সৃষ্টি করিবে। স্বাধীন চিন্তার সুফল তাহা হইলে ষোল কলায় উচ্ছৃঙ্খলতারূপে আত্ম-প্রকাশ করিবে, সন্দেহ নাই। অপর দিকে ইংরাজ জাতির মধ্যে যাহারা দেশ ও সমাজ লইয়া ব্যস্ত তাহাদের মধ্যে Foreign Policy (বৈদেশিক নীতি) জনিত 'মোষের শিং বাঁকা—বুঝবার বেলা একা—' দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। ভারতবাসী বলিতে তাহারা 'নিগার' ভিন্ন কিছু বুঝিতে চায় না। সেই নিগারদের শোষণ এবং শাসন করিতে হইবে—ইহাতে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড যখন যাহা প্রয়োজন করিতে হইবে। Diehard প্রমুখ নেতাগণ একথা সোজা ভাষাতেই বলিয়া থাকেন—অপর দলে বা একটু ঘুরাইয়া মোলায়েম করিয়া বলেন; কিন্তু ফলে শোষণ এবং শাসন সমভাবেই চলিয়াছে। থাক্ এখন সে কথা।

"সিন্ধুবাদের" মত ভারতের কাঁধে যে জাতি আজ দেড় শত বৎসরের

উপর চাপিয়া রহিয়াছে তাহাকে প্রবল না বলিয়া দুর্ব্বল বলিলে তাহার বলহানি ঘটিবে না। তাহাকে অপদার্থ বলিলেও তাহার যা পদার্থ আছে তাহা আদৌ কমিবে না। তাহাকে চোর বলিলে সে হাসিবে কিন্তু (exploitation) শোষণ বন্ধ করিবে না। গো-খাদক বলিয়া গালি দিলেও 'গোমাতা' বলিয়া সে গো-হত্যা বন্ধ করিবে না। সে যে প্রবল তাহা বুঝাইবার জন্য তাহার যখন যাহা প্রয়োজন তাহা সে অবাধে করিবেই। উড়ো জাহাজ হইতে বোমা নিক্ষেপ, কলের কামান হইতে গুলি বর্ষণ, মানুষকে বুকে হাটান, এমন কি খাঁচায় পূরিয়া রাখা পর্য্যন্ত প্রয়োজন হইলেই করিবে [illegible]। তুমি যে দিন প্রবল হইবে সে দিন তুমিও ইহারই অনুবৃত্তি করিবে. ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। ভারত ইংলণ্ডের কামধেনু—ভারত হারাইলে ইংরাজকে 'ইটালী' হইতেও খাটো হইয়া থাকিতে হইবে, একথা ইংরাজ যে ভাবে বুঝিয়াছে আমরা ভারতবাসী হইয়াও ততটা বুঝিতে পারি নাই। সে 'প্রাণরক্ষার' জন্য ভারতকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে —আমরা 'আহারের' জন্য স্বরাজ, স্বায়ত্বশাসন চাই—প্রভেদ এইটুকু মাত্র। ভারত না হইলে এখনকার ইংরাজের প্রাণ বাঁচিতে পারে না। যখন ইংরাজ অসভ্য ছিল তখনকার অশন বসন, আর বর্ত্তমানে তাহার চাল চলন সেই অসভ্য-দিনের চাল চলন অপেক্ষা অনেক ব্যয়সাধ্য। তাই ভারতকে সে আরও বেশী করিয়া পাইতে চাহে। আর আমরা? আমরা দলাদলি লইয়াই ব্যস্ত। এই দলাদলি—টাকার লোভে ডিগবাজি খাইবার দলাদলি, পদ গৌরব তাহার পরের কথা— অনেক পিছনে।

লেখক ইংলণ্ডে যায় নাই। এদেশে ইংরাজ পল্লীতে দেখিতে পাই, শান্ত নিস্তব্ধ বাগানে ফুলের গাছ, সমস্ত বাড়ীখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শ্রীমণ্ডিত। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা খেলা করিতেছে নিঃশব্দে, কথা বলিতেছে ধীরে, এক জনের কথা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অপরে চুপ করিয়া থাকে। খেলার মাঠে ক্রিকেট, ফুটবল খেলে মুখটি বুজিয়া, টুশব্দ পর্য্যন্ত নাই, কথা বার্ত্তায় ভদ্রতা শিষ্টতা সদা বর্ত্তমান। ইংরাজ সমাজে কোন

ভদ্রলোক ক্রুদ্ধ হইলেও মেজাজ হারাইয়া চেঁচামেচি করিয়া কথা বলে না, চীৎকার করিয়া গৃহস্বামিত্ব প্রমাণ করে না। যে চীৎকার করিয়া কথা বলে, মেজাজ হারাইয়া স্বর পর্দ্দার পর পর্দ্দা চড়াইয়া তোলে সে অসভ্য নামে অভিহিত। স্কুলে টিফিনের সময় ছেলে মেয়েরা বেড়াইতেছে, ছুটাছুটি করিতেছে কোন শব্দ নাই, হল্লা নাই। যাহারা ইংরাজের ঘরে গিয়া বসিবার সুযোগ পাইয়াছে তাহারা বড় ছোট কোন ইংরাজের ঘরের দেওয়াল নিষ্ঠীবনযুক্ত দেখে নাই। জিনিষ পত্র তক্ তক্ ঝক্ ঝক করিতেছে সাসিতে পর্য্যন্ত ধূলা নাই। গৃহের কোন স্থানে ঝুল দেখা যায় না। ইংরাজ ছেলে মেয়েরা একটু বড় হইলেই মা বাপের সঙ্গে অনেক সময় কাটাইয়া থাকে, ইহাতে সামাজিক ব্যবহার গৃহাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার প্রবৃত্তি—এক কথায় সকল সদ্গুণের প্রাথমিক শিক্ষালাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে বালক বালিকা, তরুণ তরুণী দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে ব্যায়াম বা তদনুরূপ শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করিতে বাধ্য হয়। সকলেই সামর্থ্যানুসারে পুষ্টিকর আহার পাইতে চায়। এজন্য ইংরাজ জাতি সম্মানজনক সদুপায়ে পরিশ্রম করিতে যেমন অভ্যস্ত, প্রয়োজন হইলে অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতেও বিমুখ নহে। কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে পুষ্টিকর আহার চাই তাহার পর বসন, ভূষণ আর যা কিছু।

আমরা—নিষ্ঠাবান জাতি—নিজ গৃহে বসিয়া আহ্নিক করি, দেবতার পূজা করি অপরের বাগান হইতে ফুল চাহিয়া—অন্যথা না বলিয়া ফুল আনিয়া গৃহদেবতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। নিজের বাড়ীতে জায়গা থাকিলেও দুটো ফুল গাছ পুঁতিতে পারি না। ঘর ঝুলে পূর্ণ, দেয়াল ও দোর নিষ্ঠীবনসিক্ত। ঐরূপ ঘরে বসিয়া চুরিকরা ফুলে দেব অর্চ্চনা সমাধা করি। এই দেবভক্ত হিন্দুদের শিশু সন্তানগণ যে অনুপাতে বাড়ীতে থাকে ঠিক সেই পরিমাণে মা বাপের চক্ষুঃশূল হয়। ডাঁটা চচ্চড়ি নিত্য খাইয়া ডাঁটার ছিবড়ার মত মেজাজ লইয়া যখন গৃহস্বামী স্ত্রী এবং পুত্র কন্যার সহিত বাক্যালাপ করেন, তখন ভদ্রতা ও শীলতা বলিয়া কোন জিনিষ তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

জীবন-প্রভাতে ছেলে মেয়েরা শিক্ষা পায়—কি ভাবে উঁচু গলায়

চীৎকার করিয়া কথা বলিতে এবং ক্রুদ্ধ হইলে কত বেশী অশ্রাব্য অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করিতে হয়। তারপর ছেলে মেয়ের দল স্কুলে গেল, স্কুল 'বাজারে' পরিণত হইল—সে চীৎকারের বিরাম নাই। স্মরণাতীত কাল হইতে আমাদের স্কুলগুলি গোলমালের আড্ডা হইয়া আছে। জীবন-প্রভাতে যে শিক্ষা আমরা পাই তাহা সহজে মুছিয়া ফেলা যায় কি? পারা যায় না বলিয়াই আজ কর্মক্ষেত্র—অসংযত বাক্যক্ষেত্রে পরিণত, আর তাহারই ফলে দলাদলি বিস্তারিত ভাবে প্রসারিত। ধৈর্য্যের সহিত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ধৈর্য্যহারা বাপ মা কোথায় পাইবে? দিনরাত দাঁতে দাঁত ঘষিয়া কথা—ছেলের দল তিক্ত হইয়া বাপ মাকে এড়াইয়া চলে। বাড়ী ছাড়িয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায় (like street boys)।

মা বাপ 'দাঁতে দাঁত ঘষিয়া' কথা বলে—ছেলে মেয়েরা তাহা শিখিতেছে, মা বাপ ঘরের দোরে থুথু ফেলে—ছেলেরা তাহা অভ্যাস করিতেছে। ছেলেরা স্নান করিয়া কাপড়খানা মা ধুইয়া দিবেন বলিয়া ছাড়িয়া রাখে, জুতা ছোট ভাই বোনের দ্বারা ব্রাস করাইয়া লয়, বিছানার চাদর, বালিসের ওয়াড়, কাপড় জামা ঝি চাকরদের কাচিয়া দিতে হয়। জলটুকু পান করিতে হইলেও—'মা জল দাও'—বলিয়া পরিশ্রমের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ব্যবস্থা করে।

লক্ষ্মী-ছাড়াদের দুইটি উৎকট লক্ষণ আছে:— ১) আবর্জ্জনা—অশুচি—অপবিত্র—এ সকল বুঝিবার একান্ত অভাব। ২) সৌন্দর্য্য বোধে অক্ষমতা।

নিত্য কিছু কিছু পরিশ্রম করিলে শরীর যেমন একদিকে ভাল থাকে, হজমের শক্তি বৃদ্ধি হয়, অপর দিকে বাড়ীতে ফুলের বাগান এবং শাক সবজীও হইতে পারে। কিন্তু যে দেশ 'যেমন তেমন চাকুরী দুধ-ভাত' বলিয়া চাকুরীর জন্য উৎকট আগ্রহ প্রকাশ করে, সে দেশের গৃহস্বামী কখনো কোদাল ধরিয়া ছেলেকে বাগান করিতে শিক্ষা দিতে পারে? শুধু কি তাহাই, যে দেশের নীতিবাদিগণ প্রায় সকলে বিবাহিত হইয়াও প্রায় সকলেই একবাক্যে স্ত্রী-জাতিকে পশুর শ্রেণীতে স্থান দিয়াছে, যে

দেশের শাস্ত্রকারগণ নিজ প্রবৃত্তির তাড়না অস্বীকার করিয়া স্ত্রী-জাতিকে "কামিনী" বলে, সে দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ নারী-মূর্ত্তিতে জগদম্বার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিলেও মায়ের জাতের প্রতি পুরুষ কখনও শ্রদ্ধাবান হইবে বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃতিসৃষ্ট জীবের মধ্যে 'পুরুষ' জাতির মত রিপু প্রাবল্য (worst criminal) দোষে দুষ্ট মেয়ের জাতি নহে। সাংখ্যকারের মতে পুরুষ নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতি লীলাময়ী। কিন্তু প্রকৃতিসৃষ্ট পুরুষ জাতি 'অশেষ গুণে গুণময় এবং বিবিধ লীলায় লীলাময়'—মেয়েরাই বরং নিষ্ক্রিয়। তবে যেটুকু 'গুণময়ী' ও 'লীলাময়ী' দেখিতে পাওয়া যায় তাহার পশ্চাতে 'গুণময়ের—লীলাময়ের' দলের কারচুপি আছে। পুরুষ বাজিকর যেমন নাচাইতেছে—মেয়ের দল তেমনি নাচিতেছে। অথচ বেহায়া পুরুষের দলই নারীকে ধিক্কার দিয়া নিজে সাধু সাজিয়া নারীকে যা-তা বলিতেছে। সেখানে বালকগণ কি শিখিবে?

শ্রীরামকৃষ্ণের মুহুর্মুহু সমাধি—যখন একশ্রেণীর বিজ্ঞ লোকের নিকট স্নায়বিক দুর্ব্বলতা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল—এবং তাঁহার দেশের লোক তাঁহাকে পাগল বলিয়া জানিয়াছিল—তখন স্ত্রীমূর্ত্তিতে তাঁহার জগদম্বার প্রকাশ প্রত্যক্ষ করাকেও ঐরকম একটা কিছু ভাবিতে এদেশে লোকের অভাব কখনই হইবে না অন্ততঃ অনেকেই এরূপ মনে করেন।

ইংরাজ, গীতা না পড়িয়াও "যক্তাহার বিহারশ্চ" "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম"—প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছে। আর আমরা গীতা পড়িয়াও সে কথা মানি না। অথচ হিন্দুগণ ধর্ম্মপ্রাণ। যে জাতি 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং' বলিয়া তাঁহার পূজা করে কিন্তু তাঁহার কোন আদেশই পালন করিতে প্রস্তুত নহে, সে যদি ধর্ম্মবীর হয় তো ঝাঁটা লাথি খায় কেন?

বাঙ্গালী। তুমি বিজ্ঞ বুদ্ধিমানের উচ্চ উচ্চ তত্ত্ব কত শুনিয়াছ। আমার এ 'তুচ্ছ কথা' শুনিবার সময় তোমার হইবে কি? যদি সময় করিয়া পড়িয়া নিজ ঘর সামলাইয়া চলিতে পার তোমারই কল্যাণ হইবে। যে এক হাত লাফাইতে পারে না সে এক লাফে সমুদ্র পার হইবে এ যদি কখনো সত্য হয়, ভিত্তি শক্ত না করিয়া যদি সৌধ গড়িয়া তোলা

সম্ভবপর হয় তবেই তোমার চেষ্টা সফল হইবে, নতুবা আমার 'তুচ্ছ কথা' তোমাদের শুনিতে হইবে—ছোট খাটো কাজে মনুষ্যত্বের বিকাশ করিতে —আর অর্জ্জন করিতে হইবে—

"যাহা আমাদের নাই, বোধহয় পূর্ব্বকালেও ছিল না। যাহা যবন (গ্রীক) দিগের ছিল, যাহার প্রাণ স্পন্দনে ইউরোপীয় বিদ্যুতাধার হইতে ঘন ঘন মহাশক্তির সঞ্চার হইয়া ভূমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিতেছে; চাই তাহাই। চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতা প্রিয়তা, সেই আত্ম-নির্ভর, সেই অটল ধৈর্য্য, সেই কার্য্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতি তৃষ্ণা, চাই— সর্ব্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া, অনন্ত সম্মুখ-সম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই— আপাদ মস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"

শ্রীভূমানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার বাণী

"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" এই সনাতন সত্য আরও স্পষ্টভাবে প্রচার করিতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে তাঁহার বিশেষ কিছু দিবার আছে এবং এই কথা তিনি তাঁহার সহপাঠিগণকে প্রায়ই বলিতেন। তাঁহার গুরু পরমহংসদেবের নিকট তিনি যেরূপ শিক্ষা পাইয়াছিলেন এবং কাশীপুরের বাগানে যখন নির্ব্বিকল্প সমাধি উপলব্ধি করিলেন তাহাতে তাঁহার ধারণা দৃঢ় হইয়াছিল যে বিশেষ এক বাণী জগতে প্রচার করিবার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত। তিনি নিজের অন্তরে এ বিষয়ের পরিষ্কার সাড়া পাইয়াছিলেন। মহান নেতৃগণ, মহিমান্বিত

মহাপুরুষগণ পরম সত্য লাভ করিয়া তাহা জগতের কল্যাণের জন্য বিতরণ করিয়া যান. স্বামী বিবেকানন্দও ঠিক সেইরূপ নিজ উপলব্ধ সত্য নিজের ভাবে জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে তাঁহার গুরুদেবের মহতী ভবিষ্যদ্বাণী, তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা ও উপলব্ধি, পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তি ইতিহাসে বিশেষ অভিজ্ঞতা এবং সংস্কৃতশাস্ত্রে সম্যক জ্ঞান, ভারতের প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষা গঠিত শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবের পাশ্চাত্যভাব মাত্র পরিশূন্য অলোকসামান্য জীবনের পরিচয় এবং বিশেষভাবে তাহার পরীক্ষা, ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ এবং জনসাধারণের ভাব অভাব, রীতিনীতি, আচার ব্যবহার শ্রদ্ধা ও জ্ঞান, ভারতের প্রাচীন ও বর্তমান জীবনেতিহাস তুলনায় আলোচনা করিবার বিশেষ যোগ্যতা, রাজা প্রজা, সাধু অসাধু, বিদ্বান ও মূর্খের সহিত অবাধ মেলামেশা ও কথাবার্ত্তা,—এই সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে তাঁহার এক বিশেষ কার্য্য আছে যাহা জগতের জন্য প্রয়োজন এবং যাহা সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি দায়ী। সেইজন্য তাঁহার কার্য্য বলিতে প্রধানতঃ এই তিনটি জিনিষ লক্ষিত হইয়া থাকে—যথা, শাস্ত্র, গুরু এবং জন্মভূমি। এই অমূল্য সম্পত্তি সকলের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার জন্য উপযুক্ত যন্ত্ররূপে তিনি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

তাঁহার প্রচার কার্য্যের (Missionএর) সূচনা হয় চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম্মের উপযুক্ত ব্যাখ্যাতারূপে উপস্থিত হওয়াতে। হিন্দুধর্ম্মের মহান সত্য জগতের সমক্ষে তিনি প্রচার করেন এবং এমন ভাবে সনাতন ধর্ম্মের মহিমা বর্ণনা করেন যে জগতে কোন মহাপুরুষ তাঁহার পূর্ব্বে এত সুন্দররূপে ও সুস্পষ্টভাবে সকলের বোধগম্য করিতে পারেন নাই তিনি নিজের ভাবে তাঁহার উপলব্ধ জ্ঞান এবং তাঁহার গুরুদেবের সুদীর্ঘ সাধনভূত সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়বাণী "যত মত তত পথ" জগতে প্রচার করিয়া জীবের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি প্রচার করিলেন যে প্রত্যেক

ধর্ম্মই এক একটি বিশেষ পথ এবং স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া একই লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে ; মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান তাহারই প্রকাশ করিতে সর্ব্বদা যত্নবান হইতে হইবে এবং তিনি স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে বেদান্তদর্শনের গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব হইতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত তথ্যসমূহ, হীন পৌত্তলিকতা ও সামান্য মূর্ত্তি পূজা, যাহার প্রতিধ্বনিমাত্র, বৌদ্ধদের নিরীশ্বরবাদ এবং জৈনগণের নাস্তিকতা পর্য্যন্ত, এ সকলেরই হিন্দুধর্ম্মে স্থান আছে ; হিন্দুধর্ম্ম কোনটিকেও বাদ দেয় না ।

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যদেশে এবং ভারতে যাহা কিছু প্রচার করিয়াছেন তাহা তাঁহার ধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রের পরিণত জ্ঞান ও উপলব্ধি. এক কথায় বলিতে হইলে তাঁহার গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত উচ্চ আধ্যাত্মিক ও ঐহিক সকল প্রকার শিক্ষা । তিনি তাঁহার এক বন্ধুকে তাই লিখিয়াছিলেন, "I have a message and I will give it after my own fashion. I will neither Hinduise my message nor Christianise it, nor make it any 'ise' in the world I will only my-'ise' it and that is all" বাস্তবিকই তিনি জলদগম্ভীরস্বরে তাঁহার এই বাণী জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন । তিনি হিন্দুধর্ম্মের নবজাগরণ আনয়ন করিয়া নূতন ভাবে, নূতন ছাঁচে সমস্ত গঠন করিয়াছেন ।

স্বামী বিবেকানন্দ সকল প্রকার পার্থিব সুখ এমন কি নিজ মুক্তি পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়া জগতের কল্যাণের জন্য,—বিশেষতঃ ভারতের কল্যাণের জন্য—প্রাণপাত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই । তিনি বলিতেন যে তাঁহার উপাস্যদেবতা দরিদ্র, পদদলিত, দুর্ব্বল, নীচ, অজ্ঞ এবং ইঁহাদের সেবার জন্য তিনি বারবার জন্মপরিগ্রহ করিতে ও শত ক্লেশ স্বীকার করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত । "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" ইহাই তাঁহার বাণী ; বিশ্বের কল্যাণধর্ম্ম তাঁহার আত্মস্বরূপ । "অভীঃ" তাঁহার মূলমন্ত্র এবং তিনি দুর্ব্বলতা ও অকৃতকার্য্যতা কখন স্বপ্নেও মনে স্থান দিতে পারিতেন না । "No negative, all posi-

tive, affirmative" ; আমরা কৃতকার্য্য হইব নিশ্চয়ই একথা সর্ব্বদা বলিতেন এবং আরও বলিতেন যে "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি", সুতরাং আমাদিগকে শত বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, 'না' বলিলে চলিবে না। 'শ্রদ্ধা' 'শ্রদ্ধা' এ কথা তিনি বারংবার আমাদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন এবং তাহা আজও যেন আমাদের কর্ণে গম্ভীরভাবে ঝঙ্কৃত হইতেছে।

রামকৃষ্ণ-গতপ্রাণ শ্রীবিবেকানন্দ জিগীষু হিন্দুত্বের (Aggressive Hinduismএর) প্রবর্ত্তক। তিনি হিন্দুত্বকে এক অপূর্ব্ব তেজ ও গরিমায় ভূষিত করিলেন নিজ অমানুষিক শক্তি ও গভীর অধ্যাত্ম সাধনাবলে। তিনি যে শুধু অতীতের গৌরব স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া সাহস পাইয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি হিন্দুর ধর্ম্মকে প্রত্যক্ষানুভব করিলেন, দর্শনকে প্রাণময়সত্তা দান করিলেন, যুগোপযোগী নূতন আকার দিলেন, তাহাকে তুলনামূলক সমালোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া নবযুগের উপযোগী করিলেন। তিনি যে উদাত্তস্বরে ভারতবাসীকে নূতন কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিয়াছেন সে আহ্বান ব্যর্থ হয় নাই,—

"পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, দাসসুলভ দুর্ব্বলতা এবং ঘৃণিত, জঘন্যনিষ্ঠুরতা" পরিত্যাগ করিয়া ভারতবাসী মাত্রেই আজ মানুষ হইতে চাহিতেছে, সুপ্তভারত পুনরায় জাগরিত হইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ যে উদ্দেশ্য সাধন করিতে জগতে আসিয়াছিলেন তাহা আজ সফল হইতে চলিল। তাঁহার পূর্ব্বে অনেক মহাপুরুষই জগতের কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু "এমনটি জগতে আর কখনও আসে নি।"

শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

বিবেকানন্দ

শীতের জড়িমা স্তব্ধ বনানীর বুকে
বসন্তে যেমন জাগে নবীন হিল্লোল,
আকুল দক্ষিণ বায়ু গাহে উতরোল
নব কিশলয়দলে লক্ষশত মুখে ;
জাগে প্রাণ বাধাহারা তরুণ পরশে
শিথিল ধরার গেহে ; আমূল সঞ্চারী
আরক্ত বিদ্রুম কুঞ্জে জাগে নরনারী
নব রাগ উচ্ছ্বসিত হিয়ার হরষে।
সেইরূপ জরা খিন্ন, শাসন দুর্ব্বল,
সহস্র নিষেধ বিধি কণ্টকিত দেশে
তুমি এলে, হে সন্ন্যাসি ! তরুণের বেশে,
শুনালে প্রাণের মর্ম্ম সহজ সরল।
সে দিন যৌবন এল বার্দ্ধক্যের শেষে,
স্তিমিত জীবন বহ্নি উথলিল দেশে।

শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ মুখোপাধ্যায়।

ঋণ-শোধ

ত্রিতাপে দগ্ধ হয়ে মানুষ চীৎকার করছে, কে আছে পার কর— এই জন্ম, মৃত্যু, ব্যাধি, বিরহের হাত থেকে।

মৃদু হাস্যে প্রকৃতি উত্তর দিল, মুক্ত হবার উপায় নেই। কপট-বৈরাগ্যের বৃথা চীৎকারে কোন ফল হবে না। অনন্তকাল ধরে যে ভোগের উপকরণ আমার কাছ থেকে ধারে নিয়েছিলে তার বিনিময়ে

তুমি ত এতটুকু কিছুও ফিরিয়ে দাও নি। কেবল চেয়েছ ও পেয়েছ, কখনও দিয়েছ কি ?

তবে উপায় ?—

একমাত্র উপায় তোমায় সব ফিরিয়ে দিতে হবে। একটা জীবনের ঋণ শোধ না করতে পারলে লোকে নিরয়গামী হয়, আর কত কোটী জীবন ধরে তুমি আমার রূপ, রস, গন্ধের অফুরন্ত ভাণ্ডার ভোগ করেছ, অন্তর কোঠায় কত রত্ন সংগ্রহ করেছ—সে সব তোমায় ফেরত দিতে হবে। যে দিন তোমার সকল স্বার্থের সঞ্চিত ভাণ্ডার নিঃস্ব করে দিয়ে রিক্ত হতে পারবে সে দিন দেখবে তোমার সব বাঁধন খুলে গেছে। স্বরাজ্যে গিয়ে স্বস্বরূপ ফিরে পেয়েছ।

—ধ্রুব।

সংঘ-বার্ত্তা

১। স্বামী প্রভবানন্দ গত কয়েক বৎসর হইতে আমেরিকায় বেদান্তধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন—ইহা আমাদের পাঠক-পাঠিকা এবং বন্ধু-বান্ধবগণ বিদিত আছেন। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মহতী বাণী আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশের নরনারীগণ কিরূপ শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতেছেন এবং স্বামিজীর প্রচার কার্য্য তথায় কিরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইতেছে, শ্রীমতী দুর্গা দেবীর পত্রাংশ হইতে পাঠক পাঠিকাগণ তাহা অবগত হইবেন :—

পোর্টল্যাণ্ডে (Portland) প্রচার কার্য্য শেষ করিয়া স্বামী প্রভবানন্দ টেকামো, ওয়াসিনটন (Tacamo Washinton) গমনপূর্ব্বক কোন উচ্চবংশীয় ভদ্রলোকের অতিথিরূপে বাস করেন। স্বভাব-সরল ও মধুর ভাষায় ধারাবাহিকরূপে নয়টি তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা তথাকার জনমণ্ডলীর হৃদয় তিনি সর্ব্বতোভাবে অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। স্বামিজীর

বক্তৃতা শ্রবণে জনসাধারণ এতদূর আকৃষ্ট হইয়া পড়েন যে টাকোমায় একটি স্থায়ী প্রচারকেন্দ্র স্থাপনের জন্য জনৈকা সম্ভ্রান্ত মহিলা তাঁহার বাসগৃহ এবং দুইটি সমিতি তাহাদের হল (Hall) ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু পোর্টল্যাণ্ডে একটি নূতন কেন্দ্র স্থাপনের বন্দোবস্ত পূর্ব্ব হইতেই স্থির থাকায় তিনি তাঁহাদের এই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। আমেরিকাবাসিগণ বেদান্তধর্ম্ম গ্রহণের জন্য অত্যন্ত পিপাসিত। তাঁহারা আশা করেন, প্রাচ্যদেশ—বিশেষতঃ ভারতবর্ষ হইতে আচার্য্যগণ প্রতীচ্যে গমন করিয়া তাঁহাদের অন্তরের বাসনা পূর্ণ করিবেন।

শ্রীমতী দুর্গা দেবী।

বেদান্ত সোসাইটি, ২৪২ ওয়াসিংটন ষ্ট্রীট, পোর্টল্যাণ্ড—আমেরিকা।

২। গত ২১ অগ্রহায়ণ পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ত্রিসপ্ততিতম জন্মতিথি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। উদ্বোধন-মঠে শ্রীভগবান ও জগজ্জননীর বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদি হইয়াছিল। বেলুড়মঠে ন্যূনাধিক সাত শত পুরুষভক্ত সমবেত হইয়া ভজন কীর্ত্তন ও প্রসাদ ধারণপূর্ব্বক আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। নিবেদিতা-বালিকাবিদ্যালয়ে প্রায় দেড়হাজার মহিলাভক্ত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আদর্শ-মাতৃজীবন স্মরণ মনন এবং তাঁহার প্রসাদ ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ঐ দিন ভারতের এবং ভারতেতর বিভিন্ন দেশের বহু নরনারী ব্যক্তিগত ও জাতিগত কল্যাণের জন্য শ্রীশ্রীজগজ্জননীর নিকট আত্মনিবেদন করিয়া থাকেন। নারীর সহিত পুরুষের মাতৃসম্বন্ধ ঐ দিবস নবভাবে নবরূপে মূর্ত্ত হইয়াছিল, তাই জগতের ইতিহাসে উহা একটি চিরস্মরণীয় দিন।

৩। আগামী ৯ই ফাল্গুন ১৩৩২, ইংরাজী ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯২৬—রবিবার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মমহোৎসব বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হইবে। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

৪। ভবানীপুর 'গদাধর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী কমলেশ্বরানন্দ, হাওড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে প্রতি সপ্তাহে শনিবার ও রবিবার উপনিষদ্ ও অন্যান্য ধর্ম্ম পুস্তকের নিয়মিতরূপে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেব

(শ্রীমুখ কথিত চরিতামৃত।)

শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রকার ভাবসাধনে সিদ্ধ * ও অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এখন তাঁহার দেহরক্ষা কেবল ভক্তের সঙ্গে বিলাস ও লোকশিক্ষার জন্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে এরূপ আছে যে, কোনদিন শ্বেতকেতুকে তাঁহার পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শ্বেতকেতো! গুরুর নিকট তুমি কি সেই শিক্ষা পাইয়াছ, যে শিক্ষার দ্বারা অশ্রুত বস্তু শ্রুত হন, অননুভূত বস্তু অনুভূত হন, অজ্ঞাত বস্তু জ্ঞাত হন?" শ্বেতকেতু বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—"ভগবন্! সে শিক্ষা কি প্রকার?" পিতা উত্তর করিলেন,—"যেমন এক মৃৎপিণ্ড দেখিলেই মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত সকল দ্রব্যের তত্ত্ব জানা যায়,—মৃত্তিকায় প্রস্তুত যত প্রকার দ্রব্যই হউক না কেন, ঐ সকল দ্রব্য মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নয়, মৃত্তিকাই সত্য, নামরূপাদি বিকার মাত্র, অসত্য; সেইরূপ আদিতে এক অদ্বিতীয় বস্তুই বর্ত্তমান। তিনি কল্পনা করিলেন, আমি বহু হইব। সেই এক বস্তুকে জানিতে পারিলে নামরূপাত্মক সমস্তই জানিতে পারা যায়।" এককে জানিতে পারিলে, তবে বহুকে জানা যায়। সমষ্টিকে বুঝিতে না পারিলে, ব্যষ্টিকে বুঝিতে পারা যায় না, ইহাই উপনিষদের মর্ম্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই এক অখণ্ড

* যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, তখন শ্রীরামকৃষ্ণের পুরাণ, তন্ত্র, বেদ ও মুসলমান মতের সাধন সমাপ্ত হইয়াছে এবং রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাস চৌদ্দ বৎসর সেবা করিয়া পরলোকগত হইয়াছেন।

সচ্চিদানন্দকে জানিতে পারায় তাঁহার জানিবার অবশেষ আর কিছুই ছিল না। পূর্ণ অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিয়া, তিনি যাহা অনুভব করিতে লাগিলেন, তাঁহা এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"হরিই সেব্য হরিই সেবক, এই ভাবটি পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ। প্রথম নেতি নেতি করে হরিই সত্য আর সব মিথ্যা বোধ হয়। তারপর সেই দেখে যে, হরিই এই সব হয়েছেন—মায়া জীব জগৎ, এই সব হয়েছেন। অনুলোম হয়ে তারপর বিলোম। একবার অখণ্ড সচ্চিদানন্দে পৌঁছে, তারপর নেমে এসে এই সব দেখা,—তিনিই সব হয়েছেন। সংসার কিছু তিনি ছাড়া নন। ব্রহ্মজ্ঞানের পরও ঈশ্বর একটু 'আমি' রেখে দেন,—'আমি' যায় না। সমাধির অবস্থায় যায় বটে, কিন্তু আবার এসে পড়ে। জ্ঞান লাভের পরও আবার কোথা থেকে 'আমি' এসে পড়ে। সেই 'আমি' ভক্তের 'আমি,' বিদ্যার 'আমি,' তাহাতে এই অনন্ত লীলা আস্বাদন হয়। তাই এই ভক্তের 'আমি,' বিদ্যার 'আমি' রাখে—লোক শিক্ষার জন্য, আবার ভক্তি আস্বাদ করবার জন্য—ভক্তের সঙ্গে বিলাস করবার জন্য।" *

উপরোক্ত উক্তিতে তিনি বিজ্ঞানীর অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। অদ্বৈত-ভূমি হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহার এখন বিজ্ঞানীর অবস্থা। ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভগবান তাঁহার একটু 'আমি' রাখিয়া দিয়াছেন,—এখন তাঁহার পাকা 'আমি'। এই পাকা 'আমি,' দাস 'আমি,' ছেলে 'আমি,' এইরূপ—'আমি' জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি ভগবানের বিচিত্র জগৎ লীলা ও নরলীলা আস্বাদন করিতেছেন। তাঁহার সচ্চিদানন্দময়ী মা, তাঁহাতে ভক্তের 'আমি' রাখিয়া দিয়াছেন,—তাঁহার ভক্তের সঙ্গে বিলাস করিবার জন্য আর লোক শিক্ষার জন্য। তাঁহার মা, তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন,—"তুই ভাবেই থাক্, আমার সব ভক্তেরা আসবে, তোকে ঐহিক লোকের সঙ্গ করতে হবে না, আমার শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তের সঙ্গ কেবল থাকবে।"

মথুরানাথের মৃত্যুর কয়েকমাস পরে, শ্রীসারদা দেবী তাঁহার স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমন করেন। ছয় বৎসরের

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

ক্রমশঃ

বালিকা বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের পর প্রায় আট বৎসর পরে, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার প্রথম স্বামী সন্দর্শন ঘটে। সাত বৎসর সাধনার পর শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মভূমি কামারপুকুরে আগমন করিলে তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীসারদা দেবীকে তথায় আনয়ন করা হয়। এতদিন তিনি শুনিতেছিলেন যে, তাঁহার স্বামী দক্ষিণেশ্বরে দেবালয়ে উন্মাদ অবস্থায় রহিয়াছেন। কামারপুকুরে আসিয়া তিনি স্বামীর নিকট কি ভাবে গৃহীত হইয়াছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের এ সময় লোকাচার পরিত্যাগ ও ভগবৎ চিন্তায় ভাবাবেশ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার মনোভাব কিরূপ হইয়াছিল তাহা সবিশেষ জানা যায় না। ইহারও পর প্রায় চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। তিনি এখন অষ্টাদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার স্বামী এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদ গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য স্বামীর প্রতি স্ত্রীরও কর্ত্তব্য আছে। স্বামীর যেরূপ অবস্থাই হউক সাধ্বী স্ত্রীর কঠোর কর্ত্তব্য পালন বিষয়ে শাস্ত্র ও লোকাচার উভয়েরই তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। শ্রীসারদা দেবী সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য ১২৭৮ সালের ফাল্গুন মাসে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

শুনা যায়, গঙ্গাস্নান উপলক্ষ পিতার সমভিব্যাহারে এবং জয়রামবাটী গ্রাম ও তদঞ্চলের অনেক স্ত্রী ও পুরুষদিগের সহিত দলবদ্ধ হইয়া বৈদ্য-বাটীতে আসিতেছিলেন, কিন্তু বহুদূর পথ চলার কষ্টে তিনি প্রবল জ্বরে পীড়িতা হইয়া কোন চটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিঞ্চিন্মাত্র সুস্থবোধ করিলে, ঐ স্থান হইতে পিতার সহিত তিনি অসুস্থ শরীরে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। দুঃসহ ক্লেশ কি করিয়া নিরবে সহ্য করিতে হয়, শ্রীসারদা দেবীর জীবনে তাহা চিরদিন দেখা গিয়াছে। শ্রীসারদা দেবীর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থিতি হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে এক অভিনব পরিচ্ছেদ উন্মুক্ত হইল। শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তের সঙ্গ ও লোকশিক্ষার নিমিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ 'মার' কাছে আদিষ্ট। তাঁহার প্রথম ভক্ত ও শিষ্যা, তাঁহার পত্নী শ্রীসারদা দেবী।

"শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ সহধর্ম্মিণী শ্রীসারদা দেবীকে সবিশেষ যত্ন ও সমাদর-

পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া নহবতে আপনার জননীর নিকট নিযুক্ত থাকিবার

ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীসারদা দেবীও প্রীতমনে স্বামী ও শ্বশ্রূর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের এখন পাঁচ বৎসরের বালকের স্বভাব হইয়াছে—সদানন্দমূর্ত্তি, সরল বালক, অনুক্ষণ মার নামে মাতোয়ারা ও ভাবসমাধি মগ্ন হইয়া থাকেন। সে প্রেমমূর্ত্তি দর্শন করিলে, মহা পাষণ্ড, নাস্তিক ও পাপাচারীর মনও দ্রবীভূত হয়। শ্রীসারদা দেবী স্বামীকে যে পরম আরাধ্য দেবতা ভিন্ন অন্য কোন দৃষ্টিতে দেখিতে পারিলেন না, ইহা সহজেই বোধ হইতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ পত্নী শ্রীসারদা দেবীকে কি ভাবে স্বীয় সন্নিধানে রাখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ষোড়শী পূজায় প্রকাশ পাইয়াছে। জীবশিক্ষার জন্য নিজ জীবনে সেই মহাপূজা অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়াছেন যে,—

"যে মেয়ে মানুষের কাছ থেকে এত সাবধান হতে হয়, ভগবান্ দর্শনের পর বোধ হবে সেই মেয়ে মানুষ সাক্ষাৎ ভগবতী! তখন তাঁকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করবে! আর তত ভয় নাই!" *

শ্রীসারদা দেবীর দক্ষিণেশ্বরে আসিবার তিন মাসের মধ্যেই তিনি সোপচারে ও বিহিত বিধানে ষোড়শী পূজা করিয়াছিলেন। জ্যৈষ্ঠমাসের ফলাহারিণী শ্যামাপূজার রাত্রে তাঁহার গৃহে পূজার আয়োজন হইয়াছিল। ষোড়শাক্ষর মন্ত্রে জগদম্বার পূজা করিতে হয় বলিয়া ইহাকে ষোড়শী পূজা বলে। শ্রীবিদ্যা ও ত্রিপুরাসুন্দরী তাঁহারই নামান্তর। ষোড়শী পূজায় ভগবতীর কোনরূপ ভয়ঙ্করা মূর্ত্তি কল্পনা নাই। মহামায়াকে সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ী, সর্ব্বকল্যাণদায়িনী রূপে ধ্যান করিবার বিধান। মহাবিদ্যা ষোড়শীদেবীর ধ্যান নিম্নোক্ত ভাবে করিতে হয়।

"দেবী পদ্মসন্নিভা, বালসূর্য্য কিরণের ন্যায় ইঁহার শরীরের জ্যোতিঃ। ইনি জবাকুসুম দাড়িম্বপুষ্প পদ্মরাগমণি ও কুঙ্কুমের ন্যায় অরুণবর্ণ বিশিষ্টা; ইঁহার মস্তকস্থিত উজ্জ্বল মুকুট মাণিক্য-কিঙ্কিণী-জালদ্বারা বিভূষিত। কৃষ্ণকায় অলিবৃন্দের ন্যায় বক্র অলকাদাম সুশোভিত। নবোদিত অরুণের ন্যায় ইঁহার মুখপদ্ম। কুটিল ললাটদেশে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত। এই পরমেশ্বরীর শিবধনুসদৃশ ভ্রূযুগল শোভিত। ইঁহার নেত্রত্রয় আনন্দভরে

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

মুদিত ও বিকশিত হইতেছে। উজ্জ্বল কিরণ বিশিষ্ট সুবর্ণ কুণ্ডলে কর্ণযুগল পরিশোভিত। সুন্দর গণ্ডস্থল সুধাংশুর অমৃত-মণ্ডল জয় করিয়াছে। তাম্র বিদ্রুমমণি ও বিম্ব ফলের ন্যায় ওষ্ঠাধরে অমৃত স্পন্দিত হইতেছে এবং ঈষৎ হাস্যের মাধুর্য্যে রসসাগরের মাধুর্য্যকে জয় করিয়াছে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর শিরোরত্নদ্বারা পাদপদ্ম শোভিত। ইনি রক্তপদ্মে উপবেশন করিয়াছেন। ইঁহার চারি হস্ত ও ত্রিনেত্র। ইঁহার দুই হস্তে পাশ ও অঙ্কুশ। ইনি অপর দুই হস্তে পঞ্চবান ও ধনুধারণ করিয়াছেন। ইনি সর্ব্বপ্রকার মোহন বেশে ও সর্ব্বাভরণে বিভূষিতা। জগতের আহ্লাদদায়িনী, জগৎরঞ্জনকারিণী, জগৎ আকর্ষণকর্ত্রী, জগতের কারণস্বরূপা, সর্ব্বমন্ত্রময়ী, সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী, সর্ব্বলক্ষ্মী এবং সর্ব্বশক্তিময়ী এই মঙ্গলদায়িনী নিত্যা-দেবীকে চিন্তা করি।"

শ্রীসারদা দেবীকে সম্মুখস্থিত দেবীর জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে বসাইয়া, পুষ্প চন্দন মাল্য ধূপদীপাদি প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিতে করিতে শ্রীরাম-কৃষ্ণের শ্রীশ্রীত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর সর্ব্বশক্তি সমন্বিতা দিব্যমূর্ত্তি সাক্ষাৎকার হইল। শ্রীপাদপদ্মে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি ও আপনার জপমালা সমর্পণ করিয়া তিনি ভাবসমাধি মগ্ন হইলেন। শ্রীসারদা দেবীও স্বহৃদয়ে জগদম্বার আবির্ভাব উপলব্ধি করিলেন এবং তাঁহারও বাহ্য সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। ষোড়শী পূজার পুণ্যফলে বিবাহিতা হইয়াও তিনি আজীবন ব্রহ্মচারিণী, সংসারী হইয়াও সন্ন্যাসিনী। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"মার যত রূপ দেখিয়াছি, তাঁর রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি সৌন্দর্য্যে অনুপম,—তাঁর তুলনা নাই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ এ সময় আপনাতে স্ত্রীভাব আরোপ করিয়া শ্রীসারদা-দেবীকে আপনার শয়ন শয্যায় স্থান দান করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে পুনর্ব্বার সখীভাবের উদয় হইল। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"তা না হইলে পরিবারকে আট্‌মাস কাছে এনে রেখেছিলাম কেমন কোরে? দুজনেই মার সখী।"

শুনা যায়, এ সময় তাঁহার ভাবসমাধি প্রগাঢ় হইয়াছিল। শ্রীসারদা দেবীকে সর্ব্বক্ষণ সতর্ক থাকিতে হইত। রাত্রে তিনি প্রায় নিদ্রা যাইতেন না, সর্ব্বদাই উদ্বিগ্নচিত্তে জাগিয়া অপেক্ষা করিতেন কখন

সমাধি অবস্থা উপস্থিত হয়। সমাধি দেখিলেই তিনি 'মার' নাম শুনাইয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন।

শ্রীসারদা দেবী ভক্তি-বিনম্রভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ কি ভাবে রহিয়াছেন এবং মনোনিবেশ পূর্ব্বক শুনিতেন—তাঁহার শ্রীমুখের বর্ণিত প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা। এরূপে শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি নিজের জীবন কি ভাবে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাহা বিশেষরূপে অবগত আছেন। স্বামীর নিকট সর্ব্বক্ষণ জ্ঞান-ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া সংসারে থাকিয়াও কি করিলে ভগবান্ লাভ হয়, তিনি সাক্ষাদ্ভাবে তাহা অবধারণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বামীকেই তাঁহার ইষ্ট—জগদম্বাস্বরূপা জ্ঞান করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন, এবং মনে জ্ঞানে সর্ব্ববিষয়ে তাঁহারই আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া রহিলেন। স্বামীর নিকট তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জ্ঞানও ছিল না। শ্রীসারদা দেবী লজ্জা, ধৈর্য্য, দয়া, ক্ষমা, স্নেহ ও সেবার জীবন্তমূর্ত্তি। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে অবস্থান কালে, গভীর নিশীথে যখন সকলেই নিদ্রাভিভূত তিনি জাগরিতা হইয়া নিঃশব্দে স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেন। কালী বাড়ীতে নিত্যই উৎসব—কর্ম্মচারী, ভৃত্য, পূজক, সাধু, অতিথি প্রভৃতি শত শত লোক পূর্ণ; কিন্তু তাঁহাকে দর্শন করা দূরে থাক্ তাঁহার অবস্থিতি মাত্রও কেহ কখন জানিতে পারে নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুক্ষণ সেবাকারী অন্তরঙ্গ ভক্তগণও কেহই তাঁহার কণ্ঠস্বর বা পদশব্দ কখন শ্রবণ করেন নাই, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ দর্শন-ত দূরের কথা। স্বামী যোগানন্দ একদিন বলিয়াছিলেন—"আমি মাকে লইয়া ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছি, বহু তীর্থস্থানে লইয়া গিয়াছি, গাড়ী হইতে নামান উঠান পর্য্যন্ত আমাকে করিতে হইয়াছে, কিন্তু মার শ্রীচরণের অঙ্গুলির অগ্রভাগ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাই নাই।" শ্রীসারদা দেবীর চরিত্রে স্বামীর একান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তীতা, তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ ও স্ত্রীলোকের অমূল্য-ভূষণস্বরূপ সসম্ভ্রম লজ্জার-ভাব,—আধুনিক স্বাধীনতা প্রয়াসী, পুরুষ-সমতা-কাঙ্ক্ষিণী, ইংরাজী অনুকরণে শিক্ষিতা হিন্দুমহিলার সম্পূর্ণ বিপরীত। *

* 'উদ্বোধনের' আগামী সংখ্যায় ইহা সমালোচিত হইবে।—সম্পাদক।

যে সমাজে গৌরী, সীতা ও সাবিত্রী স্ত্রীচরিত্রের চরমোৎকর্ষরূপে পূজিতা হইতেছেন, সে সমাজে শ্রীসারদা দেবীও যে আদর্শ স্থানীয়া হইবেন তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না।

নহবতে যে কক্ষে তিনি থাকিতেন, তাহাতে শশ্রূঠাকুরাণীর শয্যা, আহারীয় দ্রব্য, তৈজসপত্রাদি রক্ষিত হইবার পর একটু বসিবার স্থানের সংকুলান হওয়া দুর্ঘট ছিল। তিনি কি করিয়া সেই অল্প পরিসর স্থানে দিবারাত্র অতিবাহিত করিতেন তাহা মনে করিলেও কষ্ট হয়। আগন্তুক, অভ্যাগত, শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত যে কেহ জয়রামবাটী যাইয়া তাঁহার পিতৃগৃহে অতিথি হইয়াছেন, তিনি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, শ্রীসারদা-দেবীর আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পুত্রাধিক স্নেহে লোকসেবা এক অপূর্ব্ব ব্যাপার! আপনাপন পিতামাতা ও পরমাত্মীয়গণেও সেরূপ ঐকান্তিক ভালবাসা তাঁহারা দৃষ্টি করেন নাই। পল্লিগ্রামে দরিদ্রসংসারে আহারীয় দ্রব্যের নিত্যই অভাব। সহসা লোক সমাগমে সে সকল সংগ্রহ করাও সহজসাধ্য নহে। অতিথি সৎকার জন্য অনেক সময় লোকাভাবে তিনি স্বয়ং সকলের অজ্ঞাতসারে কৃষকপল্লি হইতে ফলমূলাদির বোঝা নিজ মস্তকে বহন করিয়া আনিয়াছেন। নিজের রুগ্ন দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া রন্ধনাদি কার্য্যে উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়া দেহপাত করিয়াছেন, কিন্তু সাহায্যের জন্য কাহাকেও ব্যস্ত করিতে বা কষ্ট দিতে চাহিতেন না। আগন্তুক সকলে বিদায় গ্রহণ করিলে, তিনি দ্বারদেশে আসিয়া সজল নয়নে দণ্ডায়মানা থাকিয়া পথ নিরীক্ষণ করিতেন, যতক্ষণ না তাঁহারা নয়নপথ অতিক্রান্ত হন। আত্মবিসর্জ্জন পূর্ব্বক সকলকে প্রীতিদানে সন্তুষ্ট রাখিয়া স্বার্থপর সতত দ্বেষহিংসা কলহপূর্ণ সংসার মধ্যে সকল দুঃখ ক্লেশ নীরবে সহ্য করিয়া প্রশান্ত মনে তিনি দিন যাপন করিয়া-ছেন। কত শোকতাপ দগ্ধ অসহায়া স্ত্রীলোক তাঁহার পুণ্যসঙ্গ লাভ করিয়া জীবনের শেষকাল শান্তিতে কাটাইয়াছে। শ্রীসারদা দেবীর জীবন কাহিনী বর্ণনা করিবার এ স্থান নহে। আমরা দুই একটি কথা মাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

আট মাস কাল দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া শ্রীসারদা দেবী পিত্রালয়ে

গমন করেন। মথুর বাবুর পরলোক গমনের পর এ সময় শ্রীরামকৃষ্ণের বৃদ্ধা জননীর আহারাদি নির্ব্বাহের জন্য অর্থাভাব হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল; কিন্তু কলিকাতা সিন্দুরিয়াপটী নিবাসী বাবু শম্ভুচরণ মল্লিকের বদান্যতায় তাঁহাকে সে কষ্ট অনুভব করিতে হয় নাই। শম্ভুচরণ একজন ইংরাজী শিক্ষিত হৃদয়বান্ পুরুষ। শুনা যায়, কোন সদাগরের আফিসে মুৎসুদ্দীর কর্ম্মে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন। দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীর নিকট তাঁহার একখানি বাগানবাটী ছিল, তথায় দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সকলের পীড়িতদিগকে ঔষধদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যে অবধি শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়, তিনি তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তিপ্রদর্শন করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণও শম্ভুবাবুর বাগানে সময় সময় যাইতেন এবং ভগবৎ প্রসঙ্গে তাঁহাদিগের অনেক সময় অতীত হইত।

প্রভূত সঞ্চিত অর্থ যাহাতে লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয় করিতে পারেন, শম্ভুবাবুর ইহাই আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু মানুষের জনসাধারণের জন্য মঙ্গলকর অনুষ্ঠান যে অনেক সময় সকাম হইয়া থাকে এবং ঐ সকল কর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়া জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে মানুষ ভুলিয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাই শম্ভুবাবুকে বুঝাইয়া দিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"শম্ভু বল্লে,—এখন এই আশীর্ব্বাদ করুন যে, যে টাকা আছে সেগুলি সদ্ব্যয়ে যায়,—হাঁসপাতাল, ডিস্পেনসারী করা, রাস্তাঘাট করা, কূয়ো করা এই সবে। আমি বল্লাম,—এ সব অনাসক্ত হয়ে করতে পারলে ভাল, কিন্তু তা বড় কঠিন। আর যাই হোক এটি যেন মনে থাকে যে, তোমার মানব জন্মের উদ্দেশ্য,—ঈশ্বর লাভ; হাসপাতাল, ডিস্পেনসারী নয়। মনে কর ঈশ্বর তোমার সামনে এলেন, এসে বল্লেন—তুমি বর লও তা হলে তুমি কি বলবে,—আমায় কতকগুলো হাঁসপাতাল, ডিস্পেনসারী করে দাও,—না বলবে,—হে ভগবান্। তোমার পাদপদ্মে যেন আমার শুদ্ধাভক্তি হয়, আর যেন তোমায় সর্ব্বদা দেখতে পাই! হাঁসপাতাল ডিস্পেনসারী এ সব অনিত্য বস্তু। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। তাঁকে লাভ হলে আবার বোধ হয়—তিনি কর্ত্তা আমরা অকর্ত্তা। তবে কেন

তাঁকে ছেড়ে নানা কাজ বাড়িয়ে মরি! তাঁকে লাভ হলে তাঁর ইচ্ছায় অনেক হাঁসপাতাল, ডিস্‌পেনসারী হতে পারে!" *

শম্ভুবাবুর নিকট হইতে সামান্য একটু আফিম্‌ তিনি সঙ্গে লইয়া যাইতে অক্ষম হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ঈদৃশ অদ্ভুত ত্যাগের দৃষ্টান্ত অবলোকন করিয়া শম্ভুচরণও মথুরানাথের ন্যায় অকপট ভক্তিযোগে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীসারদা দেবীর দক্ষিণেশ্বরে প্রথম অবস্থিতিকালে, কালীবাড়ীর নহবতে থাকিবার অতিশয় ক্লেশ হইয়াছিল জানিতে পারিয়া শম্ভুবাবু মন্দিরের সন্নিকটে একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়া তাহাতে বাসের উপযোগী একটি কুঠরী নির্ম্মান করিয়া দিয়াছিলেন।

ডাঃ শ্রীশশিভূষণ ঘোষ।

শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার-বিচার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তাহার পর শূদ্র তপস্যাদি ব্রাহ্মণকর্ম্ম করিলে যে পাপ হয় না, তাহার অন্য কারণও আছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে দশম অধ্যায়ে দেখা যায় এক শূদ্র সন্ন্যাসী এক মুনির আশ্রমের নিকট তপস্যা করিতে-ছিলেন। তাহাকে একদিন একমুনি শ্রাদ্ধবিষয়ক কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহার সহিত তাঁহার বন্ধুত্বও হয়, উভয়ে অনেক সময় সদালাপে সময়ক্ষেপও করিতেন। কালক্রমে উভয়েরই মৃত্যু হইল। শূদ্র ক্ষত্রিয়কুলে জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন ও মহারাজা হন এবং মুনি সেই রাজার পুরোহিত হন। এই কথা বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলা হইল

---

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।

যে, শূদ্রকে কোনরূপ উপদেশ দিবে না, ইত্যাদি। ইহা হইতে কিন্তু প্রমাণ হয় যে, শূদ্রের কোন পাপই হয় নাই, তাহার বরং উন্নতিই হইয়াছিল। আর মুনির পুরোহিত জন্মরূপ অধোগতির কারণ যদি পাপকল্পনা করা হয়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, সে পাপ শূদ্রকে উপদেশ দানজন্য নহে, পরন্তু মুনিকার্য্য না করিয়া সময়ক্ষেপ করার জন্য পাপ। শাস্ত্রেও আছে—

আলাপাৎ গাত্রসংস্পর্শাৎ নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
শয়নাৎ গমনাৎ যানাৎ পাপমেব প্রবিশতি ॥
হীয়তে হি মতি স্তাত। হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্॥ মহাভারত।

অতএব এই যে পাপের কথা শাস্ত্রে আছে, ইহা অনধিকারী শূদ্রকে অনধিকারচর্চ্চা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য ভয়প্রদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাস্তবিক যাগবিশেষে নিষাদস্থপতিকে (রথকারকে) ঋক্, মন্ত্রদ্বারা যাজন করিবার বিধান আছে। অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণগণের স্ত্রীগণ কি বেদমন্ত্র শ্রবণ করেন না? শব্দশ্রবণ মাত্রই যদি পাপ হয় তবে তাঁহাদের উপায় কি? মৈত্রেয়ী গার্গী প্রভৃতি স্ত্রীগণের কি তাহা হইলে পাপ হইয়াছিল? যদি বলা যায়—আত্রেয়বংশসম্ভূতা নারীগণের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে, ইহা শাস্ত্রেরই কথা। তাহা হইলে ত তাঁহাদের মধ্যে অধিকারিভেদই স্বীকার করা হইল। নিষাদস্থপতিরও যাগবিশেষে অধিকার প্রদান করায় শূদ্রের মধ্যেও অধিকারভেদ স্বীকার করা হইল। অতএব পাপের কথা যে বলা হইয়াছে, অধিকার-ভেদেই তাহার সঙ্কোচ ঘটিল। উহা সাধারণের রীতি আর হইল না।

যদি বলা হয়, এতদতিরিক্ত স্থলে পাপ হয়; শাস্ত্রে যে সব স্থলে পাপ হয় না, তাহা বলিয়াই দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইলে বলিব—যে জ্ঞানে জাত্যভিমান ত্যক্ত হইয়া যায়, সেই জ্ঞান যাহার কতকটা হইয়াছে, তাহাকে বেদাধ্যয়নে বাধা দেওয়া অর্থাৎ তাহাকে সেই জাত্যভিমান-ত্যাগে বাধা দেওয়া কখনই শাস্ত্রের অভিপ্রায় হইতে পারে না। কণ্টকের দ্বারা কণ্টকোৎপাদন করাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। বিজাত্যভিমান-

দ্বারা উত্তম শাস্ত্রের অভ্যাস করিয়া তদ্রূপ ক্রমে নিরভিমান হইবার কথা।

তাহার পর শাস্ত্রে কি সকল বিধানই দেওয়া হইয়াছে যে, উক্ত কয়টি স্থল ব্যতিরিক্ত স্থলে পাপ হয় বলা হইতেছে ? মনুতে সদাচারের জন্য বহু বিধিনিষেধ নির্দেশ করিয়া অবশিষ্ট বিষয়ের জন্য ব্রহ্মাবর্তবাসীদিগের অনুসরণ করিতে কি বলা হয় নাই ? যখন স্ত্রী বৈশ্য শূদ্র ও পাপ-যোনিজ ব্যক্তির ভগবদ্ভক্ত জ্ঞানদ্বারা পরাগতির কথা বলিয়াছে, যথা—

"স্ত্রিয়ো বৈশ্যা স্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্।"

তখন তাহা ব্রাহ্মণজন্ম হইলে হয় বলিলে কি জ্ঞানাগ্নিকে নিষ্প্রভ করা হয় না ? আর যদি ইহাকে অর্থবাদ অর্থাৎ স্তুতিবিশেষ বলা হয়, তবে পাপের কথাই কেন নিন্দারূপ অর্থবাদ হইবে না ?

তাহার পর আর এক কথা। শম্বুক নামক শূদ্র রামরাজত্বে তপস্যা করায় তাহার পাপে এক ব্রাহ্মণশিশুর অকালমৃত্যু হয়। রামচন্দ্র তাহার জন্য তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন। ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে ইহাকেই বা পাপ বলিব কেন ? কারণ, শম্বুক রামচন্দ্রের হস্তে নিহত হইয়া তৎক্ষণাৎ পরমপদ লাভ করিলেন, ইহাই কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানী কি করেন ? তিনি ত কেবল প্রারব্ধ ক্ষয় করিবার জন্য জীবনধারণ মাত্র করেন। শূদ্র জ্ঞানী হইলে যদি শীঘ্র শীঘ্র প্রারব্ধ ক্ষয় হয়, তাহা হইলে তাহা শূদ্রের পক্ষে বিশেষ পুণ্যই বলিতে হইবে। ভোগাসক্ত অজ্ঞানীর পক্ষে শীঘ্র শরীরপতন অনভীষ্ট বটে, কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে ত তাহা নহে। আর জ্ঞানীর আদর্শই সমাজের লক্ষ্য। এই কারণে শম্বুকের পাপ হইয়াছিল—স্বীকার করিবার আবশ্যকতা দেখা যায় না।

যদি বলা যায় শম্বুক পাপ করিয়াছিল বলিয়াই ব্রাহ্মণশিশু অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ; সুতরাং উহা পাপ নহে কেন ? তাহা হইলে বলিব, ইহা পাপ নহে, ইহা এক প্রকার সামাজিক অসুবিধাবিশেষ। ইহাতে অনুষ্ঠানকারীর ক্ষতি নাই। ইহাতে নিয়ম বিশৃঙ্খলাজন্য সমাজের ক্ষতি হইতে পারে, তাই তাহার শাস্তি রামচন্দ্র দিলেন। অতএব

ইহাতে নরকভয় নাই। যেমন স্বেচ্ছায় অগম্যাগমনাদিজন্য যে পাপ তাহা প্রায়শ্চিত্ত করিলে অপনীত হয় কিন্তু তথাপি সে ব্যক্তি সমাজে ব্যবহার্য্য হয় না, এস্থলে এই অব্যবহার্য্যতার কারণ যে জাতীয় দোষ ইহাও সেইরূপ দোষ বলিতে হইবে। আর যদি পাপই হয় বলা হয় তবে পাপের ফল যে করিল তাহার ভোগ না হইয়া অপর যে ব্রাহ্মণ-শিশু তাহার ভোগ হইল। পাপ করিল একব্যক্তি আর ফলভোগ করিল অপর ব্যক্তি। ইহা কি একপ্রকার কৃত-নাশ ও অকৃতাভ্যাগম দোষ নহে? তাহার পর ত্রেতাযুগে এক পোয়া পাপ ও তিন পোয়া পুণ্য, এক্ষেত্রে কি রামচন্দ্রের রাজ্যে এক পোয়া পাপ এই শূদ্রের তপস্যা? এরূপ স্থির করা কবির কল্পনা বিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে বলিতে হয়।

তাহার পর ইহা যদি পাপই হয় তবে সে পাপ রামচন্দ্রের—তপস্বী শূদ্রের নহে। রামচন্দ্র এমন ভাবে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন যাহাতে লোকের স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা থাকিতে ছিল না। শূদ্রের যে ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় তাহার কারণ সমাজ ব্যবস্থাপকের দোষ, যাহার এরূপ প্রবৃত্তি হয় তাহার দোষ বলিব কেন? ধর্ম্মব্যাধ, জনকরাজ্যে স্বেচ্ছায় মাংস বিক্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহার অন্যরূপ প্রবৃত্তিই হয় নাই। অতএব শূদ্রের তপস্যায় পাপ হয় না, পরন্তু সমাজ-শৃঙ্খলা ভঙ্গজন্য অসুবিধা বিশেষই হয় মাত্র। "একমাত্র জন্মই অধিকারের হেতু", এই সময় এই ভাবটি যদি প্রবল না হইত তাহা হইলে বোধ হয় উক্ত শূদ্রেরও ঐরূপ প্রবৃত্তিই হইত না, অথবা এই পাপে ব্রাহ্মণ শিশু মরিয়াছে এরূপ কল্পনাও উদিত হইত না। এরূপ কল্পনা কি নিতান্তই অস্বাভাবিক?

তাহার পর বেদশ্রবণে যে শূদ্রের বিধি নাই, তাহাও ত নহে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে শুকানুপ্রশ্নাধ্যায়ে বেদের অধ্যয়নবিধিকথনপ্রসঙ্গে আছে,—

শ্রাবয়েচ্চতুরো বর্ণান্ কৃত্বা ব্রাহ্মণমগ্রতঃ।
বেদস্যাধ্যয়নং হীদং তচ্চ কর্ম্ম মহৎ স্মৃতম্॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে সম্মুখ করিয়া চারি বর্ণকেই বেদ শ্রবণ করাইবে,

ইহা একটি মহৎ কার্য্য। মলমাসতত্ত্বে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন যে একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও শ্রবণের বিধি আছে, যথা—

নাধ্যেতব্যং ন চান্যেন ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বিনা।
শ্রোতব্যমিহ শূদ্রেণ নাধ্যেতব্যং কদাচন॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্যতীত বেদ পড়িতে নাই, শূদ্রের শ্রবণ করিতে আছে, ইত্যাদি। এস্থলে শ্রবণ ও অধ্যয়নের ভেদ কি, তাহার প্রতি যদি লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলেও শূদ্রের গ্রহণ-ধারণ সামর্থ্যের অভাববশতঃই যে তাহাদের অধ্যয়নে অধিকার নাই তাহা বেশ বুঝা যায়। কারণ, প্রশ্ন, উত্তরপূর্ব্বক শ্রবণের নাম অধ্যয়ন। শূদ্র ভালরূপ বুঝিতে পারে না, সুতরাং তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইলে যাহারা বুঝিতে সমর্থ তাহাদের অধ্যয়নে বিঘ্ন হইবারই কথা। যেমন নিম্নশ্রেণীর বালকের সহিত উচ্চশ্রেণীর বালকের অধ্যয়ন হয় না, ইহাও তদ্রূপ। আর তাহা হইলে অধিক সমর্থ শূদ্র শ্রোতা হইলে তাহার অধ্যয়নেও নিষেধ থাকিতে পারে না। অথবা সমর্থ শূদ্র শ্রবণমাত্র করিয়াও অধ্যয়নের ফললাভ করিতে পারে। বস্তুতঃ মতান্তরে শ্রবণকেই অধ্যয়ন বলিয়া গণ্য করা হয়। অতএব শূদ্রের যে বেদশ্রবণে অনধিকার তাহা পাপের পরিচায়ক নহে—ইহাই বলিতে হইবে।

এখন দেখা যাউক, আচার্য্য এস্থলে কি বলেন। দেখা যায়, আচার্য্য বেদান্তদর্শন অপশূদ্র প্রকরণে শূদ্রের বেদশ্রবণ-বিধিজ্ঞাপক উক্ত বাক্যদ্বয়ের মধ্যে প্রথম বাক্যটির একটি চরণ উদ্ধৃত করিয়া যাহা বলিতেছেন, তাহাতে আপাততঃ বোধ হয়—শূদ্রের ইতিহাসপুরাণপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারে তাঁহার সম্মতি আছে, কিন্তু বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারে তাঁহার সম্মতি নাই। কিন্তু এ বিষয়টি ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। দেখিলে অন্যথাই প্রতিভাত হইবে।

প্রথমতঃ দেখা যায় "শ্রাবয়েৎ চতুরো বর্ণান্" এই বাক্যে যে শূদ্রের বেদশ্রবণে বিধি দেওয়া হইয়াছে, তাহা বেদাধ্যয়নের প্রকরণের বাক্য। অন্য কোন প্রকরণের বাক্য নহে। কিন্তু আচার্য্য এস্থলে অন্যান্য নিষেধ বাক্যের সহিত একবাক্যতা করিয়া বলিলেন যে, ইতিহাস ও

পুরাণপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যায় শূদ্রের অধিকার আছে। বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই। কিন্তু তিনি এরূপ বলেন কেন ; ইহার কারণ কি ?

এতদুত্তরে কেহ কেহ বলেন—যেখানে পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্য পাওয়া যায়, সেখানে প্রথমতঃ একের অর্থ সঙ্কোচদ্বারা মীমাংসা করিতে হয়। তাহা অসম্ভব হইলে বিকল্পবিধানদ্বারা উভয় বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হয়, আর তাহাও অসম্ভব হইলে একের অপলাপ করিতে হয়। ইহাদের মধ্যে প্রথমটি উৎকৃষ্ট উপায়, দ্বিতীয়টি মধ্যম উপায় এবং তৃতীয়টি অধম উপায়।

এখন এস্থলে আচার্য্য যে সকল নিষেধবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই সকল বাক্য এবং অপর কয়েকটি যে প্রসিদ্ধ নিষেধবাক্য আছে, তাহাদিগকে একত্র করিলে প্রায় সাতটি বাক্য হয় ; যথা—

১। তস্মাৎ যজ্ঞে শূদ্রোঽনবকॢপ্তঃ (তৈঃ সংহিতা ৭।১।১।১)

২। শূদ্রো বহুপশুরযজ্ঞীয়ঃ (পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ। ইহা রামানুজ ভাষ্যে উদ্ধৃত।)

৩। সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রায় নেচ্ছন্তি * * *
যদি জানীয়াৎ স্ত্রীশূদ্রঃ স মৃতোঽধোগচ্ছতি,
তস্মাৎ সর্ব্বদা নাচষ্টে, যদি আচষ্টেঃ স আচার্য্য
স্তেনৈব মৃতোঽধোগচ্ছতি (নৃসিংহ পূর্ব্বতাপনীয় উপনিষৎ)
ইহা স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও ধরিয়াছেন।

৪। স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরঃ (মহাভারত)
ইহা ভাষ্যে উদ্ধৃত হয় নাই।

৫। পদ্যু হ বা এতৎ শ্মশানং যৎ শূদ্রঃ, তস্মাৎ শূদ্রসমীপে
নাধ্যেতব্যম্। (বাৎস্যায়ন ধর্ম্ম সূত্র)

৬। অথাস্য বেদমুপশৃণ্বতঃ ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতিপূরণম্
উচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদঃ ধারণে শরীরভেদঃ (গৌতম সংহিতা)

৭। ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্।
ন চাস্যোপদিশেদ্ ধর্ম্মং ন চাস্য ব্রতমাদিশেৎ॥

যো হ্যস্য ধর্ম্মমাচষ্টে যশ্চৈবাদিশতি ব্রতম্ ।
সোঽসংবৃতং নাম তমঃ সহ তেনৈব গচ্ছতি ॥ (মনু)

৮। দ্বিজাতীনাম্ অধ্যয়নম্ ইজ্যা দানম্ । (মনু)

এখন এই সকল নিষেধবাক্যের সহিত যদি একবাক্যতা করিতে হয়, তাহা হইলে নিষেধের প্রাধান্য বা বাহুল্যনিবন্ধন উক্ত বিধিবাক্যের অর্থ সংকোচরূপ প্রথম মীমাংসোপায়দ্বারা যদি মীমাংসা করিতে পারা যায় তাহা হইলে ভাল হয়। এস্থলে বিধিবাক্যে যে বেদ শব্দ রহিয়াছে তাহারই জন্য যখনি যত গোলযোগ, তখন তাহার অর্থ ইতিহাসপুরাণাদি করিলেই আর কোন বিপত্তি থাকে না। আর বস্তুতঃ তাহা করিবার উপায়ও আছে। যেহেতু মহাভারত মধ্যেই ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলা হইয়াছে, যথা—

"ইতিহাসপুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে ॥"

সুতরাং আচার্য্য এস্থলে যে মীমাংসা করিলেন তাহা উত্তম মীমাংসাই হইল। আর তাহার ফলে শূদ্রের বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই ইহাই সাব্যস্ত হয়. আচার্য্যও তাহাই বলিয়াছেন।

কিন্তু এ কথা সঙ্গত হইতে পারে না। আচার্য্য ওভাবে ইতিহাস-পুরাণাদি শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তাহার কারণ এই—

প্রথমতঃ, ইতিহাসপুরাণের নাম পঞ্চম বেদ বলিয়া উক্ত "শ্রাবয়েৎ" বাক্যের অন্তর্গত বেদকে ইতিহাস পুরাণ বলিলে উক্ত বেদশব্দের প্রকরণার্থ রক্ষিত হয় না। কারণ, উক্ত বাক্য যে স্থলে পঠিত সে স্থলে ঋগাদি আসল বেদের কথাই আছে।

দ্বিতীয়তঃ, বেদ শব্দের অর্থ ইতিহাসপুরাণ করিলে বেদ ও ইতিহাস পুরাণের মধ্যে যে যথার্থ ভেদ তাহার অপলাপ করা হয়। ইহাদের আসল ভেদ, পৌরুষেয়ত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব লইয়া, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব লইয়া। বেদ নিত্য অপৌরুষেয়, ইতিহাসপুরাণাদি অনিত্য ও পৌরুষেয়। ইহারা বেদব্যাসের রচিত। বেদ কাহারও রচিত নহে। ইতিহাসপুরাণকে যে বেদ বলা হয়, তাহা তাহাদের প্রশংসামাত্র।

সুতরাং উক্ত বিধিবাক্যের বেদ শব্দের অর্থ ইতিহাসপুরাণাদি

করিলে প্রকৃতপ্রস্তাবে পূর্ব্বোক্ত মীমাংসার অপলাপরূপ অধম পন্থাই অবলম্বিত হইল। অতএব আচার্য্যোক্ত এই ইতিহাসপুরাণাদি অর্থে বেদের অন্তর্গত ইতিহাসপুরাণাদি গ্রহণ করাই সঙ্গত। বস্তুতঃ আচার্য্যও ইতিহাসপুরাণাদি পদে বেদান্তর্গত ইতিহাসপুরাণাদিও গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা ছান্দোগ্যোপনিষদ্ভাষ্যমধ্যে দেখা যায়। আর তাহা হইলে শূদ্র যদি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণাদিপুরস্কারে বেদোক্ত ইতিহাস ও পুরাণাদি শ্রবণ করিয়া করিতে পারিবে। সামর্থ্যাভাবপ্রযুক্ত অধ্যয়ন নিষিদ্ধ হওয়ায় গুরুমুখে বেদের গল্পাদি শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানলাভই তাহাদের পথ।

যদি বলা হয় তাহা হইলে শ্রুতিস্মৃতির বিরোধ স্থলে প্রবল যে শ্রুতি, সেই শ্রুত্যুক্ত নিষেধেরই ত অপলাপ ঘটিল। কারণ, বেদশ্রবণেরই ব্যবস্থা দেওয়া হইল। তাহা হইলে বলিব, না, অপলাপ হইল না। কারণ, শ্রুতির মন্ত্রভাগে অনধিকার থাকায় এবং অধ্যয়নে অনধিকার থাকায় বেদশব্দের অর্থসংকোচই হইল। অর্থাৎ প্রথম উপায়ই গৃহীত হইল।

অথবা বলিব এখানে শূদ্র শব্দে আচার্য্য যে জাতিশূদ্রকে লক্ষ্য করিয়াছেন (যথা—"জাতিশূদ্রস্য অনধিকারাৎ" ১।৩।৩৪) ইহা সেই জাতি-শূদ্র! আর সেই জাতিশূদ্র শব্দের অর্থ—যাহার শূদ্রভাব জন্মগত, জন্মাবধি যাহার শূদ্র কার্য্যে প্রবৃত্তি, শূদ্রোচিত কর্ম্মের সংস্কার যাহার জন্মগত বা মজ্জাগত। এতাদৃশ শূদ্রের বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই। সুতরাং দ্বিজভাবাপন্ন শূদ্রের বেদপূর্ব্বক অধিকার আছে। আর এরূপ করিলে শূদ্র শব্দের অর্থ সংকোচ করায় বিরুদ্ধবাক্যের মীমাংসায় প্রথম উপায়ই অবলম্বিত হইল।

অথবা বলিব উক্ত "শ্রাবয়েৎ" বাক্যটি ব্রাহ্মণপ্রমুখ করিয়া শ্রবণ করিবে বলায় ইহা বিশেষ বিধি হইল। যে সব নিষেধবাক্য আছে, তাহারা সামান্যবিধি হওয়ায় তাহাদের সহিত এই বিশেষ বিধির বিরোধই ঘটে না। অতএব শ্রুতিস্মৃতির বলাবলবিচারের অবকাশই হইল না। আর তাহা যদি হয়, তবে অর্থ সংকোচও এ পথে যাইলে করিতে হইল

না। অতএব আচার্য্য যে ইতিহাসপুরাণপূর্ব্বক শূদ্রকে ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার দিয়াছেন, তাহা বেদের অন্তর্গত ইতিহাসপুরাণাদি গ্রহণ করায় কোন বাধা নাই, প্রত্যুত সুগম উপায়ই হয়। আর বেদোক্ত ইতিহাসপুরাণাদিতে অধিকার থাকায় ভারতাদি ইতিহাস ও শিব বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণে যে তাহাদের অধিকার আছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

তাহার পর আর এক কথা। যে সব নিষেধবাক্য দেখা যায় তাহাতে অনধিকারী বা অসমর্থ শূদ্রকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে দেখা যায়। যেহেতু উক্ত নিষেধবাক্যগুলির মধ্যে—

১। তস্মাৎ শূদ্রো যজ্ঞে অনবকৢপ্তঃ

এই বেদবাক্যটি যে শূদ্রকে লক্ষ্য করিতেছে তাহা বাহক বা ভৃত্য শূদ্রবিশেষ। যেহেতু এই মন্ত্রটির পূর্ব্বেই দেখা যায়—

"শূদ্রো মনুষ্যানাম্ অশ্বঃ পশূনাং
তস্মাৎ তৌ ভূতসংক্রামিণৌ অশ্বশ্চ শূদ্রশ্চ।"

ইহার ভাষ্যাদি পরে প্রসঙ্গান্তরে উদ্ধৃত হইল। এস্থলে আর পুনরুল্লেখ করা হইল না। বস্তুতঃ বাটীর পাচক ব্রাহ্মণ হইতে প্রধান বিচারালয়ের বহু ব্যবহারজীবী ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত যখন অনুরুদ্ধ হইলেও শাস্ত্র কথা শ্রবণে পরাঙ্মুখ হইতেছেন দেখা যায়, তখন যে বাহক শূদ্র ভৃত্য, সে যে তাহাতে পরাঙ্মুখ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অধীতবেদ ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও যিনি গুরুভক্ত নহেন, শ্রদ্ধালু নহেন, তাঁহাকেও যখন ব্রহ্মবিদ্যাদানে নিষেধ দেখা যায়, তখন পশুগণের মধ্যে অশ্বের ন্যায়, মনুষ্যগণমধ্যে যাহারা ভৃত্য বা বহনকার্য্য করিয়া থাকে তাহাদের সামর্থ্য বা অধিকার থাকিবে না তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? অতএব এতাদৃশ বেদবাক্যদ্বারা সমর্থ জিজ্ঞাসু শূদ্রকে অনধিকারী বলা শাস্ত্রের বা শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায় হইতে পারে না। পরন্তু অসমর্থ শূদ্রই অনধিকারী ইহাই অভিপ্রায় হইবে। তাহার পর—

২। "শূদ্রো বহুপশুঃ অযজ্ঞীয়ঃ"

এই বাক্যে বহুপশু শব্দে রামানুজাচার্য্য অর্থ করিয়াছেন পশুসদৃশ। সুতরাং এতদ্দ্বারা পশুসদৃশ শূদ্রেরই অধিকার নাই বুঝা যায়। যদি বলা

যায়—ইহার অর্থ ওরূপ নহে, কিন্তু ইহার অর্থ শূদ্রমাত্রেই পশুসদৃশ আর তাহাদের অধিকার নাই। তাহা হইলে বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধকেও কি পশুসদৃশ বলিতে হইবে? আর এরূপ অর্থ করিলে গুরুভক্ত শ্রদ্ধালু ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মবিদ্যা দিবে এতাদৃশ গুণবোধক বাক্য নিরর্থক হয়। কারণ, তাঁহারা, শূদ্র ভিন্ন বলিয়াই পশুসদৃশ নহেন। সুতরাং তাঁহারা পশুসদৃশ না হওযাতেই তাঁহাদের অধিকারী হইবার কথা। বস্তুতঃ শূদ্র পশুতুল্য অতএব অযজ্ঞীয় বলায়, পশুতুল্যতারূপ ধর্ম্মদ্বারা তাহার অযজ্ঞীয়ত্বের বিধান হইতেছে। এ ধর্ম্ম না থাকিলে তাহারা অযজ্ঞীয় হইতে পারে না। আর এই ধর্ম্ম যে আকৃতিগত ধর্ম্ম তাহাও বলা যায় না। কারণ, আকৃতিতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের ভেদ নাই। অতএব ইহাকে গুণগত ধর্ম্ম বলিতে হইল। আর গুণগত হইলে সমর্থ শূদ্রের পক্ষে ইহা নিষেধ নহে। যদি বলা হয়—দ্বিজকুলে জন্মও এই গুণগত ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। তাহা হইলে বলিব গুণবশতঃ কর্ম্ম হয়, সেই কর্ম্ম হইতে জন্ম হয়, অতএব জন্ম গুণের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। জন্মের দ্বারা গুণনির্ণয় অভ্রান্ত হয় না। অতএব এই নিষেধও সমর্থ শূদ্রের পক্ষে প্রযুজ্য নহে। তাহার পর—

৩। সাবিত্রীং লক্ষ্মীং যজুঃ প্রণবং যদি জানীয়াৎ স্ত্রীশূদ্রঃ স মৃতোঽধোগচ্ছতি।

এই নৃসিংহপূর্ব্বতাপনীয় উপনিষদের বাক্যে যে নিষেধ তাহাও সমর্থ শূদ্রের পক্ষে প্রযুজ্য নহে, তাহা ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। আর—

৪। স্ত্রীশূদ্রো দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরাঃ

এই বাক্যে দ্বিজবন্ধু পদের সহিত স্ত্রীশূদ্রের পাঠ থাকায় অনধিকারী স্ত্রীশূদ্রই লক্ষ্য বলিতে হইবে। কারণ, দ্বিজবন্ধু শব্দের অর্থ নীচ দ্বিজ। নীচ দ্বিজের সহিত পঠিত হওযায় নীচ শূদ্রাদি গ্রহণ অন্যায় নহে। কারণ, এরূপ করার রীতিও আছে। জানশ্রুতি রাজাকেও এই জাতীয় যুক্তির বলে, শূদ্র বলিয়া সম্বোধিত হইলেও ক্ষত্রিয় বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। এজন্য ১।৩।৩৪ সূত্র বেদান্তদর্শন দ্রষ্টব্য। তাহার পর এই শ্লোকটি মহাভারত-রচনায় আবশ্যকতা জ্ঞাপনার্থ কথিত হওয়ায় ইহাকে মহা-

ভারতের স্তুতিপর বাক্য বলাও যায়। অতএব এতদ্দ্বারা সমর্থ শূদ্রের পক্ষে নিষেধ বুঝায় না। তাহার পর—

৫। পত্থ্য হ বা এতৎ শ্মশানং যৎ শূদ্রঃ তস্মাৎ শূদ্রসমীপে নাধ্যেতব্যম্।

অর্থাৎ চলন্ত এই শ্মশানই যে শূদ্র, সেই হেতু শূদ্রসমীপে বেদ পড়িবে না। এখানেও সমর্থ শূদ্রের পক্ষে নিষেধ বুঝায় না। কারণ,—এখানে শূদ্রকে শ্মশান বলা হইতেছে। এই শ্মশান শব্দের অর্থ—মৃতের দাহস্থান। প্রকৃত শ্মশান হইতে পারে না। অগত্যা শ্মশানের ন্যায় অপবিত্র এই অর্থই গ্রাহ্য। সুতরাং যে শূদ্র অপবিত্র তাহারই অধিকার নাই, ইহাই বুঝা গেল। যদি শূদ্রমাত্রকেই অপবিত্র বলা যায়—তাহা হইলে বহুপশু শূদ্র স্থানে যাহা বলা হইয়াছে এস্থলেও তাহাই বলা যাইতে পাবে। অতএব সমর্থ শূদ্রের পক্ষে এই নিষেধও প্রযুজ্য নহে। তাহার পর—

৬। "অথাস্য বেদমুপশৃণ্বতঃ ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রপবিপূরণম্"
উচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদঃ ধাবণে শরীরভেদঃ।

অর্থাৎ শূদ্র বেদ উপশ্রবণ করিলে তাহার কর্ণে গালা বা শীষক ঢালিয়া দিবে। উচ্চারণ করিলে জীহ্বা ছিন্ন কবিবে এবং ধারণ করিলে শরীর ভেদ করিয়া দিবে।—এই গোতম সংহিতার বাক্যদ্বাবাও অসমর্থ শূদ্রেবই অধিকার নাই বুঝা যায়। কারণ, উপশৃণ্বতঃ শব্দের "উপ" উপসর্গের দ্বারা গুরুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চুরি কবিয়া বেদশ্রবণ বুঝায়। যে চুরি করিয়া বেদ শ্রবণ করে সে যে অসমর্থ অনুপযোগী, তাহা কে অস্বীকার কবিবে? আর প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা অনধিকারীকে অনধিকারচর্চ্চা হইতে নিবৃত্তির জন্য যে ভয়প্রদর্শন তাহা পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। অতএব এতদ্দ্বারা সমর্থ শূদ্রের পক্ষে নিষেধ বুঝা যায় না। তাহার পর—

৭। ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ নোচ্ছিষ্টং ন হবিষ্কৃতম্।

* * * * *

সোঽসংবৃতং নাম তমঃ সহ তেনৈব গচ্ছতি॥

ইত্যাদি মনুবাক্যে যে নিষেধ ও পাপোৎপত্তির কথা আছে তাহাও তাদৃশ শূদ্রের পক্ষে নিষেধের জ্ঞাপক নহে। কারণ, এই বাক্যটিতে শূদ্রকে জ্ঞান, ব্রত ও ধর্ম্ম-উপদেশও নিষেধ করা হইয়াছে। অথচ দেখা যায়—স্ত্রীশূদ্রের জন্য ইতিহাসপুরাণাদি রচিত হইতেছে। সুতরাং ইহা সমর্থ শূদ্রের পক্ষে একেবারেই প্রযুজ্য নহে, পরন্তু যাহারা পশুবৎ বোধ-শক্তিহীন ও কুকর্ম্মনিরত তাহাদের পক্ষেই এই নিষেধ। পরিশেষে—

৮। দ্বিজাতীনাম্ অধ্যয়নম্ ইজ্যাদানম্

অর্থাৎ দ্বিজাতির ধর্ম্ম—অধ্যয়ন যাগ ও দান। অতএব এই বাক্য-দ্বারা শূদ্রের অধ্যয়ন অবিধি। আচ্ছা যদি ইহা সমর্থ শূদ্রেরও পক্ষে বিহিত বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলেও শূদ্রের শ্রবণবিধিও নিবারিত হয় না। শ্রবণে বিধিবোধক বাক্য ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ শাস্ত্র শ্রেয়ঃসাধনে কাহাকেও নিবৃত্ত করে না, পাপার্জ্জনেই নিবৃত্ত করে। অতএব অমুকের ইহা কর্ত্তব্য অমুকের ইহা কর্ত্তব্য ইত্যাদি ব্যবস্থা দেখিলে শ্রেয়ঃসাধনে সমর্থ ব্যক্তিকে নিষেধ করা হয় না—ইহা একটি অতি সাধারণ নিয়ম। ইহার বিরুদ্ধে কল্পনা করা সঙ্গত হয় না। যাহা হউক আচার্য্যোক্ত নিষেধবাক্য ও অপর কতিপয় প্রসিদ্ধ নিষেধ বাক্যের তাৎপর্য্য যে সমর্থ শূদ্রের অনধিকারজ্ঞাপন নহে তাহা বেশ জানা গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

ভারতীয় ধর্ম্মে বিবেকানন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পতঞ্জলির সহিত বুদ্ধদেব এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। বাসনার ধ্বংসে মনের ধ্বংস সংঘটিত হয়,—'মনএব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ'। মনই বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। অসংযত-চিন্তা সমন্বিত চিত্তই বন্ধন আনয়ন করে এবং মন চিন্তাশূন্য হইলেই মোক্ষের বীজ স্বরূপ অক্ষর ব্রহ্ম অথবা মহাশূন্যের সহিত জীবের তন্ময়ত্ব স্থাপন করে। অদ্বৈতবাদিগণও প্রকারান্তরে এই মতই সমর্থন করেন। অদ্বৈতবাদিগণের ধ্যানের দ্বারা পরমব্রহ্মের সহিত একাত্মানুভূতি অচিন্তা ব্যতীত আর কিছুই নহে। 'অচিন্তৈব পরং ধ্যানং'—শঙ্কর। ভগবান নির্গুণ ও নিরাকার। আকার ও গুণযুক্ত চিত্ত দ্বারা তাঁহার কিরূপে উপলব্ধি হইবে? তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে চিত্ত চক্ষু ও জ্ঞানের অতীত হইতে হইবে। "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ"। দৃশ্যমান সমস্ত পদার্থ যখন আত্মস্বরূপ হইয়া যায় তখন সে কিসের দ্বারা কি দর্শন করিবে?

ন দৃষ্টেদ্রষ্টারম ন মতের্মন্তারং (বৃহদা ৫।৪।২)

দৃষ্টির অনুভূতির সাক্ষী ও মতির প্রকাশককে জানা যায় না।

বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ (বৃহদা ৪।৪।১৪)

বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে?

যস্যামতং তস্যমতম্, অবিজ্ঞাতং বিজানীতাম কেন (বৃহদা ২।৩

যিনি মনে করেন ব্রহ্ম চিন্তার বিষয়ীভূত নহেন তিনিই তাঁহাকে জানেন। বিশেষরূপে যাঁহারা জানেন তাঁহারাই জানেন যে তিনি অবিজ্ঞাত। গীতায় পুনঃ পুনঃ অচিন্তার উপদেশ রহিয়াছে।

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।

আত্মসংস্থং মনঃকৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ। ৬।২৫ গীতা।

সব শান্তি, সব সুখ, সুনির্ম্মল ভাবোন্মাদনা আত্মসংস্থ অবস্থাতেই সম্ভব

হয়। চঞ্চল চিত্তের হেতুই নিরানন্দের অনন্ত প্রবাহে বিশ্বসংসার নির্ম্মম আর্ত্তনাদে মুখরিত করিতেছে। দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ যাঁহারা জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে ভগবৎ কৃপাই মুক্তির কারণ।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূঁ স্বাম্॥ কঠ।২।২৩

এই আত্মাকে কেবল মনন দ্বারা লাভ করা যায় না। কেবল মেধা (নিদিধ্যাসন) দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না এবং বহুবিধ শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারাও লাভ করা যায় না। কিন্তু আত্মা যাহাকে বরণ করেন সেই তাঁহার (আত্মার) লভ্য হয়; এই আত্মা তাহার নিকট স্বীয় তনু (স্বরূপ) বরণ করেন অর্থাৎ প্রকাশ করেন। এস্থানে উপাসনা রহিত শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনকে আত্মলাভের অনুপায় নির্দ্দেশ করিয়া এই আত্মাই যাহাকে বরণ করেন তিনি স্বয়ংই তাঁহার ভক্তের নিকট নিজরূপ প্রকাশ করেন, ইহা উক্ত হইয়াছে।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ গীতা ১০।১০

যাহারা আমাতে নিরন্তর ভাবে যুক্ত অর্থাৎ সমাহিত চিত্ত থাকিয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করেন, আমি সেই সকল ভক্তকে বুদ্ধি প্রদান করি যাহাতে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে।

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা॥ ১১।৫৩
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥ ১১।৫৪।

হে অর্জ্জুন! তুমি আমাকে যেরূপে দর্শন করিলে সমস্ত বেদাধ্যয়ন, তপস্যা দান কিংবা যজ্ঞ দ্বারা আমাকে এবংবিধরূপে দর্শন করিতে পারে না। এবংবিধ আমাকে একমাত্র অনন্যবিষয়া ভক্তি দ্বারা যথার্থ রূপে জানিতে দেখিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে শক্ত হয়।

এক্ষণে বেদান্ত মুক্তির উপায় কি বলিতেছেন তাহাই আলোচনা

করা যাউক। অবিসংবাদী ভাবে বেদান্তের প্রদর্শিত উপায়টি যে কি তাহা বলা বড়ই কঠিন, কারণ ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যকারগণ নিজ নিজ ধারণোপযোগী ভাষ্যদ্বারা এরূপভাবে দুর্ব্বোধ করিয়া তুলিয়াছেন যে কোন নির্দ্দিষ্ট এক সত্য ধরিতে না পারিয়া অনেকে ইঁহাকে সমস্ত বাদের আধারভূত এক বিরাট জ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বেদান্তের প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ কি ভাবে মুক্তি অনুভূতি করিয়াছিলেন বুঝিতে পারিলে পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিক মহাপুরুষগণের সহিত ইঁহার পার্থক্য নির্দ্দেশ করিতে কষ্ট হইবে না।

অসীমকে সীমা বিশিষ্ট করাই অজ্ঞানতা ও মুক্তির প্রধান অন্তরায়। বেদান্তের এই মহা সত্য অবলম্বন করিয়া স্বামিজী দৈনিক জীবনে বেদান্তের আদর্শ সম্মুখীন করিয়া বলিয়াছেন,—কোন্ শক্তি এই বিশ্বের ভিতর দিয়া জীবন্তভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে।—সেই অনির্ব্বচনীয় আশ্চর্য্য শক্তি। অহিংসা, ত্যাগ ও প্রেম এই তিনটিই প্রকৃতপক্ষে একার্থসূচক। নর-হত্যাকারী দস্যু সম্ভবতঃ তাহার সন্তানের প্রতি একান্ত অন্ধ ভালবাসার জন্যই হত্যাকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল, প্রেমে তাহার অসীমতা ভুলিয়া গিয়া সন্তানের ক্ষুদ্র গণ্ডির ভিতর বদ্ধ থাকিয়া বাহিরের সহস্র সহস্র জীবকে পর করিয়া লইয়াছিল। সকল পাপের সমাধান ত্যাগে—সকল দুঃখের সমাধান প্রেমে। জগতের একটি মাত্র কারণ তাহা এই প্রেম—বেদান্তের একত্ব, প্রেমেরই পূর্ণ আয়তন ও বিকাশ। এক ব্রহ্ম, ব্রহ্মাতিরিক্ত সৎ নাই, সকলেই সেই ব্রহ্ম, ঘৃণায় এ ভাব আসে না। ঘৃণা দ্বিত্ব সৃষ্টি করে মাত্র। ভেদই ব্রহ্মের একত্ব বোধের বাধা। প্রত্যেক মনুষ্যাদি জীবজন্তু জগৎ সংসারকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া থাকে জগতের এক অংশ 'আমি ও আমার' বা আত্মা, দ্বিতীয় অংশ 'তুমি ও তোমার' বা অনাত্মা। এই দ্বিধা ভাবই মায়া, এই হেতুই বিশ্বব্যাপী করুণ আর্ত্তনাদ। এই আত্ম-অনাত্মের অনন্ত বিরোধ অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, একটি স্বার্থ অপরটি নিঃস্বার্থ। একটি সঞ্চয় অপরটি ত্যাগ। এই দুই বিরুদ্ধ শক্তি অনন্তকাল হইতে ধরিত্রীর বক্ষ ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিতেছে, কিন্তু উভয় শক্তির একই প্রেরণা—প্রেম। পৃথিবীর যাবতীয় হিংসা,

নিষ্ঠুরতা, দ্বেষ, অসূয়া, অসত্য সকলের পশ্চাতে সেই প্রেমই লুক্কায়িত রহিয়াছে। বেদান্তের উদ্দেশ্য সেই প্রেমের ফল্গুপ্রবাহ জীবনে অনুভব করিয়া অনাত্মের গণ্ডি কমাইয়া দিয়া সমস্ত বাহ্যকে অন্তরতম করা ও সকল অনাত্মাকে আত্মা করিয়া লওয়াই মানব জীবনের সার্থকতা ও মুক্তি। স্বামিজী তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগে দার্শনিকের ভাষায় এই তত্ত্ব এত সুন্দর ভাবে স্থাপিত করিয়াছেন যে এতদ্ সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণার মৌলিকতা স্বীকার করিতে কেহ কুণ্ঠিত হইবে না। দেশ বিদেশ ব্যাপী রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠার হেতু সেই একাত্ম বোধের সহায়তা করা ও বেদান্তের নিগূঢ় তত্ত্ব বাস্তব জীবনে কার্য্যকরী করিয়া তোলা। সেবার লৌকিক উদ্দেশ্য দুঃখাপনোদনের চেষ্টা হইলেও ইহার অন্তরতম উদ্দেশ্য আত্মার গণ্ডি বাড়াইয়া দেওয়া ও তৎসঙ্গে অনাত্মার সীমা কমিয়া যাওয়া, এবং ইহার পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা অনাত্মকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার পূর্ব্বক জাগতিক দৃশ্য অদৃশ্য জীব ও জড়কে আত্মময় করিয়া লওয়া। এই মহাসত্যের আলোক ইতিমধ্যেই জন সমাজে প্রবেশ পূর্ব্বক তমঃপ্রকৃতির নিবিড় ভেদ কালিমা অপহৃত করিয়া দিয়া পরস্পরের প্রকৃত সম্বন্ধ দেখাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়াই যেন প্রতীতি হইতেছে। যে দিন বাংলার প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে জাতি নির্ব্বিশেষে পরস্পরের প্রতি স্থায়ী সুনির্দিষ্ট প্রেমের স্পন্দন অনুভূত হইবে সেই দিন জানা যাইবে বাঙ্গলা প্রকৃতই স্বামিজীর নিজ বাস্তব জীবনের ও ভাবের নবীন অমূল্য আদর্শের যথার্থ উপাসক হইতে পারিয়াছে।

বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য দেশে এক সম্প্রদায়ের মনীষিগণ আত্মা ও জগৎ সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন যে, দৃশ্য অর্থাৎ মায়িক জগৎ জাগতিক সমস্ত মনের সমষ্টি এক অনাদি অনন্ত মনের সৃষ্টি। অনির্ব্বচনীয় সেই অসীম চিত্ত সীমার মধ্যে নিজকে সম্পূর্ণরূপে বিকাশ করিয়া সার্থকতা লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই সমষ্টি মন আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রহিয়াছে, এবং সে-ই চিন্তা করিয়া থাকে। মহামতি Hegel এই মত প্রথম স্থাপন করিয়া যান। বলা-বাহুল্য এই সমষ্টি মনই বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ। কিন্তু বেদান্ত

স্বীকার করেন না যে অসীম পরমাত্মা সীমার মধ্য দিয়া সার্থকতা লাভ করিতেছে। পরন্তু এমন সময় আসিবে যখন দেখা যাইবে সীমার মধ্যে অসীমের সার্থকতা লাভ অসম্ভব। তখন সীমা বা উপাধির গণ্ডি ত্যাগ করিয়া যাওয়া একান্ত আবশ্যকীয় হইয়া পড়িবে। তখন 'ত্যাগেই সার্থকতা' এই সত্য ফুটিয়া উঠিবে এবং প্রকৃত ধর্ম্মের আরম্ভ হইবে। ত্যাগই জীবনের ও ধর্ম্মের আরম্ভ পাশ্চাত্য দার্শনিক Carlyle'ও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বেদান্তের এই সত্য স্বামিজী এইরূপ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে ঘোর জড়বাদী পাশ্চাত্য মনীষিগণকেও তিনি নিজ মতে আনিতে কোনরূপ বিশেষ কষ্ট পান নাই। বেদান্তের ত্যাগের আদর্শ শুষ্ক আত্ম-পরিহারের উপদেশ নহে। মায়িক জগতের উচ্ছেদ সাধনই ইহার একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়, জগৎ যে ভাবে দৃষ্ট হইতেছে তাহারই ত্যাগের দ্বারা ব্রহ্মময় উপলব্ধি করা ত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা।

বর্ত্তমান কালে অনেক ভক্তের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে প্রজ্ঞার (Intellect অনুশীলন ভক্তিমার্গের অন্তরায়। তর্ক বা শাস্ত্রানুশীলনে ভগবান লাভ সুদূর পরাহত হইয়া পড়ে। গ্রন্থকে সকল সময়েই বন্ধন স্বরূপ মনে করিয়া থাকেন। এতদ্ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া স্বামিজীর এ বিষয়ে মতামত প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। মানবের মুক্তির জন্য তর্ক যে আবশ্যকীয় তাহা হিন্দু শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ অনুমোদিত হইয়াছে। তর্ক জিনিষটি যে কি তাহা সম্পূর্ণ জ্ঞাত না থাকায় এইরূপ বিরুদ্ধ ভাব অনেকে পোষণ করিয়া থাকেন।

"তর্ক হি নাম অর্থ স্বভাব বিষয়েণ বা সামগ্রী বিষয়েণ
বা নিরূপণেনার্থবিশেষে প্রামাণ্যং ব্যবস্থাপয়েৎ
তদিতিকর্ত্তব্যতারূপং উহাপর-পর্য্যায়ং জ্ঞানম্"—রামানুজ

তর্ক কি ? না বস্তু বিশেষের স্বভাব বিশেষ নিরূপণ দ্বারাই হউক কিংবা সামগ্রী বা কারণ বিশেষ নিরূপণ দ্বারাই হউক বিষয় বিশেষে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারক জ্ঞান—যাহার অপর নাম উহ।

কোন এক বিষয় দুই বা ততোধিক প্রমাণের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে যাহাদ্বারা—সেই প্রমাণগুলির বিরোধ পরিহার করা যায়,

অবিরোধ স্থাপন করা হয় তাহার নাম তর্ক বা ঊহ। বিরোধ পরিহারের দুইটি উপায়—(১) বিপদস্থানীয়—বিপদের স্বভাব বিশেষ নির্দ্ধারণ। (২) কারণের পর্য্যালোচনা। যথা সাধারণ প্রত্যক্ষে দেখা যায় আকাশ নীল বর্ণ কিন্তু শাস্ত্রে ও যুক্তিতে জানা যায় আকাশের কোন রূপ নাই উহা নিরূপ তথাপি যে নীলবর্ণ দেখা যায় উহা তাহার স্বভাব। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ অন্যত্র প্রমাণ হইলেও এস্থলে অপ্রমাণ।

মনুতেও উক্ত হইয়াছে "যস্তর্কেনানুসংধত্তে স ধর্ম্মং বেদনেতর"—১২।১৯

যে লোক বেদ শাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক দ্বারা ঋষিপ্রোক্ত ধর্ম্মোপদেশের অনুসন্ধান করে সেই লোকই ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে অপরে নহে। এইরূপ তর্ক সাহায্যে শাস্ত্রার্থ নিরূপণ করাকে শ্রুতি মন্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভক্তিবাদী শ্রীশ্রীরামানুজাচার্য্যও তর্কের একান্ত আবশ্যকতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। জলন্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয়ীভূত সমগ্র জগৎ যে স্বাধীন সত্তাবিহীন, মায়ায় কল্পিত, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিরোধী—শাস্ত্র আলোচনা ভিন্ন কিরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে? সমগ্র বেদান্ত একটি জটিল তর্কপূর্ণ প্রজ্ঞানুশীলন ভিন্ন আর কিছুই নহে। বেদান্ত ও উপনিষদের সত্যসমূহ কত যে তর্ক ও চিন্তাশক্তি ও শাস্ত্রানুশীলনের মহান সিদ্ধান্ত তাহা পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। এই সমস্ত জাতীয় গৌরবের অমূল্য রত্ন দর্শন সাহিত্য কেবল মাত্র বিশ্বাসের উপর স্থাপিত নহে পরন্তু কিরূপে সেই অজ্ঞেয় ব্রহ্মকে জ্ঞানের দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারা যায় তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিতে গিয়া শাস্ত্র বিচারের সার্থকতা স্বরূপ যে সত্যের আলোক উদ্ভাসিত করিয়াছে তাহাতে আর প্রজ্ঞার নিন্দা করা চলে না। তবে কি প্রজ্ঞানুশীলনই একমাত্র অবলম্বন? তাহা নহে। স্বামিজী ভাব ও প্রজ্ঞা উভয়েরই একান্ত আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। ভাবই কার্য্য করে—প্রজ্ঞা সহায়তা করে মাত্র, প্রজ্ঞার পরিচালনা শক্তি না থাকিলেও ভাবকে সংযত করিবার ক্ষমতা আছে। সেই সম্ভাবনা নিরোধ করিবার জন্যই প্রজ্ঞার আবশ্যকতা। সীমার মধ্যে অসীমের পূর্ণ সার্থকতা হইতে পারে না এই জ্ঞান পর্য্যন্ত প্রজ্ঞার অনুশীলন। ইহার পর ত্যাগের

মধ্য দিয়া সীমার গণ্ডি ছাড়িয়া অসীমের দিকে ফিরিয়া আসিবার পথে ভাবই একমাত্র অবলম্বন। যিনি যে পরিমাণে এই ভাবের পরিচালনা করিয়াছেন তিনি সেই পরিমাণে জীবনে এই নিগূঢ় সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রজ্ঞা এইখানে ভাবের প্রখর বন্যায় ধুইয়া মুছিয়া যায়। সাধক তখন লৌকিক হিতাহিত সুখ দুঃখের অতীত হইয়া উন্মত্তের মত নিজেকে ভাবের প্রবাহে ভাসাইয়া দিয়া অনন্ত জ্ঞানরূপী একমাত্র সৎ পদার্থের সহিত মিশিয়া যাইবার চেষ্টা করে। ঘনঘোর মেঘাচ্ছন্ন অমা-নিশির নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভেদ্য আত্মহারা অন্ধকার দেখিয়া ভাবোন্মত্ত প্রেমিক তাহার অন্তরতম প্রদেশের সেই নবজলধর-কান্তি বাহিরে আসিয়া বুঝি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, ভাবিয়া—পাগলের মত অলিঙ্গন করিবার জন্য ছুটিয়া যায়। উত্তাল তরঙ্গাকুল ব্যাত্যাক্ষুব্ধ সাগরের নীলবর্ণ হেরিয়া এই যে সেই নীলোৎপল-কান্তি নয়নাভিরাম, ভাবিয়া তাহার বক্ষে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। আর মায়োপকূলের দর্শকমণ্ডলী স্তম্ভিত হইয়া নিরীক্ষণ করে, আর ভাবে এ কোন পাগল। ব্রজগোপীগণ এই ভাবের আদর্শ। আর মহাপ্রভু এই অনন্ত ভাবের পূর্ণ উপলব্ধি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাকার-ঈশ্বরে ভক্তিসহকারে উপাসনাই তাঁহাকে পাইবার সহজ উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু স্বামিজীর যথাযোগ্য অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার জন্য পৃথক বিধান নির্দ্দেশ করতঃ ষোলআনা ব্রহ্ম লাভের উপায় স্বরূপ বেদান্তের নিরাকার ব্রহ্মের অনুসরণ করিবার উপদেশ দেন এবং স্বামিজী স্বীয় জীবনে ইহা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া পাশ্চাত্য জগতে বেদান্তের অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা স্থাপিত করেন। উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায় আত্মা সম্বন্ধে অনেক দুর্জ্ঞেয় রহস্য ক্ষত্রিয় রাজন্যবৃন্দেরাই সমাধান করিতে সমর্থ হইতেন এবং ব্রাহ্মণেরা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া ক্ষত্রিয় রাজন্যবৃন্দের নিকট উপস্থিত হইতেন। বর্ত্তমান যুগে সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ ক্ষত্রিয়ের বংশধর স্বামিজী ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে তাঁহার বহুপূর্ব্বপুরুষগণের স্থানীয় তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। তিনি বলিতেন, পরম ব্রহ্মকে কদাচ জানিতে পারা যায় না। যে ঈশ্বর জ্ঞাত হইলেন, তিনি

ঈশ্বর আর রহিলেন কোথায়? তিনি এক মায়া পদার্থ হইয়া পড়িলেন। জ্ঞাত হইবামাত্র যে তিনি সসীমের আবরণে জড়িত হইয়া অসীমত্ব হারাইয়া ফেলিলেন। ঈশ্বর কি তবে অজ্ঞাত?—তাহাই বা আবার কি করিয়া হইতে পারে, তাঁহারই মধ্য দিয়া যখন জগৎ সংসার জ্ঞাত হইতেছে তখন কি প্রকারে বলা যায় তিনি অজ্ঞেয়, তিনি অজ্ঞাত। পরন্তু তিনি জ্ঞাতও নহেন অজ্ঞাত-ও নহেন। এতদুভয় অপেক্ষা তিনি অনন্তগুণ অধিক ও মহৎ। তিনি আত্মার আত্মা, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী, তিনিই সব। বেদান্তের এই চরম সত্য তাঁহাকে এতই অনুপ্রাণিত করিয়াছিল যে তিনি এই হিন্দুজাতির গৌরব পৃথিবীর সর্ব্বদেশে প্রচার করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুদূর আমেরিকায় মঠ প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তদ্দেশবাসীর সাহিত্য দর্শন ও জীবনের ধারা বেদান্তের অপূর্ব্ব উপদেশের অনুকূলে পরিবর্ত্তন করিয়া দিবার আশা করিয়াছিলেন। অবিসংবাদী ভাবে যদিও বলা যায় না তিনি স্থায়ীভাবে অধিকাংশ ব্যক্তিকে এই সত্যে অনুপ্রাণিত করিতে পারিয়াছেন তত্রাচ একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে তিনি পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় নিগূঢ় তত্ত্বসমন্বিত সাহিত্য দর্শনাদি আলোচনা করিবার ঐকান্তিক পিপাসা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার ফলে ইতিমধ্যেই জাতীয় জীবনেই বেদান্তের সত্য ফুটিয়া উঠিবার ক্ষীণ চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। ধর্ম্ম ও মনোরাজ্যে ভারতকে সর্ব্বোচ্চ আসন দিতে পাশ্চাত্য সুধিগণ আর বিদ্বেষ করেন না। দীনহীন হৃতসর্ব্বস্ব ভারতের ইহা কম গৌরবের কথা নয়। স্বামিজীর পূর্ব্বে পাশ্চাত্যদেশে অনেকে হিন্দু-গৌরবের আলোচনা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু স্বামিজীর আদর্শ জীবন এবং আদর্শ বিচার শক্তির সম্মুখীন হইয়া তাহারা প্রাণে প্রাণে উহার সত্যতা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বেদান্ত ধর্ম্ম জগতের ধর্ম্ম স্বরূপ বলিয়া গৃহীত হইবার সূচনা আরম্ভ হইয়াছে। যদি সেই শুভদিন যথার্থ ই কালের অনন্ত প্রবাহে উদিত হয় তবে ধর্ম্মপ্রচারকগণের মধ্যে স্বামিজীর জন্যই সেই সুবর্ণসিংহাসন সমগ্র জাতির হৃদয়-মণ্ডপে সুরক্ষিত হইয়া থাকিবে, আর বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধরগণের সমগ্র হৃদয় আনন্দের মধুর ধারায় পরিপ্লুত হইয়া যাইবে।

(সমাপ্ত) শ্রীকালীরঞ্জন লাহিড়ী, বি-এল।

ওমার প্রসাদ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৪০।

বহে যাবে নদী কুলু কুলু—
কোন্ দূব সাগরের পানে ;
শিরোপরি সপ্তর্ষি মণ্ডলী
শব্দহীন বিরাট বিমানে।

৪১।

পাশে বসে আছ শুধু তুমি,
রাঙা মদ আছে তব আগে,
বীণা লয়ে গাহিছ সঙ্গীত ;
সেই স্বর্গ ; কেবা স্বর্গ মাগে ?

৪২।

তোমায় কি বলি নাই, বঁধু,
সে দিনের সন্ধ্যার কাহিনী ?
তুমি কাছে ছিলে না তখন,
মৌন ছিল আকাশ মেদিনী।

৪৩।

দু'একটি দিতেছিল দেখা
সবে মাত্র নক্ষত্র অম্বরে ;
তখনও শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনি
বাজে নাই দেবতা মন্দিরে।

৪৪।

ছন্ন ছিল স্বচ্ছ অন্ধকারে
রক্ত পুষ্প অশোকের রেখা !
অকস্মাৎ ছায়ামূর্ত্তি এক
নীপ মূলে হোথা দিল দেখা।

৪৫।

ধীরে ধীরে আসিল সে কাছে
বাম কক্ষে বহিয়া কলস ;
কহিল সে—"কর দেখি পান"—
পিয়ে দেখি, তাহে দ্রাক্ষারস।

৪৬।

দ্রবীভূত প্রত্যক্ষ প্রমাণ ;
এত যুক্তি কোন তর্কে নাই ,
বর্ণে বর্ণে কত কাটাকাটি,
মদ্যে করে সব এক ঠাঁই।

৪৭।

বিলাসিনী মোহিনী মদিরা
কত বিদ্যা তার করগত,
পলকেতে জীবন-সীসক
স্পর্শে হয় স্বর্ণে পরিণত।

৪৮।

মদ্য যেন মামুদ গজনী,—
ভয়ে মরে কাফেরের দল ;
শোক দুঃখ ভীতি চলে যায়
মদ্যে হয় হৃদয় নির্ম্মল।

৪৯।

"মরণ কি ? মরে' কোথা যায় ?"-
ওকি, সাকি ? ওকি সব কথা ?
কি হলো তোমার ? মদিরায়
নাহি কি গো আজি মাদকতা ?

৫০।

শুন তবে, কহিতেছি সাকি
হৃদয়ের পূর্ব্ব ইতিহাস ;
কত হবে তখন বয়স ?—
সবে মাত্র যৌবন বিকাশ।

৫১।

গ্রামে ছিল প্রকাণ্ড পণ্ডিত
ন্যায়চঞ্চু গোবর্দ্ধন নামে ;
দেশ জুড়ে খ্যাতি তাঁর ছিল,
বৃহস্পতি যেন মর্ত্ত্যধামে।

৫২।

মৃত্যুতত্ত্ব জিজ্ঞাসিনু তাঁরে
একদিন প্রদোষে, বাদলে ;
কহিলেন তিনি—"ওহে বটু,
"শুভদিনে যেয়ো মোর টোলে।"

৫৩।

তিন বর্ষ হইল অতীত
অনুস্বর বিসর্গের শ্রাদ্ধে,
'চবা তুহি' কত কি শিখিনু,
পরস্মৈ আত্মনে তুমতাধ্বে।

৫৪।

শিখেছিনু, দিয়ে পরিভাষা,
বুঝাইতে আত্মার অস্তিত্বে ;
শিখেছিনু বুঝাইতে ভেদ,
হেত্বাভাসে, অনিত্যে ও নিত্যে।

৫৫।

স্মৃতিশাস্ত্র—কেনোপনিষদ
গৌতমাদি—নখের দর্পণ ;
তর্কযুদ্ধ, পণ্ডিতে পণ্ডিতে,
করিলাম কত না দর্শন।

৫৬।

কেহ অস্তি, কেহ বলে নেতি ;—
নস্য অস্ত্র চলে ঘন ঘন ;—
দাঁতভাঙ্গা শব্দে কাণ ফাটে ;—
চতুর্দ্দিকে পড়ে নিষ্ঠীবন।

৫৭।

অবশেষে বিদায় লইনু
একদিন, আচার্য্যের ঠাঁই ;
অর্ব্বাচীন আমি যে ছিলাম,
শিষ্যান্তেও রহিলাম তাই।

৫৮।

তর্কাতর্কি করুক পণ্ডিতে ;
বিশ্বসহ আমার কলহ ;
সে কলহে নাহি কণ্ঠধ্বনি
জিগীষার অথবা আগ্রহ।

৫৯।

কিন্তু, সাকি, শোন সত্য কথা—
মতি নাহি ছিল হেত্বাভাসে ;
রতি ছিল শুধু সুবা প্রতি
ধ্রুবসম হৃদয় আকাশে।

৬০।

শিখিয়াছি বিদ্যা বহুবিধ—
বিজলি করিতে পারি বন্দী,
জলে জলে আগুন রচিতে,
জানি আমি কত শত ফন্দি।

৬১।

ঘরে বসে বলে দিতে পারি
কবে কোথা নভে রবে শনি ;
চিত্রসম এঁকে দিতে পারি
নভে ধূমকেতুর শরণি।

৬২।

জটিল রহস্য কত শত
ভেদিয়াছি, এ দীর্ঘ জীবনে ,
কৃষ্ণগ্রন্থি শুধু মরণের
অসমর্থ হয়েছি মোচনে।

৬৩।

তবে এটা ঠিক—মৃত্যু সত্য ;—
আর সব মিথ্যা জেনো, সাকি ;
মরণ নিশ্চয় ;—গেলে পরে
ফিরে নাহি আসে প্রাণপাখী।

৬৪।

মিথ্যাকথা নরক, গোলক,
ধূর্ত্ত সুদখোরের রচনা ,
কাঠাটেক ধানের দাদনে,
গোলাভরা শস্যের লহনা।

৬৫।

পাপ পুণ্য কেন ভেবে মর ?
যা’ হবার হবে তা’ নিশ্চয় ,
বিশ্ব যেন মস্ত দাবা ছক,
কেহ বোড়ে, কেহ হস্তি, হয়।

৬৬।

দেখিয়াছি ভিতর বাহির,
উর্দ্ধ অধঃ দেখিয়াছি সব ;
কিছু কিন্তু পারিনা ধরিতে
কাছে গেলে সঙ্গীত নীরব।

৬৭।

মনে হয়, যেন চরাচর
সীমাহীন মস্ত ছায়াবাজী,
কেন্দ্রে জ্বলে সূর্য্যের প্রদীপ ;
মোরা ঘুরি নানা সাজে সাজি।

৬৮।

খেলোয়ার করে দণ্ডাঘাত
ইতস্ততঃ ছোটে গোলাগুলি ;
চলে, দণ্ডি যেমন চালায়,
কারো মুখে নাহি কোন বুলি।

৬৯।

কল যেন চলেছে আঙুল,
লিখে যায়, ফিরে নাহি চায় ;
জ্ঞান কর্ম্ম, যা কিছু সঞ্চিত,
পারিবে না ফিরাইতে তায়।

৭০।

ফিরিবে না কাটিতে কুটিতে,
এক দুর, অদ্ধমাত্র ছত্র,
কেঁদে কেঁদে অন্ধ যদি হও
মুছিবে না, বিন্দু মাত্র পত্র।

৭১।

উর্দ্ধে ওই বিশাল কটাহ
রহিয়াছে সুনীল আকাশ,
নিম্নে যার, বন্দী সম মোরা,
মরিতেছি, করিতেছি বাস।

১২।

যুক্তকরে, উর্দ্ধমুখ হয়ে,
ওদিকে চাহিয়া কিবা ফল ?
ঘুরিতেছে—তুমি আমি সম—
নভঃস্থল, ইচ্ছাহীন কল।

১৩।

জানি, চলে' যেতেছে সময় ;
কি লাভ তা' বলে নিরবধি ?
মৃত কিংবা হবু কলা নিয়ে
কেন চিন্তা, অদ্য মধু যদি ?

১৪।

মহাশূন্যে একটি মুহূর্ত্ত
আস্বাদিতে জীবনের অন্ধু ;
তারা ডোবে ; চলে যাত্রিদল ;
ঝট পট পিয়ে লও, বন্ধু।

১৫।

শুধু বাজে চিন্তা ; পিও সুরা ;—
ডুবে যাবে ভবিষ্যৎ ভয় ;
অশুভ দর্শন—উল্কাপিণ্ড—
মহাসিন্ধু মাঝে হয় লয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন রায়।

অন্তঃপুরে

ভাবি যবে এ বিপুল ব্রহ্মাণ্ড অপার
মুগ্ধ ঐরাবত সম ইঙ্গিতে তোমার
লুটায় চরণ তলে, গ্রহ উপগ্রহ
অঙ্গুলী-সঙ্কেতে তব ঘুরে অহরহ,
আজ্ঞা তব অনুসরে আপনি প্রকৃতি
ছায়া সম, জন্ম মৃত্যু বিরচিছে নিতি
জীবের করম-চক্র তোমারি ইচ্ছায়
ওহে রাজরাজেশ্বর ! দারুণ শঙ্কায়
কাঁপে হিয়া, ভাবি মনে—কত ক্ষুদ্র আমি,
কি বিরাট তুমি নাথ ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী !
কিন্তু যবে মনে পড়ে প্রতিক্ষুদ্র কাজে
তোমার করুণা ধারা, মরি যেন লাজে ;
জানি তবু বাহিরের রাজত্ব তোমার,
অন্তঃপুরে তুমি নাথ ! একান্ত আমার।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

• অন্ধু = কূপ

জগৎ-কারণ—ঈশ্বর কৃষ্ণ ও শঙ্কর

পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ব্রহ্মের জগৎ-কারণতা পক্ষে সাংখ্যাচার্য্যেরা নিম্নলিখিত দোষ দেখাইয়া থাকেন—

(১) ব্রহ্ম চেতন ও শুদ্ধ কিন্তু জগৎ অচেতন ও অশুদ্ধ, সুতরাং, ব্রহ্ম জগৎ-কারণ হইতে পারে না। হেতু, কার্য্য ও কারণ এক, প্রকৃতি বিকৃতি সমলক্ষণ হওয়া চাই।

(২) শুদ্ধ ব্রহ্মকে অশুদ্ধ জগতের কারণ স্বীকার করিলে, সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ থাকে না, কারণ তখন মাত্র শুদ্ধ ব্রহ্ম থাকেন। কাজে-কাজেই জগৎ অসৎ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু কিছু না হইতে কিছুর উৎপত্তি হইতে পারে না।

(৩) যদি ব্রহ্ম জগতের কারণ হন তাহা হইলে জগতের লয় অবস্থায় উহা যখন কারণে লয় হইবে তখন উহা স্বীয় দোষে কারণ (ব্রহ্ম) কে দূষিত করিবে।

(৪) একই ব্রহ্ম কি প্রকারে ভোক্তা ও ভোগ্য হইবেন ?

(৫) কারণ ও কার্য্যের ভেদ আমরা অনুভব করিয়া থাকি ; ব্রহ্মকে জগতের উপাদান স্বীকার করিলে এই অনুভবে বিরুদ্ধ হয়।

(৬) নিজেই নিজের বন্ধন সৃষ্টির হেতু কি ?

(৭) ব্রহ্ম অদ্বয়, ব্রহ্মের অতিরিক্ত আর স্থান নাই, তাহা হইলে জগৎ সৃষ্টি হইল কোথায় ?

(৮) নিরবয়ব ব্রহ্ম সাবয়ব জগতের কারণ কি করিয়া হইবেন ? ইহাকে কৃৎস্ন-প্রসক্তি দোষ বলে।

(৯) ব্রহ্ম নিরিন্দ্রিয় অতএব তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান হইতে পারে না।

(১০) ব্রহ্ম আপ্তকাম সৃষ্টিতে তাঁহার কিছুমাত্র প্রয়োজন না থাকায় তাঁহার জগৎ কর্ত্তৃত্ব অসম্ভব।

(১১) জগৎ সৃষ্টি করায় ব্রহ্মের পক্ষপাতিত্ব বা বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্য দোষ হয় ইত্যাদি।

ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ ॥ ২অ, ১পা, ৪সূ ॥

শঙ্করানন্দ কৃতা-দীপিকা—ন ব্রহ্মচেতনং জগতঃ কারণং। কুতো-জগতোবিলক্ষণত্বাৎ। তথাত্বঞ্চ জড়ত্বমপ্যস্য জগতঃ শব্দাৎ বাক্যাৎ সিদ্ধং।

সূত্রার্থ—"ব্রহ্ম চেতন ও শুদ্ধ, কিন্তু জগৎ অচেতন ও অশুদ্ধ, সুতরাং সমলক্ষণ নহে। তোমরা স্থাপন করিয়াছ, ব্রহ্মই জগৎ কার্য্যের প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান কারণ, কিন্তু তাহা অসঙ্গত। নিয়ম এই যে, যে যাহার প্রকৃতি, উপাদান, সে তাহার সমলক্ষণ। জগৎ যখন ব্রহ্ম লক্ষণাক্রান্ত নহে, প্রত্যুত ব্রহ্ম বিলক্ষণ তখন ব্রহ্ম ইহার প্রকৃতি, ইহা কদাচ নহে। জগৎ যে ব্রহ্ম বিলক্ষণ তাহা শাস্ত্রের দ্বারাও জানা যায়।"

ভাষ্য তাৎপর্য্য। ভিন্ন-পূর্ব্ব-পক্ষ—শাস্ত্রের অর্থ নিশ্চিত হইলে তর্কের প্রসর বা প্রয়োজন নাই। কারণ ব্রহ্ম, ধর্ম্মের ন্যায় অনন্যসাপেক্ষ অর্থাৎ কেবল শাস্ত্র বাক্যকেই অপেক্ষা করে। যাহা শাস্ত্র সাপেক্ষ তাহা শাস্ত্রের দ্বারাই নিশ্চিত হয়, অনুমান সেখানে বৃথা। সুতরাং শাস্ত্র-নিশ্চিত-পদার্থ অনুমানের অযোগ্য।

পূর্ব্ব-পক্ষ—ব্রহ্ম যদি ধর্ম্মের ন্যায় কেবল শাস্ত্র প্রমাণের বিষয় হইতেন তাহা হইলে ঐ যুক্তি অবলম্বন করিতে পারিতে। ধর্ম্ম অনুষ্ঠান সাধ্য, ব্রহ্ম অনুষ্ঠান সাধ্য নহেন। ব্রহ্ম সিদ্ধ বস্তু, যাহা সিদ্ধ বা পরিনিষ্পন্ন তাহাতে অন্য প্রমাণের প্রসর বা প্রয়োজন আছে। পৃথিবী পদার্থ পরিনিষ্পন্ন এবং উহা প্রমাণের বিষয়—সেইরূপ ব্রহ্মও। ব্রহ্মের স্বরূপ তর্ক মার্জ্জিত হওয়া চাই। যেমন এক শ্রুতির সহিত আর এক শ্রুতির বিরোধ দেখিলে তাহার সমন্বয় করিয়া এক শ্রুতির অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা হয়, সেইরূপ শ্রুতির যদি কোনও প্রমাণের সহিত বিরোধ ঘটে তাহা হইলে যুক্তিবলে কোনও বিশেষ প্রমাণের অনুযায়ী ব্যাখ্যা করা উচিত। দৃষ্ট-বস্তু অবলম্বন করিয়া আমরা অদৃষ্ট-বস্তু বিষয়ে অনুমান করিয়া থাকি। সুতরাং তাহা যত অনুভবের নিকট, শ্রুতি তত নিকট-

বর্ত্তিনী নহে। শ্রুতি ঐতিহ্য প্রমাণ অবলম্বন করায় তাহা দূর প্রমাণ। ব্রহ্মবিজ্ঞানের চরমফল ব্রাহ্মানুভূতি এবং তাহা অজ্ঞাননাশরূপ মুক্তি। সেই হেতু শ্রুতি শ্রবণের পর মননের বিধান দিয়াছেন। (মনন =তর্ক সহকৃত অনুমান)। এক্ষণে তোমাদের (বেদান্তীদের) জগৎ কারণ সম্বন্ধে কি মত বল, আমরা তাহা যুক্তি বলে খণ্ডন করিব।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—ব্রহ্মই জগতের প্রকৃতি বা উপাদান কারণ।

পূর্ব্ব-পক্ষ—তাহা অনুপপন্ন অর্থাৎ হইতে পারে না। কারণ, কার্য্য-রূপ জগৎ কারণরূপ ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বা বিসদৃশ। জগৎ অচেতন ও অশুদ্ধ কিন্তু ব্রহ্ম চেতন ও শুদ্ধ। সালক্ষণ্য ব্যতীত অর্থাৎ সমানে অসমানে প্রকৃতি-বিকৃতিভাব (কার্য্যকারণ সম্বন্ধ) হয় না। যেমন স্বর্ণবলয় ও মৃত্তিকা, মাটির সরা ও সুবর্ণ এ সকলের মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। সেই হেতু অচেতন ও অশুদ্ধ জগতের সহিত চেতন ও শুদ্ধ-ব্রহ্মের প্রকৃতি-বিকৃতি ভাব সম্ভব নহে। সুখ-দুঃখ-মোহান্বিত অচেতন জগৎ, জগল্লক্ষণ বর্জ্জিত চেতন-ব্রহ্ম হইতে পারে না।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—জগৎ ব্রহ্ম-লক্ষণ বর্জ্জিত জানিলে কি করিয়া?

পূর্ব্ব-পক্ষ—জাড্য ও অবিশুদ্ধি দৃষ্টে জানা যায়। জগৎ সুখ, দুঃখ, মোহ, প্রীতি, পরিতাপ, স্বর্গ, নরকাদি প্রভৃতি বিকারের আশ্রয়স্থল সুতরাং অশুদ্ধ। চেতনে ও অচেতনে পরস্পর সম্বন্ধ উপকার্য্য উপকারকের, কিন্তু এ সম্বন্ধ চেতনে চেতনে, অচেতনে অচেতনে নহে।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—প্রভু চেতন, ভৃত্যও চেতন কিন্তু এই উভয়ে ত পরস্পর উপকার্য্য উপকারক সিদ্ধান্ত আছে?

পূর্ব্ব-পক্ষ—প্রভু ও ভৃত্যের বুদ্ধি প্রভৃতি অচেতনাংশই অন্যতর চেতনের উপকার করে। স্বয়ং চেতন উপকার অপকার কিছুই করে না। এ কথা তোমরা এবং আমরা উভয়েই মানি। অতএব কার্য্য ও কারণ সবই অচেতন।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—অচেতনর মধ্যে ত চেতন লুকাইত থাকিতে পারে?

পূর্ব্ব-পক্ষ—কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদিতে চৈতন্য থাকার প্রমাণ নাই এবং

চেতন ও অচেতন এই দুই বিভাগ সর্ব্ববাদী সম্মত। সব যদি চেতন হয় তাহা হইলে এই বিভাগের উচ্ছেদ হইবে।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—যদি বলি যাহাকে তোমরা অচেতন বলিতেছ তাহা চেতনের অনভিব্যক্তি মাত্র। কাষ্ঠ লোষ্ট্র সেই হিসাবে অচেতন। অভিব্যক্তির বা প্রকাশের তারতম্যে চৈতন্য স্ফূর্ত্তির অল্পাধিক্য। এবং এই অল্পাধিক্য লইয়া চেতন অচেতন ব্যবহার আমরা করিয়া থাকি। চৈতন্যের বিকাশ যখন আমরা অনুভব করি তখন তাহাকে আমরা চেতন বলি আর বিকাশ যখন অনুভব হয় না তখন আমরা অচেতন বলি। যেমন, আত্মা বিস্পষ্ট চেতন হইলেও মূর্চ্ছাদি কালে তাহার চৈতন্যাভিভব হয়, তখন লোকে বলে, 'অচেতন হইয়াছে'। অতএব চেতন অচেতন অবস্থা অভিব্যক্তি ও অনভিব্যক্তি ঘটিত। সমস্ত বিকারী পদার্থ চেতন হইলেও ব্যক্তাব্যক্ততারূপ প্রভেদ থাকায় উপকার্য্য উপকারক ভাবের বাধা হয় না। যেমন মাংস সূপ ও অন্ন প্রভৃতি দ্রব্য মৃৎ-স্বভাব তথাপি ভেদক ধর্ম্ম থাকাতে একে অপরের উপকার্য্য উপকারক হয়।

দৃশ্যতে তু ॥ ২ অ, ১পা, ৬সূ ॥

দীপিকা—তু শব্দঃ পূর্ব্বপক্ষব্যাবৃত্ত্যর্থঃ। দৃশ্যতে চেতনাৎ কেশাদি অচেতনাদ্‌গোময়াদেবৃশ্চিকাদিঃ।

সূত্রার্থ—"ব্রহ্ম চেতন, জগৎ অচেতন, এই বৈলক্ষণ্য অনুসারে জগৎ ব্রহ্মপ্রভব নহে, এ আপত্তি হইতেই পারে না। কেন না চেতন চেতনেরই উৎপাদক, অচেতন অচেতনেরই জনক, ইহা ঐকান্তিক অর্থাৎ নিয়মিত নহে।"

ভাষ্য-তাৎপর্য্য। পূর্ব্ব-পক্ষ—কিন্তু ব্রহ্ম শুদ্ধ, জগৎ অশুদ্ধ—এ বৈলক্ষণ্য কি করিয়া মিটাইবে?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—বৈলক্ষণ্য দেখিয়া জগৎ ব্রহ্ম-প্রভব নহে এ কথা বলিতে পার না। যাহা হইতে যাহার উৎপত্তি হয়, উভয়ই যে সমলক্ষণ হইবে তাহার কোনও নিয়ম নাই। আমরা উহার ব্যভিচার (ব্যতিক্রম) দেখাইতেছি। চেতন মনুষ্য হইতে অচেতন কেশনখাদি জন্মে। অচেতন গোময় হইতে চেতন বৃশ্চিকাদি জন্মে।

পূর্ব্ব-পক্ষ—অচেতন দেহই অচেতন কেশনখাদির এবং অচেতন গোময় অচেতন বৃশ্চিকাদি-শরীরের উৎপাদক।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—তাহা হইলে ইহাও বলিব অচেতন গোময় হইতে কিঞ্চিৎ সলক্ষণ বৃশ্চিকদেহ ও কিঞ্চিৎ বিলক্ষণ বৃশ্চিকের চেতন অংশ উৎপত্তি হইতেছে। কাজে-কাজেই বৈলক্ষণ্য দোষ রহিয়া গেল। কারণ ও কার্য্যে কিঞ্চিৎ ভেদ থাকিবেই থাকিবে। নচেৎ প্রকৃতি-বিকৃতি ভাবের উচ্ছেদ হইবে। অতএব জগৎ ও ব্রহ্মে বৈলক্ষণ্য দেখিয়া কার্য্য কারণ ভাব নিষেধ করিতে পার না।

পূর্ব্ব-পক্ষ—যদি বলি পুরুষের ও গোময়ের যে মৃৎ স্বভাব আছে, সেই স্বভাব কেশনখাদি ও বৃশ্চিক প্রভৃতিতে দৃষ্ট হয়।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—আমরা ইহার প্রত্যুত্তরে বলি যদি স্বভাব ধরিয়া প্রকৃতি-বিকৃতি ভাব নির্ণয় কর তাহা হইলে ব্রহ্মের সৎ (অস্তিরূপ) যে স্বভাব তাহাকে অতিক্রম করিয়া জগৎ থাকিতেই পারে না। সেই অস্তিরূপ স্বভাবকে অবলম্বন করিয়া আকাশাদি পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ।

পূর্ব্ব-পক্ষ—যদি বলি জগতে সমস্ত ব্রহ্মস্বভাবের অনুবর্ত্তন নাই বলিয়া জগৎ ব্রহ্ম-বিলক্ষণ।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—কারণ যদি কার্য্যের ন্যায় একেবারে একই প্রকার থাকে তাহা হইলে প্রকৃতি-বিকৃতি ভাবের উচ্ছেদ আপত্তি ঘটে।

পূর্ব্ব-পক্ষ—কিন্তু যদি বলি বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে বলিয়া, জগৎ ব্রহ্ম-প্রভব নহে।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—আপাদ্যের অসিদ্ধতা দোষ হইবে। কারণ ব্রহ্মের সত্তালক্ষণ অস্তিত্ব রূপ স্বভাব জগতের যাবতীয় পদার্থে রহিয়াছে।

পূর্ব্ব-পক্ষ—যদি বলি সেখানে ব্রহ্ম স্বভাবের অননুবর্ত্তনরূপ বৈলক্ষণ্য আছে তাহা ব্রহ্ম প্রভব নহে।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—দৃষ্টান্তের অভাব দোষ হইবে। চৈতন্য ব্যতিরিক্ত পদার্থ দেখাইতে পারিবে না।

পূর্ব্ব-পক্ষ—ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী বিভু এই অনুমানটি তোমাদিগকে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা বুঝাইতে হইবে।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—রূপাদি না থাকায় তিনি প্রত্যক্ষ বহির্ভূত এবং লিঙ্গাদি না থাকায় তিনি অনুমানের অবিষয়। ধর্ম্মের ন্যায় ব্রহ্মও কেবল শাস্ত্র-গম্য।

পূর্ব্ব-পক্ষ—কিন্তু শাস্ত্রও শ্রবণের পর মননের উপদেশ করিয়াছেন ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—উহা শুষ্ক তর্ক নহে। শুষ্ক তর্ক প্রতারক। শ্রুতির অনুকূল যুক্তি করিতে হইবে।

পূর্ব্ব-পক্ষ—আচ্ছা তোমরা যে পূর্ব্বে জড় ও চেতনের বিভাগের মীমাংসা একই চৈতন্যের অভিব্যক্তি অনভিব্যক্তির তারতম্য দিয়া বুঝাইয়াছিলে তাহা অখণ্ড-ব্রহ্মে কি প্রকারে সম্ভব ? কিংবা একই ব্রহ্মের এক অংশ চেতন অপর অংশ অচেতন ইহাই বা কি প্রকারে সম্ভব।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—উহা একই জগৎ-কারণ ব্রহ্মের উপর দেশকাল নিমিত্তের কল্পিত ব্যবহারিক ভেদ মাত্র।

কাজেকাজেই কার্য্য কারণের বৈলক্ষণ্য দেখিয়া ব্রহ্মের জগৎ কারণতা নিবারণ করিতে পার না।

অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥ ২ অ, ১ পা, ৭ সূ

দীপিকা—নির্গুণে ব্রহ্মণি প্রাগুৎপত্তের্জগতোঽভাবাৎ অসৎ কার্য্যমিতি চেদেবং যদি, তন্ন, কুতঃ, প্রতিষেধ মাত্রত্বাৎ কারণাত্মনা কার্য্যস্য বিদ্যমানত্বাৎ প্রতিষেধ্যাভাবেন প্রতিষেধমাত্রত্বাদসৎ কার্য্যমিতিশব্দস্য।

সূত্রার্থ—"রূপাদি বিহীন চেতন ব্রহ্মকে রূপাদিবিশিষ্ট অচেতন (জড়) জগতের কারণ বলিলে সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা (জগৎ) ছিল না, এরূপ বলা হয় না। কেন না, নিষেধের নিষেধ্য না থাকায় অসৎ— 'ছিল না' এ নিষেধ নিরর্থক। অভিপ্রায় এই যে, জন্য-মাত্রেই (Created মিথ্যা সুতরাং তাহার কারণ-রূপের অস্তিত্ব ত্রৈকালিক অর্থাৎ সকল কালেই সেরূপ অস্তিত্ব আছে।"

পূর্ব্ব-পক্ষ—যদি শুদ্ধ-চেতন ও শব্দাদিবিহীন ব্রহ্মকে অশুদ্ধ, অচেতন ও শব্দাদিযুক্ত কার্য্যের অর্থাৎ জগতের কারণ বলিতে চাও, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকে না। সম্পূর্ণ

অভিনব অর্থাৎ নূতন সৃষ্টি হয়। ইহা হইল অসৎ-কার্য্যবাদ। অর্থাৎ জগৎ পূর্ব্বে অসৎ ছিল এবং অসৎ হইতে এই সৎ জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা অসম্ভব।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—চেতন কারণবাদ স্বীকার করিলেও আমাদের কার্য্যের অসত্ব স্বীকার করিতে হয় না। সৃষ্টিকালে এই জগৎরূপ কার্য্য যেমন কারণরূপে সৎ, তেমনি উৎপত্তির পূর্ব্বেও ইহা কারণরূপে সৎ। কার্য্যের কারণরূপে থাকা কোন কালেও নিষেধ হয় না। সূক্ষ্ম-কারণ যেরূপ স্থূল কার্য্যরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ শুদ্ধ কারণরূপ ব্রহ্ম অশুদ্ধ কার্য্যরূপ জগতে বিবর্ত্ত-পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃতি ও বিকৃতিতে যে ভেদ থাকে ইহাতেও সেইরূপ ভেদ আছে। কার্য্য অসৎ কিন্তু কারণরূপ ত্রিকালে সৎ।

অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্॥ ২ অ। ১ পা। ৮ সূ

দীপিকা—স্থূলাদিগুণকস্য কার্য্যস্য ব্রহ্মণোঽভেদে প্রলয়ে ব্রাহ্মণোঽপি তদ্বত্ত্বপ্রসঙ্গঃ স্থূলাদিমত্ত্বপ্রসঙ্গস্তস্মাৎ অথবা তৎ প্রসঙ্গাদভেদপ্রসঙ্গাৎ ভোক্তৃভোগ্যাদ্যভাবপ্রসঙ্গেন অথবা তদভিন্নানাং মুক্তানামপি তদ্বৎ প্রসঙ্গাৎ পুনরুৎপত্ত্যাদি প্রসঙ্গাৎ অথবা ভেদসদ্ভাবে তদ্বৎ প্রসঙ্গাৎ কারণবৎ প্রলয়ভাবপ্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসং অসমীচীনং ঔপনিষদং দর্শনম্।

সূত্রার্থ—"কার্য্যমাত্রেই প্রলয়কালে কারণে লয় প্রাপ্ত হয় (অবিভক্ত বা এক হইয়া যায় সুতরাং কারণে বহু অসামঞ্জস্য (কার্য্যের দোষ কারণে) ঘটিতে পারে।" (ইহা শঙ্কা-সূত্র)।

ভাষ্য-তাৎপর্য্য। পূর্ব্ব পক্ষ—স্থূল, সাবয়ব, অচেতন, পরিচ্ছিন্ন ও অশুদ্ধ কার্য্যরূপ জগৎ যদি ব্রহ্মপ্রভব হয়, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই কারণ ব্রহ্মে লীন বা এক হইয়া যাইবে। যখন লীন হইবে তখন ইহা কারণকে স্বীয় অশুদ্ধ্যাদি দোষে দূষিত করিবে। যেমন লবণ জলকে দূষিত করে। কার্য্য যেমন অশুদ্ধ, প্রলয়ে কারণও তেমনি অশুদ্ধ হইবে। ইহা যদি স্বীকার করি তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞ-সম্পূর্ণ ব্রহ্ম দূষিত হইলেন এবং ঔপনিষদ-দর্শন ব্যর্থ হইল।

আবার দেখ যেমন প্রলয়ে জগৎ অবিভক্ত ভাবে ব্রহ্মে থাকে তখন সৃষ্টির

হেতু বিভাগ-নিয়ামক কোন কারণ বিশেষ থাকিবে না। তাহা হইলে বিভাগক্রমে পুনরুৎপত্তিও হইতে পারিবে না। আবার যদি বল জগৎ বিভক্তভাবে থাকে। তাহা হইতে পারে না। কারণ তোমাদের মতে এক ব্রহ্মে, জগৎ প্রলয়ে লীন হইয়া যায়। বিভাগ থাকিলে দ্বৈতাপত্তি হয়। এই সকল কারণে ঔপনিষদ-দর্শন অসামঞ্জস।

ন তু দৃষ্টান্ত ভাবাৎ ॥ ২ অ, ১ পা, ৯ সূ ॥

দীপিকা—তু শব্দঃ এবকারার্থঃ। ত্বদুক্তং নৈব, কুতঃ, আদ্যে স্থূলস্যঘটাদেঃ পৃথিব্যাদিকং প্রবিশতঃ দ্বিতীয়বিভাগস্য তেন সুষুপ্তাবুত্থিতস্য তৃতীয়ে তদ্দেহাদেস্তদনুৎ পাদেন চ। সন্তিদৃষ্টান্তাঃ।

সূত্রার্থ—"বাদী যে সকল দেবের কথা বলেন সে সকল দোষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। লয় প্রাপ্ত কার্য্য যে কারণকে স্বধর্ম্ম-বিশিষ্ট করে না, ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে।"

ভাষ্য তাৎপর্য্য। সিদ্ধান্ত-পক্ষ—কার্য্য কারণে লয় হইলেই যে তাহার দোষ কারণকে দুষ্ট করিবে এমন বলিতে পার না। কার্য্য নশ্বর অতএব কার্য্য যখন কারণে লয় পায় তখন কি কারণকেও সে নশ্বর করিবে? মৃত্তিকাদি-প্রভব ঘটাদি বিভাগাবস্থায় (কার্য্যরূপে) নানা ভেদ যুক্ত হইলেও অবিভাগাবস্থায় অর্থাৎ প্রলয়ে কারণকে (মৃত্তিকাকে) স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করে না। আরও দেখ সুবর্ণ-প্রভব অলঙ্কার লয়কালে সুবর্ণকে স্বধর্ম্ম বিশিষ্ট করে না, পৃথিবী বিকার চতুর্ব্বিধ দেহ, পৃথিবী-প্রাপ্তিকালে পৃথিবীকে স্বধর্ম্ম বিশিষ্ট করে না। সেইরূপ জগৎও লয়কালে কারণকে (ব্রহ্মকে) জগদ্ধর্ম্ম-বিশিষ্ট করে না।

আরও দেখ কার্য্য যদি কারণে নিজের ধর্ম্মের সহিত প্রবেশ করিত তাহা হইলে লয়ই হইত না। কার্য্য অবস্থাতে ঘট যেরূপ ছিল কারণে গিয়াও যদি ঘট ঘটই থাকে তাহা হইলে কার্য্য কারণের বিভাগ হইল কোথায়? মৃত্তিকা ও ঘটে প্রভেদ থাকিল কোথায়?

পুনশ্চ দেখ, কার্য্য (জগৎ) যদি কারণে (ব্রহ্মে) লয় হইয়া নিজ দোষে কারণকে (ব্রহ্মকে) দুষিত করে, তাহা হইলে আমরাও বলিব

তোমাদের কারণ (প্রকৃতি) কার্য্যে জগতে) পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যের (জগতের) দোষে দূষিত হইল। পরিণাম বাদে এই দোষ উভয় দিকেই থাকিবে। কিন্তু আমরা, বিবর্ত্তবাদীরা, নিম্নলিখিত উপায়ে ঐ দোষ পরিহার করি—

হেতু—কার্য্য ও কার্য্যের ধর্ম্ম অবিদ্যা (দেশ কাল) কল্পিত, সেই হেতু কারণ কার্য্যে বা কার্য্যধর্ম্মে সংসৃষ্ট (কলুষিত) হয় না। যাহা মিথ্যা তাহা কিরূপে সত্যকে স্পর্শ করিবে ?

দৃষ্টান্ত—যেমন মায়াবী নিজ মায়ায় স্পৃষ্ট হয় না

যেমন স্বপ্নদর্শী নিজ স্বপ্নে লিপ্ত হয় না

নিগমন—সেইরূপ পরমাত্মাও নিজ মায়ায় লিপ্ত হন না

পূর্ব্ব-পক্ষ—প্রলয়ে সকল বিভাগ Plurality) অবিভক্ত (unity) হইলে, পুনরুৎপত্তি কালে বিভাগের নিয়মন (Law) করিবে কে ?

সিদ্ধান্ত পক্ষ—এরূপ প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আছে। সুষুপ্তি হইতে যে ভাবে স্বপ্ন ও জাগ্রতঃ অবস্থা উপস্থিত হয়।

স্বপক্ষ দোষাচ্চ ॥ ২ অ, ১ পা, ১০ সূ

দীপিকা—স্বস্য প্রতিবাদিনঃ পক্ষস্তস্মিন্ বিলক্ষণত্বাদের্দোষাৎ।

সূত্রার্থ—"ঐ সকল দোষ সাংখ্য পক্ষেও আছে। সাংখ্য যে সকল রীতিতে বেদান্তের ঐ সকল দোষের উদ্ধার করিবেন আমরাও সেই রীতিতে প্রধান-বাদের দোষ দেখাইব।

ভাষ্য তাৎপর্য্য। সিদ্ধান্ত-পক্ষ—প্রধান-বাদীরা শব্দাদি বিহীন প্রধান হইতে শব্দাদিমান জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন। ইহাতে কার্য্য-কারণের বৈলক্ষণ্য স্বীকার করায় তাঁহাদের নিজপক্ষ পরপক্ষের সমান দোষযুক্ত হইল। পরন্তু সাংখ্য মতে আর একটি দোষ থাকিয়া যাইতেছে। তাঁহারা বলেন কার্য্য মাত্রই সৎ কিন্তু কার্য্যে কারণের বৈলক্ষণ্য স্বীকার করায় সে সিদ্ধান্ত টিকিতেছে না।

সাংখ্যও প্রলয়ে কারণে (প্রকৃতিতে) কার্য্যের জগতের) অবিভাগ (একীভূত হওয়া) স্বীকার করেন, সুতরাং তাঁহার নিজপক্ষেও পূর্ব্বোক্ত দোষ সমূহ আশ্রয় করিবে। অর্থাৎ অমুক আত্মার অমুক

কর্ম্ম অমুক ফল ইত্যাদি প্রকার বিভাগ প্রলয়ে বিনষ্ট হওয়ায় কারণাভাব প্রযুক্ত পুনরুৎপত্তি কালে কার্য্য কারণাত্মক বিভাগ সম্ভব হয় না।

পূর্ব্ব-পক্ষ—যদি বলি প্রলয়ে কর্ম্মের অভাব হইলে কর্ম্ম নিয়ামক নিয়মের অভাব হয় না।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—তাহা হইলে নিয়মের যখন নাশ হয় না। তখন মুক্ত পুরুষও সেই নিয়মের অধীন হইতে পারেন।

পূর্ব্ব-পক্ষ—যদি বলি কোন কোন ভেদ (সংঘাত বিশেষ) (বদ্ধ আত্মার জন্য) থাকে (প্রকৃতি লীন হয় না) কোনও কোনও ভেদ (মুক্ত আত্মার জন্য) থাকে না।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—তাহা হইলে যে গুলি লীন হয় না সেগুলিকে আর প্রাকৃতিক বলা চলে না। কিন্তু তাহা তোমাদের মতে সম্ভব নহে কারণ পুরুষ ব্যতীত সকলই প্রাকৃতিক।

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদন্যথানুমেয়মিতিচেদেবমপ্যবিমোক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥ ২ অ. ১পা, ১১ সূ ॥

দীপিকা—তর্কস্য যুক্তেরেকেনোক্তায়াঃ পরেণদূষণাদপ্রতিষ্ঠাঽনবস্থিতিস্তস্মাৎ। অন্যথা প্রতিষ্ঠিতে স্ত্রেকস্যচিত্তর্কস্য স্বরূপমনুমানাদবগন্তব্যমিতি চেৎ; যদি প্রতিষ্ঠিতস্তেঽপ্যবৈদিকপ্রধানপ্রতিপাদক তর্কস্যাপ্রতিষ্ঠিতত্বাদবিমোক্ষঃ প্রসঙ্গঃ। তর্কতত্ত্বজ্ঞানাভাবাৎ সংসারাদবিমোক্ষভাবঃ প্রসঙ্গঃ।

সূত্রার্থ—"তর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না অর্থাৎ স্থির থাকে না, সুতরাং তর্কে অপ্রতিষ্ঠা দোষে আছে। যেহেতু অপ্রতিষ্ঠা দোষ আছে সেই হেতু শাস্ত্র-গম্য বস্তুতে তর্কের আদর করা অন্যায্য। যদি বল, অনুমানের বলে এমন তর্ক গ্রহণ করিব, যাহা প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ স্থির—বিচলিত হইবার নহে। তথাপি তর্কের মোচন নাই। তর্কের দ্বারা তর্কের অপ্রতিষ্ঠা দোষ নিবারিত হয় না।"

[এই সূত্রের ভাষ্য তাৎপর্য্য এই—মানব মন বিচিত্র অর্থাৎ বহুরূপ সেই জন্য মতও বহুরূপ। এক পণ্ডিত বুদ্ধি বলে একটি মত স্থাপন করিলেন অপর পণ্ডিত আসিয়া তাহা খণ্ডন করিলেন। একজন

বলিলেন কপিলের মত ঠিক আর একজন বলিলেন গৌতম-মত ঠিক। জগতে এমন কিছু নাই যাহার বিরোধী তর্ক উঠান যাইতে পারে না। যদি বল কোনও তর্ক দোষযুক্ত হইলে তাহা ত্যাগ করিয়া নির্দ্দোষ তর্ক গ্রহণ করিতে পারি, আমার পূর্ব্ব পুরুষ দোষ করিয়াছিলেন বলিয়া আমাকেও সেই দোষ স্বীকার করিয়া চলিতে হইবে তাহার কোনও অর্থ নাই এ কথাও বলিতে পার না। ব্যবহারিক বিষয়ে তর্ক চলিতে পারে কিন্তু যে জগৎ-কারণ দেশ কালের অতীত, তর্কের অতীত তাহা কখনও তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যাহা প্রত্যক্ষ নয় (রূপ নাই), যাহার লিঙ্গ নাই, তাহার সম্বন্ধে অবিনাভাব বা ব্যাপ্তিজ্ঞান অসম্ভব অতএব সে সম্বন্ধে অনুমান অসিদ্ধ। তবে যদি অতীত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতের সকল তার্কিকের একটি সভা করিয়া মীমাংসা করা যায় তাহা হইলে অনুমানের দ্বারা জগৎ-কারণ নির্ণয় হইতে পারে। কিন্তু এ কার্য্য অসম্ভব। সত্য এক এবং তাহা সমাধি লভ্য। অতএব শ্রুতির অর্থ-বিচার এবং অনুকূল যুক্তিই কর্ত্তব্য।]

(আগামী বারে সমাপ্য) —বাসুদেবানন্দ।

ভাই লরেন্স

'ভাই লরেন্স'—(Brother Lawrence) প্রথম জীবনে নিকোলাস হার্মেন নামে পরিচিত ছিলেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ফরাসী দেশের লরেইন নগরে এক ক্ষুদ্র নগণ্য পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সামান্য ঘটনা হইতে কি করিয়া একটি জীবন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং মহৎ জীবনের সূত্রপাত হয়, 'ভাই লরেন্সের' জীবন-চরিত আলোচনা করিলে তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। কতদিন কত লোকের সম্মুখে কত বৃক্ষ হইতে ফল পতিত হইয়াছে, কিন্তু নিউটনের

সম্মুখে যেই একদিন কোন্ এক শুভ মুহূর্ত্তে একটি আপেল ভূপতিত হইল, এবং এই ঘটনা তাঁহার চিন্তাবৃত্তিকে এরূপভাবে আলোড়িত করিতে লাগিল যে, তাহার ফলে পৃথিবীতে এক অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হইয়াছে। আমরা কত সময়, কত মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া থাকি, সেগুলি সময় সময় চক্ষুর তৃপ্তি সাধন করিলেও কদাচিৎ আমাদের প্রাণস্পর্শ করিতে বা স্মৃতিতে কোন স্থায়ী চিহ্ন রাখিতে পারে, কিন্তু পূর্ব্ব জীবনের পুণ্যফলে বা ভগবানের অহেতুকী কৃপা বশতঃ নিকোলাস হার্মেন একদিন হঠাৎ যেই একটি পত্রহীন শুষ্ক বৃক্ষ দর্শন করিলেন, অমনি উহা এত দৃঢ়ভাবে তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিল যে, তাহাতে তাঁহার জীবনের উপর এক প্রবল ঝড় বহিয়া গেল এবং তাঁহার জীবন স্রোত এক সম্পূর্ণ নূতন ধারায় প্রবাহিত হইল। হার্মেন ভাবিতে লাগিলেন,—শীতের অবসানে কিছুদিন পরেই বসন্ত ঋতুর আগমন হইবে, তখন এই শুষ্ক তরুই মঞ্জুরিত হইয়া নব জীবন লাভ করিবে, পত্র পুষ্প-সুশোভিত এবং ফল ধারণ করিবে। এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা কি মঙ্গলময় ভগবানের অপরিসীম করুণা ও শক্তিমত্তার কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতেছে না? ইহা হইতে আর কি উজ্জ্বলতর দৃষ্টান্ত মানুষ আশা করিতে পারে? এই কথাগুলি দিন রাত তাঁহার মনে হইতে লাগিল। তখন হার্মেনের বয়স মাত্র আঠার বৎসর। ঐ ঘটনার পরে, হার্মেন ক্রমেই সংসারের প্রতি অনাসক্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন ও তাঁহার হৃদয়ে যে এক অপূর্ব্ব ভগবদ্ প্রেমের সঞ্চার হইল, উহা তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে কখনও হ্রাস পাইয়াছে কি না, তিনি বলিতে পারিতেন না।

নিকোলাস হার্মেন বাল্যে কোন রকম লেখাপড়া বা বিদ্যার্জ্জন করিতে পারেন নাই, কারণ তিনি ছিলেন গরিবের সন্তান। তাহার উপর তিনি ছিলেন পঙ্গু এবং কার্য্যকলাপেও তাঁহার কোন রকম বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাইত না। তিনি প্রথমে মোঁসা ফিবার্ট নামক একজন কোষাধ্যক্ষের ভৃত্য ছিলেন। সেখানে চাকুরীর সময় সব জিনিষপত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিতেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে একটি কিম্ভূতকিমাকার জানোয়ার বলিয়া মনে করিত এবং নেহাৎ কৃপার চক্ষে দেখিত।

নিজের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিয়া একদিন তাঁহার মনে খুব দুঃখের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, জীবনে ত দুঃখই পাওয়া যাইতেছে, তবে দুঃখকেই ভাল রকমে বরণ করিয়া লওয়া যাক! আমি এক মঠে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিব—সেখানে আমার অদ্ভুত প্রকৃতি ও এই এত ভুল ভ্রান্তির জন্য খুব মনের কষ্টে থাকিতে হইবে—আর এরূপ করিলে সম্পূর্ণ জীবনটি এবং কোন প্রকার সুখ উপভোগ করিবার যত ইচ্ছা সব ভগবানের পদে বিসর্জ্জন দেওয়া হইবে—দেখি, জীবনে কত কষ্ট পাইতে পারি! কিন্তু এরূপ করিলে ফল হইল সম্পূর্ণ বিপরীত। মঠে ঢুকিবার পর এক দিনের জন্যও হার্মেনকে কোন রকম অশান্তি ভোগ করিতে হয় নাই। ভগবানের এমনিই বিচিত্র লীলা, আমরা যতই সুখের অন্বেষণে ছুটি, সারাজীবন ছুটিয়া ক্লান্ত হই, সুখ শান্তির লেশমাত্রও আস্বাদন আমাদের ভাগ্যে কখনও ঘটিয়া উঠে না; কিন্তু যদি সাহসে ভর করিয়া আমরা দুঃখের সম্মুখীন হইতে পারি, তাহা হইলে দুঃখ আমাদের নিকট হইতে সরিয়া যায়। সকল দুঃখ কষ্টের মধ্যে হার্মেন যখন মনের আনন্দে ব্যথা বেদনাকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিলেন, তখন উহাই অন্যরূপ ধারণ করিল—ভগবৎ প্রেমে তাঁহার দুঃখময় জীবন শুষ্ক তরুরই ন্যায় নূতন ভাবে মঞ্জুরিয়া উঠিল—অন্ধকারময় ভবিষ্যতের মধ্যে যখন সূচীভেদ্য অন্ধকারকেই আপনার করিয়া লইলেন, তখন হার্মেনের জীবন ভগবানের অপার করুণার অপূর্ব্ব কিরণসম্পাতে উজ্জ্বল ও প্রতিভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি জীবনে নূতন আলোক দেখিতে পাইলেন, তাঁহাকে আর জীবনে ভগবৎ-বিচ্ছেদ সহ্য করিতে হয় নাই। এই মঠেই হার্মেনকে সকলে ডাকিত—"ভাই লরেন্স।"

ভাই লরেন্সের সাধনপদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ নূতন ধরণের এবং সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি উহার জন্য কোন রকম বাহিরের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। ভগবানের জন্য ঠিক ঠিক ব্যাকুল হইলে যে, ভগবানই সব উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দেন, ভাই লরেন্সের জীবনে তাহা পরিষ্কার দৃষ্ট হয়। তিনি বলেন,—অনেক পুস্তক পাঠ করিয়া উহাতে ভগবান লাভের যে সব পথ নির্দ্দিষ্ট আছে এবং আধ্যাত্মিক জীবনে যে সব উপায়

অবলম্বনের উপদেশ রহিয়াছে, তদ্দর্শনে আমার দ্বিধা ও সংশয় বর্দ্ধিতই হইল—লাভ কিছুই হইল না। কোনটিতেই আমার প্রাণের মত কথা পাইলাম না—ভগবানে তন্ময় হইয়া যাইবার পথ আমি তাহাতে খুঁজিয়া পাইলাম না। তারপর নিজেই ভাবিতে লাগিলাম, আচ্ছা আমি চাই কি? যদি ভগবানকে চাই, তবে ভগবান ছাড়া যাহা কিছু তাহা সব বাদ দিলেই ত হয়।—এই ভাবিয়া ভগবানের নিকট নিজকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিলাম—ভগবৎ প্রীতির জন্য। তিনি ছাড়া যাহা কিছু, একে একে সব পরিত্যাগ করিতে লাগিলাম এবং এরূপ ভাবে জীবন যাপনে প্রয়াস পাইলাম যেন তিনি আর আমি ছাড়া জগতে আর কিছুই নাই। কখন কখন ভাবিতাম, আমি যেন আসামী, ভগবান যেন বিচারক; আবার কখনও ভাবিতাম, তিনি যেন সব চেয়ে আপনার জন এবং আমার হৃদয়ে অবস্থিত—সদাসর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতাম। যখনই মন সরিয়া যাইত, তখনই জোর করিয়া আনিয়া তাঁহাতে বসাইতে চেষ্টা করিতাম।

নিঃস্বার্থ ভালবাসাই হইয়াছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র; তাঁহার প্রত্যেক কাজেরই পশ্চাতে ছিল—ভগবৎ প্রীতি। তিনি বলিতেন,—ভগবদ্ভক্তি প্রণোদিত হইয়া, শুধু তাঁহাকেই চাহিয়া, এমন কি ভগবানের নিকট হইতে যে-কোন রকম দানের প্রত্যাশাও না করিয়া, মাটি হইতে একগাছি খড় তুলিতে পারিলেও কত আনন্দ! একবার কিছুদিন তিনি অত্যন্ত মানসিক অবসাদ ভোগ করেন—কত জনের কত কথায় কিছুই লাভ হইল না। অবশেষে তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—ভগবৎ প্রেম লাভ করিবার জন্যই আমি ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করি—তাঁহাকে লাভ করিবার জন্যই আমি সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়াছি; আমার মুক্তি হইবে—কি না হইবে, তাহার জন্য কিছু না ভাবিয়া, সব কাজ কেবল তাঁহারই জন্য করিয়া যাইব, যাহা হয় হোক। তাহাতে একটা লাভ হইবে, আমার মনে হইবে যে, মরণ পর্য্যন্ত কেবল তাঁহার দিকে চাহিয়াই সব কাজ করিয়াছি। এরূপ করিলে কিছুদিন পরে তাঁহার মনের সব দুর্ব্বলতা, সব ভয় চলিয়া যায়। তিনি বলেন, আমার যত

পাপ পুণ্য যেন ভগবানের পদে ঢালিয়া দিয়া প্রার্থনা করিলাম—প্রভো, তুমি যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমি তোমার কোন অনুগ্রহ লাভের উপযুক্ত নহি ; কিন্তু আশ্চর্য্য তাহার পর হইতে ভগবানের অপার করুণার কত নিদর্শনই পাইয়াছি !

তাঁহার মত ছিল, কি সাংসারিক বিষয়ে, কি ধর্ম্মজীবনে, সব কাজেই ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকা চাই,—যেন তাঁহার ইচ্ছা পালন করাই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়। কারণ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিলে জীবনে সুখই পাই বা দুঃখই পাই, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। মাঝে মাঝে এরূপ অবস্থা সকলেরই আসে, জীবন যখন মরুভূমি সদৃশ মনে হয়, প্রার্থনা করাও বিরক্তিকর লাগে, কোথাও কিছু সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। ভাই লরেন্স বলেন, ধর্ম্মজীবনে উন্নতি করিতে হইলে এরূপ অবস্থায় খুব জোর করিয়া আরও বেশী নির্ভরতা আনা উচিত। কারণ, ঐরূপ অবস্থাদ্বারা ভগবান আমাদিগকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন মাত্র। মনে নানা রকম কষ্ট পাইলেও, তিনি কাহারও নিকট কোন দিন উপদেশ চাহিতেন না। তিনি বলিতেন, ভগবান যখন আছেন, তাঁহার অগোচর কিছুই নাই। সুতরাং তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া তিনি নীরবে নির্ভীক চিত্তে সব কাজ করিয়া যাইতেন।

প্রার্থনার সময়ও ভাই লরেন্স প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন না। তিনি বলিয়াছেন, প্রথম প্রথম উপাসনার সময় কেবল মৃত্যু চিন্তা, মৃত্যুর পর কি অবস্থা আছে, আমার কত দোষ ও দুর্ব্বলতা ইত্যাদি চিন্তা করিতাম এবং দিনের অবশিষ্ট সময় আমি যেন সর্ব্বদা ভগবানের সঙ্গে আছি, ভগবান যেন আমার অন্তরে অবস্থিত এরূপ অনুভব করিতে চেষ্টা করিতাম। কয়েক বৎসর এরূপ ভাবে চলিলে, অবশেষে প্রার্থনার নির্দ্দিষ্ট সময়েও আপনা হইতেই বোধ করিতাম যেন, ভগবানের সন্নিধানে আছি এবং তাহাতে মনে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও প্রশান্ত ভাব আসিত। কখন কখন উপাসনা কালে মনে করিতাম—আমি যেন একটি মর্ম্মর প্রস্তরখণ্ড, আর ভগবান যেন ভাস্কর। প্রার্থনা করিতাম—তিনি যেন ঠিক তাঁহারই মত, একটি প্রতিমূর্ত্তি আমাতে নির্ম্মাণ করেন।

কখন কখন মনে করিতাম—কোন চেষ্টা বা আয়াস ব্যতীতই আমার মন বুদ্ধি চিত্ত সমস্ত যেন ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হইয়া যায় এবং পরম শান্তির স্থান লাভ করে। কেহ কেহ ইহাকে একপ্রকার অলসতা, মোহ ও আত্মপ্রীতির অবস্থা বলিয়া থাকেন। স্বীকার করিলাম তাহা হইতে পারে, তথাপি উহা স্বর্গীয় অলসতা—আর যদি আত্ম-প্রীতিই হয় তবে উহা সুখেরই বিষয় কারণ, সেই অবস্থায় মন এরূপ প্রশান্তভাব ধারণ করে যে বাহিরের বা পূর্ব্বের কোন কিছু ঘটনাই উহাকে বিচলিত করিতে পারে না। আর উহাকে মোহও বলা যায় না, কারণ মন তখন ভগবানকে পাইয়া এরূপ বিমল আনন্দ উপভোগ করে যে নামিয়া আসিলেও মন আর ভগবান ছাড়া কিছুই চায় না।

তিনি বলেন, বাজে চিন্তাই যত সর্ব্বনাশের কারণ ও যত অনিষ্টের সূত্রপাত করে। টের পাইলেই উহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনকে ভগবানে বিনিযোগ করা উচিত। প্রার্থনা কালে একটা সময় শুধু বাজে চিন্তা দূরীভূত করিবার জন্যই তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি একস্থলে এক ভুক্তভোগী বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন—"মন যখন ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে থাকে, তখন উহাকে দমন করা খুবই কঠিন ব্যাপার—আমাদের একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মন বিষয়ের দিকে প্রধাবিত হয়। কিন্তু তৎপ্রতিষেধের একমাত্র উপায়, ভগবানের নিকট কাতর ভাবে নীরবে প্রার্থনা করা—বেশী বাক্য প্রয়োগ করিবারও কোন প্রয়োজন নাই,—কারণ তাহাতে মন আরও বিক্ষিপ্ত হয় মাত্র। আর যদি সময় সময় মন ভগবান হইতে নিতান্তই সরিয়া যাইতে থাকে, তবে খুব দুঃখিত বা অস্থির হইও না—তাহাতে চঞ্চলতা বাড়িবে বই কমিবে না। এইরূপ ভাবে অনবরত চেষ্টা করিলে ভগবান নিশ্চয় তোমার প্রতি কৃপা পরবশ হইবেন।" ভাই লরেন্স বলেন, ধ্যানের সময় মনকে প্রশান্ত রাখিবার একটি প্রশস্ত উপায়—মনকে অন্যান্য সময়েও ভগবানের একটা ভাবে রাখা—মন যেন অন্যান্য সময়েও ভগবান হইতে বেশী দূরে চলিয়া না যায়। তাহা হইলেই প্রার্থনার সময়ও মন খুব সহজেই স্থির হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ) শ্রী—

কথা-প্রসঙ্গে

জাতীয় মহাসভা

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় মহাসভার চত্বারিংশ অধিবেশনে শ্রীমতী সরোজিনী দেবী সভানেত্রীর পদগৌরব লাভ করায় আমরা আনন্দিত। ভারতের মহিলাগণ কি ধর্ম্মে, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে, কি শিক্ষায় সর্ব্ব বিষয়ে অগ্রণী হইলে দেশের উন্নতি ব্যতীত অবনতি হইবে না,, আশাকরি, ইহা অনেকেই বিশ্বাস করেন। কেহ মনে করিতে পারেন রাজনীতিতে নারীর অভ্যুদয়ে সংসারের কি সুবিধা ও হিত হইবে ? জনকের ধর্ম্ম-মহাসভায় গার্গীর দ্বারা যদি ভারতের কিছু কল্যাণ হইয়া থাকে এবং তাঁহার নামোচ্চারণে আমাদের অতি বড় গোঁড়ারাও যদি গর্ব্বানুভব করিয়া থাকেন তবে বলিতে পারি—ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিতে ধর্ম্মের মত না হউক, রাজনীতি বা সমাজনীতির উহা হইতে কিছু অল্প আবশ্যকতাও আছে এবং তাহাতে কোন বিদুষী মহিলা অগ্রণী হইলে আমরা কেন না আনন্দিত হইব ?

জাতীয় শিক্ষাসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অভিনেত্রী বলিয়াছেন, "তরুণ সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য আমদের শিক্ষার আদর্শকে এমনভাবে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে যাহার মধ্যে আমাদের প্রাচ্য সভ্যতার সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্য জাতিদের দ্বারা উদ্ভাবিত শিল্পকলা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়।" স্বামী বিবেকানন্দ প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এই কথাই বলিয়াছিলেন। ইহা লইয়া দেশে ইতঃপূর্ব্বে অল্প বিস্তর আলোচনাও হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ কোন বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতি দেশকে দিতে পারেন নাই এবং দুঃখের বিষয় শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবীও দেন নাই। তবে তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে সামরিক শিক্ষাও জাতীয়-শিক্ষায় যাহাতে অঙ্গীভূত হয়। তিনি বলিয়াছেন, "ইহা কি সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখময় ও লজ্জাজনক অদৃষ্টের পরিহাস নয় যে,

যে জাতির বালকগণ মাতৃকোল হইতেই কুরুক্ষেত্র ও রাজপুত বীরত্বের মহিমার কথা শিক্ষালাভ করে, সেই জাতির বংশধরেরা তাহাদের নিজের গৃহ, নিজের মঠ মন্দির, নিজের পর্ব্বত ও সমুদ্র সীমাগুলি রক্ষা করিতে বিদেশীর শরণাগত হয়? বর্ব্বর মাসাই, আদিম জুলু, আরব, আফ্রিদী, গ্রীক, বুলগার সকলেই নিজের স্বাধীনতা অব্যাহত করিবার জন্য অস্ত্র-ধারণের অধিকার রাখে, কিন্তু আমরা—যাহাদের পূর্ব্বপুরুষ সর্ব্বপ্রথমে জগতের সভ্যতার দীপ জ্বালিয়াছিলেন, আজ সেই আমরা—আমাদের অধিকার হইতে বঞ্চিত। বাধ্য হইয়া আমরা কাপুরুষ হইয়াছি—আমাদের পৌরুষ সম্বন্ধে কেহ পরিহাস করিলে আমরা তাহার প্রত্যুত্তর দিতে পারি না—আমাদের গৃহ ও মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারি না।" নিয়ম-শৃঙ্খলা ও আজ্ঞানুবর্ত্তিতা ভারতীয় যুবকদের মধ্যে একান্ত অভাব। সামরিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে যুবকগণ একই নায়কের অধীনে একই উদ্দেশ্যে নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থ ও মত ত্যাগ করিয়া সমবেত শক্তিতে একযোগে কাজ করিতে শিক্ষা পাইবে—ইহা নিশ্চিত। কিন্তু এই সমস্ত সমরকুশল ছেলেদের সামলাইবে কে?—শ্রীমতী নাইডু অথবা সহৃদয় শাসনকর্ত্তা?

শ্রীমতী আরও বলিয়াছেন, "বর্ত্তমানে যে স্বেচ্ছাসেবক সংঘ আছে তাহাদ্বারাই কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। তাহারপর যাহাতে জাতি বাহিরের সকল প্রকার আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেকে অক্ষত রাখিতে পারে, তজ্জন্য নৌ-যুদ্ধ ও এরোপ্লেনে যুদ্ধ সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞানলাভ করিতে হইবে।" একটি জাতি যদি বাঁচিতে চায়, সম্পূর্ণ অখণ্ড জাতিতে পরিণত হইবার ইচ্ছা পোষণ করে, তবে তাহাকে শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষাত্র ও ব্রাহ্মণ এই চতুর্ব্বিধ শক্তিতে শক্তিমান হইতে হইবে। ভারতের ক্ষাত্র-শক্তি সত্ত্বগুণের আবরণে মহা তমোগুণে পরিণত হইয়াছিল এবং যে সময় মহাত্মা গন্ধীর অহিংসানীতি অবলম্বনে তাহাই পুনরায় অনুষ্ঠিত হইবার আশঙ্কা হইতেছিল সেই সময় দেশকে এই দুর্ব্বলতা বর্দ্ধক নীতি-বাদ হইতে মুক্ত করিবার জন্য শ্রীমতী নাইডুর প্রচেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়—সন্দেহ নাই।

তাহার পর সভানেত্রী হিন্দু মুসলমানের একতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, হিন্দু মুসলমান যদি পরস্পর পরস্পরের মত সহ্য করিবার চেষ্টা করে, যদি কেহ কাহারও উপাসনায় বা জীবন-যাপন পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ না করে, একে অপরের ধর্ম্ম বিহিত আচার ও বলি প্রদানে বাধা না দেয়, যদি পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মের নিহিত সৌন্দর্য্য এবং সভ্যতার মহত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করে, যদি উভয় সম্প্রদায়ের নারীগণ সখ্য বন্ধনে আবদ্ধা হইয়া স্ব স্ব সন্তানগণকে উভয়ের মাধুর্য্যের মধ্যে গড়িয়া তোলে, তাহা হইলে আমাদের বাসনা পূরণ হইতে আর কয় দিন!" আমরাও বহুদিন হইতে বলিতেছি এবং এখনও বলি,—যদি হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্ম নিহিত সত্য ও মহত্ত্ব বুঝিতে পারে তবে এই দ্বেষ-দ্বন্দ্ব দূরীভূত হইতে কয় দিন? কিন্তু প্যাক্ট (Pact) বা জন সভায় তর্ক বিতর্কের দ্বারা এই মিলনের সুধা কখনও উঠিবে না, বরং গরলই উঠিবে। ইহার জন্য চাই উভয় জাতির মধ্যে ব্যক্তিগত ত্যাগ, তপস্যা ও সাধনা, তবেই এই চরম সত্য একদিন অনুভূত হইবে এবং সেই ব্যক্তিগত অনুভূতি ক্রমে সমষ্টিগতভাবে উভয় জাতির অন্তরে অনুপ্রাণিত হইয়া পরস্পরের বাহ্যিক ভেদ ও আচার বিচার স্বীকার করিয়াও এক মহাসমন্বয় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মাধুকরী

সাহিত্য ও সত্য

ফটোগ্রাফ তোলা একজন আর্টিষ্টের প্রশংসনীয় গুণ নহে। স্বহস্তে নিজের মনের ভাব প্রতিবিম্বিত করিয়া যে চিত্র অঙ্কিত করা হয় তাহার দ্বারাই আর্টিষ্টের কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। সেইরূপ Realistic Art এর সাহায্যে হুবহু সমাজের চিত্র অঙ্কিত করা কবির প্রকৃত বাহাদুরী নহে। সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার কোন প্রবন্ধের একস্থানে বলিয়াছেন, কোনও বন্ধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,

"মহাশয়, অমুকস্থানে এই এই-রূপ একটা লোমহর্ষণ ঘটনা ঘটিয়াছে, আপনি তাহা অবলম্বনে খুব বড় একখানি উপন্যাস রচনা করুন।" শরৎবাবু বলিলেন, তাঁহার সৃষ্ট প্রত্যেকটি চরিত্র তাঁহার অন্তরের রক্ত মাংস দিয়া গড়া, সেই জন্যই তাহা কাব্যের সার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। ধার করা লোক চরিত্র বর্ণনা দ্বারা কাব্য রচনা হয় না। তাহা হইলে Law Report এ বর্ণিত অনেক মোকদ্দমার ইতিবৃত্ত ও লোক চরিত্র অবলম্বনে কত কাব্য নাটক রচিত হইতে পারিত। কবি স্বাভাবিক ঘটনা ও স্বাভাবিক নরনারী অবলম্বনে কাব্য রচনা করিবেন সত্য, কিন্তু তাঁহার সহজাত আর্ট বা প্রতিভা দ্বারা সেই স্বভাব হইতে কাব্যের উপযুক্ত সৌন্দর্য্যটুকু ছাঁকিয়া লইবেন। এখানেই অপর সাধারণ লোক হইতে কবির বিশেষত্ব। * * *

আজকাল বঙ্গসাহিত্যে বাস্তবতার (Realism) দিকে মস্ত ঝোঁক পড়িয়াছে, এবং সেই বাস্তবতার নামে কুৎসিত লজ্জাবজনক বিষয় সাহিত্যে প্রসার লাভ করিতেছে। এই সকল সাহিত্যিক আপনাদিগকে নব্য তন্ত্রের সাহিত্যিক বলিয়া পরিচয় দিয়া ... প্রাচীনপন্থী সমাজ ... যে সকল ব্যাপার সুনীতির অনুরোধে চাপা দিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহারা সত্যের অনুরোধে সেগুলিকে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ইহাদের পরিবেশে সমাজের উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না। নব্য তন্ত্রের এই দাবী কতদূর সমীচীন একবার দেখা যাক্।

ইহারা যাহাকে "সত্য" বলেন, তাহার নাম "Platonic love" অর্থাৎ মানস প্রেম। তুমি এক জনকে মনে মনে ভাল বাসিলে, কিন্তু তাহাকে তাহা জানিতে না দিয়া মনের আগুন মনেই চাপিয়া রাখিলে, পরে কোন বিশেষ ঘটনা দ্বারা তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। ইহ দ্বারা গল্প উপন্যাসে বেশ একটা ট্রাজেডীর সৃষ্টি হয়। ইহার মধ্যে সমাজ নীতি বা মোরালিটীর প্রকাশ্যভাবে কোন বিরুদ্ধাচরণ নাই। আমার "ধ্রুবতারা"র নায়ক উপেন ইহার নাম দিয়াছিল "আধ্যাত্মিক-প্রেম।" শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্রের রচিত "বড় দিদি"র মাধবীর প্রেম, "পল্লীচরিত্রের" রমা ও রমেশের প্রেম, "দেবদাসের" নায়িকা পার্ব্বতীর প্রেম, "স্বামী"র

নায়িকা সৌদামিনীর প্রেম, রবীন্দ্রনাথের "নষ্ট নীড়ের" নায়িকা চারুর প্রেম দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

"ধ্রুবতারা"য় এই জাতীয় প্রেমকে বিদ্রূপ করার জন্য loveএর এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে যথা—"Physical love," "Intellectual love" এবং "Spiritual love" বা আধ্যাত্মিক প্রেম। যাহা হউক "Platonic love" বা মানসপ্রেমটা নব্যতন্ত্রের সাহিত্যিকগণের (আমি নিজেও কতকটা সেই দলের) বিলাত হইতে ধার করা সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ। ইহা বাঙ্গালী সমাজের মধ্যে সত্য বা বাস্তবচিত্র নহে, প্রাচীন সাহিত্যিকগণ ইহার খোঁজ খবরও রাখিতেন না। প্রাচীন সাহিত্যিকগণ যে সমাজের চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাতে এরূপ কপটতা ছিল না। দেবদাস উপন্যাসের নায়ক পার্ব্বতীর স্বামী, পার্ব্বতীকে দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিয়া তাহার সঙ্গে ঘরকন্না করিতেছে। সে বেচারা স্বপ্নেও ভাবে নাই যে তাহার স্ত্রী সেই দীর্ঘ দশ বৎসরকাল অন্য একটি পুরুষকে ধ্যান করিয়া আসিতেছে। ইহা প্রকৃত বঙ্গীয় সমাজের চিত্র নহে। বঙ্গ সমাজের নারী শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের ধর্ম্মপত্নী হইয়াও যখন প্রতাপকে ভুলিতে পারিল না, তখন তাহাকে লাভ করিবার জন্য গৃহত্যাগ করিল। তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সমাজে সকল প্রকার লোকই আছে। স্বামী লইয়া প্রকাশ্যভাবে ঘরকন্না করিতেছে অথচ পরপুরুষের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত, সমাজে এরূপ চরিত্রেরও অভাব নাই। কিন্তু নব্য লেখকগণ যে বলিতে চান এটা আমাদের বাঙ্গালী সমাজেরই একচেটিয়া ব্যাপার, তাহার কোন কারণ নাই। এরূপ মিথ্যাচরণ সকল সমাজেই আছে। প্রাচীন সাহিত্যিকগণ ইহাকে কখনও চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন নাই। প্লটের প্রয়োজনানুসারে এরূপ চরিত্র যথেষ্ট অঙ্কিত করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের রোহিণী ও গোবিন্দলালের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তবে বাস্তবের অনুরোধে যদি তাঁহারা কেবলই জঘন্য চরিত্র অঙ্কিত করিতেন, তবে তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ Realistic novel হইত, কিন্তু সৎ-সাহিত্য হইত না।

নব্যতন্ত্র সাহিত্যিকগণের মুখপাত্র শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার মুন্সীগঞ্জের অভিভাষণে এই প্রসঙ্গে একটা গুরুতর কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "একনিষ্ঠ প্রেমের মর্য্যাদা নবীন সাহিত্যিকগণ বোঝে, এর প্রতি তার সম্মান ও শ্রদ্ধার অবধি নাই, কিন্তু সে সইতে যা পারে না, সে এর নাম করে ফাঁকি। তার মনে হয়, এই ফাঁকির ফাঁক দিয়েই ভবিষ্যৎ বংশধরেরা, যে অসত্য তাদের আত্মায় সংক্রামিত করে নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সেই তাদের সমস্ত জীবন ধরে ভীরু, কপট, নিষ্ঠুর ও মিথ্যাচারী করে তোলে। সুবিধা ও প্রয়োজনের অনুরোধে সংসারে অনেক মিথ্যাকেই হয় ত সত্য বলে চালাতে হয়, কিন্তু সেই অজুহাতে জাতির সাহিত্যকেও কলুষিত করে তোলার মত পাপ অল্পই আছে। সাক্ষাৎ প্রয়োজন নাই থাক, সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডি হতে একে মুক্তি দিতেই হবে।"

শরৎ বাবুর উক্তি কথার মার প্যাঁচ হইতে মুক্ত করিয়া সাধু ভাষায় প্রকাশ করিলে এইরূপ দাঁড়ায় :—

(১) বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ বংশধরেরা ভীরু, কপট, নিষ্ঠুর ও মিথ্যাচারী হইয়া দাঁড়াইতেছে।

(২) তাহার কারণ তাহাদের জন্মকালে তাহাদের আত্মায় মিথ্যা সংক্রামিত হইতেছে। সে কিরূপে? না, বাঙ্গালীর একনিষ্ঠ প্রেমটা কেবলই ফাঁকি—নব্য যুবকেরা সেই ফাঁকির ফাঁক দিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে!

(৩) জাতীয় জীবনের এই কলুষ দ্বারা বাঙ্গালীর সাহিত্যও যদি কলুষিত হয়, তবে তাহার চেয়ে পাপ আর নাই।

(৪) সাহিত্যকে এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডি অর্থাৎ একনিষ্ঠ প্রেমের নামে ব্যভিচার হইতে মুক্তি দিতেই হইবে।

বন্ধুবর শরৎচন্দ্র প্রধানতঃ নব্য যুবকদিগকে উদ্দেশ করিয়াই তাঁহার প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা সেই প্রবন্ধেই প্রকাশ। সভাস্থলেও নব্য যুবকদিগের সংখ্যাই খুব বেশী ছিল। তাহারা তাঁহার প্রবন্ধ শুনিয়া খুব হাততালিও দিয়াছিল। অথচ শরৎচন্দ্র এই সকল নবীন যুবক-

দিগকেই এইরূপে এক সাপটা গালি দিতেছেন—যেমন তাহারা "ভীরু, কপট, নিষ্ঠুর ও মিথ্যাচারী।" কেবল ইহাই নহে; তাহারা একনিষ্ঠ প্রেমের ফাঁকির ফাঁক দিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে; অর্থাৎ ব্যভিচারের মধ্যে তাহাদের জন্ম। শরৎ বাবুর ন্যায় একজন স্বদেশ প্রেমিক সাহিত্যিক যে এরূপ সেকেলে বৃত্তি অবলম্বন করিবেন ইহা আমি আদৌ বিশ্বাস করিতে পারি না। খুব সম্ভব তাঁহার এই সকল কথার অন্য অর্থ আছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। হয় ত তাঁহার সেই নব্য যুবক শ্রোতৃবৃন্দই তাঁহার কথার অর্থ ঠিক বুঝিয়াছিলেন। আমার সে কথা লইয়া আর মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। আমি দেখিতে চাই, শরৎ বাবুর কথিত একনিষ্ঠ প্রেমের ফাঁকি দ্বারা আমাদের জাতীয় সাহিত্য কলুষিত হইতেছে কি না।

যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যায় যে আমাদের সমাজে এক-নিষ্ঠ প্রেমের নামে ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তখন একজন সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য কি হইবে? তিনি কি সমাজের সেই যথাযথ চিত্রই অঙ্কিত করিবেন? তাহা হইলে সে সাহিত্য বাস্তব সাহিত্য হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সকল ন্যক্কার জনক চিত্রের দ্বারা বাণী মন্দির কলুষিত হইবে না কি? অসত্যের দ্বারা সাহিত্য ততদূর কলুষিত হয় না, যতদূর এইরূপ তথাকথিত সত্যের দ্বারা কলুষিত হয়।

তর্কের খাতিরে ধরিয়া হইলাম, আমাদের সমাজে একনিষ্ঠ প্রেমের মুখস পরিয়া ব্যভিচার চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু মানুষ কি কেবল সেই মিথ্যা ও কপটতা লইয়াই বাঁচিতে পারে? সে চায় সেই মিথ্যার কলুষ হইতে মুক্ত হইতে। তাহাকে একমাত্র সাহিত্যই সেই মুক্তি দিতে পারে। কিন্তু মানুষ ঘরে যাহা দেখে সাহিত্যেও যদি তাহাই দেখে তবে সে কোথায় যাইয়া প্রাণ জুড়াইবে? সেইজন্য সাহিত্যে এরূপ জিনিষ থাকা আবশ্যক যাহা তাহাকে সেই ঘরের পাপচিত্র ভুলাইয়া দিতে পারে; যাহা তাহার সম্মুখে একটা উচ্চ আদর্শ ধরিয়া তাহাকে সেই কলুষের হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারে। এই জন্যই প্রাচীন কবিগণ

বেহুলা, ফুল্লরা প্রভৃতি আদর্শ নারীর চিত্র অঙ্কিত করিয়া বাঙ্গালী রমণীকে একনিষ্ঠ প্রেম শিক্ষা দিয়াছিলেন। প্রাচীন তন্ত্রের সাহিত্যিকগণ সমাজে ব্যভিচারের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করিয়া সেই ব্যভিচারের প্রতি পাঠকের ঘৃণা উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। নব্যতন্ত্রের সাহিত্যিকগণ সত্য প্রচারের অজুহতে ব্যভিচারকে মনোরম করিয়া অঙ্কিত করিয়া, ব্যভিচারীর প্রতি পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাহার ফলে সাহিত্যে ও সমাজে কলুষের বৃদ্ধি হইতেছে।

মনুষ্য জীবনে স্বভাবের নিয়মে পরকীয় প্রেমে আসক্ত হওয়া যেমন সত্য, সেইরূপ আত্মার বলে বলীয়ান হইয়া সেই প্রলোভনকে জয় করাও সত্য। গোবিন্দলালের রোহিণীর প্রেমে আসক্ত হওয়া যেমন সত্য, সেইরূপ প্রতাপের শৈবলিনীর প্রেম জয় করিয়া তাহার ও চন্দ্রশেখরের হিতার্থে যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন দেওয়াও সত্য। প্রথমোক্ত সত্যের সহিত কেবল সৌন্দর্য্যের মিশ্রণ আছে ; কিন্তু শেষোক্ত সত্যের সহিত সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলের যোগ আছে। যে সাহিত্যিক কেবল সত্য ও সুন্দরকে অবলম্বন না করিয়া, তাহার সহিত মঙ্গলকে বরণ করিবেন, তাঁহার সাহিত্য চেষ্টাই অধিকতর সফলতা লাভ করিবে। এই প্রসঙ্গে Mr. Winchesterএর কথা উদ্ধৃত করিতেছি ;—

সকল সম্প্রদায়ের সমালোচকই বলেন, সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতা নির্ভর করে সত্যের উপর, অর্থাৎ স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ করিয়া মানব চরিত্র অঙ্কনের উপর। কিন্তু মানুষের নৈতিক জীবনও ত সেই স্বাভাবিক নিয়মের অন্তর্গত এবং অন্যান্য বাস্তব পদার্থের ন্যায় ইহাও একটি বাস্তব পদার্থ। কেবল তাহাই নহে ;—সাহিত্যে নৈতিক জীবনের প্রয়োজনীয়তাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কারণ মানব চরিত্রের মূলে নৈতিক অনুভূতি বিদ্যমান, মানুষের কর্ম্মচেষ্টার মূলে নৈতিক শাসন ; মানুষের কর্ত্তব্যজ্ঞান সকল চেষ্টার উপরে আধিপত্য করে। তাহার শাসন অমান্য করিলে মানুষের অনুভবশক্তি জড়তাপ্রাপ্ত হয়, কর্ম্মের প্রেরণা দুর্ব্বল হয়, সর্ব্বপ্রকার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ক্ষীণ হয়, এবং অবশেষে মানুষ ধ্বংসের মুখে পতিত

হয়। এগুলিও বাস্তব সত্য, সুতরাং সাহিত্যিক এগুলিও মানিয়া চলিতে বাধ্য।

(মানসী ও মর্ম্মবাণী—পৌষ, ১৩৩২) শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

দুঃখানন্দ

দুঃখের গভীর ব্যথা এ চিত্তে আমার
আজি কেন পরিপূর্ণ হর্ষ-পারাবার!
সম্মুখে মানুষ যায়—হাসে, গলাগলি,
বিবাহ-সানাই শুনি, শিশুর কাকলি,
বন্ধুজন-হাসাহাসি, উচ্চ আলাপন।
আমি স্তব্ধ বসে' রই, একান্ত আপন
একান্ত নিবদ্ধ হয়ে উঠিছে ঘনায়ে
মোর ব্যথা বক্ষে মোর, আলোকে বা বায়ে
ঘটেনি প্রকাশ তার; নাহি কোনো নর
সে-বেদনা যেচে নিয়ে করে লঘুতর।
আমার বেদনা তার গর্ভে মধু দেওয়া;
গরলে অমৃত রচে,—কাঁটা-ঘেরা কেয়া!
দৈন্যে দুঃখে জাগা মোর যত অশ্রুজল
অন্তরে সঞ্চিয়া ঢালে নির্ঝর শীতল।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত।

সৎকথা

(লাটুমহারাজের উপদেশ)

১। মানুষ বিয়ে ক'রে একেবারে বশীভূত হ'য়ে পড়ে। স্ত্রীকে কি ক'রে সন্তুষ্ট রাখবে এই চেষ্টায় ব্যস্ত! বাপ, মা, ভাই, বন্ধু-সব পর হ'য়ে যায়; সকলের কাছ হ'তে তফাৎ হ'য়ে যায়।—দেখ, একবার মায়ার ব্যাপার! মা—গর্ভধারিণী, সেও পর হ'য়ে যায়। আবার দেখ—বড় বড় চাকুরে, দু-পাঁচ হাজার টাকা মাহিনা পায়, যুদ্ধের সময় দশ—পনর হাজার লোকের নেতা হয়—হয়তো একেবারে স্ত্রীর গোলাম। স্ত্রীর কথার উপর কথা ব'ল্‌তে পারে না—তার কাছে গেলেই যেন সব বিদ্যা-বুদ্ধি চাপা প'ড়ে যায়। কি মোহিনীশক্তি, দেখ! তবে সকলেই কি অমন হয়? এমন সংযমী-পুরুষও আছে যে কখনও স্ত্রীর মোহে পড়ে না। স্ত্রী তার উপরে কর্ত্তৃত্ব ক'র্‌তে পারে না। স্ত্রীকে ভালবাস্‌তে হবে ব'লে কি তার গোলাম হয়ে যেতে হবে? ভালবাসা একটা—জিনিষ আর, গোলাম হয়ে যাওয়া আর একটা—জিনিস। যারা যত বেশী ইন্দ্রিয়পরায়ণ তারা তত স্ত্রীর বশ হ'য়ে যায়।

২। তাঁকে 'ডাকা' বৃথা যায় না। তাঁকে ডাক্‌লে তিনি একটা—না—একটা সুবিধা ক'রেই দেবেন। তোমার কষ্ট হ'চ্ছে, তাঁকে জানাও; তাঁকে জানাবে না তো, আর কা'কে জানাবে?—সমস্ত লোককে ব'লে বেড়ানর চে'য়ে তাঁকে বলাই ঠিক্।

৩। আমাদের মন বেশীর ভাগই বিষয়মুখী (বহির্মুখী) তাই এত ক্লেশ পেয়ে থাকি। আমরা কষ্টের ধ্যান করি ব'লে এত দুঃখ পাই। আমাদের মন সর্ব্বদাই ধন জন স্ত্রী পুত্রাদির বিষয়ে সর্ব্বদাই মগ্ন থাকে। এই সব বিষয় নিয়ত ধ্যান (চিন্তা) ক'রে ক'রে এমন একটা সংস্কার জন্মেছে যে সেই মলিন মন কিছুতেই উঁচু ধাপে আর উঠ্‌তে পাচ্ছে না, যদিও ক্ষণেকের জন্য একটু উঠে কিন্তু শীঘ্র আবার পড়ে যায়, যেমন শ্রীশ্রীপরমহংসদেব উপমা দিতেন, বেজীর ল্যাজে যদি কেউ

দড়ির সঙ্গে আধলা ইট বেঁধে দেয়। বেঙ্গী পাচিলের গর্ত্তে উঠে খানিক পরে ধুপ করে নীচে পড়ে যায়, ঐ আধলা ইটের টান পড়ে বলে। তেমি সংসারী জীবের বিষয়ে বেশী টান বলে, ঐ বেঙ্গীর মত নীচে পড়ে যায়, কিন্তু ঐ টান, ঐ ভালবাসা জিনিষটা ভগবানের উপর ফেল্‌তে পাল্লেই উহা প্রেম হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু জীব তার হৃদয়ের ঐ টান ভালবাসা কাম-কাঞ্চনরূপ আস্তাকুড়ে ফেলে রেখেছে। ইহাও তাঁরই মায়া। মায়ার নেশার ঘোর এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব জীবকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাঁর দয়া হলে তবে জীবের এই নেশার অবস্থা দূর হয়, কিন্তু তাঁর কৃপা হয় কার উপর? তিনি সর্ব্বদা তোমার মঙ্গলের জন্য ভাবছেন, কিন্তু তোমার প্রাণ কি তাঁর করুণা পাবার জন্য লালায়িত হয়েছে? যেদিন তোমার মন সংসারের আঘাত খেয়ে খেয়ে 'হে ঠাকুর তোমার করুণা বিনা প্রাণ আর বাঁচে না', এই বলে কাতর প্রাণে কেঁদে তাঁর চরণে শরণাগত হবে, এক পাও তাঁর দিকে এগুবে, সেই সময় বুঝ্‌তে পার্‌বে যে তিনি তোমাকে কৃপা কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে একশো হাত তোমার দিকে এগিয়ে এসেছেন। তাঁর কৃপা পাবার উপায় হচ্ছে কেবল চোখের জল। সে কি ছেলের হাতের মোয়া যে ভুলিয়ে খাবে! সংসারের বিষয়ের জন্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত মনের টান (ভালবাসা) রয়েছে, ততক্ষণ মুখে শুধু 'কৃপা কর, প্রভু', এই কথা বল্‌লে কি তাঁর আসন টল্‌বে? এই কপটভাব ভণ্ডামী যে দিন চলে যাবে, আর সরলপ্রাণে ভগবানের নিকট কেঁদে কেঁদে নিজের দুঃখ জানাতে পার্‌বে, সেইদিন মন অন্তর্মুখী ভগবৎমুখী) হয়েছে এইটা বেশ অনুভব কর্‌তে পার্‌বে। মনটা মায়ার নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে বাহিরে বাহিরে সর্ব্বদা ঘুরে বেড়ায় বলে, এত চোট খায়, এত দুঃখ কষ্ট পায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মন এত দুঃখ কষ্টের ধাক্কা খেয়েও আবার সেই দুঃখের খনি স্বরূপ কাম-কাঞ্চনের বিষয়ই ধ্যান করে। ঠাকুর বলিতেন যে, 'মন গরীবের কি দোষ আছে', শ্যামা মা তাঁরে আখি ঠেরে দিয়েছে যে তুই সাধ মিটিয়ে খুব ভোগ করে নে।

(ক্রমশঃ)

সমালোচনা

সাধক কমলাকান্ত—শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৩৲ টাকা। গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত অতুলবাবু বাংলা দেশের ও বাংলা সাহিত্যের একটি দীর্ঘ অনুভূত অভাব মোচন করিয়াছেন। বাংলা-দেশে বৈষ্ণব সাহিত্য যেরূপ ব্যাপকভাবে আলোচিত ও অনুসৃত হইয়াছে সিদ্ধ-কবি রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের সংগীতের তদ্রূপ বিশেষভাবে আলোচনা না করিয়া বঙ্গের আধুনিক সাহিত্যিকগণ অবিচার করিয়াছেন। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনায় তাঁহার বিরাট গ্রন্থ পূর্ণ করিয়া কবি কমলাকান্তের জন্য দয়া করিয়া একটুখানি স্থান ছাড়িয়া দিয়াছেন। পরলোকগত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ 'সাধক-সংগীত' মধ্যে কমলাকান্তের কতকগুলি গান সন্নিবেশ করিলেও তাহাতে সাধক জীবনের কোন আলোচনা করেন নাই। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ—বৈষ্ণবকাব্যের মধুর ভাব ও আদি রসের প্রভাবে নব্য-সভ্য বাঙ্গালা এত অভিভূত যে আজ পর্য্যন্ত সে বিশুদ্ধ মাতৃভাবের রস উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। বৈষ্ণব ধর্ম্মের ক্রমাবনত সহজিয়া ধর্ম্ম বাংলার নগরে পল্লিতে, আনাচে কানাচে এত বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে তাহার ঘোর কথঞ্চিৎ কাটাইয়া আধুনিক সাহিত্যিকগণ আজও শক্তি সাধকের জনমনপাবনী সংগীত-রসাস্বাদের সৌভাগ্য লাভ করেন নাই।

শ্রীযুক্ত অতুলবাবু বাংলা সাহিত্যের এই অভাব আজ দূর করিয়াছেন। এই পুস্তক প্রণয়নে তিনি দীর্ঘ ছয় বৎসর যে কঠোর পরিশ্রম, পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান ও একনিষ্ঠ সাহিত্য সাধনার পরিচয় দিয়াছেন—তাহা প্রশংসনীয়। তাঁহার এই পরিশ্রম সর্ব্বতোভাবে সার্থক হইয়াছে। সাধকের জীবনী, নানা বিষয়ক সংগীত, প্রত্যেক সংগীতের সহিত সুরসংযোগে, স্বরচিত পুঁথি, বিভিন্ন লেখকের পূর্ব্ব প্রকাশিত

প্রবন্ধ নিচয় ও কয়েকটি উৎকৃষ্ট ছবি সন্নিবেশ করিয়া গ্রন্থকার পুস্তকটি যতদূর সাধ্য নিখুঁত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অনেকের ধারণা সাধক কমলাকান্ত কেবল শ্যামা-সংগীত রচনা করিতেন, কিন্তু এই পুস্তক পাঠ করিলে সাধারণের সে ভ্রম দূর হইবে। বৈষ্ণব কবিগণের ন্যায় তিনিও যে একজন উৎকৃষ্ট পদাবলী রচয়িতা তাহা দেখাইবার জন্য আমরা গৌর-প্রেম বিষয়ক তাঁহার একটি সংগীত উদ্ধৃত করিলাম।

আমার গৌর নাচেরে নাচে হরিনাম
সংকীর্ত্তন রস প্রকাশে
হরি হরি বলি, দেয় করতালি, কলি
কলুষ নাশে ॥
তড়িত পুঞ্জ জড়িত কায়, শরত ইন্দু বদন তায়,
একি আনন্দ ভকতবৃন্দ মগন প্রেম পাশে।
ক্ষণে অচেতন অবশ অঙ্গ, ক্ষণে পুলকিত ভকত সঙ্গ
রাধা পুনরাধ্য ভাব প্রসঙ্গ প্রকট সুখ বিলাসে।
নব কি নবকরে করঙ্গ, দণ্ডপাণি একি তরঙ্গ,
কমলাকান্ত হেরি অনন্ত মিনতি ভকত আশে।

শক্তি সাধক কমলাকান্ত রচিত কৃষ্ণ-প্রেম ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক মধুর ভক্তিভাবোদ্দীপক গীতাবলী সাধক-হৃদয়ের মহান উদারতার পরিচয় দেয়। এইরূপ উদারতা বৈষ্ণব কবির মধ্যে দৃষ্ট হয় না ; কোনো বৈষ্ণব কবি শ্যামাসংগীত রচনা করিযাছেন এরূপ প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সিদ্ধ সাধক কমলাকান্তের এই উদারতা তাঁহার পরবর্ত্তী কালে মহা ধর্ম্মসমন্বয়ের সূচনাস্বরূপ বলিযা আমাদের মনে হয়। গ্রন্থকারও লিখিতেছেন—"শাক্ত ও বৈষ্ণবের মধ্যে আজ যেন একটি মিলনের ভাব ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে,—এই মিলনের ফলে তোমার ও প্রসাদের জ্যোতিঃ উজ্জ্বলতর, এবার তোমাদের রূপ আরও মনোহর মনে হইতেছে, তোমরা যেন ফিরিয়া আসিয়াছ। * * আবার তোমরা আসিয়াছ, তোমাদের ভাব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত, তাই তিনি আজ বিশ্ব-

মানবের গুরু, সকল ধর্ম্মের যথার্থ সমন্বয় কর্ত্তা তিনি। ঐ সপ্ত সিন্ধু উল্লঙ্ঘন করিয়া তোমাদের তিনের সেই মহাবাণী শিব-কল্প স্বামী বিবেকানন্দ প্রতীচ্য জগতের নরনারীকে শুনাইয়া আসিয়াছেন। হে মহাসাধক, মাতৃনামের মহা সংগীতের কি মহান অধিকারেই তোমরা আমাদের অধিকারী করিয়াছ। কি মহান্ অতীত আমাদের পশ্চাতে, কি বিরাট ভবিষ্যৎ আমাদের সম্মুখে!"

মীমাংসা

(ক)

গত মাসের উদ্বোধনে প্রকাশিত প্রশ্ন দুইটির উত্তর :—

১। একটি বিরাট ভারতীয় জাতি গড়িয়া তুলিতে হইলে হিন্দু মুসলমানে স্থায়ী মিলন অত্যাবশ্যক। জাতীয়তা হিসাবে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান শ্রেষ্ঠ ও সবল। সবলে ও দুর্ব্বলে, শ্রেষ্ঠে ও নিকৃষ্টে স্থায়ী মিলন সহজ ও সম্ভব নয়। হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজ বহুধা বিভক্ত এজন্য হিন্দুরা ঐক্যহীন ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুর্ব্বল জাত। 'যত মত তত পথ' রূপ মতবাদের ভিত্তির উপর ভারতের জাতীয়তা গড়িয়া তুলিতে পারিলে হিন্দুর বহুধা বিভক্ত ধর্ম্ম ও সমাজের মধ্যে ঐক্যের সৃষ্টি সাধন করিয়া জাতি হিসাবে হিন্দুকে যেমন একদিকে সবল ও পুষ্ট করিয়া তুলিবে, অপর দিকে তেমনই আবার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পরস্পরের ধর্ম্মের গোঁড়ামী বিদূরিত করিয়া তাহাদের মধ্যে স্থায়ী মিলনের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিবে। ভারতীয় বিরাট জাতিরূপ পক্ষীর হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পক্ষ; দুইটি পক্ষ সম্পুষ্ট না হইলে জাতির পূর্ণাঙ্গ হইবে না।

২। গভর্ণমেন্টের সাহায্যের প্রত্যাশা না করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের নরনারীকে শিক্ষিত করিতে হইলে প্রথমতঃ দেশীয় ভাষায়

শিক্ষার প্রচলন করিতে হইবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পল্লি অঞ্চলে স্থাপিত হওয়া উচিত। দেশের শতকরা ৯৪ জন লোক পল্লিবাসী। পল্লি অঞ্চলে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা ও তাহাতে বিদ্যালাভ করা খুব অল্প ব্যয় সাধ্য। বিদ্যালয়ে চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ইত্যাদি ব্যয়বহুল আসবাব পত্রের পরিবর্ত্তে মাদুর, পাটি প্রভৃতি প্রচলন করা উচিত। গৃহাদিও যথাসম্ভব কম করিয়া গাছতলায় বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। এ দরিদ্র দেশে যত অল্প ব্যয়ে শিক্ষালাভের বন্দোবস্ত করা যায়, তত অল্প সময়ে দেশের নরনারী শিক্ষিত হইতে পারে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ প্রামাণিক

(খ)

১। হিন্দুর গুরু পুরোহিত ও মুসলমানের মোল্লা মৌলবী এই উভয় সম্প্রদায়ের মিলন হইলেই মনে হয় যে সমগ্র হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মিলন হইবে।

২। যদি ছাত্র ছাত্রীর বিদ্যালয়ের বেতন টাকা না হইয়া ধান্য বা বস্ত্র বা কোনরূপ শিল্প সামগ্রী বা কৃষিজাত কোনও ফসল হয় তাহা হইলে নিরক্ষর সমস্যার সমাধান হইতে পারে এইরূপ মনে হয়।

শ্রীবিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়

সংঘ বার্ত্তা

১। বিগত ২২ শে পৌষ বুধবার কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের ও পূজ্যপাদ স্বামিজীর বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তাহা ছাড়া ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণসেবা, ভজন, কীর্ত্তন, 'বীরবাণী' হইতে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও প্রতিযোগী বালকগণকে পদক পুরস্কার, এবং শ্রীশ্রীস্বামিজীর অপূর্ব্ব মহিমান্বিত জীবন—মানবকল্যাণে তাঁহার অসাধারণ কর্ম্মানুষ্ঠান, জ্বালাময়ী

স্বদেশপ্রেম, সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মহত্ত্বে তাঁহার অটলশ্রদ্ধা ও জগতের সর্ব্বত্র বীরদর্পে উহা প্রচার, সকল জাতির সকল বর্ণের অধঃপতিত দরিদ্র দুর্ব্বল পাপীতাপীর উপর তাঁহার গভীর সমবেদনা, ভারতের যুবক-শক্তির উদ্বোধন এবং তৎপ্রতি স্বামিজীর ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা সম্বন্ধে বক্তাগণের ওজস্বিনী বক্তৃতা উৎসবের আনন্দ অধিকতর বর্দ্ধন করিয়াছিল।

বেলুড় মঠ ব্যতীত প্রয়াগ, কাশী, কনখল (হরিদ্বার), মান্দ্রাজ, বাঙ্গালোর (মহীশূর , বম্বাই, ঢাকা, বালিয়াটি ঢাকা), রাজসাহী, রামকৃষ্ণ-বেদান্ত-সমিতি কলিকাতা) প্রভৃতি বহুস্থানে পূজ্যপাদ স্বামিজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে দরিদ্র নারায়ণসেবা ও বক্তৃতাদি হইয়াছিল।

২। বিগত ১০ই পৌষ বেলুড় মঠে ভগবান যীশুখৃষ্টের লোকপাবন জীবন, ধর্ম্ম, শিক্ষা ও উপদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য একটি সাধারণ সভা আহূত হয়। যীশুর একখানি বৃহৎ তৈল-চিত্র নানারূপ পত্রপুষ্পে সুশোভিত হইয়া এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। উক্ত সভায় বাইবেল হইতে বালকগণের আবৃত্তি, ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় প্রবন্ধপাঠ, এবং সর্ব্বশেষে স্বামী ওঙ্কারানন্দের বক্তৃতা শ্রবণে উপস্থিত সকলে প্রভূত আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

গদাধর আশ্রম (ভবানীপুর—কলিকাতা) এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ঢাকা) হইতেও আমরা ঐরূপ খৃষ্টোৎসবের সংবাদ পাইয়াছি।

৩। স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম শিষ্য, আমেরিকার বোষ্টন এবং লাক্রেসেণ্টা আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ, সুবক্তা সুলেখক ও সুকবি স্বামী পরমানন্দ দীর্ঘ বিশ বৎসর যুক্ত-রাজ্যে বেদান্ত ধর্ম্মের সানাতনবাণী প্রচার করিয়া অধুনা কিছুদিনের জন্য ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে এক মিলন সূত্রে গাঁথিবার যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন তিনি তাঁহাদের অন্যতম একজন প্রধান-কর্ম্মী। স্বামিজীর সাধুতা, জ্ঞান-গরিমা ও বাগ্মিতা পাশ্চাত্যের বহু নরনারীকে এই আদর্শাভিমুখে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

স্বামী প্রেমানন্দের উপদেশ

আজ রবিবার, ৫ই মার্চ ইংরাজী ১৯১৮ সাল মিশনের সাধারণ বাৎসরিক সভা। বাগবাজার হইতে পূজনীয় শরৎ মহারাজ, সান্ন্যাল মহাশয় আসিয়াছেন; এবং অনেক গৃহস্থ মেম্বর, যথা—দুর্গাপদ বাবু, বাড়ুয্যে মহাশয়, কেদার বাবু, কাঞ্জিলাল প্রভৃতি অনেকেই আসিয়াছেন। বৈকালে Visitors' room এ সভা আরম্ভ হইল। শ্রীশ্রীমহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, শরৎ মহারাজ, খোকা মহারাজ প্রভৃতি মঠের সকল সাধু-ব্রহ্মচারী ও মিশনের গৃহী মেম্বরগণ সভাতে যোগদান করিয়াছেন। ঘরটি লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

মিশন সম্বন্ধে মেম্বরদের আলোচনা হইবার পর বাবুরাম মহারাজ সকলকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

বাবুরাম মহারাজ—হাতীর দু রকম দাঁত থাকে—একটা বাহিরে, আর একটা ভিতরে খাবার জন্য। আমাদের এই যে Missionary work ওটা হাতীর বাহিরের দাঁতের মতন। তোমরা সেবাশ্রমই কর, বা Famine work প্রভৃতি যা কিছু কর, ও সব কিছুই কিছু না, যদি তোমাদের চরিত্র না থাকে। চাই—চরিত্র, পবিত্রতা, একনিষ্ঠা। তবে কিছু হবে, তা না হলে কিছুই না। (গৃহস্থ মেম্বরদের লক্ষ্য করিয়া) শুধু মিশনের মেম্বর হলেই চলবে না—নিজের নিজের চরিত্র তৈরী করতে হবে। ভালবাসার দ্বারা জগৎকে আপনার করে নিতে হবে। তোমাদের নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ, পবিত্রতা দেখে লোকে শিখুক। অহংকার, অভিমান মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে, নিজেকে ভগবানের দাস মনে করে সেবা করতে হবে।

ঠাকুর যেমন নাম চাইতেন না, ঠিক তেমনি তাঁর নাম বেজে উঠছে। স্বামিজী ইদানীং বলতেন, 'ওরে, নাম যশে আমার ঘৃণা ধরে গেছে।' বলতেন—'প্রতিষ্ঠা শূকরী-বিষ্ঠা'। আপনারা সব চরিত্রবান হোন, মানুষ থেকে দেবতা হোন—তবেই জানবেন মিশনের কাজ ভাল-রূপে চলবে। আপনাদের কাছে এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। তার পর সভা ভঙ্গ হয়।

রাত্রে আহারাদির পর বাবুরাম মহারাজ গঙ্গার সম্মুখস্থ পূর্ব্ব দিকের নীচের বারাণ্ডায় বড় বেঞ্চির উপর বসিয়া আছেন। উত্তর দিকের পাশের লম্বা বড় বেঞ্চিতে কেদার বাবু, বাঁড়ুয্যে মহাশয়, ব্রহ্মচৈতন্য বসিয়া আছেন। আরও কয়েকটি সাধু-ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্ত এদিক ওদিক কেহ দাঁড়াইয়া কেহ বসিয়া আছেন।

বাবুরাম মহারাজ বলিলেন—সংসারে স্ত্রী, পুত্র, পরিবারে, কাম-কাঞ্চনে মন ছড়িয়ে আছে। মনকে গুটোতে না দেওয়াই হচ্ছে অবিদ্যার কাজ, কিন্তু আমাদের এই মনকে গুটিয়ে এক করতে হবে—মনকে এক করাই সাধন। সূতোর ফেঁসো থাকলে, মনের কোণে এতটুকু বাসনা থাকলে, মন ভগবানে তন্ময় হয় না। ধ্যান জপের সঙ্গে সঙ্গে মনের খুব বিচার চাই—মনের কোন্ কোণে বাসনা লুকিয়ে আছে, তাকে খুঁজে বার করতে হবে, তাকে তাড়াতে হবে। একেই বলে, "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্।" এইরূপে মনকে জয় করাই দরকার, মনকে জয় করতে পারলেই আত্মারাম হওয়া যায়—তাকেই মুনি বলে। শুধু জপ কচ্ছি বা প্রাণায়াম কচ্ছি—অথচ মনের অনন্ত বাসনা-গুলো তাড়াবার চেষ্টা কচ্ছি না, তাকে আরও ফুল চাপা দিয়ে ঢেকে রাখছি, তা করলে চলবে না।

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—উঃ, ঠাকুর আমাদের কতই দেখাচ্ছেন। আগে ঠাকুরের উৎসবে আজ কাল রাত্রে যেরূপ ভক্ত হচ্ছে, সেই রকম লোক হলে, খুব হলো মনে করতুম। (বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের দিকে চাহিয়া) আমরা মশাই ক্ষুদ্র বুদ্ধির লোক, অল্প আধার নিয়ে এসেছি, তাঁকে কি সব

ঠিক ঠিক বুঝতে পারতুম। ঠাকুরের কৃপায় এখন কিছু কিছু বুঝছি। জানেন তো, কত লোক তাঁর কাছে আসতো, কিন্তু কয়টা লোক তাঁকে বুঝতে পেরেছে? কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে, দেখছি লোকের আগ্রহ ততই তাঁর প্রতি বাড়ছে। ঠাকুর যখন এসেছেন, এটা সত্যযুগ বলে নিশ্চয়ই জানবেন।

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গে প্রচার কার্য্যে শ্রীশ্রীরাখাল মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে অমূল্য মহারাজ, বিশ্বরঞ্জন, গাইয়ে বিনোদ প্রভৃতি মঠের অনেক ব্রহ্মচারী সাধু গিয়াছিলেন। আজ কয়েকদিন হইল তাঁহারা সদলবলে মঠে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বাবুরাম মহারাজ—আমি মশাই, এবার ঢাকায় গিয়ে দিনরাত ভক্তদের নিয়ে বকর বকর করতুম। তাতেই বায়ু চড়ে গিয়ে রাত্রে ঘুম হতো না। ঠাকুরের কথা নিয়ে বলতুম—নিজের তো কিছুই ক্ষমতা নেই—তাঁর কথা, তাঁর ভাব নিয়েই তো বলতুম—তবুও রাত্রে ঘুম হতো না। ক্ষুদ্র আধার কি-না। আর ঠাকুর, তাঁর দেখেছি মুহুর্মুহু ভাব, মহাভাব, সমাধি হচ্ছে।

ঠাকুরের কাছে তাঁর সেবার জন্য কোনও অপবিত্র লোক থাকতে পারতো না—ঠাকুরের কৃপা না থাকলে আমি তাঁর কাছে কাছে থাকতে পারতুম না—এখন মনে করি—কি করেই যে ছিলুম। একটু কিছু উদ্রেক হলেই, অমনি সমাধিস্থ।

একদিন চৈতন্য লীলা দেখতে যাবেন, আমাকে বল্লেন,—"দ্যাখ্, যদি সেখানে সমাধিস্থ হয়ে যাই—লোকে সবাই আমায় দেখতে সব গোলমাল করে উঠবে। তুই আমার ঐ রকম হবার উপক্রম দেখলে, অন্য বিষয়ে খুব কথা টথা বলবি।" এই বলে তো আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। তারপর অভিনয় দেখতে দেখতে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সমাধিস্থ হলেন। আমি আবার নাম বলতে থাকি, তবে সমাধি ভাঙ্গে। এই রকম ভাব, মহাভাব, সমাধি হওয়াটাই তাঁর স্বাভাবিক। মনকে জোর করে তিনি নীচে নামিয়ে রাখতে চেষ্টা করতেন; আর আমরা অল্প আধার কিনা, কত সাধন

ভজন, তপস্যা করি ঐ একটু ভাব, সমাধি লাভ করবার জন্য। কেউ কেউ আবার একটু হতে না হতেই, লোকের কাছে দেখাতে থাকে।

(বাঁড়ুয্যে মহাশয়কে উদ্দেশ্য করিয়া) কিন্তু মশাই, আপনারা যাই বলুন শ্রীশ্রীমাকে দেখছি ঠাকুরের চেয়েও আধার বড়। তিনি শক্তি-স্বরূপিণী কি-না, তাঁর চাপবার ক্ষমতা কত! ঠাকুর চেষ্টা করেও পারতেন না, বাহিরে বেরিয়ে পড়তো। কিন্তু মাঠাকরুণের ভাব, সমাধি হচ্ছে, কিন্তু কাকেও জানতে দেন? তাঁর ধারণা করবার শক্তি কত। বউটির মতন ঘোমটা দিয়ে থাকেন। মায়ের দেশের লোকেরা মনে করেন—ভাইপো ভাইঝির জন্য তিনি সব কচ্ছেন।

প্রকৃতিলীন *

সগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম নাহি আমি জানি,
শুধু জানি হে প্রকৃতি তুমি মহারাণী।
তব পদ মম শিরে কিরীট স্বরূপ,
চন্দ্র তুমি, আঁখি মম চকোর লোলুপ;
আমার নয়নে তুমি অমৃত-অঞ্জন,
আমার তনুতে তুমি মলয়-চন্দন;
হৃদয়ের হার তুমি, আমার জীবন,
ঘুমের আবেশে তুমি সোণার স্বপন।
নগ্ন মূর্ত্তি দেখিয়াছি অবাক হইয়া,
তব ব্যক্ত রূপে তবু মুগ্ধ মম হিয়া,
কিবা দিঠি, কিবা মিঠি, কিবা কণ্ঠ স্বর,
কিবা অঙ্গ-গন্ধ তব, পরশ মধুর!
কিছু নাই, কিছু নাই আমার কামনা,
ঘুমের স্বপন তুমি, জাগ্রতে সাধনা।—"ওমার।"

* "বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ"—সাংখ্য কারিকা। ৪৫।

শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার-বিচার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এইবার দেখা যাউক আচার্য্যোক্ত "ইতিহাসপুরাণপূর্ব্বক অধিকার শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যাতে আছে, বেদ পূর্ব্বক নাই" এই বাক্যের দ্বারা আর কি বুঝাইতে পারে। বস্তুতঃ এই বাক্যদ্বারা প্রকারান্তরে আচার্য্য শূদ্রকে বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার দিয়াছেন বুঝা যায়। কারণ, উপনীত হইয়া গুরুমুখে বেদশ্রবণপূর্ব্বক তাহার অনুচ্চারণ করিলে বেদাধ্যয়ন সিদ্ধ হয়। নচেৎ বেদাধ্যয়ন অসিদ্ধ। স্বয়ং বেদ পড়িলে বা অনুপনীত হইয়া কোনরূপে বেদ পড়িলে তাহা সকলের নিকট বেদাধ্যয়ন বলিয়া বিবেচিত হয় না; উহা ইতিহাসপুরাণপাঠের তুল্য। যথা, পাণিনীয় ভাষ্যে :—মাত্রাহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যা-প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ। স বাগ্‌বজ্রো যজমানং হিনস্তি, যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥ সূত্রকারের অনুসরণ করিয়া আচার্য্যও শূদ্রের উপনয়নাভাবে এতাদৃশ বেদাধ্যয়নই হয় না বলিয়াছেন।

আর সেইজন্যই ইতিহাসপুরাণপূর্ব্বক শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে বলা হইয়াছে। আচার্য্যকর্ত্তৃক শূদ্রকে ইতিহাসপুরাণপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারদানের ইহাই তাৎপর্য্য—ইহাই নিগূঢ় রহস্য। বস্তুতঃ, এতাদৃশ বেদাধ্যয়ন না হইলেই যে বেদাধ্যয়ন হয় না, তাহা নহে। যেহেতু অধ্যয়ন বলিলে বাক্য ও তাহার অর্থের অবগতি বুঝায়। ইহাই অধ্যয়নের সাধারণ অর্থ। আচার্য্যপ্রভৃতি এস্থলে এই পারিভাষিক অর্থকে গ্রহণ করিয়া ইতিহাসপুরাণপূর্ব্বক অধিকারের কথা বলিয়াছেন। অবগতিভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না। কেবল বিধিপূর্ব্বক উচ্চারণে ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব। যেহেতু তাহা না হইলে সকল বেদ-পাঠীরই ব্রহ্মজ্ঞান হইত। এজন্য বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক যে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাহা বেদের অর্থজ্ঞানপূর্ব্বকই হয়। বেদের

অর্থজ্ঞানের জন্য বেদাধ্যয়ন—ইহা আচার্য্যও স্বীকার করিয়াছেন। শ্রবণমননিদিধ্যাসনকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় বলায় বেদের অর্থজ্ঞানই লক্ষ্য হয়। উপনীত হইয়া গুরুমুখে বেদশ্রবণ করিয়া গুরুর ন্যায় উচ্চারণ করিয়া বেদগ্রহণপূর্ব্বক যে বেদার্থাবগতি হয়, তাদৃশ বেদাধ্যয়নের দুইটি ফল হয়। একটি—বেদাধ্যয়নজন্য অপূর্ব্ব বা পুণ্য, অন্যটি—অর্থজ্ঞান। উপনীত না হইয়া বেদার্থাবগতি করিলে বেদাধ্যয়নজন্য পুণ্য হয় না, কিন্তু অর্থাবগতি হইতে বাধা হইতে পারে না। কারণ, যাহারই পদ, পদার্থ ও তাহাদের অন্বয়ের জ্ঞানাদি থাকে, তাহার শাব্দবোধ হইতে বাধ্য। আলোকমধ্যে ঘটের দিকে চাহিলে যেমন ঘটজ্ঞান হইতে বাধ্য, এস্থলেও তদ্রূপ শাব্দ-জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। ইহাকে শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে বেদাধ্যয়ন না বলিলেও সাধারণ অর্থে বা অর্থজ্ঞানার্থ যে ইহা বেদাধ্যয়ন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর এতাদৃশ বেদাধ্যয়নকে ইতিহাসপুরাণাদির অধ্যয়ন বলিলে যে একেবারে বেদাধ্যয়ন অস্বীকার করা হয়, তাহা বলা যায় না। অতএব আচার্য্যের মতে শূদ্রের ইতিহাসপুরাণপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার থাকায় প্রকারান্তরে বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে—ইহাই স্বীকার করা হইল। আর এ ভাবে বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার স্বীকার করিলে নিষেধশ্রুতির সহিত বিরোধেরও পরিহার হইয়া যায়। পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্যের মীমাংসার জন্য অর্থসংকোচরূপ প্রথম উপায়ই অবলম্বিত হয়। "শ্রাবয়েৎ" বাক্যে ব্রাহ্মণপ্রমুখ করিয়া শূদ্রকে বেদ শুনাইবে—এইরূপ বিশেষবিধি প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং সামান্যনিষেধবাক্যের সহিত ইহার অবিরোধ ইহা যাঁহারা স্বীকার করিবেন না, তাঁহাদের পক্ষে এই মীমাংসাতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। এই জন্য এই পক্ষই আচার্য্য গ্রহণ করিলেন।

যদি বলা যায় বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়নজন্য যে অপূর্ব্ব বা পুণ্য তাহা না হইলে বেদবাক্যের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে না, তাহার মনে সংশয়-বিপর্য্যয়প্রভৃতি উদিত হইয়া জ্ঞানের প্রতিবন্ধকতাচরণ

করিবে। তাহা হইলে বলিব—শাব্দবোধের প্রতি অদৃষ্ট কারণ নহে, জ্ঞান প্রমাণজন্য, ইহা বিধিজন্য নহে—ইহা আচার্য্যেরই মত।

তাহার পর যাহার বেদবাক্যের উপর শ্রদ্ধাদি আছে, তাহার কেন তাদৃশ প্রতিবন্ধক উদিত হইবে? অতএব বিবিদিষা ও বেদে শ্রদ্ধাদিসম্পন্ন শূদ্রের যদি বেদবাক্যার্থ গ্রহণধারণে সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে তাহার তাদৃশ বেদপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার কেন থাকিবে না?

অবশ্য এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যাহাদের এই বিবিদিষা ও শ্রদ্ধাদি নাই, তাহাদের জন্য তাহা হইলে বিধিপূর্ব্বক অধ্যয়ন আবশ্যক কি না? আর যদি বলা যায়—আবশ্যকতা আছে, তাহা হইলে বিধিপূর্ব্বক পাঠে উত্তরোত্তর বিবিদিষা ও শ্রদ্ধাদির বৃদ্ধিই পাইতে থাকিবে, অতএব সর্ব্বক্ষেত্রেই তাহার অনুসরণ করাই ভাল। সুতরাং শূদ্রের অবিধিপূর্ব্বক বেদ না পড়াই ভাল। আর যদি বলা হয়—আবশ্যকতা নাই, তাহা হইলে বিবিদিষাপ্রভৃতির উৎপত্তিই এক প্রকার অসম্ভব হয়। কারণ, মানবহৃদয়ে স্বভাবতঃই যে ইচ্ছা ও শ্রদ্ধার বীজ থাকে, তাহাকে বর্দ্ধিত করিতে হইলে একনিষ্ঠ হইয়া অভ্যাস ও আলোচনা আবশ্যক। আর ইহা করিতে হইলে যাহা আবশ্যক তাহা বিধিপূর্ব্বক করিলে অর্থাৎ অভিজ্ঞব্যক্তির আদিষ্ট পথে করিলে যতটা হয় এতটা অন্যথা সম্ভব হয় না। অতএব শূদ্র মাত্রেরই বেদ না পড়াই উচিত।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যাহাদের বিবিদিষা ও শ্রদ্ধাদি বীজাকারে অবস্থিত অর্থাৎ অপ্রকাশিত তাহাদের জন্য বিধিপূর্ব্বক অধ্যয়নই ভাল, তাহারা ভারতাদি ইতিহাসপুরাণ পাঠ করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হউন, কিন্তু যাহাদের তদপেক্ষা উহা স্বভাবতঃই পরিস্ফুট, অথবা যাহাদের ভারতাদি পাঠ করিয়া শ্রদ্ধাবীজ পাদপে পরিণত হইয়াছে, যাহাদের "ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা" জ্ঞান হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহাদিগকে আবার বিধির দাস করা কেন? বিধির দাসত্বে কি কর্ত্তৃত্বাভিমান ফিরিয়া আসে না? গীতা প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে

যে জ্ঞান হয়, তাহাতে এই কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য ভাব অনেকস্থলে সুলভ হয়। অতএব সকলেরই পক্ষে এরূপ বিধান শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে। যেমন যে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে ব্রাহ্মণ থাকিয়া যথাবিধি তপশ্চর্য্যা করিয়া কোন পূর্ব্বপাপবশতঃ যদি শূদ্রকুলে জন্মে, তাহাকে যদি বিধির দাসত্ব করিতে আদেশ করা হয়, তাহা হইলে তাহা সামাজিক সুবিধার দিকে দৃষ্টি করিয়া নিয়ম মাত্র বলিতে হইবে, উহা শাস্ত্রের বিধি নহে। দেশকালভেদে এরূপ সামাজিক নিয়ম সুবিধাকর হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে যে ইহা সুবিধাকর হয় না, তাহাও একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। যেহেতু দেখা যায়—যাহারা এককালে অতি বর্ব্বর জাতি বলিয়া বিবেচিত হইত, কালবশে শিক্ষাদির গুণে তাহারা যথেষ্ট উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে এই যে ইংরাজোপবাসী আজ জগতে রাজত্ব করিতেছেন, ইহারা দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বন্য বর্ব্বর জাতি কি ছিলেন না? আজ যে ইহারাই বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বীর উপর রাজত্ব করিতেছেন। দেশকালভেদে সামাজিক বিধির পরিবর্ত্তন না করিলে অথবা গুণ বা সামর্থ্যানুরূপ ব্যবস্থা না করিলে সময় সময় ভয়ানক বিষম ফল ফলে। ইহারই ফলে বহু বিধর্ম্মী বেদবিনাশে বহুবার বদ্ধপরিকর হইয়াছিল এবং এখনও হইতেছে। অজ্ঞানই শত্রু, জ্ঞান কখন শত্রু হয় না। ভারতের সমাজেও এ জাতীয় পরিবর্ত্তন বহুবার হইয়াছে, কিন্তু এখন আর তাহা করা হইতেছে না যে সব দ্বিজেতর জাতি বেদ বঞ্চিত হওয়ায় আজ যেরূপ ভাবে বেদের উপর শত্রুতা করিতেছে, তাহার অন্যথা হইলে তাহা করিত না। অতএব কোন সময়ে সামাজিক সুবিধার জন্য শূদ্রদিগকে বেদজ্ঞানে বঞ্চিত করায় সুবিধা হইয়াছিল বলিয়া এবং পাত্রভেদে এখনও হয় বলিয়া চিরকাল যে তাহাই করিতে হইবে, তাহা সামাজিক নিয়মেও সঙ্গত হয় না। অতএব শূদ্রমাত্রেরই বেদ না পড়া উচিত—ইহা বলা সঙ্গত হয় না।

যদি বলা যায়—শূদ্রাদির বেদ শ্রবণ বা অধ্যয়ন করিলে যে পাপ হয়, বলা হয়—তাহা অনধিকারীকে অনধিকারচর্চ্চা হইতে নিবৃত্ত

করিবার জন্য, ভয়প্রদর্শনমাত্র নহে। উহা যথার্থই পাপ। উহা ভগবানের আদেশলঙ্ঘনজনিত পাপ, উহা শাস্ত্রের অমর্য্যাদা-করণজন্য পাপ। আর এই পাপ এতাদৃশ পাপ বলিয়াই উহার দ্বারা অধোগতি হয়—নরক হয়—উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়। নচেৎ বেদের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া বেদনিন্দা করায়, অথবা অপরের হৃদয়ে বেদের উপর অশ্রদ্ধা উৎপাদন করায়, অথবা বিপরীত অর্থ বুঝিয়া তদনুরূপ আচরণ করায় যে পাপ হয়—বলা হয়, তাহা নহে। তাহার কারণ, ভগবান্ চারি জাতীয় মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া তাহাদের নিজ নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছেন, যথা—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ। গীতা ৪।১৩।

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ (১৬।২৩)
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তুমিহার্হসি ॥ (১৬।২৪)

এই চারি জাতীয় মনুষ্যের যে কর্ম্ম যে ভাবে করিলে উন্নতি হইবে তাহাও ভগবান্ বলিয়াছেন, অতএব ইহার অন্যথা করাই পাপ ; যথা—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ। গীতা ১৮।৪১
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥—৪২
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥—৪৩
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥—৪৪
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥—৪৫
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥—৪৬

এতদ্দ্বারা বুঝা যায়—শূদ্রের ত্রিবর্ণের সেবাই কর্ত্তব্য। সেই সেবা কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে ভগবান্‌কে অর্চ্চনা করিতে পারিলে তাহার উন্নতি, নচেৎ অধোগতি, ইত্যাদি। অতএব শূদ্রের বেদাধ্যয়ন অশাস্ত্রীয় এবং সাক্ষাৎ ভাবেই পাপজনক।

ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, ভগবান্ চারি জাতীয় মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন—ইহা বলা সঙ্গত নহে। যেহেতু শ্রুতিতে আছে—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ উরু তদস্য
যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ইহার (প্রজাপতির) মুখ, বাহুদ্বয় ক্ষত্রিয়, উরু বৈশ্য এবং পদ শূদ্র—ইত্যাদি।

এই শ্রুতিবলে ব্রাহ্মণ প্রজাপতির মুখস্বরূপ বলিয়া ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব বা অগ্রজন্মত্ব বলা হইয়াছে এবং শূদ্রের নিকৃষ্টত্ব বা শেষ-জন্মত্ব কথিত হইয়াছে। তিনি উহার সৃষ্টিকর্ত্তা—ইহা বলা হয় নাই। বস্তুতঃ সৃষ্টি অনাদি, ভগবান্ তাহার অভিব্যক্তিকর্ত্তা মাত্র। ভগবান্ যদি চারি জাতীয় মনুষ্য সৃষ্টি করিবেন, তাহা হইলে তাঁহার বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্য দোষ অনিবার্য্য হয়। তাহার পর মহাভারতেও দেখা যায়—ভগবান্ ইহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, পূর্ব্বে সবই ব্রাহ্মণ ছিলেন, কর্ম্মবশতঃ বর্ণভেদ হইয়াছে ; যথা—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্ ॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ ॥
হিংসাঽনৃতপ্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥
ইত্যেতে চতুরো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী।
বিহিতা ব্রহ্মণা পূর্ব্বং লোভাৎ ত্বজ্ঞানতাং গতাঃ ॥

তাহার পর "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" এই বাক্যের যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহাও অসঙ্গত। ইহার অর্থ—ভগবান্ চারি জাতীয় মনুষ্য গুণকর্ম্মানুসারে করিয়াছেন—ইহা নহে। এরূপ অর্থ করিলে 'চাতুর্ব্বর্ণ্যং' পদের অর্থ চারি বর্ণ অর্থাৎ চারি বর্ণের মনুষ্য অর্থাৎ চারিবর্ণী করিতে হয়। তাহা করিলে বর্ণ পদে লক্ষণা করা হয় এবং পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিস্মৃতির সহিত বিরোধ হয়। কারণ, পূর্ব্বোক্ত "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" শ্রুতিতে ব্রাহ্মণাদির সৃষ্টির কথা নাই, এবং পূর্ব্বোক্ত মহাভারত বাক্যে ক্ষত্রিয়াদি কর্ম্মবশতঃ উৎপন্ন এইরূপই বলা হইয়াছে। অতএব গুণ ও কর্ম্মের বিভাগপূর্ব্বক চারিটি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি—এই ভগবদ্‌বাক্যের—অর্থ গুণ ও কর্ম্মানুসারে চারিটি বিভাগ বা "থাক্" সৃষ্টি করিয়াছি। ইহার উদ্দেশ্য বিভিন্ন শ্রেণীর মানবের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা মাত্র। এই গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ সমাজের প্রয়োজনে স্বভাবতঃই হইয়া যায়, সুতরাং মনুষ্যগণ চারি শ্রেণীতে বিভক্তও হইয়া যায়। তাহাদের স্বভাবে চারি প্রকার গুণ ও কর্ম্ম প্রকাশ পায়। যেমন সত্ত্বগুণী ব্রাহ্মণ, সত্ত্বরজোগুণী ক্ষত্রিয়, রজস্তমোগুণী বৈশ্য এবং তমোগুণী শূদ্র। এই গুণ অনুসারে ইহাদের কর্ম্ম পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। যথা—শম দম তপ শৌচ ক্ষান্তি আর্জব জ্ঞান বিজ্ঞান ও আস্তিক্য ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্ম্ম। শৌর্য্য তেজ ধৃতি দাক্ষ্য যুদ্ধে অপলায়ন দান ও ঈশ্বরভাব ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম। কৃষিকার্য্য গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম্ম এবং পরিচর্য্যারূপ যে কর্ম্ম তাহা শূদ্রের স্বাভাবিক কর্ম্ম। ভগবান্ এই স্বাভাবিক কর্ম্মের বিভাগ প্রকাশিত করিয়া জনগণকে তাহার অনুবর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন—এই মাত্র, তাহাদের কর্ত্তব্যবিষয়ে অজ্ঞান নষ্ট করিয়াছেন—এই মাত্র। বস্তুতঃ তিনি কিছু নূতন করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। তিনি মেঘের ন্যায় সাধারণ কারণ। অর্থাৎ মেঘ যেমন কটু তিক্ত বিষ বৃক্ষে সমভাবে বৃষ্টির দ্বারা রসসঞ্চয় করে, তিনিও তদ্রূপ করেন। ব্রহ্মসূত্রে এ কথা স্পষ্ট করিয়াই ব্যাসদেব বলিয়া গিয়াছেন। জীব এই বর্ণ-বিভাগ অবগত হইয়া স্বভাবানুরূপ কর্ম্ম করিলে সহজে সিদ্ধি লাভ

করিতে পারিবে। এ কথাও তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, যথা—

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। ১৮।৪৫ (গীতা)।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥—৪৬
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥—৪৭
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ ॥—৪৮
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ ॥ ৩।৩৫

অতএব চারি জাতীয় মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহাদের গুণ ও কর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, মনুষ্য ইহা না করিলে পাপ হইবে—ইহা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে।

তাহার পর মুখই ব্রাহ্মণ ও পা শূদ্র বলায় ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব প্রভৃতি গোত্ব বা অশ্বত্বের ন্যায় জাতিও বলা যায় না। যেহেতু গোত্বাদি প্রত্যক্ষ জাতি। ব্রাহ্মণত্বাদি কিন্তু তাদৃশ প্রত্যক্ষ জাতি নহে। যেহেতু বেশভূষা সকলেরই ইচ্ছাধীন। যদি বলা যায়—উহা অনুমেয় জাতি, তাহা হইলে প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুর জাতি আর প্রত্যক্ষ হইল না। ঘট যেমন প্রত্যক্ষ, ঘটত্ব জাতিও তদ্রূপ প্রত্যক্ষ হয় এবং ঘটগত দ্রব্যত্ব ও সত্তাজাতিও তদ্রূপ প্রত্যক্ষ জাতি হয়। এস্থলে আর সেরূপ হইল না। জন্ম দেখিয়া এই জাতি অনুমেয় বলিলে এই জাতিজ্ঞানে স্থলে স্থলে দোষ ঘটিবে। যেহেতু ব্যভিচার সকল সমাজেই অল্পবিস্তর বিদ্যমান। অতএব এই জাতি গোত্ব বা অশ্বত্বের ন্যায় জাতি নহে, ইহা কল্পিত জাতি। বস্তুতঃ এ কথা নিরালম্বোপনিষদে অতি স্পষ্ট করিয়াই কথিত হইয়াছে। যথা—

ন চর্ম্মণো ন রক্তস্য ন মাংসস্য ন চাস্থিনঃ।
ন জাতি বাত্মনো জাতি ব্যবহারপ্রকল্পিতা ॥

অর্থাৎ জাতি চর্ম্মের নহে, রক্তের নহে, মাংসের নহে, অঙ্গের নহে অথবা আত্মারও নহে। ইহা ব্যবহারপ্রকল্পিত। অতএব ব্রাহ্মণত্বাদিকে গোত্বাদি সদৃশ জাতি বলা যায় না।

তাহার পর মুখ ব্রাহ্মণ, পদ শূদ্র বলিয়াও যে গোত্ব বা অশ্বত্বের

ন্যায় ইহারা বিভিন্ন হইবে, তাহাও বলা যায় না। কারণ, মুখ ও পা যেমন একটি শরীরের অঙ্গ, গোত্ব ও অশ্বত্ব তদ্রূপ একটি শরীরের অঙ্গ হয় না। যদি বলা যায়—উহারা প্রজাপতি শরীরের অঙ্গ, তাহা হইলেও সুবিধা নাই। কারণ, গোত্ব বা অশ্বত্ব প্রত্যক্ষ হয়, প্রজাপতির শরীর ত সেরূপ প্রত্যক্ষ হয় না। অতএব ইহারা যে অত্যন্ত বিভিন্ন পদার্থ তাহাও নহে।

(ক্রমশঃ) শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

ওমার-প্রসাদ

পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৭৬।

কত দিন ?— কত দিন আর
ইদমদঃ করিবে এষণা ?
এষণার নাহি কি বিশ্রাম ?
তর্কের কি বিরাম হবে না ?

৭৭।

যত্ন তর্ক উভয়তঃ শেষে
হয় ব্যর্থ, কিংবা তিক্ত ফল,
ফেলে যত্ন তর্ক, লভ সাকি !
দ্রাক্ষাফলে আনন্দ বিমল—।

৭৮।

এই শষ্পে আজিকে নিশীথে
দুজনায় করিতেছি পান,
কত জন হয়তো অতীতে
বচেছিল হেথায় আপান ,

৭৯।

ঢালি তারা দুএক চোষক ;
একে একে পড়েছে ঘুমায়ে ;
সেই সব দেহোপরি মোরা
বসে আছি, আসন বিছায়ে।

৮০।

আমরাও ঘুমায়ে পড়িব ;
বিরচিব নব পান-ভূমি ;
বসি তাহে কে জানে তখন,
কে মজিবে মদ্যপাত্র চুমি ?

৮১।

ভুলে যাও বিশ্বচরাচর ;
দোঁহে করি দুঁহু মাঝে বাস ;
ক্ষুদ্র মনে যত দ্বেষ দুঃখ,
অভিমানে ভরা দীর্ঘশ্বাস।

৮২।

ঢালো সুরা ; পান কর সাকি !
যত পার, সে দিনের আগে ;
আঁখি ভরি নেহারি ও আঁখি,
রঞ্জিত মধুর মদ রাগে।

৮৩।

শত রন্ধ্রে পরিপূর্ণ পথ,—
পান্থে কহ, যথেচ্ছা ভ্রমিতে,—
পড়ে রন্ধ্রে যদি কোন পান্থ—
পাপী বলে, চাহ শাস্তি দিতে !

৮৪।

রন্ধ্রকারী, তব বিধিমতে,
নাহি পায় যদি কোন সাজা,
তবে, চাহো ক্ষমা পথিকের,
ওগো পন্থা, পথিকের রাজা।

৮৫।

কিছু না পুছিয়া কে আমায়
কোথা হতে আনিল এ ঘরে ?
অনাহূত কে জানে কোথায়
হেথা হতে দিবে দূর করে ?

৮৬।

অর্দ্ধচন্দ্রে বিদায় আহ্বান—
আমিত্বের হেন অপমান !
ডুবাইতে অপমান-স্মৃতি
ভর পাত্র ; কর মদ্য পান।

৮৭।

ভর, ভর পুনঃ স্বচ্ছ পাত্র,
রক্তবর্ণ দ্রাক্ষাফল রসে,—
মুছে যাবে অতীতের ব্যথা,
হিম যথা মলয় পরশে।

৮৮।

"কালিকে কি হবে"?—কেন, সাকি !
কালিকেও হয়ে যাবে লীন ;
সংখ্যাহীন বর্ষব্যাপী ভূতে
যুক্ত হবে, আরেকটি দিন।

৮৯।

মেশামিশি অনন্তে অনন্ত,
মাঝখানে ক্ষুদ্র বর্ত্তমান,
তারি মাঝে কতরূপ খেলা—
কত কান্না ? কত হাসি গান।

৯০।

গৌড়-যাত্রা আসে কি স্মরণে ?
নববর্ষে পান্থশালে বাস ?—
কি দুর্যোগ ! ত্রিযাম ধরিয়া
ডাকে মেঘ ; পাগল বাতাস !

৯১।

সূর্য্যোদয়ে ঘটে ছাড়াছাড়ি,
পান্থশালে কাটাইয়া রাত্রি ;
যেতে হবে—বহু দীর্ঘ পথ—
গুছায় গাঁঠরী যত যাত্রী।

৯২।

মোসাফের মোসাফেরে কহে—
"খোল দ্বার, দেখি একবার,
"দেরি নাই,—যেতে হবে দূর—
"হয়তো, হবেনা দেখা আর।"

৯৩।

কোন যাত্রী নয়ন মুদিয়া
নত করে ভূমে শূন্য শির,
সব দেখে, দেখেনা কেবল—
অন্দরের পুষ্পিত মন্দির।

৯৪।

বিকশিত হিজল শুকালে
মুঞ্জরিবে অশোক বকুল,
দিবসের সাথে সাথে, সাকি!
কত ফোটে, কত ঝরে ফুল!

৯৫।

ভুলে যাও অশোক বকুল ;
এস হেথা, শূন্য পাত্র কাঁদে ;
পূর্ণ কর তারে, তৃপ্ত হোক
তৃপ্তি-হারা, চুম্বি মুখ চাঁদে।

৯৬।

কেহ ভাবে,—ভাবি স্বর্গ শ্রেয়ঃ,
কেহ ভাবে,—ধন্য রাজপদ ;
কাজ কি গো, অতশত ভেবে?
লও হেসে, যা পাও নগদ!

৯৭।

হের পুষ্প বাতাসে দুলিয়া
কহে হেসে—"দুলিতেছি বনে,
"বৃন্তছিন্ন হলে, ঝরে যাই,
"মিশি গিয়া মৃত্তিকার সনে।"

৯৮।

লোকে পোষে ঐহিক কামনা—
কারো ছাই, কারো বা কাঞ্চন ;
কিন্তু কহ নীহারের হার
দুর্ব্বাদলে থাকে কতক্ষণ?

৯৯।

স্বর্ণ বীজ জলে ফেলে দাও,
কর ক্ষেত্রে অথবা বপন,
সম ফল, মাটির শরীর
কোন কালে হবেনা কাঞ্চন।

১০০।

কালে জীর্ণ প্রকাণ্ড সবাই,
যুগ্ম দ্বার—দিবা আর রাত্রি,
ভেবে দেখ, আসে যায় তথা
অবিরত কত শত যাত্রী।

১০১।

পরে পরে কত না পাত্‌শা
তথা এসে হয়েছে অতিথি,
দণ্ড দুই দেখাইয়া জাঁক
চলে গেছে, নাহি কোন স্মৃতি।

১০২ ।

ঘৃতাহুতি দিয়াছিল যথা
বেদ-ভক্ত রাজা আদিশূর,
লোকে বলে, তথায় এখন
বাস করে আরণ্য কুকুর ।

১০৩ ।

বুনো গাধা ছুটে যায় বেগে,
গর্ব্বে, মুখে করে পদাঘাত,
তবু নিদ্রা ভাঙে না ভীমের,
পড়ে থাকে, হয়ে চিৎপাত ।

১০৪ ।

উন্মাদ কল্পনা ! মনে হয়
প্রতি পদ্ম মৃণালের মূলে
শুয়ে আছে, রূপসী রমণী,
নগ্ন তনু, আলু থালু চুলে ।

১০৫ ।

তুমি আর আমি নিয়ে কথা
হয়ে থাকে দুদণ্ডের তরে ;
তারপর কোথা তুমি আমি ?—
খোঁজে যারা, বৃথা খুঁজে মরে ।

১০৬ ।

আছে এক বিরাট কবাট,
পাই নাই তাহার কুঞ্চিকা ।
দৃষ্টিশক্তি করে প্রতিহত
স্পন্দহীন নীল যবনিকা ।

১০৭ ।

ব্যর্থ মনোরথ হয়ে, তবে,
রাশিচক্রে করিনু মিনতি,
জিজ্ঞাসিনু,—"অন্ধকার পথে
কি ব্যবস্থা করেছে নিয়তি ?"

১০৮ ।

রাশিচক্র, শুনিয়া মিনতি,
"অন্ধজ্ঞান"—কহিল উত্তরে ।
তারপরে তুমি এলে, সাকি !
সুরাপাত্র ধরিলে অধরে ।

১০৯ ।

চুম্বিনু পেয়ালা ; চুপি চুপি
কহিল সে গদ গদ ভাষে,—
"পিও, পিও যাবৎ জীবন,
"মলে কেহ, ফিরে নাহি আসে ।"

১১০ ।

নিশ্চয় ছিল সে পেয়ালা
একদিন রূপসী রমণী,
কাটায়েছে মদির চুম্বনে
কত স্নিগ্ধ শারদ রজনী ।

১১১ ।

সেই রাত্রে তুমি জান, সাকি !
গৃহে মোর কত মহোল্লাস,
'যুক্তিমতি' প্রথমা গৃহিণী
গৃহ ছাড়ি গেল কাশীবাস ।

১১২ ।

শূন্য ঘর ; তুমি এলে ঘরে
সদা হাস্য মদির নয়নে,
কলহের হইল সমাধি
নিত্য নব আনন্দ ভবনে ।

১১৩।

যে প্রতিমা এতকাল ধরে
প্রীতিভরে করেছি অর্চ্চনা,
তারি তরে, জানি আমি বেশ,
দশে নাহি করে অভ্যর্থনা।

১১৪।

মদ্য পাত্রে মজ্জিত গৌরব
ডুবে গেছে সর্ব্ব গুণগ্রাম।
কাঁচ মূল্যে বিকায়ে ফেলেছি
রাজৈশ্বর্য্য মাণিক্য সুনাম।

১১৫।

কত দিন অনুতাপে আগে,
সত্য বটে, করিয়াছি পণ;
কিন্তু কহ? কি মূল্য পণের?—
সাদা চক্ষু ছিল কি তখন?

১১৬।

শুধু তাই নয়; ছয় ঋতু
অহরহ আনে, প্রলোভন;
বসন্তের পুষ্প-গন্ধবহে—
অনুতাপ করে পলায়ন।

১১৭।

পুষ্পসহ ফুরাবে বসন্ত;
বহিবে না মলয় অনিল;
কুঞ্জ মৌন করি চলে যাবে,—
কোথা যাবে? কে জানে কোকিল।

১১৮।

দুনিয়ার মতলব, সাকি!
শুধু যেন ছড়াতে যন্ত্রণা।
তুমি আমি, ভাগ্য সহ যদি,
এক জোটে করিয়া মন্ত্রণা—

১১৯।

জগতের গুপ্ততত্ত্ব যত
পারিতাম করিতে ধারণা,—
করিতাম, সব ভেঙে চূরে
মনাসিব—নূতন রচনা।

১২০।

তুমি সাকি আমার হৃদয়ে
পূর্ণচন্দ্র, অস্তোদয় হীন;
ওই হের, উঠিতেছে নভে
দ্বাদশীর চন্দ্র অতি ক্ষীণ।

১২১।

এরপর কতবার চাঁদ
উঠিবে, ভাতিবে নভোস্থল;
আমায় সে এ বনে খুঁজিবে,
কিন্তু হবে প্রয়াস নিষ্ফল।

১২২।

হয় হোক, নিষ্ফল প্রয়াস;
তুমি আমি এখনো জীবিত;
পাত্র পূর্ণ কর, ওগো সাকি!
দিয়ে মদ, ফেনিল রঞ্জিত।

১২৩।

চলো, চলো সাকি! করিগে শয়ন,
ঘুম ঘোর এসেছে নয়নে;
পরিপূর্ণ মদ্য-পাত্র করে
দেখি যেন তোমারে স্বপনে।

১২৪।

অস্তমান এ জীবন, সাকি !
সুরারসে করিও পোষণ,
জীবন ফুরালে, মদিরায়
মোর তনু করিয়ো ধাবন !

১২৫।

শেষে, স্নিগ্ধ মধুদ্রুম বনে,
উর্দ্ধে নীল আকাশ অনাদি,—
দ্রাক্ষাপাতে জড়াইয়া তনু,—
দিয়ো, সাকি ! আমার সমাধি।

১২৬।

ওকি, সাকি ! কেন কাঁদ তুমি ?
সমাধির মুখে দাও ছাই ;
ঢালো পাত্রে তীব্র রক্ত-সুরা ;
তুমি ভিন্ন কেহ মোর নাই।

১২৭।

দুই পাত্রে ঢালো হে মাধ্বীক ;
আরো কাছে, হিয়ালগ্ন হিয়া ;
ওই শোন, অদূরে—বনান্তে
পিয়ো পিয়ো কুহরে পাপিয়া।

১২৮।

একি, একি, সাকি ! একি রূপ ?
কোথা হতে আসিল যৌবন ?
পাত্র পূর্ণ করো পুনর্ব্বার ;
মত্তে হোক কালের মজ্জন।

১২৯।

মনে কি গো পড়ে সেই রাতি—
যুগান্তের পুরাণো কাহিনী ?
চন্দ্র-করোজ্জ্বল স্থির পদ্মা—
স্বপ্নেভোর নীরব যামিনী।

১৩০।

গৌরব, বিভব,—কত কি যে
চিন্তা লয়ে বসেছিনু একা ;
কি জানি সহসা, কোথা হতে,
ওগো সাকি ! তুমি দিলে দেখা।

১৩১।

সেই হলো প্রথম মিলন,
সে কি কভু পারি পাশরিতে ?
চলে গেছে কত শত দিন
তবু চিত্র জেগে আছে চিতে !

১৩২।

তুমি এসে দাঁড়াইলে পাশে,
নত মুখ ; ওষ্ঠে মৃদু হাসি,
পরণে সুনীল সূক্ষ্ম সাড়ী ;
পৃষ্ঠে দোলে মুক্ত কেশরাশি।

১৩৩।

বিলম্বিত শুভ্র বাম বাহু ;
স্ফটিকের পাত্র ডান হাতে,
প্রসারিলে কর ; ঝমকিল
তনুপদ্ম কলধৌত ভাতে।

১৩৪।

মুগ্ধ হয়ে চাহিয়া রহিনু ;
কোথাও কি দেখেছি এ মুখ ?
এই ভুলি, এই মনে পড়ে ;
শুধু জাগে, সামীপ্যের সুখ।

১৩৫।

কি জানি, যে কতক্ষণ ধরে
সে দশায় ছিলাম বিভোর ;
মনে হলো, শেষে বীণারব
পশিতেছে মুগ্ধ কর্ণে মোর—

১৩৬।

"ওগো বিপ্র ! কর মোরে সাকি
"অরুণ মদিরা কর পান,
"স্বস্তি বিরাজিবে চিত্ত মাঝে,
"সর্ব্বচিন্তা হবে অবসান।"

১৩৭।

রক্ত বর্ণ স্ফটিক চোষক
জবাবর্ণ মদিরা আভাতে,
রক্তাধারে করিয়া চুম্বন,
ওগো সাকি! দিলে মোর হাতে।

১৩৮।

কম্পমান বুদ্বুদের স্রকে
ঢল ঢল মদির-মাধুরী,
বিস্ফারিত অপাঙ্গে তোমার
ব্রীড়াসহ হাস্তে লুকোচুরি।

১৩৯

আত্মহারা ; করিনু নিঃশেষ
দিয়াছিলে যেটুকু মদিরা ;
ভরে গেল, অভূত আনন্দে,
অন্তরের শিরা উপশিরা।

১৪০।

ভেসে গেল অতীতের স্মৃতি ;
ভাসায়ে দিলাম ভবিষ্যতে।
তুমি, সাকি ! জীবন সঙ্গিনী
চিরোজ্জ্বল সেই রাত্রি হতে।

১৪১।

আজি ম্লান জ্যোতিঃ তব আঁখি ;
আমি, সাকি ! বিগত-যৌবন,
কিছু নাই করিতে গৌরব—
লোকে বলে, অকৃতী জীবন।

১৪২।

কি হয়েছে ? কেন ক্ষুণ্ণ, সাকি !
হয়েছে কি সুরা পাত্র শূন্য ?
তবে কেন পড়ে দীর্ঘশ্বাস ?
ত্বরা, সাকি ! কর পাত্র পূর্ণ।

১৪৩।

ক'দিনের তরে হেথা মোরা ;
ওই শোন, মরণ আহ্বান ;
কোথা রবে গৌরব, বিভব ;
এই বেলা করে লও পান।

১৪৪।

স্বচ্ছ পাত্রে ঢালি রক্ত সুরা
কর, সাকি ! প্রাণ ভরি পান,
যদি চাহ, মরণের মাঝে,
শুনিবারে অমৃতের গান।

১৪৫।

ঢালো ঢালো, আরো ঢালো,
সাকি !
তুমি আমি এক হয়ে যাই
শেষ কর ; পূর্ব্বাকাশে ওই
হের শুক্রে ; রাত্রি বেশী নাই।

(সমাপ্ত) শ্রীসুরেন রায়।

জগৎ-কারণ—ঈশ্বরকৃষ্ণ ও শঙ্কর

(পরিশিষ্ট)

আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের ২ অ, ১ পা, ১২ সূত্রে জগৎ-কারণ সম্বন্ধে উপসংহার করে বলেছেন, "প্রধানমল্লনিবর্হণন্যায়েন" অর্থাৎ প্রধান মল্লকে পরাজিত করলে যেমন অপর মল্লদের? হার স্বীকার হয়, সেইরূপ সাংখ্য-মত খণ্ডনে অপরাপর মত খণ্ডিত হল বুঝতে হবে। কিন্তু সাংখ্য-দর্শন "বেদান্তের নিকটবর্ত্তী, গুরুতর-তর্ক-যুক্ত, বেদানুযায়ী এবং শিষ্ট-জন-গৃহীত" এ জন্য সাংখ্য ও অদ্বৈত-বেদান্ত আরও ভাল করে বোঝবার জন্য পরবর্ত্তী সূত্র সমূহে আরও অনেক আপত্তি তোলা হয়েছে এবং তার সমাধানও করা হয়েছে। সেগুলি আমরা নিম্নে প্রশ্নোত্তর ছলে দিলাম।

পূর্ব্ব-পক্ষ—ভোক্তা (Subject) ও ভোগ্যের (Object বিভাগ সকলেই আমরা মানি। জীব ভোক্তা—বিষয় ভোগ্য। কিন্তু ব্রহ্ম ভিন্ন যদি দ্বিতীয় বস্তু না থাকে তা হলে এ বিভাগ কি করে সম্ভব হয়?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—ও বিভাগ লৌকিক Convention)। এক বস্তুকেই আমরা বহু নামরূপে বর্ণনা করে থাকি। যেমন, "ফেনবীচি তরঙ্গ-বুদ্বুদাদীনামিতরেতরবিভাগইতরেতরসংশ্লেষাদিলক্ষণশ্চ ব্যবহার উপলভ্যতে" —একই সমুদ্রের ফেন, বুদ্বুদ, তরঙ্গ প্রভৃতি বিভাগ মানিলেও তাহারা একই জলের পরিণাম ছাড়া আর কিছুই নয়। (১৩ সূ)

পূর্ব্ব-পক্ষ—পরিণাম মানিলে ব্রহ্মে স্বগত ভেদ হয়। ডাল, পালা, পাতা নিয়ে যেমন গাছ, ব্রহ্মও তেমনি বহুশক্তি বা প্রবৃত্তি যুক্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁকে বহুরূপ বলতে হয়। সেই জন্য ব্রহ্মের একত্ব (Absolute) ও বহুত্ব (Relative) উভয় দিকই সত্য হোক।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—কারণই সত্য, কার্য্য মিথ্যা। রজ্জু সত্য—সর্প মিথ্যা। আমরা যথার্থ পরিণাম মানি না, বিবর্ত্ত পরিণাম মানি। ব্রহ্মে দেশ

কালের দ্বারা এই জগৎ কল্পিত। বালি যেমন ত্রিকালে নিত্য, ব্রহ্ম সেইরূপ ত্রিকালে নিত্য। মরীচিকার জল তরঙ্গ যেমন মিথ্যা, জগৎ সেইরূপ মিথ্যা। মরুভূমিতে মরীচিকা ভ্রান্তিকালে বালি যেমন পূর্ব্ববৎই থাকে, ব্রহ্মেও জগৎ-ভ্রান্তিকালে তিনি পূর্ব্ববৎই থাকেন। (সূ ১৪)

পূর্ব্ব-পক্ষ—কার্য্য কারণের রূপান্তর (কার্য্য-কারণ), তা কে বল্লে ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—উহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। কারণ না থাকলে কার্য্যের উপলব্ধি হয় না। সূত্র না থাকলে বস্ত্র হয় না। কুম্ভকার থাকলেই কুম্ভ আছে বুঝতে হবে। (১৫ সূ)

পূর্ব্ব-পক্ষ—জগৎ যখন অসৎ তখন উহার কারণও অসৎ হোক ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—জগৎ একেবারে অসৎ আমরা বলি না, ওর আপেক্ষিক বা ব্যবহারিক সত্তা আছে। অসত্য থেকে কিঞ্চিন্মাত্র সত্যও পাওয়া যেতে পারে না। মাটি থেকে দুধ হতে পারে না। দুধ থেকে ঘট হয় না। কারণে কার্য্য-শক্তি না থাকলে সে কারণ নয়। মৃত্তিকা ঘটের কারণ কেন ? মৃত্তিকায় ঘটত্ব অব্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। দুধ ঘটের কারণ নয় কেন ? দুধে ঘটত্ব কেহ উপলব্ধি করে না।

পূর্ব্ব-পক্ষ—যদি বলি জগৎ ও ব্রহ্মে সমবায় সম্বন্ধ ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—ইহাতে অনবস্থ দোষ হয়। উভয়ের মধ্যে সংযোগ ঘটাবে কে ? (১৮ সূ)

পূর্ব্ব-পক্ষ—সূক্ষ্ম-কারণ স্থূল-কার্য্যে কিরূপে থাকে ?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—প্রকাণ্ড রেশমের চাদর মুঠোর মধ্যে রাখলে, সেটা কি বুঝা দুর্ঘট (অব্যক্ত-কারণ)। কিন্তু বিস্তার করলে তখন আর অজ্ঞান থাকে না (ব্যক্ত কার্য্য)। কুম্ভকে প্রাণ বায়ু এক—রেচক ও পূরকে বহু। (১৯, ২০ সূ)

পূর্ব্ব পক্ষ—(হিতাকরণাদি দোষ)। সৃষ্টিতে ব্রহ্ম ওত-প্রোত ভাবে আছেন বলে জীব ব্রহ্ম। জীব যদি ব্রহ্ম হয় তাহা হলে ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব ও জীবের কর্ত্তৃত্ব একই হোক ? কর্ত্তা আপন হিতকর কার্য্যই করুন, তিনি বদ্ধ হয়ে নিজের অহিত করলেন কেন ? রোগ, শোক, জরা প্রভৃতি

অনর্থবহুল কারাগারে তিনি নিজেকে নিক্ষেপ করলেন কেন? কিংবা বর্ত্তমান দেহ দুঃখময় জেনেও তিনি সুখময় দেহ ধারণ করতে পারেন না কেন? (২১ সূ)

সিদ্ধান্ত পক্ষ—ব্রহ্ম নিত্য-বুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ও সর্ব্বশক্তি। তিনি কেবল মাত্র জীব নন, জীব হতে অধিক। ব্রহ্মই স্রষ্টা জীব স্রষ্টা নহে। কিন্তু এই ভেদ যে আমরা মানি, এটা যথার্থ ভেদ নয়—কাল্পনিক। অবিদ্যা উপাধি থাকাতেই হিত, অহিত, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি ব্যবহার আমরা করে থাকি। কাজেকাজেই তোমাদের ওসকল দোষ ব্রহ্মে স্পর্শ করতে পারে না। (২২ সূ)। যেমন একটা নুড়িতেও পার্থিবত্ব আছে আবার নীলাতেও পার্থিবত্ব আছে, তাই বলে সভ্য মানুষ কি দুটোকেই একদামে কিনতে পারে? কিন্তু এ ভেদ স্বাভাবিক নয়, মানুষের কল্পিত। তেমনি ব্রহ্মে ঈশ্বরে ও জীবে প্রাজ্ঞে যে ভেদ তা কল্পিত ব্যবহারিক সত্তা। (২৩ সূ)

পূর্ব্ব-পক্ষ—কর্ত্তা বিনা উপকরণে কোন কাজ করতে পারে না। যেমন মাটি না থাকলে কুম্ভকার ঘট তৈরী করতে পারে না, সেইরূপ ব্রহ্ম ছাড়া যদি আর কিছু না থাকে তা হলে অসহায় হয়ে অর্থাৎ অন্য কিছুর আশ্রয় না নিয়ে তিনি কিরূপে জগৎ তৈরী করেছেন?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—দুধ যেমন কাহারও সাহায্য না নিয়ে দধিতে পরিণত হয়, জল যেমন বরফ হয়, সেইরূপ অসহায় ব্রহ্ম হতে নামরূপের দ্বারা নানা পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে। যদি বল অম্ল দধির সাধন, তা নয়, দুধ নিজেই দই হয় অম্লদ্বারা তার শীঘ্রতা হয় মাত্র। অম্ল দধি হয় না তা হলে অম্ল বায়ুকেও দই করতে পারত। ব্রহ্ম পূর্ণ শক্তি। দেশকাল নিমিত্তাত্মিকা মায়াই তাঁর শক্তি, তাঁর সৃষ্টি বিষয়ে কোনও বিভিন্ন করণের বা উপাদানের অপেক্ষা নাই। এই মায়া শক্তি সাংখ্যের প্রধান হতে পারে না। কারণ, গুণ ও গুণী এক, ব্রহ্ম ও মায়া এক। যেমন সমুদ্র ও তার তরঙ্গ। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, কিন্তু পুরুষ ও প্রধান প্রভেদ। (২৪ সূ)

পূর্ব্ব-পক্ষ—দুধ অচেতন বলে বাহ্য সাধন ব্যতিরেকে দধি হতে পারে,

কিন্তু চেতন বিনা সহায়ে কাজ কখনও করতে পারে না প্রকৃতিকে যদি ব্রহ্ম হতে পৃথক জড় সত্তা বলে না মান, তা হলে সৃষ্টি হতে পাবে না।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—ব্রহ্ম স্বমহিমা বলে সৃষ্টি করেন। মাকড়সা নিজ দেহ থেকে সূতো বের করে জাল তৈরী করে, বিনা শুক্রে বকী গর্ভ ধারণ করে, কল্পনার স্বপ্ন রাজ্যে মানুষ কত মিথ্যা-বাস্তবের সৃষ্টি করে। ২৫ সূ

Pantheism of Spinoza Criticised

পূর্ব্ব-পক্ষ—ব্রহ্ম বাহ্য বস্তু ছাড়া যেমন কুম্ভকার মাটি দিয়ে ঘট তৈরী করে নিজেই জগৎ হয়েছেন একথা বল্লে, নিম্নলিখিত দোষগুলি হয়। ১ জল যখন বরফ হয়, তখন মূল জল-ভাব নষ্ট হয়ে বরফ হয়। ব্রহ্মও রূপান্তরিত হয়ে জগৎ হতে পারেন, কিন্তু তাঁহার মূল ভাব—"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরোহ্যজঃ" নষ্ট হয়। ২ যদি বল আংশিক পরিণাম ঘটে তাও বলতে পার না, কারণ তিনি নিরবয়ব। ৩ যদি বল ব্রহ্ম সাবয়ব, তা হলে তিনি নশ্বর। ৪ যদি বল নিরবয়ব কিন্তু পরিণাম ঘটে, তা হলে কৃৎস্ন-প্রসক্তি দোষ ঘটে—নিরবয়ব কখনও পরিণাম প্রাপ্ত হতে পারে না। ২৬ সূ

Doctrine of Maya is not Pantheism

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—ব্রহ্ম-বস্তুর পরিণাম ঘটে না, তা হলে তোমরা ঐ সকল আপত্তি তুলতে পারতে, কিন্তু ব্রহ্মে যে পরিণাম ঘটে তা বিবর্ত্ত পরিণাম—যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম ২৭ সূ অহং-দেশ-কাল-নিমিত্তরূপ-মায়া ব্রহ্মে নানা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করছে, কিন্তু তাতে তাঁর স্বরূপের কিছু মাত্র হ্রাস বৃদ্ধি ঘটছে না। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে যেমন চেতনার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে না, ধূলা মেঘের জন্য যেমন আকাশের মলিনতা ঘটে না, রং বেরঙের কাচে যেমন আলোর শুভ্রতা নষ্ট হয় না, সেই রকম দেশ-কাল কলনা-বৈচিত্র্য-চিত্রীকৃত-জগৎ-হেতু ব্রহ্মের সত্য-জ্ঞানানন্দ নষ্ট হয় না। (২৮ সূ)

কৃৎস্ন-প্রসক্তি-দোষ ঘটে মায়াবাদীদের নয়, সাংখ্য প্রভৃতি বাস্তব

পরিণাম-বাদীদের। প্রকৃতি নিরবয়ব, কিন্তু তাহার পরিণাম ঘটে কিরূপ? পুরুষ ও প্রকৃতি যদি দ্বৈত পদার্থ হয়, তা হলে উভয়েই সাবয়ব অতএব নশ্বর। প্রকৃতির যদি বাস্তব পরিণাম হয়, তা হলে মূল প্রকৃতির ভাব নিশ্চয়ই নষ্ট হয়। (২৯ সূ)

পূর্ব্ব-পক্ষ—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ—ব্রহ্ম নিরিন্দ্রিয় তাঁতে কি করে সর্ব্বশক্তিমত্তা এবং জগৎ-কর্তৃত্ব আসতে পারে?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—তিনি মায়া-সহায়। মায়া ইন্দ্রিয়েরও জননী। সেই পরম ব্রহ্ম-মহিষী দেশ-কাল-নামক বিক্ষেপ এবং অহংরূপ আবরণী শক্তি-দ্বারা দ্বন্দ্বাতীত-গগন-সদৃশ আত্ম-বক্ষে জগৎরূপে খেলা করছেন। (৩১ সূ)

পূর্ব্ব-পক্ষ—প্রয়োজনই প্রবৃত্তির কারণ। ব্রহ্ম নিত্য-তৃপ্ত, তাঁর কোনও প্রয়োজন থাকতে পারে না। তাঁর সৃষ্টিতে প্রয়োজন কি? (৩২ সূ

সিদ্ধান্ত পক্ষ—জগৎ-সৃষ্টি ব্যাপারে ব্রহ্মের কোনও অভিসন্ধি নাই। তিনি অপরিমিত শক্তি, সৃষ্টি তাঁর লীলা। যেমন রাজা লীলায় অনেক কার্য্য করেন। (৩৩ সূ)

পূর্ব্ব-পক্ষ—ঈশ্বর জগৎ-কারণ। তিনি কাকেও সুখী, কাকেও দুঃখী, কাকেও দুর্ব্বল, কাকেও সবল করলেন কেন? তা হলে তাঁর রাগদ্বেষ আছে। আবার তিনি যখন লোককে দুঃখ দেন, সংহার করেন তখন তাঁর নিষ্ঠুরতাও আছে। অতএব তাঁর বৈষম্য (Partiality) এবং নৈর্ঘৃণ্য (Cruelty) দোষ হয়।

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—জীব স্বীয় কর্ম্ম ফলে কষ্ট পায়। জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মই নিমিত্তান্তর ও বৈষম্যের কারণ। (৩৪ সূ)

পূর্ব্ব-পক্ষ—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বৈষম্য সৃজন করলে কে?

সিদ্ধান্ত-পক্ষ—সৃষ্টি অনাদি বীজাঙ্কুরের ন্যায়, বর্ত্তমান কল্পে পূর্ব্ব কল্পের বীজ নিহিত আছে। (৩৫ সূ)

এই প্রকারে অনুমান দ্বারা স্বীয় মত পোষণ করলেন এবং পূর্ব্ব অধ্যায়ে পর মত খণ্ডন করেছেন। সংক্ষেপে আমরা এই ব্রহ্মবিদ্যা

সম্বন্ধীয় তর্ক ভাষায় প্রকাশ করলাম, এক্ষণে পাঠক-পাঠিকা এই তত্ত্বের অনুসন্ধান আরও সূক্ষ্মরূপে করতে থাকুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

—বাসুদেবানন্দ।

ইতি সাংখ্য-মত খণ্ডন।

হরি ওঁ তৎ সৎ।

জিজ্ঞাসা *

(১) বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহের পক্ষে বা বিপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ কিছু বলিয়াছেন কি-না ?—বলিলে কোথায় এবং কি বলিয়াছেন ?

(২) যে সমস্ত সতী হিন্দু মহিলাকে বিধর্ম্মিগণ হরণ করিতেছে হিন্দুসমাজে তাঁহাদিগকে স্থান দেওয়া উচিত কি-না ? উচিত হইলে অথবা না হইলে উহার শাস্ত্রীয় বা ন্যায়ানুমোদিত যুক্তি কি ? স্থান দেওয়া উচিত বিবেচিত হইলে উহা কার্য্যকরী কবিবার জন্য দেশে কিরূপ আন্দোলন হওয়া প্রয়োজন ?

শ্রীপূর্ণানন্দ বসু।

---

* সকল পাঠক-পাঠিকার উপরোক্ত প্রশ্ন দুইটির সদুত্তর প্রদানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। উত্তর যতদূর সম্ভব সরল ও সংক্ষেপ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

—সম্পাদক।

দাসখৎ দিয়াছি কি চরণে তোমার ?

আমি, ঘৃণা করি, ঘৃণা করি, ঘৃণা করি শত শত বার,
ঘৃণা করি এ হেয় কলঙ্ক চিহ্ন, শৃঙ্খল আমার !
জীবনের প্রতি কাজে
নিরন্তর ধ্বনি বাজে
"ওরে মূর্খ, শক্তিহীন, তুই শুধু গোলাম আমার !
দাসত্বের ব্রত নিয়ে জন্ম তোর জগৎ-মাঝার !"

হৃদয়ের প্রতি বিন্দু, প্রতি রক্ত নিঃশেষিয়া আমি,
তোমার পুষ্টির তরে চেষ্টা করে মরি দিবাযামী !
তবু তব তুষ্টি নাই
শুধু বল—"চাই, চাই,
আরো রক্ত চাই তব, পূর্ণিবারে মোর ধনাগার !"
হে মনিব ! ঘৃণা তোমা করি আমি শত শত বার !!

এক মুষ্টি অন্ন বিনিময়ে জীবনের যত কিছু সুখ
গ্রাসিবারে চাও তুমি ? ওগো প্রভু, ওগো সর্ব্বভুক !
মানুষেরে পশুসম
খাটাইয়া, হে নির্ম্মম !
চাও নাকি তার পুনঃ প্রাণভরা ভক্তি-উপহার ?
পদাঘাতে চাও তুমি খুলিবারে হৃদয়ের দ্বার ?

মোরা কি মানুষ নই ? মোদের কি নাই সুখ, দুখ ?
এ বাহু লোহার বটে, লোহার তো নয় এই বুক।
মোদেরো বুকের মাঝে
সুখ দুখ ধ্বনি বাজে

* ধনীর প্রতি শ্রমিক।

এ মূর্খ হৃদয়ে আছে বেদনার অতি তীব্র ভার।
মোরাও বুঝিতে পারি মধু কিংবা তিক্ত ব্যবহার ।।

মুদ্রাই কি মূল্যবান, জীবনের কোন মূল্য নাই ?
মোরা মরি অনশনে, বিলাসের শয্যা তব চাই ?
আমরা করিব যোগ
জোগাইতে তব ভোগ
আজন্মের দাসখৎ দিয়াছি কি চরণে তোমার ?
লাঞ্ছনা সহিব তব পূরাইতে বাঞ্ছা কামনার ?

মোদের বুকের পরে হাটু গাড়ি বসিয়া, বসিয়া,
কলিজার রক্ত খাবে হে রাক্ষস! চুষিয়া চুষিয়া,
আর তুমি ভাবো বুঝি
মোরা সব চোখ বুঁজি
নীরবে সহিব তব অন্যায়ের যত অত্যাচার ?
হে মনিব! ঘৃণা রোষ করি আমি শত শত বার ।।

একদিন দুর্বলের আসিবে যে প্রবল বিদ্রোহ,
অত্যাচারী মনিবের বক্ষে যাবে ঘন তপ্ত লোহ।
তোমাদের আর্ত্তস্বরে
গগন উঠিবে ভরে
পবন উঠিবে কাঁদি প্রতিশোধ হেরি লাঞ্ছনার।
বিপ্লবের গীতি হবে সে দিনের কবিতা ঝঙ্কার ।।

ভাবিছ নিশ্চিন্ত মনে আমাদের অস্ত্র কিছু নাই ?
নিরস্ত্রের অস্ত্র আছে, একতার শক্তিময় ঠাঁই।
সংখ্যায় আমরা যত
তোমরা তো নও তত
দুর্ব্বলো যে লক্ষ যোগে হয় শক্ত দৈত্য দুর্নিবার।
বিন্দু বিন্দু বারি লয়ে সিন্ধু ধরে ভীষণ আকার ।।

ঘৃণা করি, কেন ঘৃণা করি ? ভালো বাসিব কেমনে ?
তুমি কি বাস মা, ভালো সন্তানের নিষ্ঠুর শমনে ?
ছলে কি কৌশলে, বলে
শক্তি যারা পলে পলে
হবে নেয় নিঃশেষিয়া জীবনের রস পাত্রাধার—
মাগো ! সেই রক্তপায়ী প্রভু হবে প্রণয়ী আমার ?

প্রেম মন্ত্রে ব্যাঘ্র কিগো স্বাভাবিক হিংসা তার ভুলি,
হৃদয়ের বন্ধু বলি মৃগসনে করে কোলাকুলি ?
মৃগ যদি ব্যাঘ্র হয়
তবে বন্ধু পরিচয়
একই কন্দরে থাকি সম্ভবিতে পারে গো দোঁহার ।
নতুবা মৃগের দেহ জোগাইবে ব্যাঘ্রের আহার ॥

বিষদংষ্ট্রা সর্প প্রতি মণ্ডূকের প্রেম যদি ধায়,
সেই প্রেমে মণ্ডূকের অতি শীঘ্র মরণ ঘনায় ।
দুর্ব্বল প্রবল মাঝে
প্রেম কি কখনো রাজে
গোলামের প্রভু-প্রেমে, প্রাণ নাহ, ভীতি মূলে তার ।
ভয়ে ভয়ে যেই প্রেম, সেই প্রেমে ভণ্ডামিই সার ॥

যেদিন শৃঙ্খল ভাঙ্গি হব রুদ্র, হব শক্তিমান ;
এ মের-দুর্যোগ ভেদি হব মুক্ত সূর্য্যের সমান ,
মনিবে গোলামে যবে
ভেদাভেদ নাহি রবে
সেদিন বাসিব ভালো পাপী কিংবা অপাপী ধরার ।
মনিবেরে, গোলামিরে ঘৃণা আজ করি বারংবার ॥

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ।

মরমের কথা

সর্ব্বতোমুখীপ্রতিভাসম্পন্ন, প্রেমিক সন্ন্যাসী যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের অমৃতময়ী লেখনীপ্রসূত "সখার প্রতি" শীর্ষক কবিতা তাঁহার বিশাল বীর হৃদয়ের অন্তর্নিহিত গভীর মর্ম্ম বেদনার একটি সকরুণ উচ্ছ্বাস। জগৎ, ধর্ম্ম প্রচারক—হিন্দু ধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তী সগৌরবে সুদূর পাশ্চাত্যে বহনকারী, ওজস্বী ও নির্ভীক সংস্কারক বিবেকানন্দকেই জানে, কিন্তু তাঁহার বীরত্বের পশ্চাতে যে কুসুম অপেক্ষাও সুকোমল বিশাল প্রেমিক হৃদয়ের গভীর প্রেরণা বর্ত্তমান ছিল, তাঁহার ওজস্বিনী বাক্যের অন্তরালে যে গভীর মর্ম্মবেদনার সকরুণ ঝঙ্কার উত্থিত হইত, তাঁহার সকল সংস্কার সকল সংগঠনের মূলে যে অতলস্পর্শী প্রেমপ্রসূত অকপট সমবেদনার অজস্র অশ্রুপাত বিদ্যমান ছিল—কে তাহার সংবাদ রাখে? প্রাণের কথা, হৃদয়ের অন্তঃপুরে গোপনে লুক্কায়িত ভাববাণী, বিভিন্ন মতাবলম্বী সহস্র শ্রোতার সম্মুখে বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া ব্যক্ত করিবার সামগ্রী নহে। সহধর্ম্মী সহকর্ম্মী ব্যথার ব্যথী সমপ্রাণ বিরল দুই একজনের নিকটেই হৃদয়ের উৎস খুলিয়া যায়, তখন প্রাণের ভাষা আপনার ছন্দে আপনিই ব্যক্ত হইয়া পড়ে। সাংসারিক সাধারণ ব্যথার ব্যথীই জগতে বিরল, সুতরাং নিঃস্বার্থ প্রেমিক হৃদয়ের সুগভীর মর্ম্ম বেদনার যথার্থ 'দরদী' 'সে যে দুএক জনা' হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাই বুঝি বিশ্বপ্রেমিক বিবেকানন্দের প্রেমিক হৃদয় দরদীর সন্ধানে গুমরিয়া মরিতেছিল! মরমের সে মর্ম্মন্তুদ হাহাকার বুঝি আর লুকাইয়া রাখা চলে না, তাই বুঝি বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত যথার্থ ব্যথার ব্যথী 'দরদী'-কোনও-'সখার প্রতি' তাঁহার এই অপূর্ব্ব ভাবোচ্ছ্বাস কাব্যের ছন্দে অভিব্যক্ত হইয়াছে। কাব্যে প্রকাশিত সকরুণ সঙ্গীতের এক বর্ণও যাহার হৃদয়তন্ত্রীতে সদৃশ-ঝঙ্কার উৎপন্ন করিবে, কবির গভীর মর্ম্মবেদনা যাহার হৃদয়কন্দরে স্পষ্ট হাহাকারে প্রতিধ্বনিত হইবে, বর্ত্তমানে বা ভবিষ্যতে তিনিই কবির সখা, তিনিই প্রেমিক দরদী—যথার্থ আপনার জন।

ভাবুক চিত্রকরের সুনিপুণ রেখাপাতে আপাতরমণীয় জগতের অন্তর্নিহিত অসারতার কি স্পষ্ট ছবিই অঙ্কিত হইয়াছে :—

"আঁধারে আলোক অনুভব, দুঃখে সুখ, রোগে স্বাস্থ্যভাণ,
প্রাণ-সাক্ষী শিশুর ক্রন্দন, হেথা সুখ ইচ্ছ মতিমান্ ?
দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে অনিবার, পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান ;
'স্বার্থ' 'স্বার্থ' সদা এই রব, হেথা কোথা শান্তির আকার ?
সাক্ষাৎ নরক স্বর্গময়, কেবা পারে ছাড়িতে সংসার ?
কর্ম্ম-পাশ গলে বাঁধা যার, ক্রীতদাস বল কোথা যায় ?"

যাহা মিথ্যা, বীভৎস ও দুঃখময় এ সংসার তাহাকেই সত্য সুন্দর ও সুখ বলিয়া মনে করে, যেখানে সদ্যজাত শিশুকণ্ঠে জীবনের প্রথম অভিব্যক্তি ক্রন্দনে, সেই জীবনে সুখের আশা কোথায় ? জগৎ স্বার্থ ছাড়া কিছুই বুঝে না, বিশ্বপ্রেমিকের নিঃস্বার্থ পবিত্র প্রেমেও জগৎ স্বার্থ আরোপ করে। উন্নত উদার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা জগতের নাই, কারণ সে নিজে স্বার্থ ছাড়া এক পদও অগ্রসর হয় না। এক কথায়, এই সংসারই আপাতরমণীয়তায় ঢাকা নরকের চিত্র অথচ কর্ম্মের এমনই কঠোর শৃঙ্খলে জগৎ আবদ্ধ যে বুঝিয়াও এ পাশ ছিন্ন করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই।

শান্তির প্রত্যাশায় জগৎ কত কি অনুষ্ঠানে ব্যস্ত, কেহ বা যৌগিক বিভূতির প্রত্যাশায় কঠোর যোগানুষ্ঠানে রত, কেহ বা ভোগের অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান, কেহ বা পুত্র কলত্র বেষ্টিত হইয়া সচ্ছল গার্হস্থ্যজীবনে সুখের অনুসন্ধান করিতেছে, আবার কেহ বা ধন জন গৃহ পরিবার পরিত্যাগ করতঃ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া সুখের সাধনায় নিরত, কিন্তু নিজের জন্য সুখের অনুসন্ধান এ শরীরে মরীচিকায় জলানুসন্ধানের মত বৃথা ; যতদিন এ শরীর আছে যতদিন 'আমি আমার' আছে ততদিন শরীর ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। ভাবিয়াছ উচ্চ-ভাব উচ্চ উদার দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া সুখী হইবে ? কিন্তু তুমি যত উচ্চ উদার ভাব সম্পন্ন হইবে জগৎ ততই নীচ দৃষ্টিতে তোমাকে দেখিবে, আবার জগতের নীচতায় তোমার উদার হৃদয়ে ততই আঘাত লাগিবে।

উচ্চ ভাবের আদর এ জগতে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। যাহার হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও নিস্পন্দ, নীচ স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে মিথ্যা স্তোক বাক্যে জগৎকে মোহিত করিতে পারে জগৎ তাহারই গুণগান করে—

"যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়।
হৃদিবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমিক! এ জগতে নাহি তব স্থান;
লৌহপিণ্ড সহে যে আঘাত মর্ম্মর-মূরতি তা কি সয়?
হও জড়প্রায় অতি নীচ, মুখে মধু অন্তরে গরল—
সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ, তবে পাবে এ সংসারে স্থান।"

ইহা প্রেমিক কবির মরমের কথা, জীবন ব্যাপী কঠোর অভিজ্ঞতার স্পষ্ট ইতিহাস, অথচ জগতের প্রতি বিন্দুমাত্রও রোষ বা অভিমান তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সেই অকৃতজ্ঞ, অসার, মিথ্যার পশ্চাতে ধাবমান জগৎকে হৃদয়ের ভিতর টানিয়া লইবার জন্য প্রেমিক-হৃদয় ব্যগ্র। যদি এই অসার জগতে সার বস্তু কিছু থাকে, যদি বীভৎস বিভীষিকাময় স্বার্থান্ধ কুৎসিত সংসারে বিমল, পবিত্র, আনন্দময় ও সত্য বলিয়া কিছু থাকে তবে তাহা প্রেম। পরের জন্য, অকৃতজ্ঞ জগতের জন্য নিজের যা কিছু এমন কি সুখের আশা, মুক্তির ইচ্ছা পর্য্যন্ত অকাতরে বিলাইয়া দেওয়া হইতেছে প্রেম। মন্ত্র, তন্ত্র, প্রাণায়াম, বিচার, দর্শন, বিজ্ঞান, ত্যাগ অথবা ভোগ সকলের পশ্চাতেই রহিয়াছে 'আমি ও আমার'; সকল বন্ধন সকল অশান্তি যাবতীয় অতৃপ্তির মূলে রহিয়াছে 'আমি ও আমার'; এই প্রকার ভাবগুলিকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দেওয়ার নামই প্রেম। এই প্রেমই জগতের পালক, ইহাই একমাত্র ঈশ্বর, ইহাই একমাত্র সত্য। জগতের জন্য, জগতের একটি মাত্র প্রাণীর জন্য নিজের যা কিছু সব অকাতরে বিলাইয়া দাও, তোমার কি হইল—তোমার সুখ হইল কি-না, শান্তি কতটা মিলিল, উন্নতি কতটা হইল—এই চিন্তা হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ মুছিয়া যাক, তবেই তুমি প্রেমের আস্বাদ পাইবে; এই প্রেমশূন্য তপস্যা ব্রত যাগ যজ্ঞ সবই অসার—মিথ্যা। দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর তপস্যার ফলস্বরূপ এই সুমহান

সত্য হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রীতে স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া প্রেমিক সন্ন্যাসী 'মনের মানুষ'কে আহ্বান করিয়া হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিতেছেন :—

"শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর, এক তরি করে পারাপার—
মন্ত্র, তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম, 'প্রেম' 'প্রেম'—এই মাত্র ধন ।"

এই প্রেমের শক্তিতে শক্তিমান হইয়াই বিবেকানন্দ বিশ্ববিজয়ী। তাঁহার একটি স্পর্শে, একটি দৃষ্টিতে, একটি মাত্র প্রেমের আহ্বানে জগৎ-মন মুগ্ধ, চকিত, বিগলিত। এই প্রেমই তাঁহার সমগ্র বীর্য্য সমস্ত ওজঃ ও যাবতীয় আকর্ষণের মূল। এই প্রেমের বার্ত্তা জগতের দ্বারে দ্বারে বহন করিবার জন্যই তিনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। এই প্রেম বা আত্মবিসর্জ্জনের রহস্য অবগত না হইয়া, শান্তির প্রত্যাশায় মানব কতই না ব্যর্থ প্রয়াসে শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। পরের জন্য—জগতের জন্য নিজের যা কিছু সব অনায়াসে বিলাইয়া দিতে না পারিলেই অশান্তি। কি পারিবারিক জীবনে, কি সন্ন্যাস অথবা অন্য কোনও বহুজনহিতকর কর্ম্মজীবনে সর্ব্বত্রই এই একই কৌশল—'রূপ-মুগ্ধ পতঙ্গের মত অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন'। জগতের বা জগতের বাহিরে কাহারও নিকট কিছুর প্রত্যাশা থাকিলেই সে ক্ষুদ্র, দীন, ভিক্ষুক। ভিক্ষুক আবার কেমন করিয়া সুখের অধিকারী হইবে ? ভগবানের আরাধনা —তাহাও হয় আত্মবিসর্জ্জনে—যাচ্ঞায় নহে। তোমার যা কিছু আছে এমন কি মুক্তির ইচ্ছা পর্য্যন্ত—সব বিসর্জ্জন দিয়া এস কে আছ প্রেমিক পূজারি! তোমার ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হও, ঐ শোন প্রেমের অগ্নিহোত্রীর সাগ্রহ আহ্বান :—

"হে প্রেমিক, স্বার্থমলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জ্জন।
ভিক্ষুকের কবে বল সুখ ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল ?
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।
অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
'দাও, দাও'—যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।"

এই আত্মবিসর্জ্জন, এই অকাতরে যা কিছু সব বিলাইয়া দেওয়াই লৌকিক বা পারমার্থিক জীবনকে সার্থকতায় মণ্ডিত করিবার কৌশল। বস্তুতঃ এই কৌশল অবলম্বন করিলে লৌকিক ও পারমার্থিকের আর কোনই ভেদ থাকে না; দেওয়ার ভাব লইয়া যা কিছু অনুষ্ঠান করা যায় তাই পারমার্থিক, আর নেওয়ার ভাব লইয়া যা অনুষ্ঠিত হয় তা বাহ্য দৃষ্টিতে পারমার্থিক বলিয়া অনুমিত হইলেও বস্তুতঃ ঘোর লৌকিক। কি বিদ্যার্জ্জন, অর্থোপার্জ্জন ও পরিবার প্রতিবেশীর পরিপোষণ, তথাকথিত লৌকিককর্ম্মে কি পূজা, ধ্যান, জপ, যাগ, যজ্ঞ পারমার্থিক বিষয়ে সর্ব্বত্রই সিদ্ধির মূল মন্ত্র সেই একই—"দাও আর ফিরে নাহি চাও"—"যেবা ফিরে চায় তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।"

এইটিই জগতের নিকট স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ বার্ত্তা। তাঁহার নিজের সমগ্র জীবন এই সত্যেরই প্রকৃষ্ট আদর্শ, এই বিশ্বপ্রেমের নিগূঢ় প্রেরণাই তাঁহাকে পাগল করিয়াছিল—তাঁহার হৃদয়ে অপার বেদনা আনিয়া নয়নে অজস্র অশ্রু ঝরাইয়াছিল। হায় স্বার্থান্ধ জগৎ, প্রেমিকের পাষাণভেদী তপ্ত অশ্রুপাতেও তোমার হৃদয় বিগলিত হয় না, তাঁহার গভীর মর্ম্মস্পর্শী আহ্বানেও তোমার মোহ নিদ্রা ভাঙ্গে না! এমন জলদগম্ভীর অথচ অপার করুণামিশ্রিত আহ্বান আর শুনিয়াছ কি?—"হে প্রেমিক স্বার্থমলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জ্জন।" যদি এই দেওয়ার ভাব হৃদয়ে বিন্দু মাত্রও ধারণা করিতে সমর্থ হও, যদি বুঝিতে পার তোমার জীবনে যা কিছু আছে সব বিলাইয়া দিবার জন্য—চাহিবার জন্য নহে তবে আর সত্যকে, আনন্দকে এখানে সেখানে অন্ধের মত খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না, তোমার প্রেমের চক্ষু খুলিয়া যাইবে, হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত হইবে, তখন বিশ্বই ভগবানের মন্দির; আর তোমার হৃদয়ের প্রেমই একমাত্র তাঁহার পূজার উপকরণ, রোগী, দুঃখী, আর্ত্ত, মূর্খ, পাপী, তাপী সর্ব্বত্রই দেখিবে তোমার সেই প্রেমাস্পদের প্রতিবিম্ব। তুচ্ছ কীট হইতে স্বর্গের দেবতা পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতেই অনুভব করিবে তোমার প্রাণের দেবতাকে, তাহাদের জন্য তোমার তন-মন-ধন তোমার যা কিছু সব বিলাইয়া দিয়া তুমি

জাগাইয়া তুলিবে তোমার জ্ঞানস্বরূপকে, তোমার প্রেমস্বরূপকে। সব ভেদ, ঘৃণা, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব চিরকালের জন্য বিলীন হইয়া যাইবে। তবে এস প্রেমিক, এস জ্ঞানি, এস কর্ম্মি, এস যোগি এই লও তোমার সাধনার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা—

"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সথে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

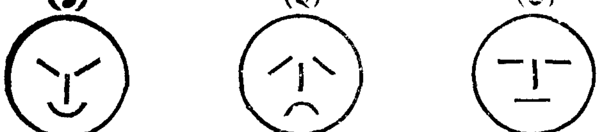
—জ্ঞানেশ্বরানন্দ।

কথা-প্রসঙ্গে

যোগী

মানুষের একটি প্রত্যঙ্গ আছে যাহা প্রথমেই সকলের চোখে পড়ে। আমি সেই প্রত্যঙ্গ, হাসি কান্না এবং সুষুপ্তির সময় একাধিক মানুষের দর্শন করিয়াছি এবং তাহার ফলে আমার মনে যে ছবি পড়িয়াছে তাহা নিম্নলিখিত চিত্রত্রয়ে প্রকাশ করিতেছি।

(১) (২) (৩)



সুখ দুঃখ সুষুপ্তি

ছবি মনে নিবদ্ধ আছে। এই তিনটি ছবির পরস্পর মিশ্রণে একটি কাল্পনিক চিত্র মনে উদয় হয়। উহাই হইতেছে সেই অবয়বের Abstract Idea; ইহার বাংলা আমি আমার দুর্ভাগ্য বশতঃ জানি না। কিন্তু Abstract Idea অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে হইলে যে শব্দ ব্যবহার করি, তাহাকে নাম বা সংজ্ঞা বলি। এস্থলে সংজ্ঞা হইতেছে "মুখ"।

১ম ছবি যাহা নানাবিধ হাসিমুখ দেখিয়া মনে চিহ্ন রাখিয়াছে তাহার সংজ্ঞা হইতেছে হর্ষ; ঐরূপে ২য় ছবির নাম বা সংজ্ঞা হইতেছে দুঃখ। হর্ষ দুঃখের অতীত ছবি মনে সব সময়ে ধরা যায় না, যে ধরিতে পারে তাহার সংজ্ঞা হইতেছে, "যোগী"। (সংজ্ঞা = Concept)

শ্রীসুরেন রায়।

স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী

অ-সহযোগী, সহযোগী, স্বরাজ্য-দল প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক সম্প্রদায় দেশের কল্যাণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের কার্য্যপদ্ধতি ও নীতি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার নাই, তবে এ কথা বলিলে বোধ হয় কিছু অন্যায় হইবে না যে, তাঁহারা তথাকথিত রাজনৈতিক 'দিল্লীকা লাড্ডু্র' প্রতি আকৃষ্ট হইয়া যত বেশী লাফালাফি ও যত অধিক চেঁচামেচি এপর্য্যন্ত করিয়াছেন—পল্লি-সংস্কার প্রভৃতি কার্য্যে তাহা অপেক্ষা কিছু অল্প পরিশ্রম স্বীকার করিলেও নিশ্চয় এতদিন ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী উপকার সাধিত হইত। পল্লি ও জনপদের সর্ব্বসাধারণ, স্বাস্থ্যের দিক দিয়া যাহাতে তাঁহাদের দুরবস্থার বিষয় সম্যক জ্ঞাত হইয়া সময় থাকিতে উহার প্রতীকার করিতে পারেন তজ্জন্য কলিকাতায় বিগত ৮ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১২ই ফেব্রুয়ারী একটি স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। প্রতি বৎসর ভারতের বিভিন্ন সহরে জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে যত উপকার সাধিত হয়, এইরূপ একটি স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী দেশের যে তদপেক্ষা অধিক উপকার সাধন করে—ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

এই স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীতে যে যে বিষয় দেখান হইয়াছে তাহার মোটা-মুটি বিবরণ আমরা দিলাম।

মাতৃ-মৃত্যু

কারণ—(প্রসবের পূর্ব্বে) দারিদ্র ও অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বাল্যবিবাহ, উপদংশজনিত পীড়া, সংক্রামক ব্যাধি, শিক্ষিতা ধাত্রীর অভাব।

(প্রসবের পর) নোংরা আঁতুড়ঘর, অশিক্ষিতা ধাত্রী, দারিদ্র, অজ্ঞতা ও অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিক অবস্থা, উপদংশজনিত পীড়া, অকাল প্রসব, পেটের অসুখ—আমাশয় ও রক্ত আমাশয়, বসন্ত রোগ।

প্রতীকার—(প্রসবের পূর্ব্বে) স্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে পিতামাতার সুস্থ জীবন যাপন, প্রাপ্ত বয়সে বিবাহ ও গর্ভসঞ্চার, উপদংশজনিত পীড়া বর্জ্জন, শিশু-মঙ্গল কেন্দ্রে গমন, গর্ভাবস্থায় সুচিকিৎসকের উপদেশ গ্রহণ, গর্ভাবস্থায় সংযম, প্রসব কালে সুচিকিৎসা ও শিক্ষিতা ধাত্রী নিয়োগ, স্বাস্থ্যকর আঁতুড় ঘর।

(প্রসবের পর) প্রসবের সময় প্রসূতির প্রতি যত্ন, শিক্ষিতা ধাত্রী ও ডাক্তার নিয়োগ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আঁতুড় ঘরে রাখা, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, টীকা লওয়া, সদ্য পক্ষে বোতলের দুগ্ধ শিশুকে না খাওয়ান—কারণ, মাতৃস্তন্য-পুষ্ট একটি শিশু কৃত্রিম দুগ্ধ পুষ্ট তিনটি শিশুর তুল্য। যে গরু বা ছাগল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার না পায় সে গরু বা ছাগলের দুগ্ধ শিশুকে খাইতে না দেওয়া, শিশুকে দোল খাওয়ান বা চুষি কাঠি চুষিতে দেওয়া উচিত নয়, দিবা ভাগে চার ঘণ্টা অন্তর ও রাত্রিকালে মোট দুই বার শিশুকে দুগ্ধ খাওয়ান উচিত।

বাংলায় প্রত্যেক আট মিনিটে সন্তান প্রসব কালীন একটি করিয়া মাতার মৃত্যু হয়। প্রসবের পূর্ব্ব হইতে নিয়মিত রূপে চলিলে, সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের উপদেশ মত কার্য্য করিলে এবং প্রসব কালে শিক্ষিতা ধাত্রীর সাহায্য লইলে মাতৃ-মৃত্যু সংখ্যা অনেক কমিতে পারে।

ম্যালেরিয়া

প্রতি ঘণ্টায় চল্লিশজন বাঙ্গালী ম্যালেরিয়া রোগে মারা যান।

কারণ—অপরিষ্কার পুকুরে মশা ডিম পাড়ে, মশা ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত খাইয়া সুস্থ লোককে কামড়াইলে ম্যালেরিয়া হয়।

প্রতীকার—মশারী ব্যবহার, কুইনাইন সেবন, পুষ্করিণী ও ডোবায় কেরোসিন ঢালা, "তে চোকা" মাছই সব চেয়ে বেশী মশার বাচ্ছা খায়, পুষ্করিণীর জলের উপর পানা পরিষ্কার করিয়া এই মাছ রাখিলে মশার বাচ্ছা আদৌ থাকিবে না।

কলেরা

বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর আশী হাজার লোকের কলেরায় মৃত্যু হইতেছে। প্রতিদিন ৩৬০টি এবং প্রতি ঘণ্টায় পনরটি (১৫) বাঙ্গালী কলেরায় মারা যান।

কারণ— মাছি। একমাত্র মাছি কলেরার বীজ বহন করিয়া লইয়া যায়।

প্রতীকার— মাছি-বসা-খাবার না খাওয়া, জল ফুটাইয়া খাওয়া, পুষ্করিণী 'রিসার্ভ' করা।

যক্ষ্মা

কলিকাতা সহরে প্রতি বৎসর দুই হাজারের বেশী লোক যক্ষ্মা রোগে মারা যান।

কারণ—অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, যেখানে সেখানে থুথু ফেলা, যক্ষ্মা-রোগীর সহিত একত্রে থাকা ইত্যাদি।

প্রতীকার—কাশিবার সময় রুমালে মুখ ঢাকা উচিত। তাহার পর উহা জলে ফুটাইয়া লওয়া অথবা একেবারে পুড়াইয়া ফেলা, রোগীর সেবা করিয়া হাত বিশেষরূপে পরিষ্কার করা, টাটকা দুগ্ধ ও শাক সব্জী খাওয়া, মুক্ত বাতাসে অবস্থান ও লঘু ব্যায়াম যক্ষ্মার প্রতিষেধক উপায় বলিয়া বিবেচিত হয়।

স্ত্রীলোকগণের মধ্যে আজকাল যক্ষ্মা দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছে। ছেলেরা সহরে থাকিলেও সকাল-বিকালে ফাঁকা মাঠে বেড়াইতে, ছুটা-ছুটি করিতে ও খেলিতে পায়, কিন্তু সহরের মেয়েরা দিনরাত পর্য্যাপ্ত বাতাস ও আলোকহীন ঘরে বাস করেন বলিয়া শীঘ্র যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন—চিকিৎসকগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন।

মেয়েদের বেড়াইবার ও খেলাধূলা করিবার জন্য প্রতি সহরের বিভিন্ন স্থানে কেবল মেয়েদেরই জন্য পার্ক বা খানিকটা ফাঁকা মাঠ থাকা প্রয়োজন। সহরের মেয়েদের স্বাস্থ্যের দিক দিয়া দেখিলে তাঁহাদের অবরোধপ্রথাও কিছু শিথিল হওয়া অত্যাবশ্যক বলিয়া আমাদের মনে

হয়। সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত মান, সম্ভ্রম, লজ্জাশীলতা, চরিত্র ও সংযম রক্ষা করিয়া স্ত্রীলোকগণ কিরূপ অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যের অধিকারিণী হইতে পারেন, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মহিলাগণকে দেখিলে তাহা বেশ বুঝা যায়।

কুষ্ঠ

কুষ্ঠরোগ আক্রমণের প্রথম লক্ষণ—শরীরের কোন অংশ অসাড় হইয়া যায়; সূচের দ্বারা বিদ্ধ করিলেও কষ্ট বোধ হয় না। চোখের উপরি ভাগের চামড়া পুরু এবং নাক, কান, হাত ও পায়ের আঙ্গুল প্রভৃতি স্ফীত হয়। হাতে ও পায়ে ঘা হইতে আরম্ভ হয় যাহা সহজে সারে না।

কারণ—কুষ্ঠরোগী যেখানে বসে তথায় বসা, যাহা স্পর্শ করে তাহা ছোঁয়া, এক হুঁকায় তামাক খাওয়া, এক শয্যায় শয়ন করা, এক পুষ্করিণীতে স্নান, কুষ্ঠরোগীর বস্ত্র পরিধান, উচ্ছিষ্ট বা কুষ্ঠরোগীর প্রস্তুত কোন দ্রব্য খাওয়া প্রভৃতি।

প্রতীকার—প্রচুর ব্যায়াম, পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া। খাদ্য দ্রব্য উত্তমরূপে পাক করা প্রয়োজন যাহাতে উহা অতি সহজে হজম হইয়া যায়। বাসি ও পচন যুক্ত, লবণ যুক্ত, বেশী মশলা ও গরম মশলা দ্বারা পাক করা খাদ্য, কলে অতিপরিষ্কৃত চাউল, মদ, আফিং প্রভৃতি মাদক দ্রব্য কুষ্ঠরোগীর পক্ষে একান্ত বর্জ্জনীয়।

বালক বালিকারাই এই রোগে অধিক আক্রান্ত হয়। পিতা মাতার কুষ্ঠ থাকিলে প্রসবের পর সন্তানকে স্থানান্তরিত করিলে এবং মাতা পিতার কোনরূপ সংস্পর্শে না আনিলে প্রসূত সন্তান কুষ্ঠ রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে।

* * * * *

স্বামী ভূমানন্দ এবং স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দের উদ্যোগে স্বাস্থ্য-প্রদর্শনীতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবা-বিভাগ খোলা হইয়াছিল। দরিদ্রগণের মধ্যে অতি সহজ ও সাদাসিদা ভাবে অথচ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে

কিরূপে রোগীর সেবা করা যায় তাহা দেখানই 'মিশনের' সেবা-বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল।

যাহাতে বঙ্গের প্রতি জনপদে ও জনবহুল পল্লিতে এইরূপ প্রদর্শনী খোলা হয় তাহার জন্য দেশবাসীর বিশেষ রূপে চেষ্টা করা উচিত।

জাতি-ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

(কঠোপনিষদ্)

বিশ্ব সৌন্দর্য্যের আধার পরম পুরুষকে অবগত হইবার এই অভিনব পন্থা ভারত যেদিন আবিষ্কার করিল, সেই দিন হইতে তাহার জাতীয় জীবন-প্রবাহ ভিন্নমুখে ধাবিত হইল। পূর্ব্বে যাহার উপর তাহার জাতি-ধর্ম্ম, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি প্রতিষ্ঠিত ছিল, অতঃপর তৎপরিবর্ত্তে এক নূতন বস্তুর উপর ঐ সমস্ত গঠিত হইতে লাগিল। এতদিন সে বাহিরের দিকে চলিয়াছিল, বাহির হইতে শক্তি, সৌন্দর্য্য ও সম্পদ আহরণ পূর্ব্বক তাহার জাতীয় জীবনকে মহিমান্বিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, এখন হইতে তাহার মন, বুদ্ধি, উদ্যম, সামর্থ্য ও কর্ম্ম বাহিরে বিমুখ হইয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হইল। অন্তর-গহ্বর হইতে রত্নরাজি আহরণ পূর্ব্বক সে তাহার জাতীয় জীবন-সৌধের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ইহলোক হইতে পরলোক, আধিভৌতিক হইতে আধ্যাত্মিক জগতের একাধিপত্য লাভে ভারত এখন হইতে অধিক মনোনিবেশ করিল; এখন হইতে বাহিরের মুক্তি অপেক্ষা অন্তরের মুক্তির দিকে তাহার চিত্ত অধিক আকৃষ্ট হইল। যজ্ঞ, ব্রত, তপস্যা, সমাজনীতি, রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য ও শিক্ষা সকল বিষয়কে

এখন হইতে সে তাহার জীবনাদর্শ লাভের উপায় স্বরূপ গঠন করিতে লাগিল। জাতি-ধর্ম্ম—যাহা পূর্ব্বে সূক্ষ্মরূপে ভাবের বিষয় ছিল তাহা অতঃপর সমাজে, শিল্পে ও শিক্ষায় প্রবিষ্ট হইয়া যেন নিজকে কতকটা বাস্তবে পরিণত করিল।

বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন জীবনাদর্শ আছে; উহাকে লাভ করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য—অন্যান্য বিষয় গৌণমাত্র বা ঐ মূল উদ্দেশ্য লাভের উপায় স্বরূপ। যে জাতির জীবনোদ্দেশ্য সামাজিক স্বাধীনতা লাভ, সে যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষায় উদাসীন হইবে, সাহিত্য চর্চ্চা, বাণিজ্য পরিত্যাগ করিবে, তাহা নহে, উহাদিগকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সে সামাজিক স্বাধীনতা লাভে অধিকতর সচেষ্ট হইবে, অধিকন্তু রাজনীতি, সাহিত্য ও সমাজনীতিকে এরূপভাবে গঠন করিবে যাহাতে তাহারা তল্লাভের পরিপন্থী না হইয়া উহার সহায়তা করে। ব্যাসার্দ্ধ সমূহ বৃত্তের বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া যেরূপ এক কেন্দ্রে মিলিত হয়, দেহ-যন্ত্রের শিরাসমূহ একই হৃদ্‌পিণ্ডে যেরূপ শোণিত প্রবাহ বহন করে, তদ্রূপ কোন জাতি-শরীরের শিরাসদৃশ শিল্প, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি জাতির হৃদ্‌পিণ্ডরূপ কোন এক আদর্শের দিকে তাহাদের শক্তিপ্রবাহ সঞ্চারণ পূর্ব্বক তাহাকে ক্রিয়াশীল করিয়া রাখে। ঐ শক্তিপ্রবাহ যদি রুদ্ধ বা ভিন্নমুখী হয় তাহা হইলে জাতির মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সংসারের বহু ঘাত প্রতিঘাত, সুখ দুঃখের বহু আবর্ত্ত বিবর্ত্তে পড়িয়া হিন্দুজাতি বুঝিয়াছে ইহজগতের আনন্দ অনিত্য, এই অনিত্য আনন্দের লোভ সংবরণ করিতে পারিলে নিত্যানন্দের অধিকারী হওয়া যায়। মানবের প্রতি চেষ্টায় ও কর্ম্মের মধ্যে গুপ্তভাবে ভূমানন্দ লাভের ইচ্ছা বর্ত্তমান, কিন্তু বিপথে চলিয়া সে শ্বাপদসঙ্কুল সংসারারণ্যে প্রাণ হারাইতেছে। ভূমানন্দ লাভকে একমাত্র লক্ষ্য করিয়া হিন্দুজাতি তাহার জীবন যাত্রার পথ সমূহকে ঘুরাইয়া তদভিমুখী করিয়াছে। তুমি যদি সম্মুখে অগ্রসর হও, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস পথ চলার পর নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে দেখিবে তুমি যে স্থান হইতে বহির্গত হইয়াছিলে পুনরায় তথায় আসিয়া উপনীত হইয়াছ। মানবমন বহির্ম্মুখী,

ইন্দ্রিয়ের রাজা মন অধীনস্থ ইন্দ্রিয় সমূহকে বাহিরের দিকে ছুটিবার জন্য কেবলই কশাঘাত করিতেছে। বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য তাহারা যে পথই অবলম্বন করুক—বিবাহ, বাণিজ্য, কৃষি, অধ্যয়ন, যুদ্ধ, দেশসেবা যাহারই অনুসরণ করুক, শাস্ত্রনির্দ্দেশ মত চলিলে একদিন দেখিবে, যথায় তাহারা উপনীত হইয়াছে উহা তাহাদেরই একমাত্র লক্ষ্যস্থল। বিবাহ ভোগের জন্য, কিন্তু হিন্দুর বিবাহ এরূপ একটি জিনিষের সহিত সংযুক্ত যাহা গৃহস্থকে ধীরে ধীরে ত্যাগের অভিমুখে লইয়া যায়, ধীরে ধীরে তাহার বহির্ম্মুখী মনকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া তুলে; যুদ্ধের উদ্দেশ্য স্বার্থ সিদ্ধার্থে অন্যের সর্ব্বনাশ সাধন; উহা অন্যায়—সন্দেহ নাই, কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠিত হইলে উক্ত অন্যায়জনক পাপ, পুণ্যের আকারে পরিণত হয়। তজ্জন্য হিন্দু যুদ্ধ বিগ্রহকে পাপ জ্ঞানে পরিত্যাগ করে না—যাঁহারা করেন তাঁহারা হিন্দু শাস্ত্রের আংশিক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহার সর্ব্বভাবসামঞ্জস্য উদার মতের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন নাই। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জ্জুনের এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা হইয়াছিল বলিয়াই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখে গীতার উৎপত্তি। যুদ্ধক্ষেত্রে স্বজন নিপাতে ব্যাপৃত থাকিয়াই শুদ্ধচিত্ত হইয়া অর্জ্জুন সংসার-মোহ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু ধর্ম্মের ইহাই রহস্য, হিন্দু শাস্ত্রের ইহাই বিশেষত্ব। মদীয় জাতির সকল কর্ম্ম ও সকল প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি দ্বারা আত্মার মোহাবরণ উন্মোচন করা। এমন কি যাহাকে আমরা অতি জঘন্য কুকার্য্য বলিয়া মনে করি হিন্দু শাস্ত্রে তাহারও স্থান আছে। স্থান আছে বলিয়াই বাংলায় একদিন তন্ত্র ও সহজিয়া ধর্ম্মের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছিল। বাংলার পল্লি জনপদে উহাদের প্রতিষ্ঠান সমূহ গুপ্ত ও ব্যক্তভাবে গঠিত হইয়া বহু নর-নারীকে ভোগের পথ হইতে ক্রমশঃ নিবৃত্তি মার্গে আনয়ন পূর্ব্বক তাহাদের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে।

হিন্দুর জাতি-ধর্ম্ম ভারতে ও তদেতর দেশে নিজকে অধিকতর স্থূলভাবে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য উপযুক্ত সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল। হিন্দুধর্ম্মের বিদ্রোহী সন্তান বৌদ্ধধর্ম্ম স্বদেশ ও বিদেশের

আপামর সাধারণে, শিল্প সাহিত্য কলা ও কৌশলে তাহাকে সর্ব্বজন-অধিগম্য করিয়া প্রকাশ করিতে বহুল পরিমাণ সাহায্য করিয়াছিল; সফলকামও আশাতীতরূপে হইয়াছিল। প্রাচীন বৌদ্ধ-ভাস্কর বিহার, চৈত্য ও স্তূপে, পর্ব্বত গুহায়, গিরিগাত্রে ও স্তম্ভে, ভারতীয় সভ্যতার সৌন্দর্য্য এবং আদর্শের বিশেষত্ব যাহা খুদিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা অসংখ্য নৈসর্গিক খণ্ডপ্রলয় হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আজও ভ্রান্ত হিন্দু জাতিকে করুণস্বরে নীরব ভাষায় তাহার প্রাচীন সভ্যতা এবং আদর্শকে গ্রহণ করিতে ইঙ্গিত করিতেছে। গ্রীক্ সভ্যতার গৌরবময় যুগে পাশ্চাত্য শিল্পের যে অপূর্ব্ব বিকাশ হইয়াছিল তাহা হইতে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের পার্থক্য বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। পাশ্চাত্য বাহিরের সৌন্দর্য্যে, বাহিরের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শে মুগ্ধ। সে জগদাতীত বস্তু জানে না, জানিতে চাহে না তাই মৃত্তিকার ও রক্ত-মাংসের সৌন্দর্য্যকে আদর্শ করিয়া সে তাহার শিল্পের সৃষ্টি করিয়াছিল। আর প্রাচ্য?—চিত্ত-দর্পণে যাহার রূপের প্রতিবিম্ব দর্শনে সে পাগল, যাহার অমৃতরসের বিন্দু-পরিমাণ আস্বাদনে সে উন্মাদ, যাহার বিমল কান্তির নিকট প্রকৃতির সৌন্দর্য্য তাহার নিকট চিতাভস্ম তুল্য, প্রাচ্য সেই অপার্থিব সৌন্দর্য্যকে প্রস্তরফলকে ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছে। তাই দেখিতে পাইবে—ভারত-শিল্পী বাহিরের সৌন্দর্য্য প্রকাশে উদাসীন। তাহার লক্ষ্য অন্তরের দিকে। দয়া, ধর্ম্ম, ভালবাসা, করুণা, সরলতা, নির্ভীকতা, পবিত্রতা প্রভৃতি অন্তরের সৌন্দর্য্য সমষ্টিকে বাহিরে রূপদান করিবার জন্য ভারত-শিল্পী উদ্গ্রীব। পাশ্চাত্য শিল্প দর্শনে তুমি বাহিরের দিকে আকৃষ্ট হইবে, তথা প্রাচ্যশিল্প তোমার মনকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া অন্তরতম পুরুষের রূপ ও গুণ চিন্তায় উহাকে নিমগ্ন করিবে। দেশের সাহিত্য ও শিল্পে স্বীয় জাতি-ধর্ম্মের আদর্শ। আঁকিয়া, খুদিয়া, মূর্ত্ত করিয়া প্রাচীন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ উহাকে বিদেশে বিজাতিগণের মধ্যে প্রচার করিতে অত্যন্ত যত্নবান হইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য—যে-ধনে তাঁহারা ধনী, জগতের সকল জাতিকে তাহা দান করিয়া তাহাদিগকে ঐশ্বর্য্যবান করা।

ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, চীন, জাপান, এসিয়া মাইনর প্রভৃতি প্রাচ্যের বহু-দেশে তাহারা ভারতীয় জাতি-ধর্ম্মের আদর্শ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এসিয়ার বহু অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য শিশু-জাতি ভারত জননীর পীযূষধারা পানে মানুষ হইয়াছে। এমন কি, বর্ত্তমান খৃষ্ট-জগৎও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী। একদল প্রচার-ধর্ম্মশীল বৌদ্ধভিক্ষু হইতে খৃষ্ট-ধর্ম্মের উৎপত্তি ইহা আজ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বাক্য। এইরূপে ভারতীয় জাতি-ধর্ম্ম বৌদ্ধভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক বিভিন্ন দেশে নীত হইয়া তাহাদের সমাজ ও শিক্ষার বহুল পরিমাণ উন্নতি সাধন করিয়াছিল। শুধু ভিক্ষুগণ নহেন, প্রাচীন ভারতীয় বণিকগণও বাণিজ্য ব্যপদেশে ভারতবহির্ভূত নানা স্থানে স্বীয় জাতি-ধর্ম্মের শক্তিপূত বীজ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল যাহা বিভিন্ন দেশে উপ্ত হইয়া ভূমির গুণগত ভেদানুসারে আজ শুভাশুভ ফল প্রসব করিতেছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের পর হিন্দুধর্ম্ম নবীন আকার ধারণ করিল। বৌদ্ধধর্ম্মের বহু জিনিষ সে নিজস্ব করিয়া লইল। হিন্দুধর্ম্মের অদ্বৈতবাদ যাহা পূর্ব্বে যোগীদিগের ধ্যান এবং দার্শনিকগণের বিচারের বস্তু ছিল, তাহা অতঃপর নানা দেবদেবীর মূর্ত্তিরূপে বাস্তবে পরিণত হইয়া সর্ব্বজন-অধিগম্য হইল। এইরূপে হিন্দুর জাতি-ধর্ম্ম ধীরে ধীরে আপামর সাধারণে বিস্তার লাভ করিতে লাগিল। ভারতীয় শিশু জ্ঞান হইবার সঙ্গে সঙ্গে মাতাপিতার নিকট হইতে শিক্ষা পাইত এবং এখনও পায়—ভগবান ও পরলোক আছেন এবং ভগবানকে লাভ করিয়া প্রকৃত আনন্দের অধিকারী হইবার জন্য সে ইহলোকে মানবশরীরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কারণ একমাত্র মানবই অমৃতের অধিকারী। ভারতীয় নারী অশিক্ষিতা তথাপি পবিত্রতার আদর্শ তাঁহার নিকট জলন্ত, সতীত্বের গৌরব তাঁহার নিকট 'স্বর্গাদপিগরীয়সী'। যে আত্মা বা বাসুদেব সর্ব্বভূতে আছেন ভারতীয় সতী তাঁহাকে পতিমধ্যে দর্শন করিয়া শিবভাবে তাঁহার সেবা ও পূজা করেন। পতিকে শিবভাবে সেবা করিয়া সতী স্ত্রী ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন ইহার প্রমাণ ভূরি ভূরি না থাকিলেও মহাভারতাদি পুরাণে একেবারে বিরল নহে। পতিকে শ্রীভগবানের মূর্ত্তবিগ্রহরূপে পূজা করা

ভারতের বৈশিষ্ট্য, তাহার নিজস্ব সম্পত্তি। আত্মা আছেন বলিয়াই স্ত্রী পতিকে, পতি স্ত্রীকে ভালবাসেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাশ্চাত্যভাবে ভাবিতা মহিলাগণ এই উচ্চ ভাব বুঝিতে না পারিয়া বৃথা তর্ক যুক্তিতে বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দেন। তাঁহারা বলেন, "পতিকে দেবতা বলিয়া পূজা করা স্ত্রীলোকের পক্ষে অতি হীন কাজ, তাহাতে স্ত্রীর-গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়।" ভারতভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভারতীয় জাতি-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্যের সহিত পরিচিতা নহেন বলিয়াই তাঁহারা ঐরূপ বলিয়া থাকেন। আত্মা সর্ব্বব্যাপী, স্ত্রী পতির মধ্যে সেই আত্মাকেই পূজা করেন। যদি শিলাখণ্ডে বা মৃন্ময় প্রতিমায় সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া উপাসক ক্রমে নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন, তাহা হইলে রক্ত মাংস নির্ম্মিত, চৈতন্য বিশিষ্ট পতি-বিগ্রহে উপাসিকা সতী সেই আত্মার পূজা করিয়া কেন না উচ্চগতি লাভ করিবেন? যদি দরিদ্র-নারায়ণের পূজা কিছুমাত্র অগৌরব জনক না হয়, তবে পতি-নারায়ণের পূজাই বা কেন অগৌরবের বস্তু হইবে? যাঁহারা পতি-হৃদয়ে আত্মাকে দেখিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে জানেন না, পতিকে রক্ত-মাংসের দেহবিশিষ্ট কোন এক যন্ত্রস্বরূপ বলিয়াই মনে করেন, তাঁহারা বলিতে পারেন—পতিকে দেবতা বলিয়া পূজা করিব কেন? কিন্তু এইরূপ জড়বুদ্ধি ভারতীয় নারীর পক্ষে শোভনীয় নহে। হিন্দুনারীই কেবল পতিকে দেবতা বলিয়া পূজা করেন না, হিন্দু পুরুষও স্ত্রীকে দেবী বলিয়া পূজা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সারদামণি দেবীকে পরমাত্মার সহিত অভেদ শ্রীশ্রীজগন্মাতার মূর্ত্ত বিগ্রহ জানিয়া ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন ইহা ষোড়শী রমণীর রূপ যৌবনের পূজা নহে, ইহা আত্মার পূজা, জগজ্জননীর পূজা, সতীত্বের পূজা, নারী-ধর্ম্মের পূজা। হিন্দুর জাতি-ধর্ম্ম পুনঃ প্রকাশের জন্য বর্ত্তমান কালে শক্তিরূপিণী নারী পূজার প্রয়োজন তাই যুগাবতার স্বয়ং তাহার অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন।

কথা-প্রসঙ্গে মূল বিষয় হইতে আমরা বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন মূল বিষয়ের আলোচনা করা যাক্। ইহা নিশ্চিত যে আমাদের

জাতি-ধর্ম্ম সূক্ষ্ম হইতে ক্রমশঃ স্থূলে রূপান্তরিত হইতেছে। সকল বস্তু সম্বন্ধেই প্রকৃতির এই একই নিয়ম কার্য্যকরী। অব্যক্ত ব্যক্ত হইতেছে, কিছুদিন ব্যক্ত ভাবে থাকিয়া পুনরায় অব্যক্তে লীন হইবে।

"অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥"

অথবা "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যং প্রবিশন্ত্যভিসংবিশন্তি।" সেই আদি কারণ হইতে সৃষ্ট হইয়া সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণবৈষম্যে বিশ্ব স্থূল হইতে স্থূলতর ও স্থূলতমরূপে পরিণত হইতেছে, কালক্রমে পুনরায় উহা সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতমরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গুণসাম্যাবস্থায় একেবারে প্রকৃতীতে লীন হইয়া যাইবে। এই সৃষ্টিচক্রের সঙ্গে সঙ্গে জীব অবিরাম মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে, এই চেষ্টা তাহার স্বাভাবিক। গুটিপোকা স্বেচ্ছায় আপনার নালে আপনি বদ্ধ হইয়াছে, একদিন স্বেচ্ছায় সে ঐ গুটি কাটিয়া বাহির হইয়া যাইবে। ব্রহ্ম জীবাত্মারূপে আপনার মায়ায় আপনি বদ্ধ হইয়া অধঃপতিত হইয়াছেন যখন তিনি অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইবেন, যাহার নিম্নে আর অধঃপতন হইতে পারে না, তখন তাঁহার ক্রমোন্নতি আরম্ভ হইবে অর্থাৎ মায়াপাশ উন্মুক্ত হইতে থাকিবে, যতদিন না তিনি স্বস্বরূপকে প্রাপ্ত হইতেছেন। আমরা সেই দ্বন্দ্বাতীত, অনন্ত ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মবস্তু হইতে আসিয়াছি ইচ্ছা না করিলেও একদিন তাঁহাকে লাভ করিব—এই ক্রমোন্নতিকে কেহ রোধ করিতে পারিবে না, কিন্তু এই ব্রহ্মাভিমুখী গতি চেষ্টাকৃত হইলে অধিকতর দ্রুতগামী হয়। আমরা যতই স্থূল হইতে স্থূলতর হইতেছি, আমাদের জাতি ধর্ম্মও তত স্থূলরূপে পরিণত হইয়া সেই সত্যবস্তুকে স্থূলভাবে আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিতেছে। সূক্ষ্ম স্থূলের গ্রাহ্য নহে, তাই মদীয় দেশাচারিত ধর্ম্ম সেই সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, দুর্ব্বোধ্য, অদ্বৈত ব্রহ্মকে আমাদের কথঞ্চিৎ বোধগম্য করিবার জন্য নানা কাল্পনিক রূপদান করিয়াছে, যদি আমরা ছায়াকে অবলম্বন করিয়া প্রকৃত কায়াকে কোন দিন ধরিতে পারি। ভারতীয় জাতি-ধর্ম্ম এইরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত। সুগায়ক

বাদ্যযন্ত্রের সহিত সুর মিলাইয়া যেরূপ সংগীতালাপ করেন, তাঁহার সুর যখন ধীরে ধীরে সপ্তমে উঠিয়া নামিতে থাকে তখন বাদ্যযন্ত্রও যেরূপ উঠিয়া এবং নামিয়া সেই সুরের সহিত একতানতা রক্ষা করে, তদ্রূপ কোন অপূর্ব্ব শিল্পী আমাদের মনের উচ্চাবচ গতির সহিত আমাদের ধর্ম্মকেও এক তারে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, উহা আমাদিগকে অগ্রে বা পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে পারিবে না। হিন্দুর এই মহামহিমপূর্ণ জাতি-ধর্ম্মকে জগতের অন্যান্য তথাকথিত সভ্যজাতি কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া অবজ্ঞা করেন, কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে এই অবজ্ঞাত ধর্ম্মই হিন্দুজাতিকে তাঁহাদের শত সহস্র অত্যাচার ও ষড়যন্ত্র হইতে অদ্যাবধি রক্ষা করিতেছে। এই বিশাল, উদার ধর্ম্মে উচ্চ নীচ সকলেরই যথাযোগ্য স্থান আছে। স্থান আছে বলিয়াই নিরাকার ব্রহ্মধ্যান হইতে ষষ্ঠীপূজা পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত। সকলকেই ব্রহ্মচিন্তা বা সকলকেই ষষ্ঠীপূজা করিতে হইবে এইরূপ বাধ্যতামূলক আইন প্রচলন করিয়া কোন হিন্দুরাজা কখনও তাঁহার প্রজাবর্গকে হত্যা করেন নাই। যে সক্ষম সে ব্রহ্মচিন্তা করুক, যে অক্ষম সে তাঁহারই প্রতীক জ্ঞানে ষষ্ঠীপূজা করুক—ইহাই হিন্দুধর্ম্মের ঘোষণাপত্র। যদি কেহ নির্গুণ বা সগুণ ব্রহ্মচিন্তা করিতে না পারে, সে কি ধর্ম্মহীন পশুজীবন যাপন করিবে? যদি সুকুমারমতি বালক একেবারে বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম হয় তবে তাহার কি বিদ্যাশিক্ষার কোনই আবশ্যকতা নাই—অথবা প্রাথমিক শিক্ষাদানে তাহাকে উচ্চশিক্ষার অধিকারী করিতে হইবে? এইরূপে হিন্দুধর্ম্ম সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে অবরোহণ করিয়াছে বলিয়াই হিন্দুজাতির দরিদ্র, অশিক্ষিত জনগণও ধর্ম্মপ্রাণ এবং হিন্দুধর্ম্মের ভিতর হইতে এত অধিক সংখ্যক ধর্ম্মবীর মহাপুরুষগণের উদ্ভব হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে হিন্দুধর্ম্ম যেরূপ স্থূলভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে, আমরা চাই—সে তদপেক্ষাও অধিকতর স্থূল হউক। হিন্দুজাতির—শুধু হিন্দুজাতির কেন—পৃথিবীর মধ্যে এরূপ কেহ যেন না থাকেন যিনি মনোগত ভাবানুযায়ী তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস ইহার মধ্যে খুঁজিয়া না পাইবেন। —চন্দ্রেশ্বরানন্দ।

শীত

কে সৌম্য সন্ন্যাসী ! ওগো শুচি শুভ্র বেশ,
স্পন্দ লেশ হীন !
স্তিমিত নয়নে জাগে কি দিব্য আবেশ,
অন্তর নিলীন !
ধ্যান মৌন শঙ্করের অঙ্গের বিভূতি
বদ্ধ জটাজুটে
কি রৌপ্য ধবল ভাতি, তুষার মণ্ডিত
চন্দ্রমা মুকুটে।
কোন্ প্রয়োজনে ত্যজি, যোগ হিমাদ্রির
সমাধি কন্দর—
আজি এ মায়ার রাজ্যে শুভ পদার্পণ,
হে বৈরাগিবর ?
জেগেছে গৈরিক আভা, পক্ক সুরসাল,
কমলার বনে,
এসেছে আদেশ বাণী ত্যাগ তপস্যার
নির্ম্মম পবনে।
পাদপ ত্যজেছে পত্র, পুষ্প বর্ণ বাস,
বিশীর্ণ বনানী,
বিলাস বর্জ্জিত বিশ্ব, ভয়ে রুদ্ধ শ্বাস
চরাচর প্রাণী।
শুধু পুলকিত তব শুভ আগমনে,
এ বিশ্ব সংসার,
আজি আমি কহ স্বামি ! কি দিব তোমায়,
পূজা উপহার।
তৃষিত এ বুক ভার, সুখ দুঃখ সহ
লভুক বিলয়,
ও অভয় পদপ্রান্তে, হে দেব মহান্
হোক্ তব জয় !

শ্রীনীহারিকা দেবী।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের ভবিষ্যৎ

বিগত অগ্রহায়ণ সংখ্যা "উদ্বোধনে" জনৈক 'নিবেদক' শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের ভবিষ্যৎ কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে সকলকে আলোচনায় আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহার সাধু-আহ্বানে সাড়া না দিয়া থাকা অনুচিত বিবেচনা করিয়া সাধ্যানুসারে এই কিঞ্চিৎ পত্রস্থ করিতেছি।

'নিবেদক' শিক্ষাদানের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন—ইহা তাঁহার সূক্ষ্ম দর্শিতারই পরিচায়ক। "রুগ্ন, দৈবদুর্য্যোগে পীড়িতগণের সেবার আদর্শ দেশবাসী গ্রহণ করিয়াছেন"——এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের অতঃপর 'শিক্ষা'-দানের প্রতি বিশেষ মনঃসংযোগ করিতে হইবে। কারণ শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 'দৈবদুর্য্যোগ ও কম ঘটিবে এবং রুগ্নের সংখ্যাও হ্রাস পাইবে, এমত আশা করা অন্যায় নহে। দ্বিতীয়তঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন স্থাপনকারীর মনে দেশকে Negative education এর কবল হইতে মুক্তি দান করিয়া Man-making education দানের ব্যবস্থা করিবার একটি প্রবল ইচ্ছা সদা-সর্ব্বদা জাগরিত ছিল, আর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন তাঁহারই নিকট হইতে এই কর্ম্মভার দায়স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে। কিরূপ ভাবে এই শিক্ষাদান সম্ভব হইতে পারে 'নিবেদক' তাহা আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা শিক্ষাদান ব্যাপারটি আর একটু সূক্ষ্মতর ভাবে অনুধাবন করিয়া দেখিব।

বুদ্ধ-চরিত্রের সহিত বিবেকানন্দ-চরিত্রের যত সামঞ্জস্য আছে, বোধ করি আর কাহারও সহিত তত নাই। হয় ত বা সেইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘ বৌদ্ধ সংঘের সহিত আশ্চর্য্য রকমে সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিয়াছে। শুধু এই 'মহাসম্মেলন' দেখিয়াই আমি এই মীমাংসায় উপনীত হই নাই। স্বামী নির্ব্বেদানন্দ কর্ত্তৃক যে দিন দেওঘরে বিদ্যামন্দিরের ভিত্তি পত্তন হইয়াছে, মান্দ্রাজ হইতে যে দিন 'Female college' প্রতিষ্ঠার বিজ্ঞাপন

প্রচারিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে মিশন-পক্ষ হইতে ছোট বড় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যগ্রতা যে দিন প্রত্যক্ষ করিয়াছি সেই দিনই বুঝিয়াছি শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের শিক্ষাদানব্রত আরব্ধ হইয়াছে—এইবারে শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের Intellectual Evolution এর যুগ। শ্রীবুদ্ধের দেহত্যাগের পর কিছুকাল পর্য্যন্ত কেবল তাঁহার বাণীই প্রচারিত হইয়াছিল। লোক-হিতই তখনকার ভিক্ষুগণের ব্রত ছিল। বৌদ্ধ-সংঘের Intellectual Evolution হইতে সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। Intellectual Evolution মানে এই নহে যে, শ্রীবুদ্ধ বা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যে সত্য নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তদপেক্ষা উন্নততর সত্যাবিষ্কার। আমার অর্থ এই যে, কোন ধর্ম্মনায়কের সময় হইতে তাঁহার দেহত্যাগের কিছুকাল পর্য্যন্ত একটা Intense Spiritual feeling তাঁহার অনুগতগণকে আবিষ্ট করিয়া রাখে। শ্রীগুরুর বাণীর পুনরুল্লেখ ছাড়া তাঁহাদের দ্বারা আর বেশী কিছু সম্ভব হয় না। কালে অর্থাৎ Extensity বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে Intensity কমিয়া আসে। তখন একদল ধর্ম্ম-সংস্থাপকের স্থূল কায়ের পূজামাত্র সার করেন, এবং আর একদল গভীর চিন্তা ও আলোচনার সাহায্যে তাঁহার বাক্যাবলির উপর টীকা ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া নূতন নূতন দার্শনিক মতবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। ইহাই Intellectual Evolutionএর যুগ, কারণ চিন্তারাজ্যে জাগ্রত সভ্যেরাই কোন সংঘের নিয়ামক হন, বাদবাকী স্থূলবুদ্ধি যাঁহারা, ইতিহাস তাঁহাদের কোন খোঁজ খবরই রাখে না। অনেকের ধারণা আছে—এ যুগের বাণী সব তো মাতৃ-ভাষাতেই, তাহার আবার টীকা ভাষ্য কি! অচিরেই তাঁহাদের ভ্রম ভাঙ্গিবে। তাঁহাদের কথঞ্চিৎ ধারণা জন্মাইবার জন্য 'ভারতের সাধনা' পুস্তকখানি পড়িতে অনুরোধ করি। "So long as mankind thinks, there will be sects." বিভিন্ন মতের জন্ম হইবেই। এখনি আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীবিবেকানন্দ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ দেখিতে পাইতেছি না কি? কাহারও মতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তি-মার্গই প্রচার করিয়াছেন, আবার কাহারও মতে জ্ঞান ও কর্ম্মের উপরেও তিনি সমান জোর দিয়াছেন। কাহারও মতে বিবেকানন্দ ভগবান লাভের পর লোকহিত ব্রত অনুষ্ঠান

করিতে উপদেশ দিয়াছেন, আবার কাহারও মতে লোকহিত ব্রতই ভগবান লাভের সহায় হয়, ইহাই বিবেকানন্দের উপদেশ। শ্রীবুদ্ধ সম্বন্ধেও তাই। শ্রীবুদ্ধের দেহত্যাগের কিছু কাল পরে প্রশ্ন উঠিল—ভগবান বুদ্ধদেবের জন্ম কি সাধারণ মানুষের মতই হইয়াছিল? কেহ বলিলেন, সাধারণের মতই; কিন্তু ইহাতে সাধারণের মনস্তুষ্টি হইল না। অধিকাংশের মতে শ্রীবুদ্ধ অনৈসর্গিক উপায়ে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। কিছু কাল পরে আর একদল প্রচার করিলেন—শ্রীবুদ্ধ জন্মগ্রহণই করেন নাই, 'আনন্দের' হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া 'আনন্দের' শ্রীমুখ দিয়াই স্বীয় বাণী প্রচার করিয়াছেন। শ্রীবুদ্ধের দেহত্যাগ হইলে কেহ বলিলেন—তিনি নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর কোন অস্তিত্বই নাই। আবার কেহ বলিলেন, তিনি সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থান করিতেছেন। কাহার কাহারও মতে শ্রীবুদ্ধের প্রকৃত শিষ্য হইতে হইলে "বিনয়"কেই প্রধান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আবার অন্য একদলের মতে—"বিনয়" সত্য লাভের সহায়ক কতকগুলি নিয়ম মাত্র, "সূত্র"ই প্রধান, কারণ "সূত্রই" সত্য। *

বৌদ্ধ ধর্ম্মেতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই বৌদ্ধ ধর্ম্মান্দোলনের কেন্দ্র এক এক সময়ে এক এক স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। কোন স্থানে কেন্দ্র স্থানান্তরিত হইবার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় ঐ সময়কার উক্ত আন্দোলনের চিন্তা-রাজ্য-নায়কের স্থিতিস্থানই ঐরূপ ঘটনার মূলে। উহা ছাড়া যখন যে স্থলে বৌদ্ধ শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, সেই স্থানই অচিরে ধর্ম্ম কেন্দ্রও হইয়া উঠিয়াছে। তক্ষশিলা, নালন্দা ও বিক্রমশিলার যুগ অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে। কোন সংঘের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণই [illegible] সেই সংঘ নিয়মন করেন। কেবল ইহাই নহে, Intellectual Culture ব্যতিরেকে সংঘের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। কারণ, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,

---

* এই প্রকারের বিভিন্ন মতবাদের জন্য হইতেই বৌদ্ধ-সংঘের বিভাগ ঘটিয়াছিল। ইতিহাসের এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়া যাহাতে বর্ত্তমান সংঘে ব্যক্তিগত মতবাদের স্বাধীনতা দিলেও বিভাগ না ঘটে 'সম্মেলনের' সেইরূপ কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য।

Extensity বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ ভাবে (Exception থাকিতে পারে ও থাকিবে) Intense Spiritual Feeling কমিয়া আসিবে। Intellect ব্যতীত তখনকার বৃহত্তর সংঘ নিয়মন অসম্ভব।

Intellectual culture দুই ভাবে হয়—অপরকে শিক্ষাদান ও নিজে বিদ্যা অর্জ্জন। অপরকে শিক্ষাদান দুই রকমে সম্ভব হয়—(১) বিদ্যালয় স্থাপনদ্বারা এবং (২) দার্শনিক ও ধর্ম্মনিয়ামক জ্ঞানপ্রচারদ্বারা।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা ব্যতীত দেশের মঙ্গলের কোনই সম্ভাবনা নাই। আগেকার প্রণালী অবলম্বন বর্ত্তমানে অসম্ভব। ছাত্রনিবাস, বিদ্যাপীঠ ইত্যাদির সাহায্যেই গৌরবময় যুগের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। 'নিবেদক' এতদ্ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

স্রোতের জলে ময়লা জমে না। ময়লা না জমিবার জন্য সংঘকেও সর্ব্বদা গতিশীল রাখিতে হইবে। প্রচারই তাহার উপায়। প্রচারক ও শিক্ষাদাতৃগণের জ্ঞানস্পৃহা দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। প্রচারশীল সংঘে তমোভাব স্থান লাভ করিতে পারে না।

সভাগণকে একটা নির্দ্দিষ্ট কাল উপযুক্ত Training দিয়া Training এর ব্যবস্থা করিতে হইবে বিদ্যালয়ে বা ছাত্রাবাসে শিক্ষাদান (কেবল বই পড়ান নয়) অথবা প্রচার কার্য্যে প্রেরণ করিলে উল্লিখিত "শিক্ষা-অর্জ্জনের" নিমিত্ত স্বতন্ত্র উন্নততর ব্যবস্থা না থাকিলেও সংঘ কখনও মূঢ়তা প্রাপ্ত হইবে না। Lay-Memberদের কর্ত্তব্য হইবে, আর্থিক ও অন্যান্য যে উপায়ে সম্ভব এইরূপে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনে সহায়তা করা।

বিষয়গুলি উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম। সংঘের যোগ্যতর ব্যক্তিগণ Scheme প্রস্তুত করিবেন। আমার বিশ্বাস আছে কালে সকলই হইবে—এই আন্দোলনের পিছনে যে পুঞ্জীভূত শক্তি রহিয়াছে, বিকাশ তাহার হইতেই হইবে।

শ্রীরমণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সকলি জানো

আমার সকলি জানো।
মনের নিভৃত গুহায় যা আছে
রেখেছ সে সন্ধানো।
তোমারে গোপন করা শুধু মিছে
দৃষ্টি তোমার সুমুখে ও পিছে
মম কল্পনা যাহারে জানে না
সেখানে নয়ন হানো,
আমার সকলি জানো।
একি মায়া হায়! তবু আমি চাই
তোমারে কিছু না জানাতে,
কালো মুখে মোর রং যে মাখিয়ে
কুৎসিতগুলি ঢাকিতে।
ুমি, সঞ্চার বারি জীবনের ঝড়ে,
মিছা আবরণ হায় খসে পড়ে,
হাসে লোক যত হেরি নগ্নতা
করে কত অপমানো,
আমার সকলি জানো।
ভাঙ ভাঙ মায়া অচলায়তনে
অবাধ কর হে মনেরে,
আপনার সনে ছলনা করিয়ে
ক্লান্ত হয়েছি এবারে,
বুঝিতে পেরেছি তুমি যাহা দিবে
মঙ্গল শুধু বিষাদ ঘুচিবে,
করমের পাশ খসিয়া পড়িবে
শান্তির কোলে টানো,
আমার সকলি জানো।

—অসিতানন্দ।

ভাই লরেন্স

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ভাই লরেন্সের সাধনার একমাত্র লক্ষ্য ও জীবনের একমাত্র অভিলাষ ছিল ভগবানের চির সান্নিধ্য প্রত্যক্ষ ও তজ্জনিত আনন্দ উপভোগ করা। তাঁহার সাধন প্রণালীও এরূপভাবে নিবদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার নিকট প্রার্থনার নির্দ্দিষ্ট সময়, অন্য সময় হইতে পৃথক ছিল না। নিয়মানুসারে প্রার্থনার নির্দ্দিষ্ট সময়ে তিনি উপাসনা করিতে যাইতেন বটে, কিন্তু ঐরূপ করার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। কারণ, মহা কাজের মধ্যেও তাঁহার মন ভগবান হইতে বিচলিত হইত না। তিনি বলেন, প্রার্থনার সময় ও অন্য সময়ের কোন রকম পৃথক প্রভেদ আছে মনে করা নিতান্ত ভুল। উপাসনার সময় যেরূপ প্রার্থনা দ্বারা ভগবানকে স্মরণ করি, ঠিক সেইরূপ ভাবে কাজের সময়ও কাজের মধ্য দিয়াই আমরা মনকে ভগবানে নিবদ্ধ করিতে পারি। এইরূপ নিজের জীবনে তিনি কর্ম্মযোগের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন—এক কাজ পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রকার কাজ আরম্ভ করিলেই আমরা জীবনে ধর্ম্মভাব আনয়ন করিতে পারি না; তাহার জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ হইতেছে—আমরা সাধরণতঃ নিজের জন্য যে সব কাজ করি, সেগুলি ভগবানের উদ্দেশে করা। তাঁহার এই অভিমত তিনি নিজের জীবনে কার্য্যে-পরিণত করিয়া উহার সত্যতা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে দীর্ঘ পনর বৎসরকাল সামান্য পাচকের কার্য্য করিতে হয় ঐ কাজের জন্য তাঁহার একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা ছিল। কিন্তু সকল কাজই ভগবানের নামে করিতেন বলিয়া এই অপ্রীতিকর কার্য্যও তাঁহার নিকট প্রীতিকর হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাতে তাঁহার কোন রকম কষ্ট হইত না। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, তিনি রান্না ঘরের কাজেই বেশ আছেন, তবে যে কোন মুহূর্ত্তে

উহা ছাড়িয়া দিয়া যাইতে তিনি প্রস্তুত, কারণ যে কোন অবস্থায় ভগবানের জন্য একটু সামান্য কাজ করিতে পাইলেই তাঁহার আনন্দ। কর্ম্মের মধ্য দিয়া উপাসনা করিবার তিনি এক সুন্দর নিয়মপ্রণালী আবিষ্কার করেন। প্রথমতঃ রান্না ঘরে ঢুকিবার পূর্ব্বে কিছু সময় প্রার্থনা দ্বারা মনকে ভগবদ্ভাবে উদ্দীপিত করিয়া লইতেন, তারপর রান্না ঘরে ঢুকিয়া সব জিনিষ পত্র সাজাইয়া লইয়া এবং কোনটার পর কোনটা করিতে হইবে ঠিক করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতেন। তার পর ফাঁকে ফাঁকে এবং রান্নার পূর্ব্বে ও পরে প্রার্থনা করিতেন। রান্না আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন—তিনি ভগবানের নামেই এই কার্য্য আরম্ভ করিতেছেন, এই কার্য্যের মধ্যে ও সকল সময়ে যেন তিনি তাঁহার উপস্থিতি উপলব্ধি করিতে পারেন এবং ভগবান যেন তাঁহার ভক্তি পূর্ণ কার্য্যগুলি গ্রহণ করেন। রান্না শেষ হইলে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে কি না; যদি হইয়া থাকে তবে ভগবানকে আবার ধন্যবাদ দিতেন! যদি কাজের মধ্যে কোন ভুল বাহির হইত, তবে ভগবানের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেন এবং তজ্জন্য মন আর খারাপ না করিয়া যেন কিছুই হয় নাই এরূপ ভাবে নিজের সাধন পথে চলিতে থাকিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—এরূপ ভাবে সফলতা বিফলতার মধ্য দিয়া অবিরত চেষ্টা করিতে করিতে মন এরূপ অবস্থায় আসিয়াছে যে এখন ভগবানকে স্মরণ করা অপেক্ষা ভগবানকে ভুলিয়া যাওয়াই আমার পক্ষে অধিকতর অসম্ভব। দেখা যাইত, রান্না ঘরে নিতান্ত তাড়াতাড়ির মধ্যেও তাঁহার মন যেন স্বর্গীয় রাজ্যে অবস্থিত থাকিত—কোন সময়ই তিনি ভগবানের ভাব হইতে বিচ্যুত হইতেন না। তাঁহার কার্য্যের মধ্যে কোন ব্যস্ততার লক্ষণ প্রকাশ পাইত না। তিনি কখনও থতমত খাইতেন না, সব সময়েই একটা ধীর গম্ভীর প্রশান্ত অবস্থায় থাকিতেন। তাঁহার চেহারার ভিতর দিয়াই এরূপ একটা স্বর্গীয় আভা ফুটিয়া বাহির হইত—এমন একটা নির্ম্মল প্রশান্ত ভক্তির ভাব দৃষ্ট হইত যে, যে তাঁহাকে একবার দেখিত, সেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। তিনি বলিতেন,—আমার কাজের সময়ের এবং

প্রার্থনার সময়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। রান্না ঘরের এই গণ্ডগোল, চেঁচামেচির মধ্যে যখন চারিদিক হইতে নানা লোক একই সময়ে আমাকে ডাকাডাকি করিতেছে তখনও—নত জানু হইয়া উপাসনা করিতে বসিলে যেরূপ হয়, ঠিক সেইরূপ প্রশান্ত ভাবে ভগবানে মন রাখিতে পারি।

ইহা শুনিতে আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু সাধু মহাপুরুষদের জীবন আলোচনা করিতে যাইয়া তাঁহাদের সিদ্ধির দিকটা আমরা যত দেখিতে চাই, তাঁহাদের সাধনার বিষয় তত মনে করি না। আমরা বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের উপর যেরূপ স্বর্ণময় আবরণ দিয়া একটা দূর স্বপ্ন-রাজ্যের সৃষ্টি করি, তাঁহার ছয় বৎসরব্যাপী প্রাণপণ কঠোর সাধনা দ্বারা অস্থিকঙ্কালসার হওয়ার কথা তত তলাইয়া দেখি না; যীশু-খৃষ্ট একমাত্র ঈশ্বর-তনয় বা একমাত্র মুক্তিদাতা কি-না ইহা লইয়া যেরূপ বাকবিতণ্ডা ও তর্কবিতর্কের ঝড় তুলি, যীশুখৃষ্ট যে এক সময় দিনের পর দিন আহার নিদ্রা ভুলিয়া 'ভগবান ভগবান' করিয়া বনে জঙ্গলে কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন সেই কথা—যে কথাটা আমাদের পক্ষে বেশী প্রয়োজনীয় ও শিক্ষনীয়, তাহা একেবারে ভুলিয়া যাই। ভাই লরেন্সের বিষয়ে কথিত আছে—আধ্যাত্মিক জগতে তিনি অবিরত জোয়ারের স্রোতেই ভাসিয়া গিয়াছিলেন, ভাঁটার টানে কি যাতনা তাহা তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় নাই, কিন্তু তাঁহার জীবনের কথাও একটু ভাল ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই, তাঁহাকেও এক সময় কত আশা নিরাশা, সুখ দুঃখ, সফলতা বিফলতা, আলো অন্ধকারের ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছিল। ভাই লরেন্স এক স্থলে নিজে স্বীকার করিয়াছেন—বলিতে কি প্রথম দশ বৎসর কি কষ্টই পাইয়াছি! ভগবানে যথেষ্ট ভক্তি আসিত না—তারপর, পূর্ব্বে কত অন্যায় করিয়াছি সেই সব চিন্তা অসম্ভব জ্বালাতন করিত। এই সময়টা যেন অনবরত উত্থান পতনের মধ্য দিয়া চলিয়াছিলাম। এক এক সময় মনে হইত, সমস্ত জগৎ, এমন কি নিজের বুদ্ধি এবং স্বয়ং ভগবান পর্য্যন্ত আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন—একটা বিশ্বাসের ক্ষীণ রশ্মি যেন তখন আমাকে জীবিত রাখিয়াছিল। এক একবার মনে

হইত, ভগবানের নিকট যে সব কৃপা-নিদর্শন লাভ করিয়াছি বলি, তাহা সব মনের ভ্রম মাত্র—শুধু আমার এক প্রকার খেয়াল—আমার আর কোন রকম আশা নাই; শেষে এমন এক অবস্থা আসিয়াছিল যখন মনে হইত,—সারাটা জীবন এরূপ ভাবেই কাটিবে এবং তাহার জন্যই তৈয়ার হইতে হইবে। তারপর হঠাৎ যেন একদিন একটা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন বোধ করিলাম, এত দিনের অশান্তি যেন কোথায় চলিয়া গেল—প্রাণের ভিতর একটা গভীর শান্তির আস্বাদ পাইলাম, মনে হইল যে এত দিন পরে একটা বিশ্রামের স্থানে দাঁড়াইতে পারিয়াছি।

ইহার পর আর ভাই লরেন্সকে কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই, ভগবানকে লইয়াই তিনি অনবরত থাকিতেন, ভগবান ছাড়া তাঁহার কোন চিন্তাই ছিল না, ভগবানের অপ্রীতিকর কোন কার্য্য তিনি করেন নাই। এত দিনের পরিশ্রমের পর তিনি যে শান্তি লাভ করিযাছিলেন—তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে আর তাহার বিচ্যুতি হয় নাই। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে একজনকে লিখিয়াছিলেন—"অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার কোলে আশ্রয় পাইব। জীবনে এই একটা আনন্দ পাইতেছি, যে এখন বিশ্বাসের মধ্য দিয়া তাঁহার দর্শন পাই। এই দর্শনটা এত প্রত্যক্ষ যে বলিতে হয়, আমি যে ভগবানকে বিশ্বাস করি তাহা নয়, আমি ভগবানকে চক্ষু দ্বারা দর্শন করি।"

ইহার কিছুদিন পরেই আশী বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন। ভাই লরেন্সের জীবনে কোন ঘটনা বৈচিত্র্য নাই; জনকোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও লোকচক্ষুর অন্তরালে তিনি এক অদ্ভুত বিমল মধুর জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন—তাঁহার অন্তর নিহিত জীবনের যে খবর পাইয়াছে, সে কখনও ভাই লরেন্সকে ভুলিতে পারিবে না। তিনি নিজের জীবনের কথা খুব গোপন রাখিতেন, বাহির হইতে কেহ কিছু জানিতে পারিত না। শুধু তাঁহার সঙ্গে একজনের কয়েক দিনের কথাবার্ত্তা ও অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট লিখিত কয়েক খানা চিঠি হইতে তাঁহার জীবনের কথা সকলের নিকট বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ঐগুলি সংবদ্ধ হইয়া ক্ষুদ্র

লিপিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে—উহার নাম—(Practice and Presence of God) "ভগবানের সান্নিধ্য ও তল্লাভের উপায়"।

শ্রী—

মাধুকরী

বৌদ্ধযুগে স্ত্রীধর্ম্ম

অন্যান্য যুগের ন্যায়, বৌদ্ধযুগেও নারী জীবন তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—কন্যা, স্ত্রী ও জননী। বৌদ্ধশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে এই তিনের প্রতিই যে যথাযথ স্নেহ, প্রেম ও ভক্তি প্রদর্শন করা হইত তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধশাস্ত্রমতে কন্যার প্রতি নিম্নোক্ত কর্ত্তব্য প্রদর্শন সমীচীন ছিল—

(১) অন্যায় হইতে কন্যাকে রক্ষা করা।

(২) কন্যাকে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা করা।

(৩) শিল্প ও বিজ্ঞানে কন্যাকে শিক্ষিত করা।

(৪) কন্যাকে উপযুক্ত স্বামীর হস্তে ন্যস্ত করা।

(৫) কন্যাকে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করা।

তদ্রূপ স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, স্ত্রীর প্রতি অভদ্র বাণী প্রয়োগে বিরত থাকা, স্বকীয় অর্থাদি পত্নীর হস্তে ন্যস্ত করা, স্ত্রীর পদানুযায়ী অলঙ্কার ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদান করা এবং তাঁহাতে অনুরক্ত থাকা স্বামীর অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল।

জননীকে রক্ষা করা, তাঁহার সম্মানোপযোগী কর্ত্তব্য প্রতিপালন, সংসারে তাঁহাকে তাঁহার পদানুযায়ী স্থান দেওয়া এবং মৃত্যুর পরেও তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা বৌদ্ধযুগে করণীয় কর্ম্ম ছিল।

উল্লিখিত কর্ত্তব্যগুলি অনুধাবন করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে

যে, বৌদ্ধযুগে স্ত্রীলোককে ঘৃণার চক্ষে দেখা হইত না। কন্যা, স্ত্রী, মাতার কথা দূরে থাকুক, দাসীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইত, তাহা পর্য্যালোচনা দ্বারাও উপরোক্ত সিদ্ধান্তে সহজেই উপনীত হওয়া যায়। দাসীর শক্তি অনুযায়ী তাহাকে কর্ম্ম প্রদান করা (অর্থাৎ তাহার শক্তি যেরূপ সেইরূপ কর্ম্ম সম্পাদন করিতে দেওয়া), নিয়মিত ভাবে আহার্য্য ও বেতন প্রদান, ব্যাধির সময় যথোপযুক্ত সেবাশুশ্রূষা, উত্তম খাদ্যের অংশ প্রদান ও উপহার প্রদান কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। সুতরাং ইহা হইতে আমাদের অনুকূল সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়।

যদিও পূর্ব্বজন্মের এক ঘটনা উল্লেখ ও আলোচনা দ্বারা বুদ্ধ তাঁহার সেই পূর্ব্বজন্মের গর্ভধারিণীর চিত্রাঙ্কন দ্বারা আমাদের মনে ক্ষোভের উদ্রেক করিয়াছেন, তথাপি এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব হয় না যদ্বারা আমরা তাঁহার মাতৃভক্তির প্রমাণ পাই। সংঘের অন্যতম ভ্রাতা নিজ মাতার সেবা করিতেছেন জানিয়া বুদ্ধ অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছেন, জাতক পাঠে ইহা আমরা জানিতে পারি। বুদ্ধদেবের নিজ আচার-ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিলেও ইহাই মনে হইবে। যদি তিনি রমণী-দিগকে পুরুষের সমান বলিয়া পরিগণিত না করিতেন, তবে তিনি কদাচ তাঁহাদিগকে নিজ ধর্ম্মে এবং স্বয়ং দীক্ষিত করিতেন না। বস্তুতঃ পক্ষে বৌদ্ধযুগে স্বধর্ম্মনিষ্ঠা স্ত্রীলোকের বিন্দুমাত্রও অভাব দৃষ্ট হয় না। বুদ্ধের মাতা (প্রকৃতপক্ষে বিমাতা) মহাপ্রজাপতি গোতমী, সহধর্ম্মিণী যশোধরা, অশোকের কন্যা সংঘমিত্রা, কুন্দলকেশী, বিশাখা, অশোকপত্নী অগণিষমিত্রা প্রভৃতির নাম সহজেই স্মৃতিপথে উদিত হয়। স্বধর্ম্মক্ষেত্রে ইঁহারা কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন।

বৌদ্ধযুগে, শাস্ত্র, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি সুকুমার কলায় অভিজ্ঞ নারীর অভাব দৃষ্ট হয় না। রাজসভায় উপনীতা হইয়া রাজমাতারূপে রমণীউপদেশ দিতেও কুণ্ঠিতা হইতেন না, সুভদ্রারূপে স্বামীর রথের বল্গা ধারণেও ভীতা হইতেন না, সুখস্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া তপশ্চারণেও

দ্বিধা বোধ করিতেন না। এরূপ প্রমাণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়, যাহাতে বৌদ্ধ যুগের স্ত্রীগণকে নিন্দা করা সমীচীন হয় না।

বস্তুতঃ পক্ষে, বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়কালে স্ত্রীলোকপ্রদত্ত অর্থেই ইহার প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত বিশাখাদেবীর আখ্যান পর্য্যালোচনা করিলে উপরোক্ত মন্তব্য সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। শ্রাবস্তীর বিশাখাদেবীই, বুদ্ধ তথায় উপনীত হইলে সর্ব্বপ্রথমে সশিষ্য বুদ্ধের সেবার ব্যবস্থা করেন এবং যাহাতে তাঁহাদের ধর্ম্মাচরণে কোনরূপ অভাব না হয় তজ্জন্য প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করেন। "হে প্রভো! আমি যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন সংঘের ব্যবহার্য্য বস্ত্র প্রদান করিব; যে সকল বৈদেশিক যতি এইস্থানে শুভাগমন করিবেন, তাঁহাদিগকে আহার্য্য প্রদান করিব; পীড়িত শ্রমণদিগকে পথ্যদান করিব, ঔষধ দিব, দৈনিক সকলকে অন্ন পরিবেষণ করিব, সন্ন্যাসিনীদিগকে স্নানের বস্ত্র প্রদান করিব" সংঘপ্রতিপালিকা বিশাখার এই অভিলাষ পূর্ণ হইয়াছিল এবং এই সকল পূতচরিত্রা স্ত্রীলোকের জন্যই যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার সুযোগ ঘটিয়াছিল তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে না।

মহাবংশে রাজা অগ্রবোধির মাতৃসেবার যে চিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তাহারই উল্লেখ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। রাজা অগ্রবোধি দিবারাত্র তাঁহার মাতৃদেবীর সেবা করিতেন। প্রত্যহ মাতার কেশে তৈল প্রদান ও তাঁহার অঙ্গ পরিষ্কার করিতেন। মাতার পরিত্যক্ত বস্ত্র নিজ হস্তে প্রক্ষালন করিয়া বস্ত্রধৌতকরণের জল নিজ মস্তকে প্রক্ষেপ করিয়া ধন্য বোধ করিতেন। পূজারী যেরূপ মন্দির-মধ্যস্থ দেবতাকে পুষ্প ও সুগন্ধি প্রদান করেন, নরপতি অগ্রবোধিও তদ্রূপ প্রত্যহ তিনবার মাতার চরণে পুষ্প ও সুগন্ধি দান করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতেন। মাতার পরিচারিকাগণ যাহাতে কোনরূপ ক্লেশ বোধ না করে, তজ্জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট থাকিতেন। স্বহস্তে মাতাকে আহার্য্য প্রদানে সন্তুষ্ট করিতেন এবং মাতার আহারান্তে মাতৃপরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। উচ্ছিষ্টের কিয়দংশ নিজ

মস্তকে ধারণ করিতেন। স্বহস্তে মাতার শয়নকক্ষ পরিষ্কৃত করিয়া শয্যাবস্ত্র বিন্যস্ত করিতেন। মাতার যতক্ষণ নিদ্রা না আসিত ততক্ষণ তাঁহার পদসেবা করিতেন।

উপরোক্ত ঘটনা বৌদ্ধযুগে না ঘটিলেও বৌদ্ধযুগের আদর্শানুযায়ী যে সিংহলাধিপতি অগ্রবোধি মাতৃসেবা করিতেন তাহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং বৌদ্ধযুগে স্ত্রীধর্ম্মের প্রশংসাসূচক প্রমাণের অভাব হয় না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

(মাতৃ-মন্দির, মাঘ—১৩৩২) অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

সমালোচনা

(১) উপাসিকা-চরিত বা মাদাম ব্লাভাস্কীর জীবনী—শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ তত্ত্বভূষণ প্রণীত, মূল্য ২৲ টাকা। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট। সিনেট সাহেব, অল্কট্ সাহেব, মিসেস্ বেসাণ্ট প্রভৃতি প্রসিদ্ধনামা থিওসফিষ্টগণ মাদাম ব্লাভাস্কী সম্বন্ধে ইংরাজিতে যে বিভিন্ন সন্দর্ভ ও পুস্তিকা লিখিয়াছেন তাহাতে ইংরাজি ভাষা-অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে এই বিদুষী, ধর্ম্মপ্রাণা মহিলার জীবন সম্বন্ধে কিছু জানিবার বিশেষ অসুবিধা ছিল; 'উপাসিকা চরিত' সে অভাব পূর্ণ করিবে। মাদাম ব্লাভাস্কী বিদেশিনী হইলেও ভারত-মহিলা, কারণ, তিনি আমাদের দেশকে মাতৃ-নামে সম্বোধন করিতেন, ভারতবর্ষকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন এবং ভারতবাসীকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার এক শিষ্য লিখিয়াছেন, "ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে এচ, পি, বির—দয়া, স্নেহ ও অনুগ্রহ, হিন্দুজাতির উপর যত অধিক পারিমাণে ছিল, এরূপ আর কোন জাতির উপর ছিল না।" অত্যন্ত ঘৃণার সহিত আমরা

• বিগত অগ্রহায়ণ মাসের উদ্বোধনের "সমালোচনা"য় ৬৯৮ পৃষ্ঠার ২৩ লাইনে আয় ২২২৮৪৫১৫ ও ব্যয় ৬৮৮৮৶১০ না হইয়া আয় ১০৩৮৫৷৷৵১৫ এবং ব্যয় ৭৮৪৮৷১০ হইবে।

ইহা অস্বীকার করি। আমাদের দেশকে দয়া ও অনুগ্রহ করিবার অধিকার কোন বিদেশীর নাই তবে, মাদাম ব্লাভাস্কী ভারতবর্ষের সম্পর্কে আসিয়া ধর্ম্মজীবনে উন্নতি লাভ পূর্ব্বক নিজে বিশেষ উপকৃতা হইয়াছিলেন —ইহা আমরা জানি। মাদাম অনেক সময়ে বলিতেন, "ভারত হইতে সনাতন ধর্ম্ম উৎসন্ন হইলে কেবল ভারতের ক্ষতি নহে, কিন্তু জগতের ক্ষতি, কারণ, ভারতই ধর্ম্মের ক্ষেত্র। এ স্থান হইতেই ধর্ম্মবীজ সকল দেশে নীত হইয়াছে।" ইহা অতি সত্য কথা। ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল ভারত হইতেই ধর্ম্মলাভ করিয়া তিনি ধর্ম্মের সারমর্ম্ম বিভিন্ন দেশে প্রচার করিয়াছিলেন। এই পুস্তক হইতে পাঠক, মাদাম ব্লাভাস্কী ও থিওসফি সম্বন্ধে অনেক তথ্য ধারাবাহিকরূপে জানিতে পারিবেন।

(২) দেব-গীতি—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদার রচিত এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-অর্চ্চনালয়ের (ইটালী, কলিকাতা) সেবক-মণ্ডলী দ্বারা প্রকাশিত, মূল্য ।৵০ আনা। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-মণ্ডলী ও সাহিত্য-ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত দেবেন বাবুর নাম সুপরিচিত। তাঁহার রচিত সংগীতগুলি ভাব ও কবিত্ব মাখা। ইহা গাহিয়া এবং শুনিয়া অসংখ্য নরনারী ভক্তি ও আনন্দের অস্বাদ পাইয়া থাকেন। এই পুস্তকের আমরা বহুল প্রচার কামনা করি।

(৩) বিগত মাসের উদ্বোধনে "শ্রীরামকৃষ্ণ দেব" নামক প্রবন্ধের সমালোচনার বিষয় এই যে, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর কোন ব্যবহারের যথাযথ তাৎপর্য্য জ্ঞাত না হইয়া অযথাভাবে শিক্ষা ও স্বাধীনতাকে দোষারোপ করা হইয়াছে। নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে মতামত স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'পত্রাবলীতে' প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাই সাধারণ নারীজাতির পক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। শাস্ত্র বলেন,—অসৎ লোকের সহিত আহার, বিহার, আলাপ বা অবস্থান হইতে শুদ্ধসত্ত্বদেহে কলুষতা সঞ্চারিত হয়। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অঙ্গাবরণের হেতু—ঐ সকলের নিবারণ কল্পে। পূজনীয়া গোলাপ মাতা প্রভৃতির প্রতি ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার উপদেশ সমূহের আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়, নারীজাতির লজ্জাই ভূষণ, পরন্তু জড়ত্ব নহে।

সংঘ-বার্ত্তা

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের মহাসম্মেলন

বেলুড়-মঠ-প্রাঙ্গণে আগামী ১লা এপ্রিল হইতে ৭ই এপ্রিল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহাসম্মেলনের অধিবেশন হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের ইহাই সর্ব্ব প্রথম মহাসম্মেলন। ন্যূনাধিক নব্বইটি প্রধান কেন্দ্র হইতে প্রতিনিধিবর্গ আসিয়া এই সম্মেলনে যোগদান করিবেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে ইহার কার্য্য-তালিকা দিলাম :—

(প্রয়োজন মত ইহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইতে পারে)

বৃহস্পতিবার ১লা এপ্রিল, ১৯২৬ (১৮ই চৈত্র, ১৩৩২)—প্রাতঃকাল ৭ হইতে ১১ ঘটিকা—প্রতিনিধিবর্গের সম্মেলন (ইহাতে মিশনের সকল সদস্য এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠভুক্ত সকল সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীই উপস্থিত থাকিয়া প্রতিনিধিবর্গের আলোচনাদি শ্রবণ করিতে পারেন)। (১) উদ্বোধন-সঙ্গীত (২) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ। (৩) মহা-সম্মেলনের সভাপতি স্বামী শিবানন্দের অভিভাষণ (এই অভিভাষণে সভাপতি মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের এই প্রথম মহাসম্মেলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিবৃত করিয়া কিরূপে এই উদ্দেশ্য অর্থাৎ বিভিন্ন আশ্রম সমূহের মধ্যে সহযোগিতা ও সদ্ভাব বর্দ্ধন হইতে পারে এবং উহাদের উন্নতি সাধন হইতে পারে তদ্বিষয়ে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিবেন)। (৪) প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক নিজেদের মধ্য হইতে বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতি সংগঠন। (৫) বিভিন্ন আশ্রমের কার্য্যবিবরণী পাঠ আরম্ভ—(ক) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অঙ্গীভূত আশ্রম সমূহ। অপরাহ্ন ৩॥০ হইতে ৫॥০টা—বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন।

শুক্রবার ২রা এপ্রিল, ১৯২৬ (১৯শে চৈত্র, ১৩৩২)—প্রাতঃকাল ৭টা হইতে ১১টা—প্রতিনিধিবর্গের সম্মেলন। বিভিন্ন আশ্রমের কার্য্য-

বিবরণী পাঠ—(ক) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অঙ্গীভূত আশ্রম সমূহ (সমাপ্ত)। (খ) শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের সাধুগণ পরিচালিত মঠ ও আশ্রম-সমূহ। অপরাহ্ণ ৩৷৷৹টা হইতে ৫৷৷৹টা—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সাম্বাৎসরিক সাধারণ সভার অধিবেশন। (কেবল মিশন সদস্যবর্গের জন্য)

শনিবার ৩রা এপ্রিল, ১৯২৬ (২০শে চৈত্র, ১৩৩২)—প্রাতঃকাল ৭টা হইতে ১১টা—প্রতিনিধিবর্গের সম্মেলন। বিভিন্ন আশ্রমের কার্য্য-বিবরণী পাঠ—(খ) শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘভুক্ত সাধুগণ দ্বারা পরিচালিত আশ্রম ও মঠ সমূহ। অপরাহ্ণ ২৸৹ হইতে ৫৷৷৹টা—সর্ব্বসাধারণের জন্য সভা। বিষয়—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ ও কার্য্যাবলী। সভাপতি—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের উপ-সভাপতি (Vice-President) স্বামী অখণ্ডানন্দ। বক্তা-গণ—স্বামী সারদানন্দ। স্বামী অভেদানন্দ (বক্তৃতা করিবেন আশা করা যায়)। স্বামী শর্ব্বানন্দ—মান্দ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ। স্বামী নিখিলানন্দ। স্বামী বিপুলানন্দ—সিংহল-দ্বীপস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতির অধ্যক্ষ। স্বামী নির্ব্বেদানন্দ—কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ। রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর। অধ্যাপক শ্রীকামাখ্যানাথ মিত্র—ফরিদপুর কলেজের প্রিন্সিপাল। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—'আনন্দ বাজার পত্রিকা'র সম্পাদক এবং অন্যান্য বক্তাগণ। প্রসাদ বিতরণ। সঙ্গীত।

রবিবার ৪ঠা এপ্রিল, ১৯২৬ (২১শে চৈত্র, ১৩৩২)—প্রাতঃকাল ৭টা হইতে ১১টা—প্রতিনিধিবর্গের সম্মেলন। বিভিন্ন আশ্রমের কার্য্য বিবরণী পাঠ—(খ) শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘভুক্ত সাধুগণ পরিচালিত মঠ ও আশ্রম সমূহ (সমাপ্ত)। অপরাহ্ণ ৩৷৷৹টা হইতে ৫৷৷৹টা—বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন।

সোমবার ৫ই এপ্রিল, ১৯২৬ (২২শে চৈত্র, ১৩৩২)—প্রাতঃকাল ৭টা হইতে ১১টা—প্রতিনিধিবর্গের সম্মেলন। বিভিন্ন আশ্রমের কার্য্য-বিবরণী পাঠ—(গ) মিশনের গভর্ণিংবডির (Governing Body) প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, ইত্যাদি পদে অবস্থিত ব্যক্তি সকলের অন্যতমের সাহায্যে ও পরামর্শে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমূহ। (ঘ) অবশিষ্ট সমুদয়

নিমন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান সমূহ। অপরাহ্ণ ২৸০ হইতে ৫॥০টা—সর্ব্বসাধারণের জন্য সভা। বিষয়—শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও উপদেশ অবলম্বনে ধর্ম্মতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক দর্শনের আলোচনা। সভাপতি—স্বামী সারদানন্দ। বক্তাগণ—স্বামী পরমানন্দ—আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের অন্তর্গত বোষ্টন ও লা ক্রেসেণ্টা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ। স্বামী মাধবানন্দ—মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ। স্বামী শুদ্ধানন্দ। স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ—পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ। স্বামী বাসুদেবানন্দ—'উদ্বোধন' সম্পাদক। স্বামী শ্রীবাসানন্দ। স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ—'উদ্বোধন' সহকারী সম্পাদক। ব্রহ্মচারী কুমারচৈতন্য, ও অন্যান্য বক্তাগণ। প্রসাদ বিতরণ। সঙ্গীত।

মঙ্গলবার ৬ই এপ্রিল, ১৯২৬ (২৩শে চৈত্র, ১৩৩২)—প্রাতঃকাল ৭টা হইতে ১১টা—বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন (সমাপ্ত)। অপরাহ্ণ ৩॥০টা হইতে ৫॥০টা—প্রতিনিধিবর্গের সম্মেলন। বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতি কর্ত্তৃক গঠিত প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে প্রতিনিধিবর্গ কর্ত্তৃক আলোচনা ও তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের বক্তৃতান্তে প্রস্তাব গ্রহণ।

বুধবার ৭ই এপ্রিল, ১৯২৬ (২৪শে চৈত্র, ১৩৩২)—প্রাতঃকাল ৭টা হইতে ১১টা—(১) বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতি কর্ত্তৃক গঠিত প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে প্রতিনিধিবর্গ কর্ত্তৃক আলোচনা ও তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের বক্তৃতান্তে প্রস্তাব গ্রহণ। (২) সভাপতি স্বামী শিবানন্দের উপসংহার বক্তৃতা। (৩) সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। (৪) বিদায় সঙ্গীত। অপরাহ্ণ ৩॥০টা হইতে—সঙ্গীত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—এতদ্ভিন্ন সেবা ও শিক্ষাকেন্দ্র সকলের কর্ম্মীদিগের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য বিশেষ বিশেষ বিষয়ে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের দ্বারা বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা করিবারও চেষ্টা হইতেছে। সেগুলি উপরোক্ত কার্য্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। খুব সম্ভবতঃ বৃহস্পতিবার ৮ই এপ্রিল ১৯২৬ ছায়াচিত্র অবলম্বনে ডাঃ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।

মহামিলন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী পরম পূজনীয়া শ্রীমতী লক্ষ্মী দিদি গত ১২ই ফাল্গুন ৺পুরীধামে শরীর ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের চির-সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন।

* * * *

স্বামী নিশ্চলানন্দ বিগত ৯ই ফাল্গুন ৺কাশী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের সহিত চিরতরে মিলিত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

(১২)

শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হইবার কিছুদিন পরে একদিন আমি দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলাম। তাড়াতাড়ি—খাইয়া যাইতে পারি নাই। ঠাকুর তাহা শুনিয়া বলিলেন, "আহা তুমি খাওনি নহবতে যাও, সেখানে ভাত তরকারী আছে খাও গে।" নহবতে মার সঙ্গে সেই প্রথম দেখা হইল। রামের মা প্রভৃতির সঙ্গে দুই একবার মার পরিচয় হইয়াছিল। তাহারা মাকে বলিল, "আমি খেয়ে যাইনি।" মা অমনি তাড়াতাড়ি ভাত তরকারী লুচি প্রভৃতি যা ছিল আমায় খাইতে দিলেন। সেই প্রথম দেখাতেই মার সঙ্গে আমার খুব ভাব হইয়া গেল। ইহার পর রামলাল দাদার বিবাহের সময় মা যে দিন দেশে যাইবেন সেই দিন আমি দক্ষিণেশ্বর গিয়াছিলাম; অনেকদিন মার সহিত দেখা হইবে না ভাবিয়া আমার মনে খুব কষ্ট হইল। যাইবার সময় মা, ঠাকুরকে প্রণাম করিতে আসিলেন। উত্তরের বারাণ্ডায় ঠাকুর গিয়া দাড়াইলে মা প্রণাম করিলেন, পায়ের ধূলা লইলেন। ঠাকুর বলিলেন, "সাবধানে যাবে। নৌকায় রেলে কিছু ফেলে টেলে যেয়ো না।" মা ও ঠাকুরকে সেই আমি এক সঙ্গে দেখি। তাঁহাদিগকে একত্রে দেখিতে আমার সাধ ছিল। মা নৌকায় রওনা হইলেন। যতদূর দেখা গেল আমি নৌকার দিকে চাহিয়া রহিলাম। নৌকা অদৃশ্য হইলে নহবতে মা যেখানে বসিয়া ধ্যান করিতেন সেখানে বসিয়া খুব কাঁদিতে লাগিলাম। নহবতের পশ্চিমধারের বারাণ্ডায় দক্ষিণ মুখে বসিয়া মা ধ্যান করিতেন। ঠাকুর এদিকে আসিবার সময় আমার কান্না শুনিতে পাইয়াছিলেন।

নিজের ঘরে গিয়া আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি যাইলে তিনি বলিলেন, "ও চলে যেতে তোমার খুব দুঃখ হয়েছে ?" এই বলিয়া আমায় যেন ভুলাইবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর যে সব সাধনা করিয়াছিলেন সেই সব কথা বলিতে লাগিলেন। বলিলেন "এ সব কারুকে বোলো না।" ঐ দিন ঠাকুরের খুব কাছে বসিয়া কথাবার্ত্তা হইল। বৌ মানুষ—এতদিন সঙ্কোচ ছিল। প্রায় দেড় বৎসর পর মা দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন। ঠাকুর লিখিয়াছিলেন—'আমার খাওয়া দাওয়ার কষ্ট হচ্ছে।' মা আসিলে ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "সেই যে ডাগর ডাগর চোখ মেয়েটি আসে সে তোমাকে খুব ভালবাসে। তুমি যাবার দিন নহবতে বসে খুব কেঁদেছিল।" মা বলিলেন, "হাঁ, তার নাম যোগেন।" আমি যখনি দক্ষিণেশ্বর যাইতাম মা আমাকে সব কথা বলিতেন, পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। আমি মায়ের চুল বাঁধিয়া দিতাম। আমার হাতের চুল বাঁধা মা এত ভালবাসিতেন যে তিন চার দিন পরেও স্নানের সময় মাথার চুল খুলিতেন না। বলিতেন, "না, ও যোগেনের বাঁধা চুল, সে যেদিন আসবে সেই দিন খুলবো।" আমি সাত আট দিন পর পর ঠাকুরের কাছে যাইতাম। দক্ষিণেশ্বর হইতে শিব পূজার জন্য বেলপাতা লইয়া আসিতাম সেই সব বেলপাতা শুকাইয়া গেলেও সেই শুকনো বেল পাতা দিয়াই শিব পূজা করিতাম। একদিন মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "যোগেন, তুমি শুকনো বেল পাতায় পূজো কর কি ?"

"হাঁ মা, তুমি তা কি করে জানলে ?"

"আজ আমি সকালে ধ্যান করবার সময় দেখতে পেলুম যে তুমি শুকনো বেল পাতায় পূজো করছো।"

একদিন নহবতে বসিয়া মা পান সাজিতেছিলেন, আমি পাশে বসিয়া দেখি—মা কতকগুলি পান ভাল করিয়া এলাচ দিয়া সাজিলেন, আর কয়েকটা শুধু সুপারী চূণ দিয়া সাজিলেন। আমি বলিলাম, "কই এগুলিতে মসলা এলাচ দিলে না ? ওগুলি বা কার, এগুলিই বা কার ?" মা বলিলেন, "যোগেন, এগুলি (ভালগুলি) ভক্তদের, এদের আমাকে

আদর যত্ন করে আপনার করে নিতে হবে। এলাচ না-দেওয়াগুলি ওঁর জন্য, কারণ উনি তো আপনার আছেনই।"

মা বেশ গাহিতে পারিতেন। লক্ষ্মীদিদি ও মা একদিন রাত্রিতে মৃদু গলায় গান করিতেছিলেন। বেশ জমিয়াছে—ঠাকুর তাহা শুনিতে পাইয়াছিলেন। পরদিন বলিতেছেন, "কাল যে তোমাদের খুব গান হচ্ছিল। তা বেশ বেশ ভাল।"

দক্ষিণেশ্বরে সমস্তদিন মায়ের একটুকুও বিশ্রামের সময় ছিল না। ভক্তদের জন্য তিন সের সাড়ে তিন সের আটার রুটি হইত। পান-ই সাজিতেন কত। তারপর ঠাকুরের দুধ খুব ঘন করিয়া জ্বাল দিতেন; কারণ, ঠাকুর সর ভালবাসিতেন। তাঁহার জন্য ঝোল হইত। ঠাকুরের খাবার মা তাঁহার ঘরে গিয়া দিয়া আসিতেন। ঠাকুরের মা যতদিন বাঁচিয়াছিলেন ঠাকুর ততদিন নহবতে খাইতেন। ঠাকুরের মা শরীর-রক্ষা করিবার পর তিনি নিজের ঘরেই খাইতেন। ছেলেরা কেহ না থাকিলে স্নানের সময় মা ঠাকুরকে তেল মাখাইয়া দিতেন। গোলাপ দিদি আসিলে ঠাকুর একদিন তাহাকে ভাতের থালা আনিতে বলেন। তদবধি গোলাপদিদি প্রত্যহই ভাত লইয়া যাইত। ভাত দিতে গিয়া মা রোজ ঠাকুরকে একবার দেখিতে পাইতেন এইরূপে তাহাও বন্ধ হইল। গোলাপদিদি সন্ধ্যার পর অনেকক্ষণ ঠাকুরের কাছে থাকিত, কোন দিন হয় ত রাত দশটার সময় নহবতে ফিরিত। নহবতের বারান্দায় মাকে গোলাপ দিদির খাবার লইয়া বসিয়া থাকিতে হইত, সেইজন্য তিনি একটু অসুবিধা বোধ করিতেন। একদিন ঠাকুর শুনিতে পাইয়াছিলেন—মা বলিতেছেন, "খাবার বিড়াল কুকুরে খায় থাক্ আমি আর আগ্‌লাতে পারবো না।" পরদিন ঠাকুর গোলাপ দিদিকে বলিলেন, "তুমি এতক্ষণ থাক, ওর কষ্ট হয়। ওকে খাবার আগ্‌লে থাকতে হয়।" গোলাপদিদি বলিলেন, "না, মা আমাকে খুব ভালবাসেন মেয়ের মত নাম ধরে ডাকেন।" গোলাপদিদির জন্য ঠাকুরের কাছে আসিবার সুযোগ বন্ধ হওয়ায় মা যে দুঃখিতা, একথা গোলাপদিদি বুঝিতে না পারিলেও ঠাকুর বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

একদিন গোলাপদিদি মাকে বলিল, "মা, মনমোহনের মা বলছিল —উনি অতবড় ত্যাগী, আর মা তুমি এই মাকড়ী টাকড়ী এত গয়না পর এ ভাল দেখায় কি ?"

পরদিন সকালে আমি দক্ষিণেশ্বর গিয়া দেখি কেবল হাতে সোনার বালা ছগাছি রাখিয়া মা আর সব গহনা খুলিয়া ফেলিয়াছেন। আমি একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মা, একি ?"

মা বলিলেন, "গোলাপ বল্লে—"

আমি অনেক বুঝাইতে তবে মা মাকড়ী আর সামান্য দুই একটি গহনা পরিলেন। সেই যে গহনা খোলা হইল আর পরা হইল না। কারণ, তাহার পরই ঠাকুরের অসুখ আরম্ভ হইয়াছিল।

মা যখন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আসেন তখন তিনি সংসারের বিশেষ কিছুই বুঝিতেন না এবং ভাব টাবও হইত না। নিষ্ঠার সহিত শ্রীভগবানের নিমিত্ত নিত্য জপ ধ্যান করিলেও তাঁহার ভাব, সমাধি হইত এ কথা আমরা শুনি নাই। বরং ঠাকুরের ভাব হইতে দেখিলে মা বড়ই ভীত চিন্তিত হইয়া পড়িতেন। কারণ, মায়ের মুখেই শুনিয়াছি দক্ষিণেশ্বরে মা যখন প্রথম আসেন তখন রাত্রে তোতাপুরীর কথায় * ঠাকুর তাঁহাকে নিজের কাছে রাখিতেন। তখন মা ও ঠাকুর এক ঘরেই শুইতেন, ঠাকুর বড় তক্তপোষে আর মা ছোট খাটটিতে। মা বলিতেন, "সমস্ত রাত ঠাকুরের ভাব হোত, তাই দেখে আমার ঘুম হোত না। ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকতুম, ভাবতুম রাত কখন পোহাবে। একদিন ভাব আর ভাঙ্গে না, তখন অস্থির হয়ে কালীর মাকে (ঝি) দিয়ে হৃদয়কে ডেকে পাঠালুম। সে এসে নাম শুনাতে তবে ভাব ভাঙ্গে, পরদিন ঠাকুর, যে রকম ভাব দেখলে যে মন্ত্র শুনাতে হবে আমায় সব শিখিয়ে দিলেন।"

---

* তোতাপুরী এক সময় ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যে কাম জয় করেছ তার প্রমাণ কি ? স্ত্রীকে কাছে রেখে দাও তবে তো বুঝবো।" উহা শুনিয়া আপনাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে মা প্রথম যখন আসেন তখন রাত্রিতে তাঁহার সহিত এক শয্যায় আট মাস একত্রে শয়ন করিয়াছিলেন।

আমার সহিত মার পরিচয় হইবার কিছুদিন পরে একদিন মা আমাকে বলিলেন, "ওঁকে বলো যাতে আমার একটু ভাব টাব হয়, লোকজনের জন্যে ওঁকে এ কথা বলবার আমার সুযোগ হয়ে উঠছে না।"

আমি ভাবিলাম হবেও বা ; মা যখন অনুরোধ করিতেছেন তখন ঠাকুরকে ঐ কথা বলিব। পরদিন সকালে ঠাকুর একা তক্তপোষে বসিয়া আছেন, দেখিয়া আমি প্রণাম করিয়া তাঁহাকে মায়ের কথা বলিলাম। তিনি ঐ কথা শুনিলেন, কিন্তু কোন উত্তর না দিয়া গম্ভীর হইয়া রহিলেন। তিনি যখন ঐরূপ গম্ভীর হইয়া থাকিতেন তখন কথা বলিতে কাহারও সাহস হইত না। তাই আমি কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। নহবতে আসিয়া দেখিলাম মা পূজা করিতেছেন। দরজা একটু খুলিয়া দেখি—মা খুব হাসিতেছেন। এই হাসিতেছেন আবার একটু পরেই কাঁদিতেছেন। দুই চক্ষু দিয়া ধারার বিরাম নাই। কতক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া ক্রমে স্থির হইয়া গেলেন,—একেবারে সমাধিস্থা। আমি ইহা দেখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া আসিলাম, অনেকক্ষণ পর পুনরায় যাইতে মা বলিলেন, "এই এলে ?" (ঠাকুরের কাছ থেকে)। তখন আমি বলিলাম, "তবে মা, তোমার নাকি ভাব হয় না ?" মা তখন লজ্জা পাইয়া হাসিতে লাগিলেন। ঐ ঘটনার পর আমি দক্ষিণেশ্বরে কখনও কখনও রাত্রিতে মার কাছে থাকিতাম। আমি আলাদা শুইতে চাহিলে মা কিছুতেই শুনিতেন না, আমায় কাছে টানিয়া লইয়া শুইতেন। একদিন রাত্রিতে কে বাঁশী বাজাইতেছিল। বাঁশীর স্বরে মায়ের ভাব হইল, থাকিয়া থাকিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি সঙ্কোচে বিছানার এক কোণে বসিয়া রহিলাম। ভাবিলাম—'আমি সংসারী মানুষ, ওঁকে এই সময় ছোঁবো না।' অনেকক্ষণ পরে মায়ের ভাব উপশম হইল।

(ক্রমশঃ)

বৌদ্ধসংঘ—জন্ম ও বিস্তার

"It is impossible to withdraw from the world, and associate with birds & beasts that have no affinity with us. With whom should I associate but with suffering men? The disorder that prevails is what requires my efforts. If right principles ruled through the kingdom, there would be no necessity for me to change its state"—Confucius.

অনেকজাতিসংসারং
সন্ধাবিস্সং অনিভিসং
গহকারকঙ্গ বেসন্ত
দুক্খাজাতি পুনপ্পুনং।
গহকারকাদিঠোসি;
পুনগেহং নকাহসি;
সভাতেকাস্থখাভগ্গা,
গহকুটং বিসংখিতং;
বিসংখারগতং চিত্তং;
তন্হানং খয়মঝগা।

বহুজন্ম কষ্ট কত সহি,
খুঁজিয়াছি গৃহকারে বৃথা।
বিড়ম্বনা পুনঃপুন জনমগ্রহণ!
এবারে চিনেছি তোমা, ওগো গৃহকার!
পারিবে কি আর
করিতে নির্ম্মাণ গেহ?
ভাঙিয়াছি কাঠামো তাহার,
উপাদান-হীন, আর—
গড়িবে কি দিয়া!

চিত্ত মোর নিমজ্জিত আজি,
পাপ তৃষ্ণা পারে,—
নির্ব্বাণের সুখ পাবাবারে।

বোধিবৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন গৌতমেব মুখ হইতে কোন ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টার অপেক্ষা না রাখিয়াই উপরোক্ত কথাগুলি উচ্চারিত হইয়া গেল। তাপস গৌতম আজ "বুদ্ধ" হইলেন—"সম্বোধি" লাভ করিয়া তিনি প্রবুদ্ধ হইলেন। দেখিতে দেখিতে উনপঞ্চাশৎ দিবস কাটিয়া গেল, নবীন বুদ্ধ আহার-নিদ্রা হীন, কেবল আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ—সমাধি-সম্ভোগ! পঞ্চাশৎ দিবসে ধীরে ধীরে চিত্ত নিম্নতর স্তরে অবতরণ করিল। কিঞ্চিৎ আহার্য্য গ্রহণ করিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'নির্ব্বাণ লাভ তো হইল। কিন্তু লব্ধ সত্য জগতে প্রচার চলিবে কি? অল্পবুদ্ধি মর্ত্তামানব এ গভীর সত্য বুঝিবে কেন।' বুদ্ধ নিবৃত্ত হইলেন, স্থির করিলেন সমাধি সাগরে ডুবিয়া থাকিয়া একাই নির্ব্বাণসুখ সম্ভোগ করিবেন। সহম্পতি ব্রহ্মা শ্রীবুদ্ধ সমীপে উপস্থিত হইয়া করজোড়ে * জগৎ হিতার্থে মহদ্ধর্ম্ম প্রচারের মিনতি জানাইলেন। তাঁহার কাতর অনুনয়ে তথাগতের অন্তরে করুণাসঞ্চার হইল। তিনি সম্মতি জানাইলেন। কি ভাবে প্রচার করিলে ধর্ম্ম লোকবোধ্য হইবে, মনে এই বিতর্ক উপস্থিত হইল। ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তি-বোধিসত্ত্ব আসিয়া তাঁহাকে একটি অলঙ্কার মণ্ডিত চক্র দেখাইলেন। বুদ্ধ শান্ত হইলেন—তাঁহার কর্ম্মপ্রণালী স্থিরীকৃত হইয়া গেল।

নূতন সত্যের অবিষ্কর্ত্তামাত্রেরই মনে দ্বিধা উপস্থিত হয় তাঁহার বাণী লোক বুঝিবে কি না, অথবা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিবে। তিনি জগতের চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত করেন বলিয়া বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে অগ্রগামী হইতে হয়। কিন্তু আশে পাশের লোক তাঁহার মনের সঙ্গে সমান তালে যে চলিতে পারিবে, তাহার স্থিরতা কি? দ্বিধা উপস্থিত হওয়াই স্বাভাবিক। বুদ্ধের মনেও এরূপ দ্বিধা আসিল, জঞ্জালের মধ্যে

* নির্ব্বাণ প্রাপ্ত জীবন্মুক্ত পুরুষ দেবগণ অপেক্ষা উচ্চে—ফলতঃ ত্রিলোকে তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ জীব।

যাইতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না ; তিনি স্থির করিলেন সমাধি-মগ্ন হইয়া থাকিবেন। কিন্তু যে মহাপ্রাণ জগতের দুঃখে ম্রিয়মান হইয়া জগতের-ই জন্য শিবত্বের অনুসন্ধানে যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ফকির সাজিয়াছেন, আত্মসুখান্বেষণ তাঁহার তো শুধু অশান্তিই ঘটাইবে। ফলেও হইল তাহাই,—তাঁহার বিশ্বহিতৈষণা ব্রহ্মারূপে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কাতর অনুনয়ে তাঁহাকে প্রচারে ব্রতী করিল।

কোন আসরে একটি জটিল প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা চলিয়াছে। হঠাৎ একজন লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—আমি পাইয়াছি।' বুঝাইতে বলিলে সে কিছু চিন্তা করিবার অবসর লইয়া আপন বক্তব্য বলিল। এরূপ ঘটনা সকলেই অল্পবিস্তর প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ব্যাপারটি হইতেছে, হঠাৎ intuitively এক একটা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়, কিন্তু অপরকে তাহা বুঝাইতে হইলে উপযুক্ত ন্যায়সঙ্গত উপমা যুক্তিবাদ সহ যোগে বলা আবশ্যক। অবসর লইতে হয় সেইজন্য। সত্যদ্রষ্টা বুদ্ধ একটা উপযুক্ত দর্শন গড়িয়া তুলিয়া উপদেষ্টা হইবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। মালমসলা প্রস্তুত হইলে তাঁহার প্রচারেচ্ছা বোধিসত্ত্বরূপে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া একটি অলঙ্কারমণ্ডিত চক্র দেখাইল—ইঙ্গিত করিল, এবারে গতি দেওয়া কর্ত্তব্য। *

তথাগত এইবারে ভাবিতে লাগিলেন, 'তাই তো কাহাকে প্রথমে বলি।' আমাদের মনে যখন কোন নূতন কথা জাগে, আমরা তাহা লইয়া প্রথমেই প্রকাশ পাইতে সাহস করি না। বন্ধুবর্গের মধ্যে একটু নাড়াচাড়া করিয়া তাহার মূল্য নিরূপণ করিয়া লইতে চেষ্টা করি। শ্রীবুদ্ধও তাহাই করিলেন। রাজগৃহে যে পাঁচজন তাপসের সঙ্গে তিনি বহুদিন তপস্যা করিয়াছিলেন, প্রথমে তাঁহাদের-ই কাছে চলিলেন। বীজ উপ্ত হইল। দেখিতে দেখিতে অঙ্কুর গজাইল।

ভিক্ষু সংখ্যা যখন একষষ্টি হইল তখন তথাগত আদেশ করিলেন—"যাও ভিক্ষুগণ, দেশে দেশে যাও, বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় দিকে দিকে

* ভারতের কবি ও ঋষি রূপকে কথা বলিতেই পছন্দ করেন। রবীন্দ্রনাথও সেই ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

পরিভ্রমণ কর, অনুকম্পায় তোমাদের হৃদয় দ্রবীভূত হউক। দুইজন একদিকে যাইও না। ভাবে ভাষায় আনন্দদায়ক এই সঞ্জীবনী "ধম্ম" প্রচারে জীবনপাত কর। সকলের সম্মুখে নিখুঁত পবিত্র জীবনের আদর্শ ধর। এমন মানব অনেক রহিয়াছে যাহাদের নেত্রাবরণ প্রায় খসিয়া গিয়াছে, পবিত্র "ধম্মে"র সন্ধান তাহাদিগকে না দিলে তাহারা মুক্তি পাইবে না! তাহারা নিশ্চয়ই ইহা গ্রহণ করিবে। চল ভিক্ষুগণ, আমিও প্রচারোদ্দেশে উরুবেল-সেনিয়গামে যাইব।"

তখনকার ভারত এক অতি অদ্ভুত অবস্থার ভিতর দিয়া চলিয়াছিল। দার্শনিক বিচার বিতর্ক লোককে পাইয়া বসিয়াছিল। গ্রামবাসী মিলিত হইয়া স্থানে স্থানে 'পরিব্রাজকারাম', 'কুতূহলশালা' নির্ম্মাণ করিয়া রাখিত। সেই সকল স্থানে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে বিচার হইত। বিচারে যে দলনায়ক পরাজিত হইতেন তিনি নিজে এবং প্রায়শঃ তাঁহার দলবল বিজেতার ধর্ম্মগ্রহণ করিতেন। পরিব্রাজক নামধেয় ত্যাগিগণ সংঘবদ্ধ হইয়া চলিতেন না। তাঁহারা আদর্শ বিদ্যার্থী ছিলেন—যখনি যেখানে যে নূতন সত্যের সন্ধান পাইতেন তখনি তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেন। সংঘবদ্ধ সন্ন্যাসিদলও তখন অনেক ছিলেন। ফলে দেশে শতাধিক মতবাদ বিরাজ করিতেছিল। তথাগতকেও অতএব একটি বিচারপ্রণালী গড়িয়া তুলিতে হইয়াছিল। তাঁহার বিচারপ্রণালীর জয় জয়কার ঘোষিত হইল।

দেশের আর একটি মনোভাব শ্রীবুদ্ধের প্রচার কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করিল। বহুকাল অবধি প্রতি 'পরিব্রাজকারামে' প্রতি 'কুতূহলশালায়' বিভিন্ন মতবাদীর বিচার বিতণ্ডা চলিয়া আসায় লোক-মনে একটি প্রতিক্রিয়ার ভাবও জাগিয়াছিল। সাধারণ মানব শুষ্ক বিচারে শান্তি না পাইয়া এবং কোন্ ধর্ম্মবক্তার মতবাদ গ্রহণ করিবে স্থির করিতে না পারিয়া একটা সুবোধ্য এবং আচরণোপযোগী ধর্ম্মবাদের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। প্রায় প্রত্যহই বিচার চলিয়াছে, প্রত্যহই নূতন নূতন মত-গ্রহণ সাধারণ মানব পছন্দ করিবে কেন? অতএব শ্রীবুদ্ধ যখন বলিলেন,—

"বস্ত্রে আগুন ধরিয়াছে, তাহার নির্ব্বাণের চেষ্টা না করিয়া, আগুন সম্বন্ধে যে বিচার করিতে বসে, সে নিতান্তই মূর্খ। শরীরে বিষাক্ত-বাণ বিদ্ধ হইয়াছে, বাণ নিষ্ক্রমণ না করিয়া যে তাহার নির্ম্মাণপ্রণালী বিচার করিতে বসে সে নিতান্তই কৃপাপাত্র।"

তাঁহার কথাগুলি বড় মর্ম্মস্পর্শী হইল। তিনি সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, এই এই কর, তাহাতে বাসনা ক্ষয় হইবে, বাসনা ক্ষয়ে কর্ম্মক্ষয় হইবে, ফলে চরম শান্তি সম্ভোগ করিতে পারিবে। প্রিয়দর্শন সুবক্তা শ্রমণের জ্যোতির্ম্ময় আননে না জানি কিসের আভাস পাইয়া দলে দলে লোক তাঁহার অনুগমন করিল।

শ্রীবুদ্ধের বিচার প্রণালীতে একটু অভিনবত্ব ছিল। তাঁহার প্রায় সমসাময়িক গ্রীকদেশীয় আচার্য্য সক্রেটিসের প্রণালীর সহিত ইহার অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য ছিল। উভয়েই বিচারকালে নিজে কোন বিষয়ে কোন মত না দিয়া, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া বিপক্ষের মতবাদের ভ্রমগুলি দর্শাইয়া দিতেন। নিজের মতবাদ পরিত্যাগ করিয়া যখন বিচারপ্রার্থী 'স্রোতাপন্ন' হইত, তখনি কেবল তথাগত তাঁহার কাছে 'ধম্ম' ব্যাখ্যা করিতেন। ফলে তখনকার জ্ঞানি-গুণী বহু সন্ন্যাসি-গৃহী তাঁহার শরণ লইল। ক্রমে 'মহাপ্রাজ্ঞ' সারিপুত্র আসিলেন, 'সিদ্ধিমন্ত মহামোগ্‌গলান, 'দিব্য-চক্ষুষ্মান' অনুরুদ্ধ, 'ধুতবাদী' মহাকস্‌সপ, 'ধম্মকথক' পুণ্ণ 'বহুশ্রুত' আনন্দ, 'বিনয়ধর' উপালী, 'শিক্ষাকামী' রাহুল আসিলেন। আরো কত কে আসিলেন। তথাগত রুচি অনুসারে, অধিকারী অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা প্রদান করিলেন। নূতন যাহারা আসিতে লাগিল রুচি অনুযায়ী তাহাদিগকে উপরোক্ত প্রধান শিষ্যগণের এক একজনের অধীনে শিক্ষালাভের জন্য রাখিয়া দিতেন। দিন দিন দলের কলেবর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

বুদ্ধের অভিপ্রায় ছিল জগৎকে মুক্তিপন্থা দেখাইয়াই তিনি নিরস্ত হইবেন। তাঁহাকে বেড়িয়া কোন সংঘ গড়িয়া উঠিবে তাহা তিনি বোধকরি কল্পনাও করেন নাই। সংঘ যখন গড়িয়া উঠিলই, তখন প্রয়োজনীয় আইন-কানুন নিয়ম-বিধি প্রণয়নও আবশ্যক হইয়া পড়িল।

শিবত্বলাভই বুদ্ধের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বলিয়া তিনি ব্যবহারিক আইন-কানুনের প্রতি প্রথমে লক্ষ্যই করেন নাই,—প্রত্যেককেই এ সম্বন্ধে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়াছিলেন। কিন্তু এ ভাবে আর অধিকদিন চলিল না। সকল মানুষই যদি ঔচিত্য বুদ্ধি খাটাইয়া চলিতে পারিত, দুনিয়ায় তবে তো ধরাবাধা নিয়ম বিধির প্রয়োজনই ছিল না। সাধারণ মানুষের প্রকৃতি উদ্দাম স্বাধীনতা বা উচ্ছৃঙ্খলতাই চায়। অন্তর হইতে যদি তাহাকে বল্গা পরান সম্ভব না হয়, বাহির হইতেই পরাইতে হইবে। এতে যন্ত্রত্বে পরিণতির আশঙ্কা থাকি-লেও গত্যন্তর নাই। কোন অল্পবুদ্ধি ভ্রাতা হয় তো কোন অপকর্ম্ম করিয়া বসিলেন; অপকর্ম্মের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিরোধোপযোগী নিয়ম প্রণয়ন করিতে হইল। কোন রাজদণ্ডে দণ্ডিত পলাতক ব্যক্তি আসিয়া বিপদ কাটাইবার অভিপ্রায়ে ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করিল, রাজার অনুরোধে এস্থলেও উপযুক্ত নিয়ম প্রণয়ন করিতে হইল। কোন ভিক্ষু আহার শয্যা ইত্যাদি ব্যাপারে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করিলেন, বিনয় (আইন) সাহায্যে তাহাও নিরোধ করিতে হইল। গ্রামবাসী অনুযোগ করিল, ভিক্ষুদের বাড়ী বাড়ী গিয়া মাংসাদি যাচ্ঞা শোভন হয় না—মাংসাহার সম্বন্ধে বিধি প্রণয়ন হইল। * এই ভাবে যখন বিনয় বেশ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, তখন এইগুলি এবং তখনকার অন্যান্য ধর্ম্মসংঘে যে সব শুভকর নিয়ম প্রচলিত ছিল সেইগুলি লইয়া সংঘ নিয়মনের জন্য একখানি স্মৃতি-সংহিতা (বিনয়-পিটক), প্রস্তুত হয়। পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন আবশ্যকানুযায়ী চলিতে থাকে,—যেমন গ্রীষ্মপ্রধান অবন্তি দেশের শ্রমণগণকে বুদ্ধ প্রত্যহ শীতল জলে স্নানাদির অনুমতি দান করেন, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাস্তাঘাট

---

* অনেকের ধারণা আছে বুদ্ধদেব মাংসাহার নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে। বুদ্ধ কুত্রাপি মাংসাহার নিষেধ করেন নাই। উপরোক্ত ঘটনার ফলে বুদ্ধ মাংসাহার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম প্রণয়ন করেন। তাহার সার কথা—ভিক্ষুগণের উদ্দেশে বলিপ্রদত্ত কোন প্রাণীর মাংস কোন বৌদ্ধশ্রমণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। বৌদ্ধ "অহিংসা" ঠিক জৈন "অহিংসা" নহে। বুদ্ধদেব শুধু মনকে হিংসাবৃত্তি পরিশূন্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

কঙ্করময় বলিয়া সেখানকার ভিক্ষুগণের পাদুকা ব্যবহার অনুমোদন করেন ইত্যাদি। গৃহীর স্থান বৌদ্ধধর্ম্মে নাই বলিলেই চলে—তাহাদিগকে বুদ্ধ কোন বিশিষ্ট আচার প্রণালী না দিয়া মাত্র দান, দয়া, সত্য, শীলাচার প্রভৃতি অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিতেন। কালে একটা যাহোক রকমের বৌদ্ধ গৃহীদলও গড়িয়া উঠে। যে যাহার নিজের পারিবারিক, সামাজিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও "উপাসক" হইতে পারিত বলিয়া বহু লোক বুদ্ধকে স্বীকার করিয়া লয়।

"So long as mankind thinks, there will be sects" Vivekananda। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর বৌদ্ধধর্ম্মেও বিভিন্ন মতবাদী বহু দল হইল। কেহ কেহ শ্রীবুদ্ধের উপদেশ সমূহকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিলেন, তাঁহারা হইলেন "সুত্রভানকা"; কেহ কেহ আচারের উপর বেশী জোর দিলেন, তাঁহারা হইলেন "বিনয়ভানকা," কেহ বলিলেন, শ্রীবুদ্ধের মতে আত্মা মিথ্যা, অতএব তথাগতের এখন আর কোন অস্তিত্ব নাই; অপরে বলিলেন, আত্মা মিথ্যা বটে, তবে কেবল "বুদ্ধদেব" নির্ব্বাণের পরেও একটা অস্তিত্ব থাকে; কেহ বলিলেন, "বুদ্ধ" ক্লেদময় নারী-জঠরে জন্ম লইতে পারেন না; আবার কেহ বলিলেন, বুদ্ধ জন্ম লইয়াছিলেন বটে, তবে জন্ম দেন নাই, রাহুল স্বয়ম্ভূব। উপরে উক্ত হইয়াছে, বুদ্ধ রুচি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাদান করিয়াছিলেন এবং প্রধান প্রধান শিষ্যগণের অধীনে অনুরূপ রুচিসম্পন্ন নবাগত ভিক্ষুগণকে শিক্ষা লাভের জন্য রাখিয়া দিয়াছিলেন। বুদ্ধের পরে এক এক রুচি-সম্পন্ন এক এক দল তাঁহাদের শিক্ষাগুরুকে লইয়া ভিন্ন ভিন্ন গণ্ডি সৃষ্টি করিল,—কোন দল তপাচারী, কোন দল বিচারপন্থী, কোন দল বিনয়বাদী ইত্যাদি।

কপিলাবস্তু, কোলিয়, ভজ্জি, মল্ল প্রভৃতি দেশের তৎকালীন গণ-তান্ত্রিক শাসন-প্রণালী বুদ্ধের মনের উপর নিশ্চয়ই ক্রিয়া করিয়াছিল। বৌদ্ধসংঘও তাই গণতান্ত্রিক নিয়মানুযায়ী পরিচালিত হয়। কোন নিয়ম প্রণয়ন কালে বুদ্ধের আচরণে গণতান্ত্রিক ভাব লক্ষিত হয়। কোন ভিক্ষু আসিয়া হয় তো কোন ভ্রাতার একটি অপকর্ম্মের উল্লেখ করিয়া

যাহাতে আর কখনো ঐরূপ না ঘটে, তদনুযায়ী নিয়ম প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করেন। বুদ্ধ—নিয়মটি কিরূপ হওয়া উচিত, প্রস্তাবকারীকে জিজ্ঞাসা করিতেন। উপস্থিত সকলের মতামত জানিয়া, তাহাদের সকলের মতে তিনি সম্মতিমাত্র জ্ঞাপন করিতেন। এইরূপেই নিয়মাবলী প্রণয়ন হয়। গণতান্ত্রিক ভাবানুযায়ী বুদ্ধ, দেহত্যাগের পূর্ব্বে সংঘ-পরিচালকরূপে কাহাকেও নির্দ্দেশ করিয়া যান নাই। বিভক্তির ইহাও একটি কারণ। নির্ব্বাণের মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে তিনি অধীর আনন্দকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়া যান— Be ye lamps unto yourselves Ananda. Be ye a refuge to yourselves. Betake yourselves to no external refuge. Hold fast to the Truth as a lamp. Hold fast as a refuge to the Truth (Rhys Davids Trans.)

পরিনির্ব্বাণের কিছুকাল পূর্ব্বে জনৈক প্রিয়শিষ্য তথাগতকে বলিয়াছিলেন, "প্রভু, যখন তথাগতের অস্তিত্ব আর থাকিবে না, প্রভুর বলে বলী আমরা দশদিকে ছুটিয়া চলিব, প্রত্যেক জীবকে লিখিতে, পড়িতে চিন্তা করিতে আর এই মহৎ ধর্ম্মপর্য্যায় ঘোষণা করিতে শিখাইব।" প্রত্যেক ভিক্ষু এই কথা বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। বৌদ্ধসংঘ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইলেও প্রচার কার্য্য দিন দিন অধিকতর উৎসাহের সহিত চলিতে থাকিল। আর তারপর যখন ধর্ম্মরাজ অশোক এই সুমহান "ধর্ম্ম" প্রচারে আপন দেহ-প্রাণ-মন সমর্পণ করিলেন, প্রাচ্য প্রতীচ্য দেশবিদেশ জুড়িয়া তখন এক আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। চীন, তুর্ক, গ্রীক্, মিসর, লঙ্কা, বর্ম্মা, শ্যাম উৎকর্ণ হইয়া শ্রবণ করিল অপূর্ব্ব দেববাণী, তাহাদের 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল' এ স্বর্গীয় সঙ্গীতলহরী। গৌরব-দীপ্ত বৌদ্ধ সংঘ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিল।—না করাই বুঝি বা ছিল ভাল!!

শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এ।

প্রতিষ্ঠা—শূকরী বিষ্ঠা

একদিন স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, 'অধিকার না হলে (পেলে) প্রেম হয় না।' এই কথাটিই শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার ভাষাতে বলিয়াছিলেন, 'No Control—No Co-operation।'

কথাটা কেন উঠিয়াছিল তাহাই আমাদের ভাবিবার বিষয়। জগতের ইতিহাসে দেখা যায় সম্রাট হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য কৃষক পর্য্যন্ত সকলেই আপন সীমার মধ্যে কিছু না কিছু স্বেচ্ছাচারী। অথচ সেই স্বেচ্ছাচারকে কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা কাহারও একার মধ্যে নাই। রাজা কখনও একা রাজ্য জয় করিতে, রাজ্যে শৃঙ্খলা রক্ষার্থ খাজনা আদায়, বিচার, শাসন, শান্তিরক্ষা এবং শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারেন না। কোন কৃষকের পক্ষেও তেমনি একা ভূমি চাষ, বীজ বপন, ফসল কাটা, গৃহকর্ম্ম এবং গো-পালন, গৃহ নির্ম্মাণ প্রভৃতি কাজ করা অসম্ভব।

আগে লোকে ভাবিতে শিখিয়াছিল,—'যার নিমক খাইবে, তার গুণ গাইবে।' মধ্যে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, এই নিমক কাহার? ইদানীং ভাবরাজ্যে একশ্রেণীর লোক প্রমাণ সহকারে তাল ঠুকিয়া বলিতেছে—আমরা রামা শ্যামা আছি, রক্ত দেই তাই তুমি রাজা, কাজের কাজী। আমরা ট্যাক্স দেই, গতর দেই, তাই তুমি ধনী তাই তুমি বলবান। আমরা যাহা দেই তাহারই অতি অল্প অংশমাত্র পরিশ্রমের বিনিময়ে আমরা ফিরিয়া পাই, সুতরাং আমাদের নিমকই আমাদের ভোগে লাগিয়া থাকে, আমরা রামা শ্যামারা কাহারও নিমক খাই না।

কোনও ব্যক্তি বিশেষ কেবলমাত্র আপন প্রচেষ্টায় জীবন ধারণ করিতে পারে না। মানুষকে ভাত খাইতে হইবে, কাপড় পরিতে হইবে এবং গৃহ আশ্রয় করিয়া মাথাটিও রাখিতে হইবে। ভাত, কাপড় এবং গৃহ এই ত্র্যহস্পর্শে তাহাকে উত্তম মধ্যম অধম শ্রেণীর

লোকের পায়ে প্রত্যহ কতবার যে মাথা নত করিতে হয় তাহা কেই বা ভাবিয়া দেখিতে চায়। তবুও মানুষ চায় সমুদয় ক্ষমতা হাতের মুঠোয় রাখিয়া অপরকে ক্রীড়া পুত্তলী করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে; কিন্তু এ ধোঁকা আর চলে না, চলিতে পারে না বলিয়াই আচার্য্য শ্রীবিবেকানন্দ বলিতেছেন, 'অধিকার দাও—প্রেম জন্মাবে।' অধিকার অর্থ আপনার বোধ—আপনার বোধ হইলে বাকী সব কাজ মানুষ আপনা হইতেই করিয়া লইবে। যে দেশে বা যে জাতিতে জনসাধারণের মধ্যে এই আপনার বোধ বিস্তার লাভ করিয়াছে, সে দেশে সেই জাতিতে তত পরিমাণে দেশাত্মবোধজনিত প্রেম জাগিয়া উঠিয়াছে—যে দেশে বা যে জাতিতে তাহা হয় নাই সেখানে চিরাচরিত প্রথা 'বামুন গেল ঘর ত লাঙ্গল তুলে ধর' চলিবেই। শুধু চুপ করিয়া থাকিলে হয় ত এত গোল বাধিত না—কিন্তু ইদানীং স্বেচ্ছাচারীরাই কর্ম্মচক্রের গতি বোধ-বৃত্তি সর্ব্বত্রই যেন জাগাইয়া তুলিতেছে। বুঝি বা লাঞ্ছনা—নির্য্যাতনের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, তাই উৎপীড়িতেরা রুদ্ধ কণ্ঠে বলিতেছে, এতদিনে 'তোমার নিমকের' মীমাংসা করিতে পারিযাছি—এইবার তোমার ঋণ শোধ করিব।

যত কিছু ভাববিপর্য্যয়, যত কিছু পরিবর্ত্তন—Co operation, Non-Co-operation এ সব কথা শিক্ষিতেরাই বলিয়া আসিতেছেন, আর সেই সকল ভাব অশিক্ষিত জনসাধারণ তাহাদের মত করিয়া বুঝিতে যাইয়াই 'ফরাসী বিপ্লব' আনয়ন করিয়াছিল। এ কথা অনেকে জানেন যে-ফরাসী জাতি উৎপীড়িত হইয়া জাতীয় জীবনে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছাচার ধ্বংস করিয়াছিল, সে জাতি আজ সিরিয়াতে কি বীভৎস কাণ্ডই না করিতেছে! অধিকার না দিয়া, প্রেম জন্মাইবার অবকাশ না দিয়া, একটা জাতিকে জুতার গোড়ালির নীচে চাপিয়া রাখিয়া আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি করিবার সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা জগতের নিত্য ঘটনা। কেহ কাহাকে স্বেচ্ছায় অধিকার দিয়া প্রেম জন্মাইয়া দেশের ও দশের ব্যবহারে লাগাইতে একান্ত অনিচ্ছুক। জগতের দিকে চাহিয়া দেখিতে না পার নিজের দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতির দিকে

চাহিয়া দেখ, বৃহৎ-রাষ্ট্র সমিতির (Congress) দিকে চাহিয়া দেখ, ধর্ম্ম মন্দিরের দিকে চাহিয়া দেখ, বাবাজীর আখড়ার দিকে, সন্ন্যাসীর মঠে, প্রতি গৃহের দিকে চাহিয়া দেখ, দেখিবে ভাবের ঢেউ সর্ব্বত্র আসিয়া লাগিয়াছে, কিন্তু জনকতক লোক নিজের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করিতে প্রস্তুত নয় বলিয়া প্রায় সর্ব্বত্রই মন কষা-কষি, গালাগালি, দলাদলি আকার ভেদে প্রকট ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেছে ; তবুও মুষ্টিমেয় নৈবেদ্যর চূড়াতে যাহারা বসিয়া আছে তাহাদের চৈতন্য হইতেছে না। বিড়ম্বনা আর কাহাকে বলে !

একবার শ্রীশ্রীমহারাজ (স্বামী-ব্রহ্মানন্দ) ভারতের নানা তীর্থাদি বেড়াইয়া আসিবার পর বলিয়াছিলেন,—'মঠ, আখড়াদিতে অধিকাংশ সাধুদের বেশ ভালই দেখিলাম, কিন্তু যাহারা চূড়ায় বসিয়া আছে তাহাদের অনেকরই মাথা বিগড়ান।' শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, 'কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করা সাধুর পক্ষে বরং সহজ কিন্তু নাম যশ হজম করা তত সহজ নহে।' সর্ব্বত্যাগী সাধুদেরই যখন এই অবস্থা তখন "ভোগৈক স্বর্ব্বস্ব যশমান-প্রিয়-গৃহীদের" অবস্থা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তাই কংগ্রেসে এত দলবিভাগ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতিতে এত ছাড়াছাড়ি, আশ্রমে মঠে গালাগালি চুলা চুলি ; তবুও কেহ কাহাকে অধিকার দিবে না, প্রেম জন্মাইয়া সেবাপরায়ণ করিয়া তুলিতে যত্নবান হইবে না।

সর্ব্বত্র এই একঘেয়ে বিদ্বেষ পূর্ণ জীবন ধারণের সার্থকতা শুধু বৈদেশিক শাসনের সীমাবৃদ্ধি করিবার সহায়তা ভিন্ন আর কিছু আছে কি-না তাহা আমাদের দেশের সন্ন্যাসী বৈরাগী মোহান্তগণ সহ জনগণ-মন-অধিনায়ক ভারতের (Self-made) তথাকথিত ভাগ্যবিধাতাগণই বলুন না কেন ?

যে ব্যক্তি বা যে জাতি ভাবসঙ্গতি বজায় না রাখিতে পারিয়া শুধু কথায় কথায় 'বড় বড় কথা' আবৃত্তি করিয়া থাকে—হীরা কিনিতে আসিয়া যে ব্যক্তি জিরা কিনিয়া আঁচলে গেরো বাঁধাই জীবনের সার্থকতা বলিয়া মনে করে, তাহাদের নিকটেই শূকরী বিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা অমৃতবৎ উপাদেয়।

জগতে যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহা কখন 'একতরফা' ঘটে নাই তিল তিল সঞ্চিত স্বেচ্ছাচারীর অত্যাচারে সামাজের যে দুর্দ্দশা—তাহারই পাল্‌টা জবাব 'নিহিলিজম্,' 'এনার্কিজম্', 'সোস্যালিজিম্'। স্বেচ্ছাচারীর অত্যাচাবেব পন্থা যতই নূতন আকার ধারণ কবিবে—পাল্‌টা জবাবে ততই (ism "ইজিমের" জন্ম হইবে। যেখানে হাজার হাজার লোক বিনা বিচারে লাঞ্ছিত, নির্ব্বাসিত, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত, সেখানেই পালটা জবাবে দেখিবে—গর্ব্বিত অত্যাচরী রাজ-বংশেব বিলোপ, সাম্রাজ্যবাদী দলের পতন।

ফরাসী বিপ্লব, পুরোহিত ও পাদরীদের যথেচ্ছাচারে যে ভাষণ আঘাত করিয়াছিল, তাহারই পুনরাভিনয়ে এদেশে ধর্ম্ম-মন্দিবের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ, সাধারণেব অর্থে পুষ্ট সন্ন্যাসী বাবাজিগণেব যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে খৈতান বিল—এমন কত কি হইতেছে এবং ভবিষ্যতে হইবেও, যাহাব একমাত্র কারণ, ব্যক্তিবিশেষেব স্বেচ্ছাচাবিতা।

স্বেচ্ছাচাব—ব্যভিচারের জন্মদাতা। যেখানে স্বেচ্ছাচাব সেখানে ব্যভিচার আত্মপ্রকাশ করিবেই। রাজতন্ত্র ভাল কিংবা গণতন্ত্র ভাল এ সমস্যার সমাধান করা এ প্রবন্ধেব উদ্দেশ্য নহে। চক্রবৎ রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র 'তোঁহে জনমি পুন তোঁহে সমাবত' হইলেও তাহারই মধ্যে সময়ে অসময়ে যে-ভাববন্যার আবির্ভাব হইতেছে জগতেব স্থিতি ও বিকাশেব জন্য তাহার আশ্রয় গ্রহণ না করিলে যাবতীয় সমস্যাই দিন দিন জটিল হইয়া উঠিবে।

প্রতিষ্ঠাব জন্য হিংসা দ্বেষে গৃহীর কংগ্রেস যেমন জর্জ্জরিত, সেই প্রতিষ্ঠা শূকরী-বিষ্ঠার জন্য সন্ন্যাসীর মঠ, বাবাজীর আখড়া তেমনই হিংসা দ্বেষে জর্জ্জরিত, সকলেই যেন এক সঙ্গে বিনাশের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। এ গতি কি রোধ হইতে পারে না ?

চাণক্য নীতি সহায়ে 'কণ্টকে নৈব কণ্টকম্' দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ বহুদিন রক্ষা করা চলে না। এতদিন চলিয়া ত দেখিয়াছ এবার পার ত স্বামিজীর কথাটা শুনিয়া কাজে লাগাইয়া দেখ—প্রতিষ্ঠা বাদ দিয়া সংসার অচল হয় কি-না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন,—

বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল, যাহা কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত করেন, তাহা অনত্র সঞ্চারের জন্য ; এ কথা মনে থাকে না, গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনিই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত।

এর পরে আর কথা চলে না, তবুও যদি বলিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে—সাধু সাবধান !

শ্রীভূমানন্দ।

শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার-বিচার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এ কথায় এখন একটি প্রবল আপত্তি উত্থাপন করা হয়। আপত্তিটি এই যে, যদি ভগবান্ চারি জাতীয় মনুষ্য সৃষ্টি না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে জাতি বা বর্ণ ত আর জন্মগত হয় না। আর জন্মগত না হইলে কাহার কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহারও স্থিরতা থাকে না। কারণ, অষ্টম বর্ষে "ব্রাহ্মণম্ উপনয়ীত" অর্থাৎ আট বৎসরে ব্রাহ্মণকে উপনীত করিবে ইত্যাদি বাক্যে উপনয়নের পূর্ব্বে যদি ব্রাহ্মণ না থাকে তাহা হইলে কাহাকে উপনীত করিবে ? এইরূপ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সম্বন্ধেও বক্তব্য। বালকের গুণকর্ম্মের বিকাশ ভালরূপ হয় না যে তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ-নির্ণয় করিয়া তাহাকে উপনীত করিতে পারা যাইবে। অতএব জন্মগত বর্ণ স্বীকার না করিলে আর উপায় নাই। আর তজ্জন্য ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণাদির সৃষ্টিই স্বীকার্য্য, অথবা ব্রহ্মা নূতন সৃষ্টিকর্ত্তা না বলিলেও সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই ব্রাহ্মণাদির সত্তা অবশ্য স্বীকার্য্য। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চিরকালই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, প্রতি সৃষ্টিতেই তাহারা তাহাই থাকে,

কেবল সৃষ্টিকালে আবির্ভাব ও প্রলয়ে তিরোভাব হয়। ব্রহ্মা তাহার সহায় বলিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা নামে অভিহিত হন। আর ইহাদের স্বধর্ম্ম ত্যাগও তদ্রূপ চিরকালই পাপ। শাস্ত্র যেমন নিত্য তাহার আদেশও তদ্রূপ নিত্য ইত্যাদি।

এতদুত্তরে বলা যায় যে, প্রদর্শিত কারণে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোন কারণ দেখা যায় না, অথবা ঐরূপই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য তাহাও বলিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ, ব্রাহ্মণকে উপনীত করিবে বলায় যদি উপনয়নের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ স্বীকার করা হয় তাহা হইলে "গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেত" অর্থাৎ গৃহস্থ সদৃশী ভার্য্যাকে লাভ করিবে এই বেদবিধির স্থলে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইবার পূর্ব্বে কি করিয়া লোকে গৃহস্থ পদবাচ্য হয় জিজ্ঞাস্য হইবে। অগত্যা এতদুত্তরে বলিতে হইবে যে গৃহস্থত্বকামী যে হইবে তাহার পক্ষে ঐ বিধি। এই যেমন দৃষ্টান্ত তদ্রূপ ব্রাহ্মণত্বকামী যে ব্যক্তি হইবে অথবা যে বালকের পিতামাতা প্রভৃতির এতাদৃশ কামনা হইবে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলা হইতেছে। ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম না হইলে অর্থাৎ পিতা মাতা ব্রাহ্মণ না হইলে যে এ বিধি প্রযুক্ত হইবে না তাহা ত বলা যায় না, কারণ, জন্মই সকল স্থলে ব্রাহ্মণা-চারের কারণ হয় না, কামনা বা ইচ্ছাই কারণ হইয়া থাকে, এবং জন্ম হইলেই যে ইচ্ছা হইবে তাহাও বলা যায় না। অবশ্য এ কথা সহস্রবার স্বীকার্য্য যে পিতা মাতা ব্রাহ্মণ হইলে এবং ব্রাহ্মণাচারে বর্ত্তমান থাকিলে পুত্রের ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার প্রায়ই অবশ্যম্ভাবী অথবা একরূপ স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া পড়ে, তাহাদের ব্রাহ্মণাচারের ইচ্ছা প্রায় স্বতঃই উদিত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া যে অন্যবর্ণের মধ্যে এরূপ সম্ভাবনা হইতেই পারে না তাহা ত বলা যায় না। আর সে সম্ভাবনা হইলে যদি তাহাকে পাপের ভয় দেখাইয়া নিবৃত্ত করা যায় তাহা হইলে কি তাহা শাস্ত্রসঙ্গত আচরণ হইবে না? অথবা সামাজিক দৃষ্টিতে তাহা সমাজের উন্নতিকর উপায় বলিতে পারা যাইবে না? যেহেতু ব্রাহ্মণাচারানুষ্ঠানের প্রতি জন্ম অব্যভিচারী কারণ নহে, পরন্তু ইচ্ছাই অব্যভিচারী কারণ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম বশতঃ ব্রাহ্মণোচিত গুণ কর্ম্মের সংস্কার

ও প্রবৃত্তি প্রায়ই জন্মগত হয় বা সুদৃঢ় হয়, এই জন্য তাদৃশ সন্তানকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। ইহাই জাতি-ব্রাহ্মণ শব্দের দ্বারা বুঝান হইয়া থাকে। ইহা উপাধি মাত্র; 'সিংহ'-আদি পদ দ্বারা যেমন বংশ বিশেষ নির্দ্দেশ করা হয় ইহাও তদ্রূপ। ব্রাহ্মণাচারী ব্রাহ্মণকুলে জাত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণাচারে রাখিলে তাহার ব্রাহ্মণোচিত গুণ কর্ম্মের বিকাশ অধিক হইবে এই আশায় ব্রাহ্মণকে উপনীত করিবে এতাদৃশ আদেশ করা হইয়াছে; নচেৎ শূদ্রকুলে জাত পিতামাতার যদি সন্তানকে ব্রাহ্মণ করিবার ইচ্ছা হয় এবং তদনুসারে তাহার সংস্কারাদিও করা হয়, তাহাকে সেই ভাবে জীবন যাপন করিবার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহা হইলে যে তাহার ব্রাহ্মণত্বের বিকাশ সেই জন্মে একেবারেই হইবে না ইহা কোন মতেই বলা চলে না।

আর তদ্রূপ যাঁহারা পাচকের কর্ম্ম বা শকট চালকের কর্ম্ম বা কৃষিকর্ম্ম অথবা মুটে মজুরের কর্ম্ম করিয়া তদনুরূপ জীবন যাপন করিতে করিতে কেবল উপবীত মাত্র ধারণ পূর্ব্বক অন্যবর্ণের সহিত রক্তমিশ্রন না করিয়া নিজ জাতি-ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের সন্তানকে ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার দিলে যে তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বের বিকাশ তাদৃশ শূদ্রকুল সম্ভূত ব্যক্তি হইতে অধিক হইবে তাহাও বলা চলে না। অতএব ব্রাহ্মণকে উপনীত করিবে এ স্থলে ব্রাহ্মণ শব্দে ব্রাহ্মণত্বকামী অর্থই সঙ্গত, ব্রাহ্মণকুলে জাত মাত্র অর্থ করিলে চলিবে না।

অবশ্য এস্থলে একটি কথা স্বীকার্য্য যে এতাদৃশ জাতি-ব্রাহ্মণসন্তানের ব্রাহ্মণত্ব অভিমান তাহাকে অধিকতর উন্নত করিবে ইহাই সম্ভব। কিন্তু এই যে সম্ভাবনাধিক্য ইহার কারণ অভিমান মাত্র, আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান মাত্র। শাস্ত্রাভিপ্রায় না বুঝিয়া শূদ্রকে পাপ ভয় দেখাইয়া ব্রাহ্মণত্বের দাবী হইতে বঞ্চিত করা হইয়া থাকে বলিয়াই এই সম্ভাবনাধিক্য ঘটিয়াছে। নচেৎ ইহার অন্য কোন কারণ স্বীকার্য্য নহে। শিক্ষা ও উৎসাহ দিলে শূদ্রেরও এ অভিমান হইতে পারে।

বস্তুতঃ জন্মাবধি একটি ব্রাহ্মণ সন্তানকে যদি ব্রাহ্মণাচারে রাখা যায় অপর একটি ব্রাহ্মণ সন্তানকে শূদ্রাচারে রাখা যায়, এবং একটি শূদ্র

সন্তানকে যদি ব্রাহ্মণাচারে রাখা যায় ও অপর একটি শূদ্র সন্তানকে শূদ্রাচারে রাখা যায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণাচারী সন্তান দুইটির মধ্যে এবং শূদ্রাচরী সন্তান দুইটির মধ্যে পার্থক্য যে কিরূপ হয় তাহা সহজে বুঝা যায় না। আর প্রকৃত প্রস্তাবে সৃষ্টির আদি হইতে যে শোণিতশুদ্ধি অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে তাহা কি নিঃসংশয়ে কেহ বলিতে পারেন? মহাভারতে যুধিষ্ঠিরও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন, যথা—

"সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদানরাঃ।
বাঙ্‌ মৈথুনমথো জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্‌॥"

অতএব জাতি মাত্র অর্থাৎ জন্মমাত্র দেখিয়া উপনয়নাদির ব্যবস্থা যথার্থ শাস্ত্রের অভিপ্রায় হইতে পারে না। বহু পুরুষ যাবৎ শূদ্রাচারী দ্বিজকে যদি শূদ্র বলা হয়, ব্রাহ্মণাচারী শূদ্রকে যদি ব্রাহ্মণ বলা হয়, দ্বাদশবর্ষব্যাপী কাল ব্রাহ্মণঅন্নভোজী ব্রাহ্মণসংসর্গীর যদি ব্রাহ্মণত্ব হয় (পরাশর সংহিতা দ্রষ্টব্য), বিশ্বামিত্র যদি একজন্মেই ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হন, রাজকুমার নন্দীশ্বর মহাদেবের উৎকট আরাধনা করিয়া সেই জন্মেই যদি দেবশরীর পাইয়া থাকেন (ব্যাসভাষ্য ২।১২), নহুষ যদি মহর্ষি শাপে সেই জন্মেই অজগর হইতে পারেন (ঐ), ত্রিশঙ্কু যদি রাক্ষসত্ব লাভ করে তবে কেন শূদ্রসন্তান সেই জন্মেই সংস্কারাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না বুঝা যায় না। মনুতেও দেখা যায়—

"অত্যুৎকট পুণ্যপাপৈরিহৈবফলমশ্নুতে"

অর্থাৎ অতি উৎকট পুণ্য পাপের ফল ইহলোকেই হইয়া থাকে। অতএব শূদ্রকে সংস্কারাদি দান করিলে যে তাহার ব্রাহ্মণত্ব সেই জন্মেই হইতে পারে না ইহা শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায় বলিতে পারা যায় না। অবশ্য একথা নিতান্ত স্বীকার্য্য যে, জন্ম দ্বারা ব্রাহ্মণত্বাদি লাভের ব্যবস্থা থাকিলে সমাজশৃঙ্খলা সুরক্ষিত হয়, সহজে সকলের উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়, কিন্তু তাই বলিয়া 'ইহা যে একমাত্র সত্য' 'ইহা যে শাস্ত্রের অভিপ্রায় অন্যথা পাপ হয়' ইত্যাদি বলা কি বিজ্ঞসম্প্রদায়ের পক্ষে শোভা পায়? আজ শক, দরদ, চীনগণ ক্ষত্রিয়সন্তান হইয়াও তাহারা যে শূদ্র হইয়া রহিয়াছে, বেদের মর্য্যাদা করিতে উহাদের মধ্যে অনেকে সমর্থ হইলেও

তাহাতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে এবং তাহার ফলে বৈদিক সম্প্রদায়ের ক্ষীণতা এবং কখন কখন বৈদিক সম্প্রদায়ের উপর ভীষণ উৎপীড়ন যে হইতেছে ইহা কি কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন ? যে চীনগণ যাবতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের উৎকৃষ্ট দার্শনিক গ্রন্থনিচয় নিজ ভাষায় অনুবাদ করিয়া লইয়াছে তাহারা যে সুবিধা পাইলে বেদকে মস্তকে বহন করিত তাহাতে কি সন্দেহ আছে ? এই যে বৌদ্ধগণ বৈদিক সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ মানসে একদিন অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল, যথা কাশ্মীরে ব্যাকুল নামক নরপতি বেদধ্বংস অসম্ভব দেখিয়া এক গ্রামের দুই সহস্র ব্রাহ্মণ বংশের ধ্বংস সাধন করিয়াছিল তাহা ত বৌদ্ধ তারানাথই নিজ গ্রন্থমধ্যে লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা কি তাৎকালিক সমাজ পরিচালকবর্গের দূরদর্শিতার পরিচয় ? যাহা হউক ব্রাহ্মণত্বাদি জন্মগত বলিলে নানা দোষ হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণত্বাদি ভগবানের সৃষ্ট হইলে অথবা নিত্য হইলে যে উহারা গোত্ব অশ্বত্বের ন্যায় নিত্য অমিশ্রণীয় হইত তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। সুবর্ণ যেমন লৌহ হয় না, অশ্ব যেমন গো হয় না ব্রাহ্মণত্বাদি নিত্য হইলে তদ্রূপ একের অন্য প্রবৃত্তি উদিতই হইত না। শূদ্র ব্রাহ্মণ হইতে চাহিত না, ব্রাহ্মণও শূদ্র হইতে চাহিত না।

জন্মগত বর্ণবাদী কেহ কেহ বলেন ব্রাহ্মণত্বাদি যে জন্মগত তাহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়, ব্যাখ্যা কৌশলে অন্যথা করা অন্যায়। কারণ, মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের বাক্যে দেখা যায়—

"ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ ব্রাহ্মণঃ স্যান্নসংশয়ঃ"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণের ঔরসে যে জন্মে সে ব্রাহ্মণই হয় ইহাতে সংশয় নাই ; যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতে দেখা যায়—

"সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ সজাতয়ঃ"

অর্থাৎ সমান বর্ণের ঔরসে সমান বর্ণের গর্ভে সমান বর্ণই হয়। এবং মহাভারতের অন্যত্র, অনুশান পর্ব্বে (১২১ অধ্যায়) দেখা যায়—

"তপঃ শ্রুতঞ্চ যোনিশ্চাপ্যেতদ্ ব্রাহ্মণ্যকারণম্"

অর্থাৎ তপস্যা, বিদ্যা এবং জন্ম ইহারা ব্রাহ্মণত্বের কারণ ইত্যাদি।

বস্তুতঃ এরূপ বহুশাস্ত্রবাক্যই সর্ব্বত্র দেখা যায়—অতএব জন্মগত ব্রাহ্মণত্বাদি অস্বীকার করিলে চলিবে না।

এতদুত্তরে বলা যায় যে, এই জাতি-ব্রাহ্মণত্ব প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বের জ্ঞাপক নহে। প্রথম দুইটি বাক্যে সম্ভাবনা মাত্রের ঘোষণা করা হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে জন্মিবে সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ যে হইবে ইহাই অত্যন্ত অধিক সম্ভব তাহাতে সন্দেহ নাই। এতদ্দ্বারা জন্ম হইতেই ব্রাহ্মণ হয় এই বিষয়ে যে সংশয় তাহার নিরাকরণ করা হইল। যদি জন্মমাত্রেই ব্রাহ্মণত্ব হইত তাহা হইলে সংশয় নাই এরূপ না বলিয়া যথার্থ ব্রাহ্মণ এইরূপ বলা হইত। উক্ত বাক্যদ্বয়ের ইহাই তাৎপর্য্য। তৃতীয় বাক্যটি হইতে বিশেষ সুবিধা নাই। কারণ, তথায় বলা হইয়াছে তপস্যা বিদ্যা ও জন্ম ব্রাহ্মণ্যের কারণ। এখন জিজ্ঞাস্য হইবে উাহারা প্রত্যেকে কারণ অথবা সকলে মিলিত হইয়া কারণ; যদি বলা যায় প্রত্যেকে কারণ, তাহা হইলে যে তপস্যা করিবে সেও ব্রাহ্মণ, যে বিদ্যাচর্চ্চা করিবে সেও ব্রাহ্মণ এবং যে ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছে সেও ব্রাহ্মণ, আর তাহা হইলে শূদ্রাদিকে ব্রাহ্মণত্ব হইতে নিবৃত্ত করা হইল না। আর যদি বলা যায় উহারা প্রত্যেকে মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণত্বের কারণ, তাহা হইলে বহু ব্রাহ্মণ সন্তান আর ব্রাহ্মণ হন না সুতরাং জাতি ব্রাহ্মণত্বও স্বীকার করা হইল না। অতএব জাতি-ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিলে শূদ্রের পক্ষে সেই জন্মেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ নিষিদ্ধ হইতে পারে না। আর তাহা হইলে শূদ্রকুলে জাত ব্যক্তিকে সর্ব্বক্ষেত্রে সংস্কারাদি বর্জ্জিত করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রের অভিপ্রায় হইল না। পক্ষান্তরে এস্থলে এতদ্ ব্রাহ্মণ্যকারণম্ এইরূপ একবচনান্ত এতদ্ শব্দ থাকায় ইহারা মিলিত হইয়াই যে ব্রাহ্মণত্বের কারণ হয় তাহাই সিদ্ধ হয়।

যদি বলা হয় "ব্রাহ্মণকে উপনীত করিবে" এই বাক্যের ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণত্বকামী করিলে লক্ষণা দোষ হয়। তাহা হইলে বলিব, না করিলেই উক্ত দোষ হয়। যেহেতু ব্রহ্মকে যে জানে সেই ব্রাহ্মণ এবং ব্রহ্মকে জানিবার জন্যই উপনয়নাদির প্রয়োজনীয়তা, ব্রহ্মকে জানাই জীবনের সার্থকতা। জন্মবধি এই ব্রাহ্মণত্বাদি লব্ধ হইলে আর উপনয়নাদি

কেন করা হয়? বিষ্ণুসংহিতায় ২৮ অধ্যায় আছে দ্বিজত্ব সংস্কার জন্য, যথা—

"মাতুরগ্রে বিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনম্।
তত্রাস্য মাতা সাবিত্রী ভবতি পিতা তু অচার্য্যঃ।
এতেনৈব তেষাং দ্বিজত্বম্।" ৩৯

ইহাতে দ্বিজত্ব জাতিগত নহে।

ঐরূপ দ্বিজের উপনয়ন কর্ত্তব্য এইরূপ বাক্যের দ্বিজশব্দে কেবল দ্বিজকুলে জাতব্যক্তি অর্থকরা চলে না। উহার অর্থ দ্বিজত্বকামীও করিতে হইবে। যেহেতু দ্বিজশব্দের অর্থ দুইবার যাহার জন্ম হয়। উপনয়নের পূর্ব্বে এই দ্বিজত্ব অসম্ভব। যদি বলা হয় দ্বিজশব্দের অর্থ দ্বিজকুলে জাত এইরূপ রূঢ়ী অর্থ গ্রাহ্য। তাহা হইলে বলিব ইহার যৌগিক অর্থই শাস্ত্রে কথিত হইয়া থাকে। তাহাকে পরিত্যাগ করা হয় কেন?

"জন্মনা জায়তে শূদ্র সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠাৎ ভবেদ্ বিপ্র ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥"

অথবা—"জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয় লক্ষণম্॥"

এই বাক্যদ্বয়ে দ্বিজ শব্দের যৌগিক অর্থ কথিত হইতেছে। অতএব ব্রাহ্মণকে উপনীত করিবে ইত্যাদি বাক্যে কোন দোষ স্বীকার্য্য নহে।

অতএব দেখা যাইতেছে জাতিগত বর্ণত্ব স্বীকার করিলেও গুণ-কর্ম্মগত বর্ণত্ব অস্বীকার করা যায় না। আর সেই গুণকর্ম্মগত বর্ণত্ব স্বীকার করিলে শূদ্রকুলে জাত ব্যক্তির দ্বিজোচিত সংস্কার রহিত করিবার ব্যবস্থা পাওয়া যায় না। বেদমধ্যে যে নিষেধ প্রদর্শন করা হয় তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে সাধারণ ভাবে নিষেধ না হইলেও প্রতি-বাদীর কথা যদি মানিয়া লইয়াও বিচার করা যায় তাহা হইলেও যে তাহা জাতি-শূদ্রের পক্ষে নিষেধ তাহা পাওয়া যায় না। আর জাতি শূদ্রের অর্থ 'সিংহ'-আদি উপাধির ন্যায় কেবল জন্মগত শূদ্রত্ব গ্রহণ না করিয়া যদি জন্মগত সংস্কার ও আন্তরিক প্রবৃত্তিকে গ্রহণ

করা যায় তাহা হইলেও সকল জাতি-শূদ্রেব পক্ষে আর নিষেধ হইল না। বাস্তবিক জাতির দ্বারা এই সংস্কার ও আন্তরিক প্রবৃত্তিই লক্ষ্য করা হয়। যে দিন হইতে এই লক্ষ্য সমাজ নেতৃবৃন্দ বিস্মৃত হইয়াছেন সেই দিন হইতে বৈদিকরাজ্য সংকীর্ণ হইতে বসিয়াছে। জাতিগত অধিকার দানে যেটুকু সত্য আছে তাহাবই বলে অবশ্য আজও ইহা একেবাবে বিলুপ্ত হয় নাই এই মাত্র। আমরা দেখিতে পাই আদিত্য পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থেব যে দিন সৃষ্টি হইয়াছে সেই দিন হইতে আমাদের অবনতিব পথ প্রশস্ত হইয়াছে। বাস্তবিক কেবল আত্মবক্ষা করিলে আত্মরক্ষা হয় না, আত্মরক্ষায় পবেব উপর আক্রমণও আবশ্যক। রাজকীয় ব্যাপারে এই দোষ যেমন আমাদেব সর্ব্বনাশের হেতু হইয়াছে তদ্রূপ সামাজিক রাজ্যে এবং ধর্ম্মবাজ্যেও ঘটিয়াছে। বিলাসেব জন্য পবাক্রম নিন্দনীয়, কিন্তু আত্মরক্ষাব জন্য পবাক্রম নিন্দনীয় নহে। বস্তুতঃ জাতি-শূদ্র বা জাতি-ব্রাহ্মণ শব্দেব অর্থ সংস্কারগত শূদ্রভাব বা সংস্কারগত ব্রাহ্মণভাব। সাধাবণ লোকে সহজে যাহাতে এই সংস্কার নির্ণয় করিতে পারে তাহারই জন্য জন্মকে অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রকারগণ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আজ যদি সমাজেব উন্নতি চিন্তা করিতে হয় তাহা হইলে জাতি শব্দেব এই অর্থটি আমাদের লক্ষ্যহীন হওয়া আদৌ উচিত নহে। কিন্তু কার্য্যতঃ ইহার অন্যথাই দৃষ্ট হয়। যাঁহারা ব্রাহ্মণাদি কুলে জন্ম গ্রহণ করেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণাদি নামে অভিহিত হন এবং তাঁহারা যখন স্বধর্ম্মাচবণ করেন তখন তাঁহারা সৎশব্দের দ্বারা বা শ্রেষ্ঠ শব্দের দ্বারা অভিহিত হন। যথা সদ্ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ইত্যাদি। কিন্তু আজ যদি এই ধারায় সংস্কার করিতে হয় তাহা হইলে বোধ হয় যিনি ব্রাহ্মণাচারী বা ব্রাহ্মণস্বভাব তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া, তাঁহার জন্ম যদি ব্রাহ্মণ কুলে হয় তখন তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণাদি বলাই ভাল। এরূপ না হইলে আর গুণকর্ম্মেব দিকে সহজে লক্ষ্য পতিত হইবার সম্ভাবনা নাই। গুণ ও কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণাদির লক্ষণ, নিম্নলিখিত বাক্যে আরও স্পষ্ট রূপ জানা যায়। যথা,—

"জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ ।
বেদাধ্যয়ন সম্পন্ন ষট্সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ ॥
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যক্ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ ।
নিত্যব্রতীসত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥
সত্যং দানমথাদ্রোহ আনৃশংসং ত্রপা ঘৃণা ।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥
ক্ষত্রজং সেবতে কর্ম্ম বেদ ধ্যয়ন সঙ্গতঃ ।
দানাদান রতির্যস্তু স বৈ ক্ষত্রিয় উচ্যতে ॥
বাণিজ্যা পশুবক্ষা চ কৃষ্যাদানরতিঃ শুচিঃ ।
বেদাধ্যয়ন সম্পন্নঃ স বৈশ্য ইতি সংজ্ঞিতঃ ॥
সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ ॥"

মহাভারত বনপর্ব্ব ।

যদি সদাচারী ও সংস্কারপ্রাপ্ত হয়, যদি বেদাধ্যয়নানুগামী হয় তবে কেন তাহাদিগকে পাপ-ভয় দেখাইয়া নিবৃত্ত করা হইবে বুঝা যায় না। শাস্ত্রাদেশের দোহাই দিয়া যাহারা এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তাঁহাদের ভাবা উচিত যে, যজ্ঞাদির ইতিকর্ত্তব্যতা অংশ ভিন্ন প্রায় সর্ব্বত্রই লৌকিক বুদ্ধির গোচর কৌশলবিশেষ অবলম্বনেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং ভগবান্ মনুও তাহা এক কথায় বলিয়া দিয়াছেন। সে কথাটা এই—"ন মৎস্য ভক্ষণে দোষো ন মাংসে ন চ মৈথুনে। প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা ॥" বস্তুতঃ বর্ণভেদে কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা এই জাতীয়, ইহা যজ্ঞাদির ন্যায় লৌকিক বুদ্ধির অগোচর বিষয় নহে। এ সব শাস্ত্রের আদেশ মানব বুদ্ধিকে সহায়তা করা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

(ক্রমশঃ) শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

দর্শন-বিজ্ঞানের আভাষ *

আমরা যে এই জগতে বাস করছি এর সম্বন্ধে আমরা খুব কমই জানি। অত্যন্ত দুর্ব্বল-যুক্তি দিয়ে আমরা আমাদের জ্ঞান বাড়াবার চেষ্টা করছি। একটা কোন বিশেষ ঘটনা দেখে তখুনি সেটাকে একটা সাধারণ সত্য বলে ঘোষণা করবার ঝোঁক আমাদের হয়ে থাকে। ব্যাস-বাল্মিকী মারা গ্যাছেন সেই জন্য সব লোককেই মরতে হবে এইটে আমরা সামান্যীকরণ (generalisation) করতে চাই। কিন্তু দৃষ্টান্ত-গুলো মানা সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি, ব্যাস-বাল্মিকী মারা গ্যাছেন সত্য, কিন্তু সেটা কেবল তাদের সম্বন্ধেই সত্য; সব মানুষের সম্বন্ধেই সত্য হবে তা কে বল্লে? আমাদের যে সকল অভিজ্ঞতা হচ্ছে সে-গুলোকে সংক্ষেপে মনে রাখবার জন্য আমরা এক একটা সাধারণ সত্য মনের মধ্যে গড়ে রাখি, কিন্তু তাতে কিছু প্রমাণও হয় না বা কোন সঠিক জ্ঞানও হয় না।

ঐ তথাকথিত সাধারণ সত্যগুলো স্মরণ শক্তির খুব সাহায্য করে বটে কিন্তু একথা কখনও বলা যেতে পারে না যে ভবিষ্যতে সে সত্যের বিরোধী কোনও ঘটনা ঘটবে না। লাল জবার গাছে ভবিষ্যতে সাদা-জবাও ফুটতে পারে। প্রতি জঙ্গম-পদার্থের (Organic matter) ক্ষয় আছে, এ সত্য আমার সকলেই জানি, কিন্তু জীবাণু (amœba) সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। তাকে একদম মেরে ফেলা যেতে পারে কিন্তু তার ক্ষয় হতে হতে নাশ হয় না। আবার দেখ, জীবাণুর ক্ষয় নেই, এই জীবাণু দিয়ে দেহ গঠিত, অতএব দেহের ক্ষয় নেই। যুক্তি হিসেবে এ কথা ঠিক কিন্তু প্রত্যক্ষ হিসাবে একথা সত্য নয়। দু চারটে ব্যাপার দেখে যে আমরা সাধারণ সত্যে গিয়ে পৌঁছুই তা সত্য হতেও

* স্যার অলিভার লজের Prologue on Science অবলম্বনে লিখিত।

পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু আমাদের বিশেষ অভিজ্ঞতাগুলো প্রত্যক্ষ স্পষ্ট এবং ঠিক সেই সেই অবস্থায় সাধারণ।

কিন্তু এমন ঢের জিনিষ আছে যা প্রত্যক্ষ হয় না, আর সেই সব জায়গায় সামান্যতো-দৃষ্ট-অনুমান (Induction) দ্বারা একটা সাধারণ সত্য গড়ে তোলবার আমাদের একটা ঝোঁক হয়ে থাকে। আমরা যে সামান্যীকরণ করে থাকি তা অধিকাংশ সময় ভাল করে না দেখে; আর সেইজন্য অতিব্যাপ্তি-দোষ (Over-lapping Division) হওয়ায়, আর একটা স্পষ্ট অভিজ্ঞতা আগেকার সমস্ত মতটা একেবারে উল্‌টে দেয়। কিন্তু কুসংস্কারের এমন জোর যে, যে-সত্য আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে প্রত্যক্ষ করছি, যা নির্ভুল বেশ বুঝতে পারছি তবুও আগেকার মিথ্যা সংস্কারগুলো ত্যাগ করবার সাহস আমাদের নেই। যেমন যদি কোনও বৈজ্ঞানিক অজ্ঞাতসারে এই সিদ্ধান্ত করেন যে সব ঘাসই সবুজ, কিন্তু তারপর যদি হঠাৎ কেউ একটা লাল ঘাস দেখায় ত সেটাকে তিনি একেবারে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না। সেই রকম অনেকেই আবার মনে করেন যে মৃতের সঙ্গে আদান প্রদান অসম্ভব; মৃতেরা কিছুই জানতে পারে না কারণ, তাদের চিন্তা শক্তি একেবারে নাশ হয়ে গ্যাছে। এই যে হেতুগুলো আমরা সাধারণ সত্য বলে মেনে নেই, এগুলো ভাল করে না জানার দরুণ হয়ে থাকে; কিন্তু একটা বিশেষ ঘটনা যদি আমরা অভ্রান্তরূপে প্রত্যক্ষ করতে পারি তা হলেই সমস্ত মতটা একেবারে ওলট পালট হয়ে যাবে।

সংক্ষেপ-ন্যায়াবয়বে প্রকাশ করতে পারা যায় বলে যখন তখন একটা সাধারণ সত্য তৈরী করা উচিত নয়। সামান্যীকরণটা দর্শন বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্চে সত্য। আমরা ইন্দ্রিয় সাহায্যেই কতকটা সত্যের ধারণা করতে চাই। কিন্তু এমন কতকগুলো সত্য আছে, যাদের ধরা ছোঁয়া বড় কঠিন। সেগুলো ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা যায় না, যদি বা দেখা যায় তাও কচিৎ কদাচিৎ। রূপ-রসের প্রজাপতি ধরবার জন্য, ইন্দ্রিয়গুলো যেন ফাঁদ পেতে বসে আছে; বোকা (স্থূল) গুলো ধরা পড়ে কিন্তু চালাকগুলো (সূক্ষ্ম) বেশ ফাঁদ এড়িয়ে বেড়ায়, কিন্তু মাঝে মাঝে ধরাও পড়ে।

সাধারণতঃ জড়ই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে—এবং জড়কেই আমরা নানাভাবে জেনে থাকি; আর যা কিছু আমরা জানি সবই অনুমান, কল্পনা। অনুমান সব সময়েই সন্দেহ জনক বটে, কিন্তু যে সব অনুমান প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তকে অবলম্বন করে গড়া হয় তার মধ্যে অনেকটা সত্য থাকতে পারে। কিন্তু যত বড়ই সত্য হোক বহুকালের গড়া কুসংস্কারের কঠিন-নিগড় ভাঙ্গা তার পক্ষেও শক্ত। কুসংস্কার এমন যাদু জানে যে, লোককে সে প্রাকৃতিক নিয়ম (Natural law) বলে বেশ ঠকায়, যেমন রাক্ষুসী রাণী সেজে রাজ্যের সর্ব্বনাশ করে। একটা বিশেষ ব্যাপার স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা গেল, ইতিহাসে তার দৃষ্টান্তও আছে, আর দশজনের কাছে শোনাও গ্যাছে, তবুও সম্প্রদায়, সমাজ, প্রিয়-জনের অনুরোধ, খেয়াল, পরশ্রীকাতরতা, অসদ্ব্যবহার, শারীরিক কষ্ট বা সুখলাভের হেতুতে তা আমরা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই। এমন খেয়ালী লোক আছেন যে তাঁরা জড়-বস্তু ছাড়া অজড়-বস্তুর কল্পনা করতেও ইচ্ছুক নন। অ-জড় জিনিষের কোন ব্যাপার তাঁদের কাণে এলেই তাঁরা দূর দূর করে উড়িয়ে দেন। পক্ষান্তরে আবার ঠিক ঐ রকম খেয়ালী অ-জড়বাদীও আছেন। এ রকম লোকেরা বিষয়ান্তরে হয় ত বুদ্ধিমান, কৌশলী, নিপুণ হতে পারেন কিন্তু ঐ বিষয়ে ধারণা করবার ক্ষমতা তাঁদের আদৌ নেই। যত বড়ই প্রত্যক্ষ ঘটনা তাঁদের ইন্দ্রিয়ে আঘাত করুক না কেন, কিছুতেই তাঁদের মনে ছাপ দিতে পারবে না। যেমন কোন কোন খাদ্যের নাম করলেই কোন কোন লোকের বমি ঠেলে আসে, তেমনি কোন কোন চিন্তা কোন কোন লোকের যন্ত্রণার সৃষ্টি করে; সেই বিষয়ের চিন্তা না করে করে মনের সেই দিকটা একেবারে শুকিয়ে গ্যাছে। তাঁদের মনটা যে অসুস্থ হয়ে পড়েছে তা তাঁরা বুঝতে পারেন না, বরং তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গেলে তাঁরা মনে করেন এরা পাগল। পাগল কেউ নয়, বহুকালের অভিজ্ঞতা, আলোচনা ও জ্ঞানের ফলে মানুষ কোন বিষয়ে মস্‌গুল হয়ে যায়। ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন সত্যের বিশেষ ঘটনা হয় ত চোখে পড়েনি বা পড়লেও তাতে মনযোগ দেওয়া হয় নি, তাই বর্ত্তমান জ্ঞানের পুষ্ট অবস্থায়, বিজাতীয় সত্যের চিন্তা করতেও কষ্ট বোধ হয়।

স্বাভাবিক মনের অভিজ্ঞতা সাধারণতঃ জড় বস্তু নিয়েই ঘটে থাকে। ন্যায়তঃ অযৌক্তিক হলেও মন যে জড়ের সাহায্য ছাড়া চিন্তা করতে পারে না এটা আমরা স্বীকার করে নিতে পারি। মন যদি নিজেকে স্মৃতি, চিন্তা বা বেদনা রূপে প্রকাশ করতে চায় তাহলে যে একটা দেহ নিশ্চিত প্রয়োজন সে বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই। অবশ্য স্মৃতি, চিন্তা বা বেদনাগুলোও যে দেহের গুণ একথা আমরা জোর করে বলতে পারি না। বাস্তবিক স্মৃতিটা কখনও জড় হতে পারে না যদিও তা দেহকে অবলম্বন করে বা দেহের সমসাময়িক পরিবর্ত্তন (Concomitant) থেকে ঘটে। প্রেমের সঙ্গে হয় ত জীবাণুর (Protoplasm) কোন সম্বন্ধ নাও থাকতে পারে বা চিন্তা জিনিষটা মস্তিষ্কের বিকার থেকে নাও হতে পারে। ঝট্ করে এ রকম সাধারণ সত্য আমাদের করা উচিত নয়। সত্য ঘটনা গ্রহণের জন্য আমাদের মন সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখতে হবে। সত্য জানতে গেলে অনেক ধৈর্য্য চাই, অনেক অধ্যয়ন চাই। আবার প্রকৃতি-পাঠ আমরা করতেই পারি না যদি আমাদের মন উদার ও উন্মুক্ত না হয়। দুম্ করে একটা সিদ্ধান্তে 'হাঁ' বা 'না' দেওয়া উচিত নয়, তাতে কোনও ফল নেই, তবে বিচার করবার জন্য মনটাকে সে বিষয়ে একাগ্র করবার সুবিধা হতে পারে। প্রত্যক্ষ সত্যের দ্বারা আমাদের চালিত হওয়া উচিত; আগের গড়া অনুমান বা সংস্কারের দ্বারা যদি আমরা চলি, তাহলে কোন নতুন সত্য আবিষ্কার করতে পারব না।

সেই রকম যদি অনেক কারণ থাকা সত্ত্বেও বলি, সব জিনিষ-ই জড় পদার্থে তৈরী, তবুও সেটা হঠাৎ অনুমান হয়ে পড়বে, কারণ এমন জিনিষ হয় ত আছে যা আকাশ (Ether) দিয়ে তৈরী। এ জিনিষটা এতদিন আমাদের ধারণার মধ্যেই আসে নি কিন্তু এখন নানা রকমে এই জিনিষটার আভাষ আমরা পাচ্ছি। পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্র এ জিনিষটার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই লেখে নি। পদার্থ-বিদ্যা (Physics) এ জিনিষটার উদ্ধার সাধন করেছে। আর দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য যখন জগতের একটা সাধারণ ভিত্তি নির্ণয় করা, তখন তাঁরা এত বড় একটা

সর্ব্বব্যাপী অপরিত্যজ্য সত্তাকে অবজ্ঞা করতে পারেন না। একটা বিষয়ের জ্ঞান মানে সে সম্বন্ধে যত রকমের সংবাদ পাওয়া যায় তার সংগ্রহ করা। কিন্তু আকাশ জিনিষটা নিয়ে যে এতদিন বিশেষ ভাবে আলোচনা হয় নি তার কারণ এ জিনিষটাকে এতদিন একটুও ধরা-ছোঁয়া যায় নি এবং পদার্থ-বিদেরাও এ সম্বন্ধে কোনও মীমাংসা করবার চেষ্টা করেন নি।

দার্শনিকতার কথা ছেড়ে দিয়ে, আমরা পদার্থ বিজ্ঞানও ভাল করে আয়ত্ত করতে পারি নি, কেবল শিখছি মাত্র, তা বৃদ্ধই হই আর বালকই হই। ছেলেপুলেদের ছোট ছোট ব্যাপার এবং সেই সম্বন্ধীয় জ্ঞানেতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সব বিষয়ে জানা তাদের পক্ষে অসম্ভব আর সেই জন্য দার্শনিকতা করাটাও তাদের পক্ষে ধৃষ্টতা। তাবা খুব অল্পই জানে, শুধু তারা কেন আমরাও খুব অল্পই জানি যাতে করে আমরা ঠিক ঠিক দার্শনিকতার পরিচয় দিতে পারি। কোন দার্শনিকেরই জগতের সর্ব্ব বিষয়ে জ্ঞান নেই, আর এই অল্পদর্শীতার ফলেই জগতে এত মুনির এত বিরোধী মত। কিন্তু প্রত্যেকেই একেবারে ভুল নয়, মায়া-মেঘের অন্তরালে সত্য সুন্দরীর বিজলী বলয়ের সন্ধান অনেকেই পেয়েছেন, কিন্তু তার সর্ব্বাঙ্গ-সৌন্দর্য্য আয়ত্ত করেছেন কয় জন ?—এই জন্যই দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাস মনকে এত উদার করে।

কিন্তু এটাও ঠিক যে, কোন বস্তু সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান লাভ করতে হলে অন্য বস্তু সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ করতে হবে। কারণ জগতে সব জিনিষ মালার মত গাঁথা। একটা কোনও বিশেষ বস্তুর সম্বন্ধে কখনও জানা যেতে পারে না। এটা কষ্টকর ব্যাপার বটে কিন্তু অপরিত্যজ্য।

বিজ্ঞান জগতের একটা দিকে মন সংযোগ করে থাকে, আর সে দিকটা হল সম্পূর্ণ রূপে জড়। দার্শনিকদের কর্ত্তব্য হচ্ছে বৈজ্ঞানিক-দের সত্যগুলো নিয়ে তার মধ্যে একটা একতার সূত্র বার করা। কিন্তু দুটো সত্যের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে, তা দূর করতে হলে দার্শনিকদের

বৈজ্ঞানিকদের পরবর্ত্তী আবিষ্কারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এই অপেক্ষাটা যে জ্ঞানতঃ হচ্চে তা নয়, বহু বর্ষ ধরে দার্শনিকেরা অনুমান করেছেন, কিছুই ভেবে ঠিক করতে পাচ্চেন না, হঠাৎ একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে সকল রহস্যের উদ্‌ঘাটন হয়ে গেল। কিন্তু, এই হঠাৎ আবিষ্কারটা যে কত দিনে হবে তার কিছু ঠিক নেই।

এ দিকে জীবন ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যেক আবিষ্কারের জন্য যদি আমাদের অপেক্ষা করতে হয়, তা হলে উন্নতি সুদূর পরাহত। সেই জন্যই অনুমান করতে হয়। কিন্তু আনুমানিক সত্যগুলোকে চরম সত্য বলে না মেনে নিয়ে, ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ-সত্যের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। জ্ঞানের "ইতি" কখনও করতে নেই। জাঁতির মত সব জিনিষ কেটে দেওয়াটাও পাগলামী। মন ও বাহ্য জড় জগতের মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য আকাশ-রূপ তৃতীয় পদার্থও উড়িয়ে দেওয়া অব্যবস্থিত চিত্তের লক্ষণ। সেই রকম প্রাণ ও মন জিনিষটা উড়িয়ে দেওয়াও জড় বৈজ্ঞানিকদের একটা বাহাদুরী। পক্ষান্তরে অজাতবাদী (Idealist) দার্শনিকেরা যে নিঃশেষে জগৎকে অস্বীকার করেন, তাঁরাও ঐ শ্রেণীর। মানুষের আচরণের ওপর বেশী জোর দিয়ে সত্য জানতে চান ব্যবহার-বাদীরা (Pragmatists) এবং আচরণ আর বাস্তবতা একেবারে ত্যাগ করে সত্য জানতে চান রহস্যবাদীরা (Mystic)। এঁদের "হাঁ"এর (Positive) দিকটা খুব সবল বটে কিন্তু "না"-এর (Negative) দিকটা একেবারে অকেজো।

এ সব সেই ভক্তি ও কর্ম্মমার্গীদের পুরোনো ঝগড়ার মত। আমাদের উচিত, মনের সব দিকটা বেশ করে দেখা, বোঝা। আর যদি গোটা জিনিষটা একই লোকের পক্ষে বিচার করা অসুবিধা হয়, তা হলে বিচারের বিষয় বিভাগ করে নিতে হয়। বর্ত্তমানের আলোচ্য বিষয় হচ্চে আকাশ (Ether) এবং প্রাণ ও মনের সঙ্গে এর সম্বন্ধ কি। এ প্রশ্নটি যে, শুধু দার্শনিক বা পদার্থবিদরাই করে থাকেন তা নয়, সব মানুষই এই জিনিষটা জানতে চায়। আর এ সম্বন্ধে আলোচনা করবার আর একটা হেতু হচ্চে যাঁরা প্রকৃতি,

সূক্ষ্ম-ভূত প্রভৃতি অতি উচ্চ উচ্চ ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করচেন, তাঁরা হয় ত এ থেকে কিছু আলো পেতে পারেন, তাঁদের অনুমান সূক্ষ্ম থেকে আরও সূক্ষ্ম জিনিসের ধারণা করতে পারে। বিজ্ঞানের স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ সত্য সকল তাঁদের ধ্যানের সহায় হবে এবং সূক্ষ্মতর জগতের অনুসন্ধানে উৎসাহিত করবে।

—বাসুদেবানন্দ।

এই কি জীবন ?

এই কি জীবন ?
শুধু আশা শুধু তৃষা শুধু আকিঞ্চন !
শুধু অসন্তোষ আর শুধু রুদ্ধ বেদনার
অবিচল গুরু ভারে নিস্তব্ধ রোদন।
এই কি জীবন ?
মায়ার দুঃস্বপ্ন শুধু মমতার ভ্রম
অশ্রান্ত উৎসাহ শেষে বিফল উদ্যম।
উন্নতির অভিযানে ব্যর্থ আন্দোলন।
এই কি জীবন ?
শুধু আলেয়ার আলো বিজন প্রান্তরে
—পথ হারা পথিকেরে লইতে অন্তরে ?
মরীচিকা অভিমুখে বারি অন্বেষণ ?
এই কি জীবন ?
জল বুদ্বুদের মত মুহূর্ত্তে উঠিয়া
মুহূর্ত্তে মিলায়ে যায়, আবার টুটিয়া—
কার পরে অভিমান ? অরণ্যে রোদন !
এই কি জীবন, শুধু ব্যর্থতায় ভরা ?
পুষ্প সম ফুটে ওঠা, পুষ্প সম ঝরা—
দুদণ্ডের পরিমল করি বিতরণ !
লুকায়ে রাখিনু যারে মনের মন্দিরে
কে হরিয়া নিল সেই প্রাণ পুতলীরে ?
ছিন্ন শিরা হৃদি করে রুধির মোক্ষণ

এই কি জীবন ?

এই যে আসিয়াছিল হৃদয়ের দ্বারে,
আদরে ডাকিতে গিয়ে না হেরিনু তারে।
কেন এল ? কেন গেল ? প্রশ্ন করে মন।
এই যে ফুটিয়াছিল দীপ্ত রূপ রাগে
জ্বালাময়ী স্মৃতি টুকু শুধু আজি জাগে,
শোক অশ্রু করে তার শূন্যতা পূরণ।
এই কি জীবন ?
এই কি ভঙ্গুর রূপ ! অস্থায়ী যৌবন
ক্ষণিক সুখের আশা অলীক স্বপন
ঘন মেঘে সচকিত বিদ্যুৎ স্ফুরণ।
এই তো জীবন।
চির অতৃপ্ত পিপাসা,
চির ব্যগ্র বাসনার বিষময় বাসা
চির প্রতিযোগিতার সংঘর্ষ প্রবল !
ঐন্দ্রজালিকের মতো যাদুমন্ত্র সেধে,
কেন বা আগ্রহ এত ঘষে, মেজে, বেধে
এরেই রাখিতে ধরে এত প্রাণ পণ ?
যাহা যাবে যেতে দাও, যাহা থাকিবে না,
তার তরে কেন যত্ন ? কিসের বেদনা ?
কেন এত অনুতাপ, আত্ম-নিপীড়ন ?
কোথা সে জীবন।
কোথা সে জীবন নিত্য স্থির জ্যোতির্ময় ?
অস্ত-হীন স্বর্ণভানু হয় কি উদয় ?
করে কলাহীন শশী জ্যোৎস্না বিকীরণ,
বহে প্রীতি অনাবিল স্বচ্ছন্দ প্রবাহে,
অবিচ্ছিন্ন মিলনের পুণ্য অবগাহে,
সুধন্য কৃতার্থম্মন্য প্রেমিকের মন !
ডাকে আর্ত্ত জন,
হে সত্য ! হে অবিনাশি ! হও পরকাশ,
দীর্ঘযামা যামিনীর কুস্বপন নাশ
করি প্রকাশিত কর যথার্থ জীবন।

শ্রীনীহারিকা দেবী।

মীমাংসা *

মুসলমান কর্ত্তৃক অথবা দুরাচারগণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক অপহৃতা সতী হিন্দুনারীকে সমাজে পুনরায় গ্রহণ করা অবশ্যই উচিত। রক্ষা করিবার যোগ্যতা যখন নেই, তখন ত্যাগ করিবার অধিকার তার কোথায়? অধিকন্তু ত্যাগ করিয়া তার কাপুরুষতাকে আরও মূর্ত্ত করিয়া তোলে। আর আন্দোলন। চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও বোধ করি এই দাম্ভিকতা তার দৃষ্টিপথে পতিত হয় না—এমনি অভিশপ্ত সমাজ!

অনৈকা গ্রাহিকা,

ফরিদপুর।

প্রথম নাম

যাহা শরীরে আছে তাহাই সমস্ত বিশ্ব সংসারে আছে। সন্তান প্রথম পৃথিবীতে আসিল, সে একটি অনুনাসিক, স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের মিশ্রিত শব্দ করিল। ওষ্ঠাধর মুক্ত হইলেই শব্দ শ্রুতিগোচর হয়, প ফ ব ভ ম ওষ্ঠ বর্ণ। সৃষ্টি অর্থে কর্ম্ম। কর্ম্ম অর্থ গতি, গতির মূলে কম্পন; যেখানেই কম্পন তথায়ই শব্দ। সৃষ্টির পূর্ব্বে ত্রিগুণ সমান অবস্থায় ছিল, যেই সৃষ্টি আরম্ভ হইল, সেই কম্পনের আরম্ভ, এবং যেই কম্পন, সেই সঙ্গে শব্দ—অব্যক্ত-রূপ প্রকৃতির অজানা-পুরুষের সংস্রবে ঘুম ভাঙ্গিল। অব্যক্ত রূপ পাইল—প্রকৃতি কাঁপিতে লাগিল, সেই কম্পনে শব্দ উৎপন্ন হইল, সেই প্রথম শব্দ, সৃষ্টির আদিম অবস্থায় যে শব্দ হইল তাহাই ওম্, তাহাই প্রণব। সৃষ্টির যেমন অভিব্যক্তি হইতে লাগিল, ওমেরও সেইরূপ হইল, অর্থাৎ বিচিত্র জগতের এবং বিচিত্র শব্দের প্রকাশ হইল।

—"ওমার"

---

* চৈত্র মাসের 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।

প্রবাসীর পত্র

শ্রীশ্রীচরণেষু,

পাদপদ্মে শতকোটি প্রণামান্তে নিবেদন এই—গত পত্রে আপনি আমাদের জাহাজে বিজয়া-উৎসব কিরূপ হইয়াছিল, জানিতে চাহিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বপত্রে কিছু লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। জাহাজে এইরূপ কোন উৎসব তেমন কিছু ভাল হওয়া সম্ভব নহে। তথাপি স্থান কাল অনুসারে বেশ Success হইয়াছিল বলা যাইতে পারে।

আমরা Bombay হইতে Italian Lloyd Triestino Line এর "Aquileja"—নামক জাহাজে যাত্রা করি। আমাদের জাহাজ যখন Red-sea তে, তখন একদিন deckএ বসিয়া গল্পগুজব হইতেছিল। এমন সময়ে একজন প্রস্তাব করিলেন, জাহাজে দশহরা উৎসব করা যাউক। জাহাজে আমরা প্রায় ৩০ জন ভারতবাসী। তন্মধ্যে ৯ জন বাঙ্গালী— অন্যান্য সকলে কেহ উত্তর-পশ্চিম দেশীয়, কেহ দাক্ষিণাত্যবাসী, কেহ যুক্ত প্রদেশীয়, কেহ বম্বেবাসী, কেহ মারাটী, কেহ বা পাঞ্জাবী। মাদ্রাজী কেহই ছিলেন না। মাদ্রাজীরা অধিকাংশই কলম্বোপথে যাতায়াত করিয়া থাকেন। উক্ত প্রস্তাব হইতেই নানাজনে নানাপ্রকার Plan দিতে লাগিলেন। অবশেষে ঠিক হইল—বিভিন্ন প্রদেশীয় এক একজন ব্যক্তি লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হউক—সেই কমিটি এই উৎসবের ভার লইবেন। তাহাই হইল। যতদূর মনে পড়ে, কমিটিতে দুইজন বাঙ্গালী, একজন যুক্তপ্রদেশীয়, একজন বম্বেবাসী, একজন পাঞ্জাবী এবং একজন মারাটী ছিলেন।

কমিটি সংক্ষেপতঃ নিম্নলিখিতরূপ আয়োজন করিলেন :—

(১) জাহাজের ডেকের একটি প্রশস্ত স্থানে সমস্ত ভারতবাসী ২৭শে সেপ্টেম্বর বৈকালে একত্র মিলিত হইবেন।

(২) জাহাজের অন্য সমস্ত যাত্রীদিগকেও নিমন্ত্রণ করা হইবে, যাঁহার ইচ্ছা যোগ দিতে পারেন।

(৩) ডেকের যেস্থানে সভা হইবে, তাহার চারিদিকে নানাবর্ণের জাহাজের পতাকা দিয়া সজ্জিত করা হইবে।

৪ সেইদিন রাত্রে একটি Special Vegetarian dinner এর আয়োজন করা হইবে। পাচকের সহিত বন্দোবস্ত করা হইল, সে আমাদিগকে আমাদের ইচ্ছানুসারে সম্পূর্ণ নিরামিষ ভোজের ব্যবস্থা করিবে।

৫ বৈকালে জাহাজের Purser অধ্যক্ষ) কে আমাদের জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা হইবে।

৬ সভার পর ফটো তোলা হইবে।

এইরূপ স্থির হইল বটে, কিন্তু ৫ম আয়োজনটি হইয়া উঠিল না। কারণ জাহাজের Purser বলিলেন যে কয়দিন পূর্ব্বেই একটি বলনাচে অনেক খরচ হইয়া গিয়াছে—সুতরাং আর কোন আয়োজন করা সম্ভব হইবে না। এটা অবশ্য বাজে কথা। আসল কথা—কাল ভারতীয়দের জন্য এতটা করা আবশ্যক মনে করি না। যাহা হউক, ইতালীর জাহাজ বলিয়া যতটুকু সাহায্য এবং সহানুভূতি পাওয়া গিয়াছিল, P. & O. হইলে ওটুকুও আমরা পাইতাম কি-না সন্দেহ।

২৬শে সেপ্টেম্বর আমাদের জাহাজ Port-Said ছাড়িল। ২৭শে Mediterranean Sea তে পড়িয়াছি। মুস্কিল হইল—গান লইয়া। একজন বাঙ্গালী এবং একজন মারাঠী কিছু কিছু গাহিতে পারেন বটে, কিন্তু কোন গানই মুখস্থ নাই। 'দোয়াত আছে, কালী নাই'—অবস্থা। বঙ্কিমবাবুর 'বন্দেমাতরম' গানটি আমার জানা ছিল। আমি তাই দেবনাগরী অক্ষরে লিখিয়া দিলাম। মারাঠী ভ্রাতা তাহাতে নিজের সুবিধামত সুরসংযোজন করিলেন। বাঙ্গালী বন্ধুটি অনেক কষ্টে "এমন দেশটি" গানটার কতকটা আয়ত্ত করিলেন। ক্রমশঃ আরো দুই একটা সুর এবং গানের অংশ সংগৃহীত হইল। একবন্ধুর সঙ্গে একটি এস্‌রাজ ছিল—তাহাতেই যন্ত্রের অভাব মিটিল।

প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণী উভয়ত্রই নিমন্ত্রণ পত্র প্রচার করা হইল। ২৭শে বৈকালে সমস্ত ডেকের চেয়ার একত্র সজ্জিত হইল। সেখানে দেখা

গেল—আমাদের আশাতীত লোকের সমাগম হইয়াছে। চারিদিকে নানাবর্ণের পতাকা উড়িয়া এই বিজয়া-মিলনটিকে অনেকাংশে মধুর করিয়া তুলিয়াছিল।

সর্ব্বপ্রথমে এক বন্ধু দাঁড়াইয়া সভার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তারপর মারাটী ভ্রাতার "বন্দেমাতরম্" গান গীত হইল। তারপর লক্ষৌ-এর একজন অধ্যাপক দশহরা-উৎসবের origin এবং significance সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তাঁহার মতগুলি ঠিক পুরাণানুযায়ী নহে। তবে সময়োচিত যেটুকু লিখিয়াছিলেন, তাহা বেশ সুন্দর হইয়াছিল। প্রবন্ধের বক্তব্য সবটুকু আমার মনে নাই—যেটুকু আভাস মনে আছে, তাহা হইতে বলিতে পারি, তাহার প্রবন্ধের মধ্যে এই কথাটাই প্রধান—দশহরা-উৎসব অথবা বিজয়া-উৎসব প্রধানতঃ একটি জয়োৎসব। এই শুভদিনে আমরা আমাদের কর্ম্মজীবনের নূতন বৎসরের উদ্বোধন করি। সকলে একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরের সার্থক এবং জয়যুক্ত জীবনের জন্য জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা করি—তিনি আমাদের সাধনার পথ সহজ এবং নির্ব্বের করুন।

প্রবন্ধপাঠের পর "এমন দেশটি" গান হইল। ইউরোপীয়েরা গানের অর্থ বুঝিতে পারিবেন না বলিয়া সংক্ষেপত একটা অনুবাদ করিয়া শুনাইয়া দেওয়া হইল। ইহার পর এস্‌রাজ-বাদ্য হইল। পরে আরো দু একটি গান হইল। দুইজন বন্ধু কয়েকটি কৌতুকপ্রদ গল্প বলিলেন। অবশেষে একজন শেষ মন্তব্যস্বরূপ কয়েকটি কথা বলার পর সভাভঙ্গ হইল, এবং পরস্পর আলিঙ্গন আরম্ভ হইল। ইউরোপীয়েরা এইখানেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন, বোধ হয় মনে করিলেন এটা barbarous. কিছুক্ষণ পরে সকলে মিলিয়া ফটো তোলা হইল। এক বন্ধুর সঙ্গে Kodak Camera ছিল, তিনি তুলিলেন। Londonএ আসিয়া সেই ফটোর এক কপি পাইয়াছি। আলো অভাবে খুব স্পষ্ট ফটো হয় নাই। তবু সেই দিনের স্মৃতি-হিসাবে ফটোখানির মূল্য আছে। ফটো তুলিবার সময়ে দুইজন বাঙ্গালী ধুতি পরিয়াছিলেন। আমারও খুবই ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু

তৎপূর্ব্বেই Red-Sea হইতেই বড় trunkটা Port Said হইতে বরাবর জলপথে পাঠাইবার জন্য জাহাজের জিম্মা করিয়া দিয়াছিলাম—এবং তাহার মধ্যেই আমার ধুতি চলিয়া যাওয়ায় সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই।

ঐদিন আমার বড়ই দেশের কথা মনে পড়িতেছিল। যে সময়ে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং মিলন হইবার কথা, ঠিক তাহারই পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে দেশ ছাড়িয়া আসিতে হইল বলিয়া সেদিন বড়ই মন কেমন করিতেছিল।

এখানে কয়েকদিন পূর্ব্বে ক্রমাগত ১২।১৩ দিন ধরিয়া ভয়ানক শীত এবং তুষারপাত হইয়া গিয়াছে। এমন নাকি এ সহরে গত ২৪।২৫ বৎসরের মধ্যে কেহ দেখে নাই। সমস্ত সহর বরফে ডুবিয়া ছিল। অনবরত পথে Snow Plough ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। সম্প্রতি শীত একটু কম। তবে ঝড় বৃষ্টি প্রায় লাগিয়াই আছে।

আমি একরূপ ভাল আছি। আপনার শরীর কেমন আছে জানাইবেন। বিধুর পত্র পাইয়াছি। সে শীঘ্রই দেশে ফিরিবে। আমি সম্প্রতি একরূপ settled হইয়াছি—এবং ধ্যান জপে একটু বেশী মন দিতে পারিতেছি। সর্ব্বদা আপনার স্নেহাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। আশা করি, মধ্যে মধ্যে আশীর্ব্বাদসহ আপনার কুশলসংবাদ দিয়া কৃতার্থ করিবেন। আমার শতসহস্র প্রণাম জানিবেন। ইতি—

সেবক

১৩।১।২৬ শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ঘোষ।

এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

কথা-প্রসঙ্গে

সত্য ও দেশসেবা

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের ঘটনা-বৈচিত্র্য অনুধাবন করিলে বেশ বুঝা যায় যে, আমাদের একটা দেশাত্মবোধ জাগিয়াছে। দেশ, তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট নহে, সমষ্টিগত ভাবে সে উন্নত হইতে চায়। উন্নতির অগ্রদূতরূপে আজ পর্য্যন্ত ভারতে যত মনীষী মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলেই নিজ নিজ ভাবানুযায়ী দেশকে এমন কিছু দিতে চাহিয়াছেন যাহাতে সে শত সহস্র বৎসরের জীর্ণ নির্ম্মোক ত্যাগ করিয়া সতেজ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে মতের বিভিন্নতা দৃষ্ট হইলেও, উদ্দেশ্য যে সকলেরই এক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য করিবার এই, যিনি প্রথমে যে মতই অবলম্বন করুন, নিজ ভাবানুযায়ী কিছুদিন কর্ম্ম করিবার পর অনেকেই এই সাধারণ-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন যে ধর্ম্মের সোনার কাঠি না ছোঁয়াইলে ভারতের অন্তরাত্মা জাগিবে না। ধর্ম্ম বলিতে কেহ অদ্বৈত, দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ, অহিংসা অথবা পূর্ণ-যোগ প্রভৃতি কোন সাম্প্রদায়িক সাধনা বিশেষ মনে করিবেন না, ধর্ম্ম বলিতে আমরা তাহাই বুঝি—যাহা সত্যকে প্রকাশ করে। মিথ্যার মোহিনীরূপ যতই সুন্দর হোক তাহা লইয়া চিরকাল কেহ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না, সহজ সত্য রূপ দেখিবার জন্য মানব-মন একদিন আকুল হইয়া উঠে। আমরা—জাতির মধ্যে সেই নির্ম্মল, মুক্ত সত্যের প্রকাশ দেখিতে চাই। এই সত্যের প্রকাশ মিথ্যার আশ্রয়ে হয় না। যে সংঘ, সত্যকে যতখানি দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিবে, সেই সংঘ দেশকে ততখানি মুক্তিরপথে অগ্রসর করাইতে সমর্থ হইবে। অনেকেই দেশকে জাগাইবার জন্য আন্তরিকতা প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু সত্যকে অবলম্বন করিবার জন্য তাঁহারা কতখানি ব্যাকুল তাহা

বলিতে পারি না। বাহির হইতে সত্যকে ধরা যায় না, ভিতর হইতেই তাহাকে ধরিতে হইবে, সাধনা ও পবিত্রতার সাহায্যে এই সত্যের আলো ব্যক্তি ও জাতির হৃদয়-মন্দিরে জ্বালিতে হইবে। দেশের উন্নতি কর্ম্মিগণের সত্যনিষ্ঠার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। কোন ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত ও জাতিগত স্বার্থের জন্য কর্ম্মিবৃন্দ কোন অবস্থায় যদি সত্যকে ত্যাগ না করেন তবে স্বদেশের ধ্রুব উন্নতি আশা করা যায়। উন্নতির চরম বিকাশ কত দিনে হইবে, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। উহা কর্ম্মিগণের সত্য-নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

শ্রদ্ধা ও দেশসেবা

পাশ্চাত্য-প্রবাসী দুই একটি কৃতবিদ্য ভারতীয় যুবক দেশে ফিরিয়া দেশ-সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছেন। যাহাতে দরিদ্র স্বদেশবাসীর আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নতি হয় তজ্জন্য সংবাদ পত্রে তাঁহারা চিন্তাপূর্ণ সন্দর্ভ লিখিয়া সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রবন্ধ নিচয় পাঠে আমাদের মনে হয়, যাহার জন্য দেশ গর্ব্বানুভব করে, পাশ্চাত্য মনীষীরা ভারতের যে বস্তুর জন্য ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধা করেন, ভারতীয় সভ্যতার যে দৃঢ় ভিত্তি শত সহস্র নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক প্রচণ্ড আঘাতেও ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই, জাতির সেই অমূল্য সম্পদের উপর তাঁহাদের একটা বিজাতীয় বিতৃষ্ণা আছে। দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকিয়া বিদেশীয় আবহাওয়া হইতে নিজ ভাবের স্বাতন্ত্র্য-রক্ষা বড়ই কঠিন। অবশ্য, স্বামী বিবেকানন্দের মত মহাপুরুষ ও শ্রীঅরবিন্দের মত মনীষী খুব অল্পই আছেন যাঁহারা পাশ্চাত্য বাসের পর স্বদেশের উপর গভীরতর শ্রদ্ধা লইয়া দেশে ফিরিতে পারেন। স্বামি বিবেকানন্দকে জনৈক ইংরাজ ভদ্রলোক কৌতুকের সহিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"স্বামিজী, এতদিন পাশ্চাত্য ভ্রমণের পর আপনার জন্মভূমি কেমন লাগিবে?" স্বামিজী তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "পূর্ব্বে দেশকে ভালবাসিতাম, এখন ভারতের ধূলিকণা পর্য্যন্ত আমার নিকট পবিত্র।"

শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বাবু তাঁহার স্ত্রীকে লিখিয়াছিলেন,—ভারতবর্ষকে নদনদী পরিবেষ্টিত একটি দেশ বলিয়া মনে করি না, আমি দেখি তিনি আমার মা। দেশ-জননীর উপর এইরূপ অগাধ ভক্তিশ্রদ্ধা বশতঃই মাতৃভূমির সেবা করিয়া তাঁহারা ধন্য হইতে পারিয়াছেন। যদি কাহারও উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা না থাকে তবে অন্তরিকতার সহিত কিরূপে যে তাহার সেবা করিতে পারা যায়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

সেই সেবার মূলে অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু প্রাণ নাই বলিতে হইবে। প্রাণহীন কাজের মূল্য কতটুকু ?

মনুষ্যত্ব ও দেশসেবা

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "মানুষ দুরকম—মানুষ ও মানহুঁষ"। মানহুঁষ মানে যাঁহার হুঁষ হইয়াছে, চৈতন্য হইয়াছে। আমাদের দেশে এইরূপ আত্মচৈতন্যে জাগ্রত মানুষের একান্ত অভাব, তাই দেশ জাগিতেছে না। দেশ একটা জড় পদার্থ নয়, পাহাড়, নদ নদী, পল্লি জনপদ বুকে লইয়া যে অচেতন ভূমিখণ্ড বিরাট্ শবের মত পড়িয়া আছে তাহাকে প্রকৃত দেশ বলা চলে না, উহার মধ্যে চৈতন্যের যে লীলার প্রকাশ তাহাই দেশ পদবাচ্য। চৈতন্যের প্রকাশ যাহাদের ভিতর সেই নরনারী, আত্মচৈতন্য হারাইয়া বিরাট শবের বুকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, যখন তাহারা জাগিবে তখনই দেশ প্রকৃত জাগ্রত হইবে। সংযম ও তপস্যা দ্বারা যে নিজ অন্তরে এই চৈতন্যকে জাগাইবার সাধনা লইয়াছে, শ্রীভগবান রামকৃষ্ণের ভাষায় যে নিজের ভিতর 'হুঁষ' আনিবার চেষ্টা করিতেছে সেই দেশের প্রকৃত সেবক। তাহার দেশ-সেবাই প্রকৃত দেশসেবা। প্রত্যেকে ব্যক্তিগত জীবনে যতই 'হুঁষ' আনিতে পারিবে সমষ্টিগত ভাবে জাতি ততই উন্নততর হইবে, কারণ, দেশের অবনতি ঘটিয়াছে মনুষ্যত্বের অভাবে। মনুষ্যত্ব জাগ্রত করিবার সাধনাই বর্ত্তমানে জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। কবি দ্বিজেন্দ্র লাল এই পরম সত্য অনুভব করিয়া গাহিয়াছিলেন,—"গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ'।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন *

ঝাঁপতাল

সব দেবদেবী মিলে ভবে আনিল রে
রামকৃষ্ণ রতন
কাতরে করুণ সুরে শুধায় তাঁরে কোথা
নাথ নারায়ণ।
মরতে যেতে হবে করিতে ধরমের
কলহ ভঞ্জন
দেখাতে সব পথে সব মতে শেষেতে
সত্য নিরঞ্জন।
মানুষের কি সাধ্য যে (ও) টলাবে সেই
স্বয়ম্ভুর আসন
দেবতার তপস্যাতে আসিল অবনীতে
পতিত পাবন।
কোমল হিয়া মহা- মায়া ত্বরা ত্যজে
অনন্ত শয়ান
সাথে সবে নিত্য- সিদ্ধ লীলার সাথী
মানসনন্দন।
শিবশক্তি গণপতি রাধামাধব রঘুপতি
তাঁরে করিল বরণ
আল্লা ঈশা ব্রহ্মঋষি ছুটে আনন্দে সেথা আসি
আনিল মধুমিলন।
ভবপারে কে যাবিরে ওরে ছাড়রে
কামকাঞ্চন

---

* শ্রীশ্রীদেবের জন্মতিথিতে বোথারো ভক্তসংঘে গীত।

এ মায়া-মানুষ রূপা কোরে করিবে
মায়ামোচন।
কে আছ ব্যথিত তাপিত ভয়ে ভীত
কে কেঁদেছ অনুক্ষণ
(তার) রবে না যাতনা সহিতে হবে না
পাইবে পদশরণ।
সে তোরে লবে কোলে আপন বোলে অন্তিমে
সেই শেষের দিন
ভ'রে দিবে ভরসা ঘুচাবে ভবতৃষা
দেখায়ে প্রেম-আনন। —শ্রীসুব্রহ্মণ্য।

নিষ্কাম কর্ম্ম

রমেশের সাংসারিক অবস্থা বড় খারাপ, প্রাইভেট টিউসিনি করে কলেজের খরচা চালাতো। সে এই রকমে কষ্টে সৃষ্টে 'ল' (Law) টা পাস করে শেষে উকিল হোল। পূর্ব্বেই বিবাহ হয়েছিল। ওকালতিতে 'পসার' না জমলেও বছরে একটি করে মেয়ে জন্মে রমেশের অবস্থাটা ক্রমেই 'কাহিল' করে তুলছিল। ঠিক এমনি সময়ে দেশে স্বদেশীর বান্ ডাকলো, আর রমেশও দড়িদড়া ছিঁড়ে সেই স্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লো। সকলে বল্লে, "খুব ত্যাগ যাহোক। সংসারের এমন ঘোরাল অবস্থা, কিন্তু রমেশবাবু সব অগ্রাহ্য করে দেশের কাজে জীবনটা সঁপে দিলেন!!" রমেশ গাঁয়ে গাঁয়ে বক্তৃতা করে বেড়ায়, একবার একটা রাজদ্রোহ সূচক বক্তৃতা করে কয়েক মাস জেলও খেটে এল। যেখানে দুর্ভিক্ষ, যেখানে বন্যা, যেখানে অগ্নিকাণ্ড

সেখানেই স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে সে নিষ্কাম কাজে লেগে যেতো। সুখের বিষয়, রমেশের সাংসারিক দুরবস্থাও এখন আর নেই। মাটির বাড়ী পাকা হয়েছে, কিছু জমিজমাও কিনেছে, মেয়েগুলিরও ভাল ঘরে বে' হয়ে গিয়েছে। সকলে বল্লে, "ভগবানের কৃপা, মানুষের হিত করলে তিনি যে পুরস্কার দেন।' একদিন রমেশের এক পুরাণো বন্ধু তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি চাকুরির জন্য অনেক বছর রেঙ্গুনে ছিলেন; দেখে গিয়েছিলেন বন্ধুকে গরীব, এসে দেখেন বন্ধু বড় লোক। বন্ধুটি সহাস্যে বল্লেন—"ভায়া, দেখে খুব খুসী হলুম, কিন্তু অবস্থাটা কি করে ফেরালে?" রমেশ কিছু মাত্র অপ্রতিভ না হয়ে উত্তর দিল—"তা বুঝি জানিস্ না, আমি যে দেশের একজন নিষ্কাম-কর্ম্মী।"

শ্রীঅজ্ঞ।

সাহিত্য

সাহিত্য তীর্থ। তীর্থে যেমন আচার প্রতিপালন করিতে হয়, সাহিত্যক্ষেত্রেও তেমনি সদাচার অবলম্বন করিতে হয়। তীর্থক্ষেত্রে যেমন অনাচার, অত্যাচার এবং অসদাচার বর্জ্জনীয়, সাহিত্যের আয়তনেও তেমনি স্বেচ্ছাচার সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য।

সাহিত্যের বিপুলায়তনে শ্রেষ্ঠ আসন সমালোচকের প্রাপ্য। ধর্ম্মাধিকরণে যেমন বিচারপতি, সমাজ শাসনে যেমন সমাজপতি, সাহিত্য পরিসরে তেমনি সমালোচক প্রবর।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের যুগে সমালোচকের কষাঘাত বড় তীব্র ছিল। সে যুগ ভিত্তি গঠনের যুগ; তথাপি সেই

যুগের প্রবর্ত্তক এক হস্তে যেমন পথ-প্রদর্শকের বিমল আলোক ধারণ পূর্ব্বক স্নিগ্ধ কিরণে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিতেন, অন্য হস্তে তেমনি শাসকের কঠোর বেত্রদণ্ডের আস্ফালনে আশ্রিত ও অনুগত জনমণ্ডলীকে মহাজন-নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য পথে পরিচালন করিতেন। সেই পুণ্য যুগে প্রবর্ত্তকের সহানুভূতি যেমন অজস্রধারে বর্ষিত হইত, সমালোচকের কঠিন কুলিশও তেমনি নিরপেক্ষ ভাবে নিক্ষিপ্ত হইত। তাহার ফল এই হইয়াছিল যে, দীনা ক্ষীণা বঙ্গভাষা দ্রুত পুষ্টিলাভ করিয়া ক্রমবর্দ্ধমান ক্রমোন্নতিশীল বিশাল বিরাট বিপুল সৎ-সাহিত্যে পরিণতি লাভ করিয়াছিল। আজ তাহার শাখা প্রশাখার বিস্তৃতি অন্য কোন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।

বঙ্গভাষার ও বঙ্গসাহিত্যের দুরদৃষ্ট হেতু কয়েকজন অসহিষ্ণু, অথচ ক্ষমতাশালী লেখকের আত্মরক্ষণশীল নীতির অনুকম্পায় সমালোচকের বংশ নির্ব্বংশ হইয়াছে। বঙ্গবিশ্রুতকীর্ত্তি "সাহিত্য" পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির তিরোধানের সহিত নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সমালোচনা বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন সমালোচকের আসন অধিকার করিয়াছেন চাটুকার, সমালোচনার নাম হইয়াছে গুণগ্রাহিতা। অনুকূল সমালোচককে আমরা পণ্ডিত আখ্যায় অভিহিত করি; আর প্রতিকূল সমালোচককে তারস্বরে শুনাইয়া দিই—"গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণং" অথবা "মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি, মধুমিচ্ছন্তি ষট্‌পদাঃ।"

প্রাণী জগতে যেমন বিবর্ত্তন ঘটে, সাহিত্য জগতেও তেমনি বিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যের ক্রমবিকাশ এবং ক্রমোন্নতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য স্তরে স্তরে কেমন পুষ্টি ও সৃষ্টিলাভ করিয়াছে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। কালের খরস্রোতে সাহিত্যের গতি ও রীতি, নীতি, পাঠকের রুচির পরিবর্ত্তনানুযায়ী আপনাকে কেমন সুন্দর ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। যে যুগে যে ভাব উপযোগী সে যুগের সাহিত্যে সেই ভাব বিশদরূপে প্রকটিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীতে যে ভাব,

বেহুলার ভাসান অথবা দাশরথি রায়ের পাঁচালীতে সে ভাব প্রস্ফুটিত হয় নাই। মাইকেলের কাব্যে যে ধ্বনি, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্য তাহার প্রতিধ্বনি নহে। বিহারীলালের কাব্যে যে সুর, কবীন্দ্র রবীন্দ্রের কাব্যে সে সুরের ঝঙ্কার নাই। প্রত্যেকের কাব্যে প্রত্যেকের ব্যক্তি-গত অথবা যুগগত বৈশিষ্ট্য অপ্রতিহত ভাবে প্রতিফলিত। রাজা রামমোহন রায়ের অথবা তৎপূর্ব্বে লিখিত গদ্যে এবং অক্ষয়কুমার দত্তের গদ্যে কত প্রভেদ। আবার অক্ষয়কুমারের গদ্যে এবং বিদ্যাসাগরের গদ্যে কত ব্যবধান। বিদ্যাসাগর এবং তাঁহার সমসাময়িক লেখকগণের ভাষায় এবং বঙ্কিমচন্দ্র ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতির ভাষায় কত পার্থক্য। বঙ্গভাষার যুগ-সূচনা হইতে রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত বঙ্গভাষার পুষ্টি ঘটিয়াছে, বঙ্গসাহিত্যের বৈভব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, অসাধারণধীশক্তি সম্পন্ন পুরুষ রবীন্দ্রনাথের ভাষার ও ভাবের অনুকরণ করিতে যাইয়া তদপেক্ষা শত সহস্রগুণে নিকৃষ্ট লেখকগণ ভাষা জননীকে নিতান্ত কুপুত্রের ন্যায় নির্ম্মমভাবে পীড়ন করিতেছেন। লিপি চাতুর্য্যের অভাবে এবং লিপি প্রাচুর্য্যের অত্যাচারে, ভাষা-জননী সেতুসংরুদ্ধ প্রতিহতগতি বেগবতী স্রোতস্বিনীর ন্যায় আপনার তেজে আপনি স্ফীতা হইয়া অধিকতর পঙ্কিলময় হইতেছেন। রবীন্দ্রনাথ আপনার ভাবে আপনি বিভোর। ভাষা-জননীকে বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল খাতে প্রবাহিত করিবার জন্য ভক্তের ভক্তিকে পূত ও উদ্বুদ্ধ করিবার অবসর তাঁহার নাই। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষক মাত্র; বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় শিক্ষক ও শাসকের একত্র সমাবেশ তাঁহাতে নাই। তিনি পথ প্রদর্শক মাত্র—পথি নির্দ্দেশক নহেন। যদি কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে —"কঃ পন্থা", তিনি বলিবেন—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।" কিন্তু মহাজনেরা যে পথে পদার্পণ করিয়াছেন, মহাজন না হইলে যে, কেহ স্বীয় শক্তিতে সে পথে গমন করিতে পারে না, তাহা তিনি ভাবিবার এবং বুঝিবার অবসর পাইলেও তাহার কোন উপায় নির্দ্দেশ করিবার অবকাশ পান না। লেখক হওয়া সহজ, কিন্তু লেখক প্রস্তুত করা বড় কঠিন। সহজ কার্য্যের নিমিত্ত সাহায্য প্রয়োজন হয় না। সাহায্য

নিতান্ত আবশ্যক, কঠিন ও আয়াসসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিবার নিমিত্ত। সে সাহায্য দান করিবার সামর্থ্য সকলের থাকে না। যাঁহার সে শক্তি থাকে, তিনিও যদি সে শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন, তাহা হইলে দেশের ও ভাষার দুর্ভাগ্য ব্যতীত আর কি বলিব? কত দিনে এ দুর্ভাগ্যের অবসান হইবে তাহা শ্রীভগবান ব্যতীত আর কে বলিতে পারে?

আমি অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছি। আমি যাহা বলিতে চাই তাহা এই যে, ভাষা ও সাহিত্যের গতি ও ধারা জাতীয় অভ্যুত্থানের অনুকূল হইতেছে কি-না সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন ভাষা-জননীর মনীষী ও কৃতী সন্তানগণ। তাঁহারা যদি এ বিষয়ে অবহিত না হন তাহা হইলে ভাষা-জননীর দ্বিতীয় আশ্রয়স্থল কোথায়?

কোন্ কোন্ বিভিন্ন মুখে ভাষা ও সাহিত্যের অবনতি হইতেছে তাহার নির্দ্দেশ করিতে গেলে আমার প্রবন্ধে অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে হইবে। সুতরাং যে বিষয়টুকু আমার বক্তব্য বিষয়ের অঙ্গীভূত সেই বিশেষ বিষয় মাত্রের অবতারণা করিয়া ক্ষান্ত হইব।

মাতৃভাষা ও সাহিত্য জাতীয় জীবনের একটি প্রধান বৈভব। মাতৃভাষা ও সাহিত্যের গতি প্রকৃতি সর্ব্বতোভাবে জাতীয় উন্নতির অনুকূল হওয়া প্রয়োজন। আমাদের জাতীয় জীবনের যে ধারা, আমাদের মাতৃভাষায় ও সাহিত্যে আমরা যেমন পরিস্ফুট করিতে পারি, ভিন্ন জাতীয় লোক অথবা ভিন্ন ভাষার সাহায্যে তাহা কখনই সংঘটিত হইতে পারে না। যে নীতি আমাদের জাতীয় জীবনে উপযোগী ও উপকারী, সে নীতি অন্য কোন জাতির সমাজের ও সাহিতের অনুকূল হইতে পারে না।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে বিধবা বিবাহের কথা। হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই। সুতরাং হিন্দুর নিজস্ব সাহিত্যে বিধবা বিবাহের অনুকূল মতাবলীর প্রচার ও প্রচলন কখনই সমীচীন নহে। অমর বঙ্কিমচন্দ্রের অক্ষয় লেখনী, হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের অবশ্যম্ভাবী কুফল কিদৃশ প্রাণান্তকর, তাহা বিষবৃক্ষে বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক লেখকগণ বিধবার প্রণয়কে তাঁহাদের প্রধান প্রধান

পুস্তকের মেরুদণ্ড করিয়া তাহাকে পুষ্প পল্লবে সুসজ্জিত করিতে ঘৃণা অথবা লজ্জা বোধ করেন না।

উপন্যাস উপকথা নহে। উপকথা বালকবালিকারা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে ঠাকুরমা ও দিদিমার নিকট মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করে। সেই সকল উপকথার নায়ক নায়িকার চরিত্র হিন্দু বৃদ্ধারা এরূপ ভাবে প্রস্ফুটিত করেন যে, তাহাদের কোন কুচরিত্রের প্রভাব কোন প্রকারে তরলমতি বালকবালিকাদের হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশের উপন্যাস রচয়িতাগণ তাঁহাদের নায়ক নায়িকার চরিত্র সেরূপ যত্ন সহকারে চিত্রিত করেন না। তাঁহাদের মানস পুত্র ও মানসী কন্যাগণের চরিত্রের প্রভাব কিরূপ পরিমাণে তাঁহাদের পাঠক-পাঠিকাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইবে তদ্বিষয়ে তাঁহারা নিতান্তই উদাসীন। এই আত্মবিলাসী ঔদাসীন্যের জন্য তাঁহারা সমাজের নিকট কিরূপ পরিমাণে দায়ী তাহা তাঁহারা ভাবিবারও বোধ হয় অবকাশ পান না। বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহার ভীষণ কুফল প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, আর আধুনিক লেখকগণ প্রতি গৃহপ্রাঙ্গণে বিষবৃক্ষ রোপণ করিতেছেন এইজন্য যে, তাহার বিষময় ফল আহরণ এবং ভক্ষণ করিয়া ঐ সকল গৃহের অধিবাসীরা যাহাতে অচিরাৎ উৎসন্ন যায়।

স্বীকার করি, কালের কুটিল প্রবাহে আমাদের রুচিবিকার ঘটিয়াছে এবং তাহার অপরিহার্য্য ফলে সামাজিক বিপ্লব ঘটিতেছে। কিন্তু লেখক কি পাঠকের ক্রীতদাস? লেখক কি শিক্ষক নহেন? এবং পাঠক কি তাঁহার শিষ্য নহে? তাই যদি না হয়, তাহা হইলে পাঠক কি হেতু লেখকের লিপি পাঠ করিবেন? যিনি বেদান্তে পারদর্শী, তিনি কি শিক্ষার অথবা কৌতূহলের নিমিত্ত বর্ণপরিচয় পাঠ করিতে স্পৃহা অনুভব করিতে পারেন? লোকে পুস্তক পাঠ করে কেন? শিক্ষা লাভ করিবার নিমিত্ত অথবা আনন্দ লাভ করিবার জন্য। যিনি শিক্ষা অথবা আনন্দ দান করিতে পারেন তিনি নিশ্চয় শিক্ষার্থী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি মহৎ না হইলেও সৎ, নতুবা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়?

শ্রেষ্ঠ যদি শিক্ষার্থীকে ইষ্ট শিক্ষা না দিলেন, তাহা হইলে তাঁহার শিক্ষকের আসন গ্রহণ করিয়া পুস্তক প্রণয়নের প্রয়োজন কি ? ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের, নীতির নামে দুর্নীতির এবং আচারের নামে অনাচারের প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা যাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য তাঁহার জনহিতকর লেখনী ধারণ করিবার অধিকার ও স্পর্দ্ধা থাকা কখনই উচিত নহে।

সাহিত্য, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বাহন। জ্ঞান ও বিজ্ঞান সত্যের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। যাহা সত্য তাহা সৎ। যিনি সৎ ও সত্যের অবমাননা এবং অসৎ ও অসত্যের সম্বর্দ্ধনা করেন, তিনি কখন শিক্ষকের পবিত্র আসন অলঙ্কৃত করিবার অধিকারী নহেন। তাঁহার আসন কোথায় তাহা সুধীজনকে বলিয়া দিতে হইবে না।

সত্য বটে, অন্ধকার সৃষ্টি না করিলে আলোকের বিকাশ ঘটে না, অমানিশা না থাকিলে পৌর্ণমাসী রজনীর মনোহারিত্ব কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না। আলোকের প্রয়োজনীয়তা যেমন, অন্ধকারের প্রয়োজনীয়তাও তদ্রূপ। কিন্তু অন্ধকার কাহাকেও দেখাইতে হয় না ; অন্ধকার দূর করিবার নিমিত্ত আলোক দেখাইবার প্রয়োজন। সেইরূপ পাপ কাহাকেও শিখাইতে হয় না, পাপকে দূর করিবার নিমিত্ত পুণ্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। মানবমাত্রেরই বিবেক সৎ, কিন্তু প্রবৃত্তি অসৎ। সুতরাং প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বিবেককে উদ্বুদ্ধ করিতে হয়। যেখানে বিবেককে খর্ব্ব করিয়া প্রবৃত্তিপরায়ণতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রচেষ্টা, সেখানে নরক—ঘোর নরক।

পুণ্যের মহিমা কীর্ত্তন করিতে হইলে পাপকে মহীয়ান করিতে হয় না ;—পাপের ভীষণ পরিণাম প্রদর্শন করিতে হয়। পুণ্যকে খর্ব্ব করিলে পাপ গরীয়ান্ হয় না, পাপকে খর্ব্ব করিলে পুণ্য গরীয়ান হয়।

চিত্র কলায় যেমন আধুনিক চিত্রকর নগ্ন সৌন্দর্য্যের মোহ মদিরায় আকৃষ্ট করিয়া কতশত পতঙ্গবৃত্ত ব্যক্তিকে বহ্নিমুখে ধাবমান করিতেছেন ; কাব্য কলায়ও তেমনি কয়েকজন আধুনিক শক্তিশালী লেখক দুর্নীতির প্রশ্রয় প্রদান করিয়া আমাদের নরকের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছেন। সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর মধ্যে সংবাদ-

পত্রসেবার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে বিচার বিতণ্ডা চলিয়াছিল তৎপ্রতি আমি আধুনিক লেখক ও চিত্রকরগণের তীব্র দৃষ্টি আকর্ষণ করি। মহাত্মা গান্ধী লোকমতকে প্রবল করিয়া সংবাদপত্র সম্পাদককে তদনুবর্ত্তী হইতে পরামর্শ দেন, কিন্তু মাননীয় শাস্ত্রী ঐ মতের পক্ষাবলম্বী নহেন। তিনি বলেন, জনমত সৃষ্টি এবং জনমত পরিচালন করাই সংবাদ পত্র সম্পাদকের প্রধান কর্ত্তব্য। তাঁহার মতে বিবেক জনমতাপেক্ষা অনেক বড়, সুতরাং কোন ক্রমে বিবেককে খর্ব্ব করা যুক্তি যুক্ত নহে। মহাত্মা গান্ধীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইলেও এ বিষয়ে আমি মহাত্মার মতাপেক্ষা মাননীয় শাস্ত্রীর মত শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়স্কর মনে করি।

যেমন সংবাদপত্রসেবী, তেমনি লেখক ও চিত্রকর। এই তিনের কর্ত্তব্য সত্যের প্রতিষ্ঠা। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই কঠোর কর্ত্তব্য আদর্শ-সৃষ্টি, অর্থাৎ জাতীয় জীবনের উন্নতি বিধায়ক রীতি নীতির প্রবর্ত্তন, প্রচলন, অথবা পুনঃ সংস্থাপন। এই মহৎ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে যিনি অক্ষম তাঁহার তুলি অথবা লেখনী ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র।

জাতীয় ধর্ম্ম সর্ব্বদাই জাতীয় জীবনের উপযোগী, তাহার ব্যতিক্রমে বিষময় ফল অবশ্যম্ভাবী। জাতীয় ধর্ম্ম এবং রীতি নীতি জাতীয় সাহিত্যে পরিস্ফুট করিতে হয়, এই জন্য সাহিত্যে স্বেচ্ছাচারের স্থান নাই। স্বেচ্ছাচার ব্যভিচারের নামান্তর মাত্র। সাহিত্যের পরিসর পুণ্যতীর্থ তীর্থে যেরূপ সংযতচিত্ত সংযতচরিত্র হইয়া সংযত ভাবে ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ কামনা করিতে হয়, সাহিত্য ক্ষেত্রেও সেইরূপ আত্মসংযম পূর্ব্বক সমাজের স্বধর্ম্মের এবং স্বদেশের হিতকল্পে লেখনী পরিচালনা করিতে হয়। আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পারিপার্শ্বিক ঘটনার সাহায্যে চরিত্র সকল এমন ভাবে চিত্রিত করিতে হয় যাহাতে পাঠক পাঠিকার মনে ধর্ম্মের প্রতি এবং স্বসমাজের কল্যাণকর রীতিনীতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং তাহার ব্যতিক্রম ও ব্যভিচারের প্রতি একান্ত বিতৃষ্ণা জন্মে। সাহিত্যিকের ইহাই প্রকৃত কর্ত্তব্য।

রস সাহিত্যের প্রাণ, ভাব তাহার বৈভব, আর ভাষা তাহার ভিত্তি। এই তিনের সমন্বয়ে এবং সামঞ্জস্যে সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি। ইহার

অন্যথা হইলে সৎ-সাহিত্যের অভাব হইয়া পড়ে। সৎ-সাহিত্যের অভাব হইলে অসৎ সাহিত্যের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ফলে, সমাজ দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠে। সাহিত্য-সাধনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। জাতীয় জীবনের প্রধান বৈভব সাহিত্য। সাহিত্যের দুরবস্থা জাতির দুরবস্থা আনয়ন করে। যে সাহিত্যের সাহায্যে মৃতকল্প জাতির জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কাল দেহে প্রাণ সঞ্চার করিতে হয়, জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় স্বাস্থ্য, জাতীয় শক্তির উদ্বোধন করিতে হয়, সেই সাহিত্যের অধঃপতন জাতির অধঃপতনের মূলীভূত কারণ।

ইতিহাস পাঠক অবগত আছেন যে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবনতি সেই দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, যে দিন হইতে ভারতবর্ষের দেবভাষা ও সাহিত্যের সাধনা ও প্রচারের প্রতি লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মৃত্যুও সংঘটিত হইয়াছে।

দেশাত্মবোধকে জাগ্রত রাখিবার একমাত্র উপায় জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য। জাতীয় ভাষার মৃত্যুর সহিত দেশাত্মবোধও লুপ্ত হইয়াছিল। মুসলমান শাসকেরা আমাদের ধর্ম্মের প্রতি যেরূপ বিরূপ ছিলেন, আমাদের জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিও তদ্রূপ বিতৃষ্ণ ছিলেন। ইংরাজের শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পরে যখন রাজপুরুষেরা আমাদের শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করিলেন, তখন বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাঁহাদের শুভদৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। আজ যে বাংলা ভাষা শাখাপল্লব পুষ্পে ফলে সমৃদ্ধ হইয়া বিরাট বিশাল বিচিত্র বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে, তাহা ইংরাজের অনুকম্পায়। কোন এক মহানুভব ইংরাজই প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করেন। বাঙ্গলা গদ্য ও পদ্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি বিষয়ে ইংরাজই আমাদের প্রধান পথপ্রদর্শক। আমাদের মাতৃভাষার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা ইংরাজের নিকট চিরঋণী ও চির কৃতজ্ঞ।

ইংরাজের শাসন সৌকর্য্যে, ইংরাজের বিধি ব্যবস্থার গুণে, ইংরাজের অনুকম্পায় আজ আমরা ভাষা-জননীর স্তন্যপীযূষ পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছি। ইংরাজের শিক্ষাগুণে যখন কৃতবিদ্য বাঙ্গালী সম্প্রদায় বাঙ্গলা

ভাষার অনুশীলন আরম্ভ করিলেন, তখন হইতে আবার আমাদের দেশাত্মবোধের সঞ্চার আরম্ভ হইল; তখন হইতে স্বধর্ম্মের প্রতি, সামাজিক রীতি নীতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাতীয় ভাব প্রবুদ্ধ হইল। আমরা বুঝিতে শিখিলাম যে, আমাদেরও নিজস্ব বৈভব কিছু আছে। আমরা রাজনীতির, সমাজ-নীতির এবং সর্ব্বোপরি ভাষার কাঙ্গাল নই। আমরা বুঝিলাম, আমাদের নিজ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ আমরা ভিখারীর স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছি, কিন্তু ভিক্ষা আমাদের বৃত্তি নহে, আমাদের ভাণ্ডার শূন্য নহে।

ভাষায় অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ শক্তিশালী লেখক জন্মগ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং আদি রস হইতে আরম্ভ করিয়া সাহিত্যের মধ্য দিয়া, আমরা পর্য্যায়ক্রমে বীর প্রভৃতি নয়টি রসেরই আস্বাদ গ্রহণ করিতে সক্ষম হইলাম। একদিন যে সাহিত্য অতি "জঘন্য" ও "কদর্য্য" ছিল, ক্রমে তাহা রসালঙ্কারে ভূষিত হইয়া সুচিতা ও সৌষ্ঠবে সর্ব্বজনপ্রিয় হইল। আজ বিশ্ব সাহিত্যের সর্ব্বোচ্চ সোপানে বাঙ্গলা সাহিত্যের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আজ আমাদের কত আনন্দের---কত গৌরবের দিন। কিন্তু আনন্দে ও গৌরবে আত্মহারা হইয়া যদি আমরা শ্লীলতা বর্জ্জন করি অথবা সৎ সাহিত্যের মর্য্যাদা হানি করিয়া দুর্নীতির প্রশ্রয় দেই, তাহা হইলে তদপেক্ষা গভীর পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে। আশা করি, সাহিত্যিকগণ এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

জাতীয় সাহিত্যের অনুশীলন যেমন প্রয়োজন, অন্যান্য জাতির ভাষা এবং সাহিত্যের অনুশীলনও তেমনি প্রয়োজন। সাহিত্য শুধু রসের আকর নহে, সাহিত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের বাহন সুতরাং যিনি যত ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন করিবেন তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডারে ততই ধন সঞ্চয় ঘটিবে। সমুদ্রের গর্ভে যেমন মণিমুক্তা নিহিত থাকে, সাহিত্যের বিরাট-ভাণ্ডারেও তেমনি অসংখ্য অপরিমিত ধন রত্ন সঞ্চিত থাকে। ডুবুরী যেরূপ অসীম সাহস ও অধ্যবসায় সহকারে সমুদ্রগর্ভস্থ শুক্তি আহরণ করে, মানুষ মাত্রেরই তেমনি নানা জাতীয় সাহিত্য হইতে অনুশীলন

দ্বারা অতি যত্নে জ্ঞানরত্ন আহরণ করিতে হয়। যিনি রস ভোগেচ্ছু তিনি নানা জাতীয় রস-সাহিত্যে আত্মনিবিষ্ট হইবেন; যিনি জ্ঞান সঞ্চয় করিতে ইচ্ছুক তিনি ভিন্ন ভিন্ন দেশের দর্শন ও বিজ্ঞানের অনুশীলন করিবেন। জ্ঞানে মনুষ্যত্বের পূর্ণ পরিণতি, জ্ঞানেই দেবত্বের বিকাশ, জ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র উপায়।

"অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতিপ্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥"

সেই জ্ঞান সাহিত্যে নিহিত, অতএব সাহিত্য মানবজীবনের কত প্রয়োজনীয় তাহা সামান্য চিন্তা দ্বারা মানব মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন। দুঃখের বিষয় এরূপ চিন্তা করিবার প্রবৃত্তি এবং তদুপযোগী অবসর অতি অল্প লোকেরই থাকে; কিন্তু স্মরণ করাইয়া দিলে তাঁহারা সহজেই প্রবুদ্ধ হইতে পারেন। আমার এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যদি একজন ব্যক্তিরও এরূপ চৈতন্যোদয় হয়, তাহা হইলে আমার অনেক বিনিদ্র রজনীর জল্পনা কল্পনা ফলপ্রসূ হইবে।

বাক্য ও অর্থের সমন্বয়ে সাহিত্য, তাই অমর কবি কালিদাস রঘুবংশের সূচনাতেই লিখিয়াছেন—

"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ॥"

বাক্য, অর্থাৎ বাক্, ধর্ম্মের সপ্ত পত্নীর মধ্যে অন্যতম। ধর্ম্মের সাত পত্নীর নাম কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। ইহাদের মধ্যে, বাক, স্মৃতি ও মেধা, এই তিনের সহিত সাহিত্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

"কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা।"

নারীগণের মধ্যে আমি কীর্ত্তি, শ্রী, বাক, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা, অর্থাৎ এই সপ্ত রূপ স্ত্রী আমার বিভূতি।

সর্ব্বার্থ প্রকাশিনী সংস্কৃত বাণীর নাম বাক, যে শক্তির দ্বারা পূর্ব্বাভ্যস্ত বিষয় মনে পুনরভ্যুদিত হয়, তাহার নাম স্মৃতি আর বহু গ্রন্থার্থ ধারণ করিবার শক্তির নাম মেধা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় আরও বলিয়াছেন,—"বেদানাং সামবেদোঽস্মি।" সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্ন বেদ। বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে সামবেদে ভগবানের বিশেষ বিভূতি।

পুনরায় ভগবান বলিতেছেন—"অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং।" বিদ্যা সমূহের মধ্যে আমি অধ্যাত্ম বিদ্যা অর্থাৎ আত্মবিদ্যা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, পরা বিদ্যা।

আবার বলিতেছেন—"বাদঃ প্রবদতামহম্", বাদিগণের মধ্যে আমি বাদ নামক তর্ক। তর্ক শাস্ত্র সাহিত্যের অন্তভুক্ত। ভগবান বলিতেছেন—বিবদমান তার্কিক পুরুষগণের কথা সমূহের মধ্যে আমি বাদ। তর্ক শাস্ত্রের তিনটি অঙ্গ—বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। ইহার মধ্যে বাদ শ্রেষ্ঠ, কারণ বাদ তত্ত্বনিরূপণ ফল অর্থাৎ মীমাংসা।

এইখানেই শেষ নহে। সাহিত্যের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত শ্রীভগবানের সম্বন্ধ। "অক্ষরাণামকারোঽস্মি"—অক্ষরদিগের মধ্যে অকার অর্থাৎ আদি। 'দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ'—সমাস সমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস—পূর্ণ সামঞ্জস্য। দ্বন্দ্ব সমাসে পক্ষপাত নাই, এই সমাসে সকল বাদেরই প্রাধান্য।

"বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম।"

সাম সমূহের মধ্যে বৃহৎসাম, ছন্দ সমূহের মধ্যে গায়ত্রী। বেদের মধ্যে সাম শ্রেষ্ঠ—আবার সামের মধ্যে বৃহৎসাম শ্রেষ্ঠ।

সাহিত্যের চর্চ্চা করেন—ঋষি ও কবি। শ্রীভগবান স্বয়ং বলিতেছেন

"মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ।"

মুনিগণের মধ্যে ব্যাস—যিনি বেদ রচনা করিয়াছিলেন, মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, বেদান্ত রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতম্ রচনা করিয়া সাহিত্য সৃষ্টির চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন। কবিগণের মধ্যে উশনা অর্থাৎ শুক্র।

অক্ষরের আদি হইতে সাহিত্যের আদিতে, সমাসের সংযোগে সাহিত্যের মধ্যে এবং ছন্দের সাহচর্য্যে সাহিত্যের অন্তে শ্রীভগবান বিরাজিত। তিনি রচয়িতা, তিনিই রসবেত্তা, তিনি সাহিত্য, তিনিই

সাহিত্যিক। তিনি কবি, তিনিই কাব্য। তিনি রস, তিনিই রসিক। তিনি জ্ঞান, তিনিই জ্ঞানী, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়।

অতএব সাহিত্যের যেরূপ ভাবেই সেবা করা হউক, তাহার যে-কোন শাখা অথবা প্রশাখার অনুশীলন করা যাউক, অথবা তাহার যে-কোন রসেরই স্বাদ গ্রহণ করি—সে সেবা সাহিত্যের সেবা নামতঃ; কিন্তু কার্য্যতঃ সে সেবা সেই শ্রীভগবানের সেবা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি রসো বৈ সঃ, আবার তিনিই বলিয়াছেন, "জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্"।

রস—সাহিত্যের প্রাণ, জ্ঞান—সাহিত্যের চরম ফল। এতদুভয়েই ভগবান প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং সাহিত্য স্বয়ং ভগবানের বিভূতি। মানুষ যদি এমন বিভূতি হইতে আপনাকে বঞ্চিত রাখে, তাহা হইলে তাহার মনুষ্য জীবনের সার্থকতা কোথায়?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবেকানন্দ

তীব্র শীতের কুহেলি ভেদিয়া কার আগমনী গান
উঠিছে মথিয়া আকাশ বাতাস অযুত কণ্ঠে তান।
মহাভারতের হে মহামানব, সিন্ধু মথন ধন!
বন্দিতে তোমা মিলেছি সকলে মর্ত্ত্যের জনগণ।
করুণা তরল আঁখিদুটি তব, জ্যোতিঃ-উজ্জ্বল-মুখ,
কে তুমি উদিলে আয়তললাট, দিব্য-লোচন যুগ!
আকাশে বাতাসে ঘোষিছে তোমার স্বদেশমন্ত্র ধ্বনি;
বাজিছে তোমার অভয়-ডঙ্কা, উঠিতেছে রণরণি।
তব গুরু সেই করুণাবতার রামকৃষ্ণের পায়—
সম্ভ্রমে দেব! আপনিই মোর মাথা নত হয়ে যায়।
বরেণ্য! তব জনমোৎসবে এই প্রাঙ্গণ মাঝে,
কোলাহলময় দিকে দিকে হেরি আনন্দ গান বাজে।
এনেছি সাজায়ে প্রাণের অর্ঘ্য হে যশঃ রথের রথী;
রাতুল চরণে নিঃশেষে ডালি দিনু নির্ম্মল-মতি!
পবিত্র করা পদ-রজঃ তব দীন অযোগ্য মাথে,
ধন্য হইল তুলিয়া আজিকে ভক্তি-শ্রদ্ধা-সাথে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাধুকরী

নারী-হিতসাধন

* * * আমাদের দেশে শিক্ষার বড়ই অভাব, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের মধ্যে এই অভাব বেশী অনুভূত হয়। লেখাপড়া শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা নহে, জানি, কিন্তু লিখিতে পড়িতে না জানিলে অধিকাংশ লোকের শিক্ষা বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে না। এজন্য জ্ঞানলাভের ও শিক্ষালাভের পক্ষে লিখন পঠন ক্ষমতা অধিকাংশ লোকের একান্ত আবশ্যক। ছেলেরা যে রকম শিক্ষা পায়, মেয়েদিগকেও ঠিক্ সেইরূপ শিক্ষা দিতে হইবে, কোন শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ একথা বলেন না। কিন্তু ছেলেদের শিক্ষা ও মেয়েদের শিক্ষা কিছু ভিন্ন ভিন্ন রকম হওয়া উচিত বলিয়া, মেয়েদিগকে নিরক্ষর ও মূর্খ করিয়া রাখা উচিত নয়। কতকগুলি জিনিষ আছে, যাহা বালকবালিকা উভয়েরই শিক্ষনীয়, দুই আর দুইয়ে চার—ছেলেমেয়ে উভয়ের পক্ষেই সত্য, ভূগোল উভয়ের পক্ষেই এক, সাহিত্য উভয়ের পক্ষেই এক। পাশ্চাত্য শিক্ষা ভাল নয় বলিয়া মেয়েদিগকে মূর্খ রাখা অনুচিত, প্রাচ্য রীতিতেই নারীদের শিক্ষা হউক না। প্রাচীন কালের হিন্দু বিদুষীদের নাম অনেকেই জানেন। আজ প্রাতে দীনেশবাবুর "বাংলাভাষা ও সাহিত্যের" পাত অন্যমনস্ক ভাবে উল্টাইতে উল্টাইতে দেখিলাম, ইংরেজ প্রভাবের পূর্ব্বে মুসলমান আমলেও আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল, এবং অনেক নারী পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। সন্তানপালন, রোগীর শুশ্রূষা, গৃহকর্ম্ম এসবও শিখিবার জিনিষ। নিরক্ষর থাকিলেই এগুলা নারীরা স্বভাবতঃই শিখিয়া ফেলেন না, এবং ইহাও প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে বলিতেছি, খুব লেখাপড়া জানা মেয়েদেরও খুব বেশী গৃহকর্ম্মনৈপুণ্য ও রোগীর শুশ্রূষাদির ক্ষমতা দেখিয়াছি। নারীদের মধ্যে যথেষ্ট শিক্ষার বিস্তার করিতে হইলে শুধু বালিকাদের শিক্ষাতেই মন দিলে চলিবে না, যাঁহারা প্রাপ্তবয়স্কা তাঁহাদেরও শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। নতুবা পঞ্চাশ বৎসর পরেও দেখা যাইবে যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোক নিরক্ষর। অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষার নানা রূপ চেষ্টা হইতেছে। এ বিষয়ে যাঁহারা

কৃতী ও অভিজ্ঞ, তাঁহাদের দ্বারা প্রবন্ধ লেখাইলে সর্ব্বসাধারণে উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। স্ত্রীশিক্ষার একটি গুণ এই যে, নারীদিগকে শিক্ষা দিলে পরোক্ষভাবে পুরুষদের শিক্ষা হইবেই ; কিন্তু পুরুষদিগকে শিক্ষা দিলে নারীদের শিক্ষা না হইতেও পারে। শিক্ষিতা মাতা সাধ্যপক্ষে পুত্রকন্যাকে অশিক্ষিত রাখেন না, কিন্তু বিস্তর শিক্ষিত ও ধনবান গৃহস্থের বাড়ীর মেয়েরা সমস্ত জীবন নিরক্ষর ও মূর্খ থাকিয়া যান, তাহাতে ঐ সকল গৃহস্থের কোন লজ্জা বোধ হয় না। কিন্তু কোন শিক্ষিতা জননীর পুত্রকন্যা নিরক্ষর থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই লজ্জিত হইবেন—বস্তুতঃ তিনি তাহাদিগকে নিরক্ষর থাকিতে দিবেনই না। এইরূপ যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া গোণ্ডালের (Gondel) ঠাকুরসাহেব স্যার শ্রীভাগবৎ সিংহজী নিজের রাজ্যে অগ্রেই বালিকাদের মধ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

আর একদল লোক আছে, যাহারা শিক্ষিতা নারীদের নিন্দা কুৎসা প্রচার করিয়া স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধিতা করিয়া থাকে। কিন্তু তথাকথিত শিক্ষা পাইয়াও যদি কোন নারীর আচরণ বাস্তবিকই নিন্দনীয় হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা শিক্ষার দোষ ও অনাবশ্যকতা প্রমাণিত হয় না, বরং সুশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাই প্রমাণিত হয়। শিক্ষিত পুরুষদের মধ্যে, এমন কি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধিধারী পুরুষদের মধ্যেও জঘন্য চরিত্রের লোক আছে। কিন্তু সে কারণে ত কেহ বলে না যে, পুরুষদের শিক্ষাটা খারাপ বা তাহাদিগকে শিক্ষা না দিয়া নিরক্ষর করিয়া রাখা ভাল। ইহাও মনে রাখা উচিত যে, নিরক্ষর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও অনেকের আচরণ নিন্দনীয়। আর একটা কথা আমরা ভুলিয়া যাই যে, যে পুরুষগুলি শিক্ষিতা বা অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকদিগের পদস্খলনের কারণ, সমাজ তাহাদিগকে কোন শাস্তি দেয় না, অপাংক্তেয় করে না,—যতকিছু নিন্দা, কুৎসা, ক্রোধ, পাতিত্য সবই হতভাগ্য স্ত্রীলোকদের উপর পড়ে।

* * * * * * *

(আনন্দবাজার পত্রিকা শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

সংঘ-বার্ত্তা

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মমহোৎসব

বিগত ৯ই ফাল্গুন ও ১৬ই ফাল্গুন বেলুড়মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিপূজা এবং জন্মমহোৎসব যথাক্রমে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। জন্মতিথি দিবসে প্রাতে মঙ্গলারতি, তৎপরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা, দশাবতারের এবং অন্যান্য দেবদেবীর পূজা ও হোম শেষ হইলে ভক্ত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। ঐ দিন সাতজন যুবক ব্রহ্মচর্য্য এবং এগারজন পবিত্র সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ" শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আত্ম নিবেদন করিয়াছেন।

মহোৎসব দিবসে—হোরমিলার কোম্পানি ও পোর্ট কমিশনারের ষ্টীমার যোগে, বাস, মোটর, নৌকা, ট্রেণ এবং পদব্রজে বেলুড়মঠে লক্ষাধিক জনসমাগম হইয়াছিল। আন্দুল কালী কীর্ত্তন, আহীরিটোলা কীর্ত্তন পার্টি এবং অন্যান্য বহু কীর্ত্তনের দল বিভিন্ন স্থান হইতে আগমন করিয়া তাঁহাদের ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীতে সমবেত নরনারীর হৃদয়-মন ভগবদ্ভাবে পূর্ণ করিয়াছিলেন। কে, বি, দত্ত, পাল কোম্পানি, আহীরিটোলা পার্টি, 'বসুমতীর' শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ইতালী অর্চ্চনালয়ের ভক্তগণ এবং সালখিয়ার ভক্তবৃন্দ জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে পান, তামাক, চা, সরবৎ পান করাইয়া সকলকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ন্যূনাধিক পাঁচশত স্বেচ্ছাসেবক বেলুড় বয়স্কাউট্ দলের সহিত মিলিত হইয়া মহোৎসব দিবসে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সুবিধা অসুবিধার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কমবেশী ষোল হাজার ভক্ত নরনারী শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করেন সন্ধ্যার পর হেমচন্দ্র চিত্রকর নানারূপ বাজি পোড়াইয়া জনগণের চিত্ত বিনোদন করিয়াছিলেন।

বেলুড় মঠ ব্যতীত নিম্নলিখিত স্থান সমূহে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের

জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে :—শ্রীরামকৃষ্ণ-বেদান্ত সমিতি (কলিকাতা), গদাধর আশ্রম ভবানীপুর, শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি পাথুরিয়াঘাটা কলিকাতা, শ্রীরামকৃষ্ণ-মণ্ডপ চেতলা সালিখা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, খাতড়া বাঁকুড়া, সাতক্ষীরা, সিরাজগঞ্জ, ঢাকা, পঞ্চখণ্ড শ্রীহট্ট, আড়বেলিয়া বসিরহাট, বেতিলা ঢাকা) সোনারগাঁ (ঢাকা কাশী, প্রয়াগ, কনখল হরিদ্বার বম্বাই মান্দ্রাজ, বাঙ্গালোর মহীশূর প্রভৃতি

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ—দেওঘর

গত ৮ই জানুয়ারী সোমবার প্রাতে দেওঘর—শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের নবনির্ম্মিত গৃহপ্রবেশ উৎসব যথোচিত সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের প্রেসিডেণ্ট শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে বিদ্যাপীঠে শুভাগমন করিয়াছিলেন। বিদ্যাপীঠের ছাত্রবৃন্দের অভিভাবকগণ, বিভিন্ন স্থান হইতে নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গ এবং স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ অনেকেই এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

পুরাতন বিদ্যাপীঠ হইতে পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজী ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি সমারোহের সহিত নূতন বাটীতে লইয়া যান। তৎপরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা আরাত্রিকাদি সম্পন্ন করিয়া মুহুর্মুহুঃ শঙ্খধ্বনি ও সমবেত জনগণের আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্যে তিনি নবনির্ম্মিত বিদ্যাপীঠের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। অবশেষে সংগীত ও ভজনাদির পর নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয় এবং দরিদ্র নারায়ণদিগকে ভূরি ভোজনে পরিতৃপ্ত করা হইয়াছিল। পরদিন অপরাহ্নে বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। বালকগণের দ্বারা কয়েকটি সুন্দর আবৃত্তির পর শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী তাহাদিগকে স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ পূর্ব্বক ছাত্র ও শিক্ষকগণের আদর্শ এবং কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। তৎপরে স্বামী নির্ব্বেদানন্দ শিক্ষাবিষয়ক সময়োচিত বক্তৃতা করিলে বিপুল আনন্দধ্বনির মধ্যে সভার কার্য্য শেষ হয়। বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার কয়েক দিন পরে স্থানীয়

ভদ্রলোকগণের উদ্যোগে লাইব্রেরী হলে পুনরায় একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। স্বামী ওঙ্কারানন্দ এবং স্বামী নির্ব্বেদানন্দ তথায় 'হিন্দুধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভায় [redacted] শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন

পশ্চিম-আমেরিকায় নূতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা

কালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিস্কো নগরে 'হিন্দুটেম্পল' নামে শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের একটি কেন্দ্র আছে। তথা হইতে স্বামী প্রভবানন্দ গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ওরেগণ ও ওয়াশিংটন প্রদেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারে বহির্গত হন। তিনি ওরেগণ প্রদেশের পোর্টল্যাণ্ড সহরে আসিয়া বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলে, তথাকার অধিবাসিগণ তাহা শুনিয়া এরূপ মুগ্ধ হন যে উক্ত সহরে একটি স্থায়ী প্রচার-কেন্দ্র স্থাপনের জন্য তাঁহারা তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করেন স্বামী প্রভবানন্দ তাহাতে স্বীকৃত হইয়া যথাসম্ভব শীঘ্র তাঁহার প্রচার কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

* * *

স্বামী প্রভবানন্দ পোর্টল্যাণ্ড সহর হইতে ১৪৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত ওয়াশিংটন প্রদেশের অন্তর্গত ট্যাকোমা সহরে যখন বক্তৃতা দিতেন ও ক্লাস করিতেন সেই সময় আমি প্রায়ই উহা শুনিতে যাইতাম, ফলে আমার বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান হইয়াছিল। এবং পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুন্দরতম এই সত্যের প্রচারকরূপে স্বামী প্রভবানন্দের ন্যায় একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে পাইয়া ইহার বিষয়ে আরও কিছু জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলাম। এই কারণে এবং প্রাচ্য বৈশিষ্ট্যের কিঞ্চিৎ আভাস পাইবার আশায় আমি পোর্টল্যাণ্ড কেন্দ্র-উদ্বোধনের নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলাম। পত্রান্তরে জ্ঞাত হইলাম সানফ্রান্সিস্কো হইতে স্বামী প্রকাশানন্দ সেই কেন্দ্রটিকে ভগবানের নামে তাঁহারই কার্য্যের জন্য উৎসর্গ করিতে আসিতেছেন।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে গিয়া দেখি একটি বৃহৎ অট্টালিকার সর্ব্ব উপরতলায় ১০০ জন শ্রোতার বসিবার উপযুক্ত একটি হল; তাহার

জানালাগুলি সুন্দর পর্দ্দা দ্বারা সজ্জিত এবং সেই সকল পর্দ্দার উপর ওঁ এই শব্দ চিহ্নিত। ভিতরে দুইখানি চিত্র—একখানি স্বামী বিবেকানন্দের ও আর একখানি প্রভু ঈশার। সম্মুখে একটি মঞ্চ, তাহার উপর দুইখানি চেয়ার ও একটি টেবিল। হলঘরের পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ, ইহাতে স্বামিজী বিশ্রাম করেন ও লোকজনের সহিত কথাবার্ত্তা বলেন। সেই স্থানটি এত গম্ভীর, শান্ত এবং অনাড়ম্বরভাবে পরিপূর্ণ যে মনে হয় তথায় একটি পবিত্র ভাবের প্রবাহ নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছে। আমি নির্দ্ধারিত সময়ের প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলাম, তখনও দেখি অনেকেই আমারও পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়াছেন।

বেলা প্রায় আট ঘটিকার সময় একটি বালিকা আসিয়া পিয়ানোর সাহায্যে রাগিণী আলাপ করিলেন। ইহা থামিলে স্বামী প্রভবানন্দ ও স্বামী প্রকাশানন্দ পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া মঞ্চোপরি আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথমে স্বামী প্রভবানন্দ সহজ ভাষায় দর্শকবৃন্দকে তাঁহার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া স্বামী প্রকাশানন্দকে আমাদের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। অনন্তর স্বামী প্রকাশানন্দ দণ্ডায়মান হইয়া একটি স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। আমার নিকট নূতন বলিয়া বা অন্য কোন কারণবশতঃই হউক আমার কম্পিত হৃদয়ে বারম্বার ইহাই ধ্বনিত হইতে লাগিল—আহা কি সুন্দর! আহা কি অদ্ভুত! বুঝি পৃথিবীতে ইহার সমতুল্য আর কিছুই নাই। স্তব পাঠ শেষ হইলে তিনি অতি সরল মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় শ্রীভগবানের নিকট একটি প্রার্থনা করিয়া নূতন কেন্দ্রটির উপর তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন এবং ইহাকে তাঁহারই কার্য্যে উৎসর্গ করিলেন।

আমার ইচ্ছা ছিল যে, স্বামিজীর বক্তৃতার সারমর্ম্ম গ্রহণ করিব, কিন্তু তাহা আর হইল না। তাঁহার বক্তৃতা ভাষার পারিপাট্যে অতি সুন্দর ও দীর্ঘ না হইলেও এরূপ ভাবপূর্ণ ছিল যে, উহা শুনিয়া আমি চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারি নাই। কেবলই আমার মনে হইতে

লাগিল, সত্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে এক স্বচ্ছ ভাবধারা প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া আমি সমস্ত বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি। কেবল আমার নয়, অন্যান্য অনেকেরই এই অবস্থা হইয়াছিল বলিয়া আমার দৃঢ় ধারণা। আমি বুঝিয়াছিলাম যে, স্বামিজী "বেদান্ত দর্শন ও পাশ্চাত্যের প্রতি তাঁহার বাণী" এই সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছেন, কিন্তু তাহা ভিন্নও তিনি এমন সব বিষয় বলিতে লাগিলেন যে আমাদের মনে হইল, বুঝি স্বীয় অনুভূতির রাজ্য হইতে সত্য সমূহ আমাদের নিকট প্রকাশ করিতেছেন ; সত্যই মনে হইল, বুঝি ইনি শ্রীভগবানের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিতে আসিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে আমরা সকলেই অবনত মস্তকে তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলাম এবং প্রত্যেকেই স্ব স্ব অন্তরে শ্রীভগবানের প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিলাম। আমাদের মনে হইল, তাঁহার আশীর্ব্বাদে ইহা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইবে এবং আমরাও সত্য বস্তু লাভে ধন্য হইব।

এইরূপে আমেরিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী ওরেগণ প্রদেশের পোর্টল্যাণ্ড সহরে সত্য-প্রচার ও সত্য-সাধনার জন্য বিনা আড়ম্বরে, কেবলমাত্র শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থে একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল। স্থানীয় অধিবাসিগণকে সত্যবস্তুর সন্ধান ও সত্যধর্ম্ম সাধনার সুযোগ দিয়া সত্যের অনুভূতি দ্বারা জীবনে অনাবিল শান্তি আনয়ন করিতে সহায়তা করা—এই আশ্রম-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। —নিনা ম্যাক্‌ডোনাল্ড।

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

(কেবল ছাত্রদের জন্য)

বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিগত মহাসম্মেলনে, সাধারণ সভায় তিন দিন যে যে বিষয় আলোচিত হইয়াছে তত্তৎ বিষয়ে ইংরাজীতে সরল সহজ-বোধ্য ভাষায় লিখিত নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ ২রা মে তারিখের মধ্যে নিম্নঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

১ম পুরস্কার—স্বর্ণপদক বা স্বামিজীর ইংরাজী জীবনী ৪ ভাগ।

২য় পুরস্কার—রৌপ্যপদক বা ঠাকুরের ইংরাজী জীবনী।

স্বামী সচ্চিদানন্দ,

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়—হাওড়া।

সমালোচনা

১ কল্পনানন্দ-মালা—শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। কতকগুলি প্রসিদ্ধ ইংরাজি কবিতার বঙ্গানুবাদ। কবিতাগুলি সহজ, সরল, মনোজ্ঞ ও সৌন্দর্য্যপূর্ণ। অধিকাংশ কবিতা এত সুন্দর হইয়াছে যে অনুবাদ বলিয়া মনেই হয় না এবং পড়িবার সময় মন আনন্দে নাচিয়া উঠে।

২ নিক্কারে নিক্কাশ কাব্য-লহরী—শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য ১।০ টাকা। প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু এই পুস্তকের পরিচয় পত্রের এক স্থানে লিখিয়াছেন, "নিক্কারে নিক্কাশ" অন্তর্গত পুষ্পপাত্রে আমি বকুলের মদির গন্ধ, কেলি-কুঞ্জ-রঞ্জন বেলা চামেলির আবেশময় সৌরভ পাই নাই সত্য—কিন্তু সচন্দন তুলসীর পবিত্র গন্ধ, ডগর-গন্ধরাজ-চম্পক-করবীর প্রাণারাম ঘ্রাণ আমাকে পুলকিত করিয়াছে।" আমরা অমৃত বাবুর কথার সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

৩ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি বা শ্রীকৃষ্ণ চরিত—শ্রীমতিলাল চট্টোপাধ্যায়, এম-এ প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের বিভিন্ন অংশ কবিতায় লিখিত। কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই উত্তম।

৪। ব্রহ্ম-বোধিকা—শ্রীদুর্গাদাস ঘোষ বি, এল প্রণীত। অদ্বৈতবেদান্ত সম্বন্ধে সহজ সরল সংস্কৃত শ্লোকে বিরচিত গ্রন্থ। বেদান্তের আলোচনা হইতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত। মূল্য ॥০ আনা।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে *

হে মোর মহান আত্মা!
এ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আজি কর তুমি মঙ্গল উত্থান,
ধর প্রভাতের বিহঙ্গের মত জাগ্রতের গান;
মুক্ত বাতায়ন পথে হের তুমি ঊষার আকাশে,
যেথায় গভীর নীল প্রভাতের প্রশান্তি বিকাশে;
যেথায় উদয় লক্ষ্মী তার উদার দর্পণ তলে—
হেরে আপনার জ্যোতিস্ফুট মুখ, হের সেথা জ্বলে
প্রভাতের শুকতারা মহেশের ভালনেত্র সম;
সদ্য ধ্যান ভঙ্গ দৃষ্টি! কি উজ্জ্বল, শান্ত অনুপম!
এখনো সুতীব্র ছটা মধ্যাহ্নের জ্বলন্ত অনল
আসেনি বিশ্বের পরে বিকাশিয়া দাহনের বল,
এখনো অন্তর মাঝে জাগে নাই বৈষয়িক রব,
দুরাশার ক্রুরশ্বাসে বাধে নাই রোষের বিপ্লব;
বহিছে পবিত্র বায়ু আনন্দের নব বার্ত্তা লয়ে,
জাগিছে স্পন্দন যেন আশ্রমের নিভৃত আশ্রয়ে;
জাগো জাগো ব্রহ্মচারি, হে তরুণ-যুগের সন্ন্যাসি!
অন্ধকার সিন্ধুগর্ভে জ্যোতি রেখা উঠিছে উদ্ভাসি;
শুকতারা ডাকে তোমা জাগ্রতের গৃহকক্ষ হতে,
জগৎ ডাকিছে তোমা প্রভাতের পবিত্র আলোতে।

---

* শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন-মহাসম্মেলন উপলক্ষে লিখিত।

আজ তব নিমন্ত্রণ উদয়ের নবমন্ত্র গানে,
আজ তব নবযাত্রা জীবনের সিংহদ্বার পানে।
অনন্ত বিশ্বের মাঝে ভাবমগ্ন সমাধি আলয়ে
স্থির হয়ে বস তুমি সাধনার নব বীর্য্য লয়ে।
জ্যোতির্ম্ময় কুণ্ডলেরে কর্ণে তব দাও গো ঢুলায়ে,
বিনয়-বিভূতি-ভস্ম অঙ্গে তব বারেক বুলায়ে,
ধরি স্বর্ণ কমণ্ডলু প্রেম তীর্থ সলিলেতে ভরা
ভুজে রক্ষাকবচেরে বাঁধি জরা মৃত্যু ক্লৈব্য-হরা;
করে ধরি জপমালা রুদ্রাক্ষের রুদ্র তেজময়,
পরি রক্ত পট্টবাস,—রঙ্গি অঙ্গে লোহিতের জয়,
গৌরতনু ব্রহ্মচারী সৌম্যমূর্ত্তি হে কুমার ঋষি।
এস, এস ওগো বীর। হের উদ্ভাসিয়া দশদিশি
আসিয়াছে শুভ লগ্ন হেমগর্ভ নবীন আলোক
তোমা পানে চেয়ে আছে আশা পূর্ণ মহাবিশ্বলোক;
ওগো পুণ্যবান!
এস তুমি সিন্ধুজলে সাঙ্গ করি প্রভাতের স্নান।

নব মৃগচর্ম্মপরে
বস তুমি পদ্মাসনে ঊর্দ্ধনেত্রে কৃতাঞ্জলি করে,
লহ তুমি রক্তজবা, সবিতার করহ আহ্বান
উদার গায়ত্রীছন্দে গাহ নব উদয়ের গান।
হে পবিত্র, হে সবিতা, তেজঃপুঞ্জ তরুণ আমার
তব রুদ্ররথে মোরে নিয়ে যাও আলোকের পার।
তব বহ্নিবর্ণ দাও হৃদয়ের প্রতি স্তরে স্তরে
জবাপুষ্প কোমলতা ফুটাও হে পাষাণ প্রস্তরে।
এস গো গায়ত্রী দেবী মূর্ত্তিমতী প্রভাত মুরতি
সবিতৃমণ্ডলাস্থিতা অয়ি রক্তবর্ণা নভঃ সতি,

হংসারূঢ় হে কুমারি। অক্ষসূত্র কমণ্ডলুকরা
হে ব্রহ্মরূপিণী মাতা ওগো উষা জ্যোতি বিভাস্বরা।
সন্তানে শকতি দাও শিরে মোর বর্ষ আশীর্ব্বাদ
মুক্ত যেন থাকি আমি ছিন্ন করি দাসত্বের বাঁধ।
বৈক্লব্যের কল্পগীতি কণ্ঠ হতে করে দাও দূর
যৌবনের জয়রসে জীবনেরে কর ভরপূর।
কর্ম্মের উদ্যম দাও, ধমনীতে উদ্দাম প্রবাহ ;
হে কিশোর ব্রহ্মচারি। জীবনের জয়যাত্রা গাহ,
কর নব অভিযান
মহান গায়ত্রীছন্দে উদ্বোধিয়া দাও লক্ষপ্রাণ।
জ্বাল অগ্নি কর হোম
হে পূত আত্মার শিখা ঊর্দ্ধে উঠি স্পর্শ কর ব্যোম্।
কায়মনে বাক্যে কিংবা ইন্দ্রিয়ের ঘৃণ্য পরবশে
যদি পাপ করে থাকি অন্ধকারে বাসনার রোষে,
চূর্ণ হোক চূর্ণ হোক্ হে দিবস পূর্ণ জ্যোতিষ্মান্!
প্রদীপ্ত ভাস্কর সম প্রাণ হোক্ অমোঘ অম্লান,
এ জীবন যজ্ঞে তুমি দৌর্ব্বল্যেরে দাও বিসর্জ্জন,
সঞ্চারিয়া বীর্য্য হবিঃ নবমন্ত্র কর উচ্চারণ ;—
নমোনমঃ হে স্বদেশ, হে ভারত জীবন আমার
নমোনমঃ নদনদী তৃষাহারি হে অমৃত ধার!
নমোনমঃ মহাসিন্ধু অনন্তের মূর্ত্তি অচঞ্চল,
নমোনমঃ অন্নদাত্রী, হে ধরিত্রী শ্যামল অঞ্চল!
তোমারে প্রণমি বিশ্ব হে ব্রহ্ম সৌন্দর্য্যের ছায়া
তোমারে প্রণমি নারী হে প্রকৃতি হে সুন্দরী মায়া!
তোমারে প্রণমি প্রেম অন্তরের বিকশিত রূপ
তোমারে প্রণমি আত্মা অনন্তের মিলন লোলুপ!
ভালমন্দে পাপপুণ্যে সর্ব্বব্রহ্মে পূর্ণ নমস্কার ;
ছড়াক বিশ্বের পরে শুভ্র জ্যোতি ধ্রুব তপস্যার!

তোমারে প্রণমি আমি,
ভারতের মুনি পুত্র, জগতের হে কল্যাণকামি !

হের হে প্রবুদ্ধ মন !
সম্মুখে মহান সিন্ধু অসীমের তপস্যামগন,
শিরে তার ছত্র ধরি দাঁড়াইয়া অনন্ত গগন।
এ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আজ প্রভাতের বিশ্ব চরাচর
গভীর সমাধিমগ্ন শব্দহীন নিখিল অম্বর।
সমুদ্র সৈকতে হেথা এ বিশ্বের সৌন্দর্য্যের তীরে
এস আর্য্য ধ্যান মগ্ন হই আজ মহান মন্দিরে।
বিশ্বের কবিরে আজ ধ্যান যোগে আকর্ষণ করি
বসাই এ হৃদয়ের প্রস্ফুটিত শতদল পরি।
জলদ গভীর মন্দ্রে তারপরে এস করি পাঠ
ধ্বনিত করিয়া পৃথ্বী সমুদ্রসৈকত গিরি মাঠ ;
সামমন্ত্র মহামন্ত্র চিরন্তন বেদের সঙ্গীত
অনাদি ওঙ্কার ধ্বনি জন্মমৃত্যু বিনাশ রহিত।
গাহ তুমি হে ব্রাহ্মণ ! নাদব্রহ্ম মহান ঝঙ্কার
চূর্ণ করি জড়তার রোষপূর্ণ অন্ধ অহঙ্কার।
হে আর্য্য হে কুমার স্থিরবীর্য্য হে বীর সন্ন্যাসি !
প্রদীপ্ত ব্রহ্মণ্যদেব জগতের হে আদিম ঋষি,
প্রাচীন পবিত্র কবি ! পাঠ কর বিধাতৃ লিপিকা
প্রথম জাগ্রত বাণী ভারতের অমৃত গীতিকা।
সমুদ্রে সমুদ্রে তার উচ্ছ্বসিত ফেনিল ভাষায়
সমীরে সমীরে আজ জগতের প্রভাতী আশায়
বাজুক সে প্রতিধ্বনি, ভারতের জাগরণী বাণী,
বিস্ময়ে থাকুক চেয়ে প্রাচ্যপানে এ জগৎ খানি !
হে তরুণ ব্রহ্মচারি !
ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের গীতি এস আজ জগতে প্রচারি।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ *

যখনই কোন নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তখনই দেখা যায়, সমাজ এবং সমগ্র মানবজাতি উহার মূল তত্ত্বগুলি মানিয়া লইবার পূর্ব্বে প্রথমে লোকে উহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, শেষে তৎসম্বন্ধে উদাসীনতা অবলম্বন করে। কোন নূতন আন্দোলনকে এই দুইটি অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতেই হয়—ইহা যেন প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়ম। আর যখন মানবপ্রকৃতি সর্ব্বত্রই সমান, তখন কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য-জগৎ সর্ব্বত্রই এই নিয়মের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজ, নীতি, রাজনীতি বা ধর্ম্ম—যে কোন ক্ষেত্রেই বল না কেন, যদি নূতন কোন সংস্কার করিতে চাও, নূতন কোন ভাবধারা—আনয়ন করিতে চাও, তবে দেখিবে, তোমার চারি পাশের লোক তোমার বিরুদ্ধে লাগিবে। আর তোমার প্রবর্ত্তিত সংস্কার-আন্দোলনের ভাবগুলি প্রচলিত ভাব হইতে যতই নূতন হইবে, ততই বাধা প্রবলতর হইবে। লোকে বলিবে, উক্ত আন্দোলনের মূলে যে ভাবরাশি—যে আদর্শ বিদ্যমান, তৎপ্রভাবে বর্ত্তমান সমাজে যাহা কিছু ভাল ও প্রয়োজনীয় বিষয় আছে, তাহার ভিত্তি পর্য্যন্ত চুরমার করিয়া ফেলিবে। কিন্তু যদি ঐ আন্দোলনের ভিতর যথার্থ জীবনীশক্তি থাকে, যদি উহা মানব-প্রকৃতির ও উহার বিভিন্ন অঙ্গ ও কার্য্যাবলির পরিচালক সার সত্য সমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে বাধা সত্ত্বেও উহার বিনাশ না হইয়া বরং উত্তরোত্তর উহার প্রভাব বাড়িতে থাকিবে এবং ক্রমে মানব-হৃদয়ে উহা স্থায়িভাবে তাহার শিকড় গাড়িয়া বসিবে। এই বাহিরের

---

* বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম মহাসম্মেলনোপলক্ষে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর অভিভাষণ। ১লা এপ্রিল, ১৯২৬ খৃঃ।

বাধা হইতেই ঐ আন্দোলনকে নিজ শক্তিরাশি একমুখী করিতে এবং যে মূল সত্যসমূহের উপর উহা প্রতিষ্ঠিত সেইগুলিকে ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশ করিতে সাহায্য করিয়া থাকে—সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহাকে মন্দ বলিতে পারা যায় না।

কিছুকাল পরে এই বাধা আপনা আপনি ধীরে ধীরে চলিয়া যায়—উদাসীনতা আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে—যাহারা প্রথমেই উহার বিরুদ্ধে লাগিয়াছিল, তাহারাই বলিতে থাকে—দেখ, এই যে আন্দোলন দেখিতেছ—ইহাতে নূতনত্ব আর কি আছে? ইহারা যে সকল তত্ত্ব প্রচার করিতেছে, আমাদের প্রাচীন গ্রন্থে ও শাস্ত্রে অমুক অমুক শ্লোকে সেই কথাগুলিই যে রহিয়াছে। ইহাতেই যথেষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বহুকাল পূর্ব্বেই এ সকল কথা জানিতেন এবং বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই এগুলি করিয়া আসিতেছেন। অতএব এগুলি লইয়া অধিক মাথা ঘামাইবার আবশ্যক নাই। এই দ্বিতীয় অবস্থায় বাধা অপসারিত হওয়ায় ঐ আন্দোলন বহুদূরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং কালে সমাজের লোকে যখন উহার অস্তিত্ব ও উপকারিতা স্বীকার করিয়া লয়, তখন উহা সমাজে একটা স্থান অধিকার করিয়া বসে—উহাকে বাধা দিবার—উহার বিরুদ্ধে লাগিবার আর কেহ থাকে না।

সুতরাং এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের শেষে সর্ব্বসাধারণের সম্মতিক্রমে উহা সমাজে পরিগৃহীত হইয়া থাকে আর এইরূপে সমাজে পরিগৃহীত ও আদৃত হইবার উপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হওয়াতে তখন হইতে দলে দলে উহাতে লোক প্রবেশ করিতে থাকে। তবে ঐ আন্দোলনের উন্নতির ইতিহাসে এইরূপ সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইলেই ঐ আন্দোলন উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছে তাহা মনে করা উচিত নহে। কারণ, বাধাহীন অবস্থায় পৌঁছিয়া—প্রথম অবস্থার উৎসাহ ও উদ্যমে যেন একটু ভাঁটা পড়ে আর প্রথমাবস্থায় উক্ত আন্দোলনের প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে যে ভাবের গভীরতা ও উদ্দেশ্যের একতা ছিল, হঠাৎ বিস্তারের সঙ্গে তাহা কমিয়া যায়। সুতরাং তখন বাহিরের

বাধার স্থলে উহার অঙ্গগণের বিভিন্ন মতামতের ফলে অন্তর্বিরোধের সৃষ্টি হয় এবং পরে প্রথমাবস্থায় খাঁটি সত্যের জন্য যে একটা স্বার্থ-ত্যাগের ভাব ছিল, তৎস্থলে খাঁটি সত্যের সঙ্গে সত্যাভাসের আপোষ করিয়া—সমাজে একটা প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা এবং যথার্থ ভিতরের জিনিষটার পরিবর্ত্তে বাহিরের চাকচিক্যের দিকে—দেখাইবার চেষ্টার দিকে একটা ঝোঁক হয়—যাহারা সত্যের জন্য কোনরূপ স্বার্থত্যাগ বা কষ্ট স্বীকার না করিয়া আরামে জীবন কাটাইতে চায়, তাহাদের স্বভাবতঃই এই দিকে প্রবৃত্তি হয়। আর যদি ঐ আন্দোলনের নেতাগণ সতর্ক দৃষ্টিতে জাগরিত না থাকেন অথবা ঐ সকল দোষের উৎপত্তিতে বাধা দিবার জন্য—উহাদিগকে সমূলে বিনাশের জন্য কোনরূপ প্রতীকারের উপায় আবিষ্কার করিয়া ঐ অবস্থাটাকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা না করেন, তবে তাহার ফলে যে কি হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রথমতঃ, এবং প্রধানতঃ যতই স্বার্থের ভাব প্রবেশ করিতে থাকে, ততই যে প্রেমের সূত্রে এতদিন সকলে একত্র ও গ্রথিত ছিলেন, তাহা কমিতে থাকে এবং সঙ্ঘের অঙ্গগণ সমগ্র সঙ্ঘের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য যে উদার ব্যাপক দৃষ্টির প্রয়োজন, তাহা ভুলিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভিন্ন এক একটা দল হইয়া সমগ্র সঙ্ঘের সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিয়া উহার পৃথক পৃথক্ এক একটা অংশের উন্নতিবিধান ও উহার স্থায়িত্বসাধনের ভাব লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হন। এইরূপে সঙ্ঘের ভিতর বিশ্লেষণের ভাব এই সঙ্কীর্ণ প্রণালীর মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া সমস্ত সঙ্ঘটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। আর কালবশে গুরুজনের অবাধ্যতা, অহঙ্কার, আলস্য ও অন্যান্য শত শত দোষ সঙ্ঘের ভিতর প্রবেশ করিয়া চিরদিনের মত উহার সর্ব্বনাশ সাধন করে।

শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া যে আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাও ইহার প্রধান প্রবর্ত্তক ও নেতা স্বামী বিবেকানন্দের অন্তর্দ্ধানের কয়েক বর্ষ পূর্ব্বেই এইরূপ বাধা ও উদাসীনতারূপ সোপানদ্বয় অতিক্রম করিয়াছিল—তিনি তাঁহার তিরোভাবের পূর্ব্বেই রামকৃষ্ণ-মিশন নাম দিয়া

ইহাকে একটা কার্য্যোপযোগী গঠন দিয়াছিলেন ও সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতেই ইহা প্রায় ত্রিশ বর্ষ ধরিয়া তৎপ্রদর্শিত পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বর্ত্তমানে এমন এক অবস্থায় পঁহুছিয়াছে, যখন ইহা ভারত ও ভারতেতর কয়েকটি দেশের লোকের হৃদয়ে আদর ও স্থান পাইয়াছে। প্রথমে ইহা প্রধানতঃ বঙ্গদেশের একটি ক্ষুদ্র নগণ্য সঙ্ঘমাত্র ছিল—এক্ষণে এই অল্পকালের মধ্যে উহা ভারতের সকল প্রদেশে, শুধু ভারতে কেন, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, যুক্ত-মালয় রাজ্য, এমন কি সুদূর পাশ্চাত্য দেশ যথা—আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং ইউরোপেও কতক কতক অংশে বিস্তৃত হইয়াছে। বন্ধুগণ, তোমরা এবং তোমাদের সহযোগী কর্ম্মী ভ্রাতৃগণ সঙ্ঘের এত গৌরবময় পরিণাম আনয়নের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় শ্রীপ্রভুর হস্তের যন্ত্রস্বরূপ হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছ। তোমরা একমাত্র শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া বারাণসী, কনখল ও বৃন্দাবনে জনহিতকর সেবাকেন্দ্রসমূহ স্থাপন করিয়াছ—তোমাদের ভবিষ্যদ্দর্শী নেতা তাঁহার কতকগুলি বক্তৃতায় যে বলিয়াছেন, অর্থবলেবলী ব্যক্তি নহে, কিন্তু চরিত্রবল ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন এবং একটা মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি তীব্র অনুরাগরূপ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত মানুষই এইরূপ কার্য্যকে স্থায়ী ও সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারে, তাঁহার সেই বাক্য জনসাধারণের নিকট প্রমাণিত করিয়াছ। তোমরা মান্দ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর ও দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য অনেক প্রদেশে এবং ইদানীং নাগপুর, বোম্বাই, কুয়ালালামপুর ও রেঙ্গুনে প্রচার ও শিক্ষাকেন্দ্র সমূহ স্থাপন করিয়াছ—ঐ সকল স্থানের জনসাধারণ তোমাদের কার্য্য দেখিয়া তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া তোমাদের সহযোগিতা আরম্ভ করিয়াছে। আর তোমরা সমগ্র ভারতের দুর্ভিক্ষ ও বন্যাপীড়িত এবং অগ্নিদাহে ক্ষতিগ্রস্ত বিপন্ন নরনারীর সাহায্যকল্পে পুনঃপুনঃ সেবাকেন্দ্র খুলিয়া সমগ্র দেশবাসী জনসাধারণের হৃদয়ে রামকৃষ্ণমিশনের উপর এখন যে লোকের একটা বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে, তাহা জাগাইতে সাহায্য করিয়াছ। তোমরা অদ্ভুত ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে তোমাদের নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে বিশ বৎসর বা ততোধিক

কাল ধরিয়া সমানে লাগিয়া আছ, কোন কোন স্থলে আবার সমগ্র জীবন একটা স্থানে কামড়াইয়া পড়িয়া আছ, কারণ, তোমাদের অবসর দিয়া তোমাদের স্থলে বসাইবার উপযুক্ত লোক পাওয়া যায় নাই।

সত্যই, আমাদের প্রভু এবং তাঁহার মনোনীত আমাদের সঙ্ঘের মূলনেতা তোমাদেরই মধ্য দিয়া দরিদ্র ভারতে এবং অন্য অধিকতর সৌভাগ্যশালী দেশসমূহে অদ্ভুত কার্য্য সাধন করিয়াছেন। কিন্তু উহাপেক্ষা বড় বড় কাজ এখনও বাকি পড়িয়া রহিয়াছে। আর আমাদের প্রভু ও স্বামিজী সময়ে তোমাদেরই মধ্য দিয়া উহা সাধন করিবেন, যদি তোমরা তাঁহাদের পবিত্রতা, সংকল্পের একনিষ্ঠতা, তাঁহাদের স্বার্থত্যাগ, এবং যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু শুভ যাহা কিছু মহৎ—তৎসমুদয়ের উপর আত্মসমর্পণরূপ তাঁহাদের জীবনের মহান গুণরাশির অনুকরণ করিতে পার এবং এতদিন যে বিনয় ও নম্রতার সহিত তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়াছ, যদি এখনও তাহাই করিয়া যাইতে পার। কারণ, যদি আমরা তাঁহাদের কার্য্য করিতে অন্য ভাব লইয়া অগ্রসর হই, এবং তাঁহাদের কার্য্য করিতে নির্ব্বাচিত হইয়া এতদিন উহা করিতে পাইয়াছি বলিয়া যদি আমরা অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠি, তবে আমরা—সেই কর্ম্মক্ষেত্র হইতে একেবারে অপসারিত হইয়াছি এবং আমাদের স্থানে কার্য্য করিবার জন্য অপরে নির্ব্বাচিত হইয়াছে—দেখিয়া শীঘ্রই আমাদিগকে শোকের অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইবে। বাইবেলে উল্লিখিত তথাকথিত ঈশ্বরনির্ব্বাচিত ইস্রায়েলিটদের কথা স্মরণ কর—তাহারা—শ্রীপ্রভুর কথা এবং 'প্রভু অতি সামান্য ধূলিকণা হইতে পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্য করিবার লোক গড়িয়া তুলিতে পারেন'—তাঁহার এই সাবধান বাক্যে কর্ণপাত করে নাই এবং তাহার ফলে তাহারা কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল—ভাবিয়া দেখ। এই প্রসঙ্গে ভারতে এক সময়ে আমাদের কতকগুলি প্রবল সম্প্রদায়ের দুর্গতির কথাও স্মরণ রাখিও।

অতএব বিগত ত্রিশবর্ষ ধরিয়া আমাদের মিশন যেরূপ বিস্তারলাভ করিয়াছে, ইহা ভাবিতে গেলে যদিও আশ্চর্য্য হইতে হয়, ঐ সঙ্গে সঙ্গে

গভীরভাবে এ প্রশ্নটিও আপনা আপনি আসিয়া পড়ে যে এই বিস্তারের ফলে কি আমাদের আন্দোলনের প্রথমাবস্থায় যে প্রবল ত্যাগের ভাব ও আদর্শের উপর প্রবল অনুরাগ ছিল, তাহা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, অথবা যে কার্য্য আমরা প্রথমে আদর্শের উপর তীব্র অনুরাগবশে ঐ আদর্শের জয় ঘোষণার জন্য করিতাম, তাহা বর্ত্তমানে আমাদের নামযশোলিপ্সা, ক্ষমতাপ্রিয়তা, ও নিজ নিজ পদগৌরবের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তিবশতঃ দাসত্ব ও বন্ধনে পরিণত হইয়াছে! সত্যই এক্ষণে এই সকল গুরুতর প্রশ্নের বিচার চিন্তা ও সমাধানের—খাঁটি শস্য হইতে তুষ এবং বিশুদ্ধ ধাতু হইতে খাদ বাছিয়া পৃথক করিবার সময় আসিয়াছে।

এই বর্ত্তমান মহাসম্মেলন তোমাদিগকে এই সুযোগ দিবার জন্য আহূত হইয়াছে। ইহাতে সমবেত হইবার ফলে তোমরা তোমাদের অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ বা তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সহকর্ম্মীদিগের সহিত এবং গুরুজনদিগের সহিত মিলিত হইবার এমন সুযোগ ও সৌভাগ্যলাভ করিয়াছ, যাহা সচরাচর ঘটে না। এই মহাসম্মেলনে যোগ দিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতা হইতে তোমরা অনেক শিক্ষা পাইবার সুযোগ পাইবে—সমগ্র মিশনের কল্যাণের জন্য তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী বিষয়ে আলোচনা করিয়া একটা স্থির করিতে এবং আমাদের সঙ্ঘের এই নবীন অবস্থায় সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক উহার প্রচারিত ভাবরাশি পরিগৃহীত হইবার ফলে যে সকল বিপদ্ ও দোষ প্রবেশ করে বলিয়া ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতে নিজেদের দূরে রাখিবার অবকাশ পাইবে। আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা সকলে অকপট ও সরলভাবে এই মহাসম্মেলনে যোগ দিয়া ভাল করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া আমাদের অনুষ্ঠিত সমুদয় কার্য্যগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখ, তোমরা এই অদ্ভুত বিস্তারের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, সেগুলি করিতে যাইয়া আমাদের সেই গৌরবময় আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ কি না। আদর্শটিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাক, কারণ, সেই আদর্শের ভিতরই প্রত্যেক আন্দোলনের

সঞ্চিত শক্তি—কুণ্ডলিনী—নিহিত থাকে। নিজেকে ও অপরকে ইহারই তীব্র আলোকে বিচার করিয়া লও। ইহা যদি করিতে পার, তবেই তুমি আমাদের কার্য্যের ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব ও উন্নতি সাধনের সহায়তা করিয়া এই মহাসম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিবে।

এইরূপ সম্মেলন ভারতের ইতিহাসে নূতন নহে—ইহা যেন স্মরণ রাখিও—এইরূপেই আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সঙ্ঘসমূহের উন্নতি সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল—আমরাও সেই প্রাচীন, বারম্বার পরীক্ষিত পথে ভ্রমণ করিবার জন্যই তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। প্রাচীনকালে বৌদ্ধগণ কয়েকবার এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের সঙ্ঘের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহাদের সঙ্ঘ খুব বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল এবং সুদীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহাদের মহৎ কর্ম্মের সর্ব্বনাশ বা বিলোপসাধন ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। যীশুখ্রীষ্ট ও মহম্মদের শিষ্যগণও তাঁহাদের সঙ্ঘজীবনের প্রাচীন যুগে সময়ে সময়ে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধানার্থ এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং এই কার্য্যপ্রণালী কিছু নূতন নহে—কিন্তু যাঁহারা এক্ষণে নিজেদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগ করিতে যাইতেছেন, তাঁহাদের অকপটতা ও লক্ষ্যের একতানতার উপরই এই প্রণালী প্রয়োগের সফলতা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। অতএব তোমরা স্বেচ্ছায় যে কার্য্য-সাধনে উদ্যোগী হইয়াছ, তাহা শ্রীপ্রভুর কৃপায় যতদিন না সমাপ্ত হইতেছে, ততদিন প্রাণপণে খাটিতে থাক—আমাদের নেতা আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় 'উঠো, জাগো, যতদিন না লক্ষ্যে পঁহুছিতেছ, ততদিন অনলসভাবে অগ্রসর হইতে থাক' এই কথাগুলি বলিয়া আমি তোমাদের প্রত্যেককে উহাতে নিযুক্ত হইতে আহ্বান করিতেছি। বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, সন্তানগণ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদর্শপ্রচাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে সহকর্ম্মিগণ, আমি আমাদের প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র নাম লইয়া, আমাদের জগদ্বিখ্যাত নেতা স্বামী বিবেকানন্দের নাম লইয়া, এবং আমাদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি আমাদের প্রভুর প্রিয়তম অন্তরঙ্গ স্বামী ব্রহ্মানন্দের নাম লইয়া—তোমাদের সকলকে স্বাগতসম্ভাষণ করিতেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের উদ্দেশ্য *

শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ,

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের এই প্রথম মহাসম্মেলনে আমাদের ভারত ও ভারতেতর দেশের প্রতিনিধিগণকে আমাদের মূলকেন্দ্র বেলুড়মঠে সমবেত দেখিয়া আজ আমি প্রাণে অপার উল্লাস অনুভব করিতেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাসে এইরূপ মহাসম্মেলন এই প্রথম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—এই মহাসম্মেলনে তোমরা যে সকল বিভিন্ন আশ্রমের প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছ, সেই আশ্রমসমূহ হইতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কার্য্যাবলী সম্বন্ধে পরস্পরকে পরিচিত করিতে ও পরস্পর ভাবের আদান প্রদান করিয়া নিজ নিজ আশ্রমের কার্য্যাবলীর পরিপুষ্টিসাধনে সমর্থ হইবে আর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে কয়জন সাক্ষাৎ শিষ্য এখনও স্থূলশরীরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাঁহাদের মুখ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজ জীবনে যে আধ্যাত্মিক আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাও শুনিতে পাইবে—ঐ আদর্শের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইবার ফলে এই সঙ্ঘের মধ্যে যে উদ্দেশ্যের একতানতা, সাহচর্য্য ও সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন—তাহা দিন দিন বর্দ্ধিত হইবার অনেক পরিমাণে সহায়তা করিবে।

আজ যদি স্বামিজী জীবিত থাকিতেন, তবে নিশ্চিতই তিনি তোমাদিগকে সোৎসাহে সাদর অভ্যর্থনা করিতেন এবং তোমাদের আলোচনার ফলে যাহাতে এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য যথার্থ সিদ্ধ হয়, তদুদ্দেশ্যে হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বচন বর্ষণ করিতেন। আজ এই প্রসঙ্গে আর এক মহাত্মার কথা স্মরণ হইতেছে, যাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আধ্যাত্মিকতত্ত্ব উপলব্ধির অধিকারী হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দের ঠিক নিম্নেই

---

* শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম মহাসম্মেলনোপলক্ষে সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর অভিভাষণ। ১লা এপ্রিল, ১৯২৬ খৃঃ।

স্থান দিতেন। আমি স্বামী ব্রহ্মানন্দের কথা বলিতেছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন স্বামিজীকে সমগ্র জগতে তাঁহার ভাব প্রচারার্থ নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ স্বামী ব্রহ্মানন্দকেও তাঁহার ধর্ম্মসঙ্ঘের বড় কম দায়িত্বপূর্ণ ভারগ্রহণের জন্য নির্ব্বাচিত করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে যাহা বরাহনগর মঠে সামান্য বীজাকারে মাত্র বিদ্যমান ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম সভাপতি রাজা মহারাজের নেতৃত্বে তাহা এখন সুবিশাল ছায়াসমন্বিত প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়াছে। পিতা যেমন সন্তানকে প্রতিপালন করিয়া তাহাকে অসহায় শিশু অবস্থা হইতে সংসারসংগ্রামে সমর্থ শিক্ষিত যুবকরূপে পরিণত করিয়া তুলেন, মঠের সংগঠন ও বিস্তারের জন্য তিনিও তাহা করিয়াছেন। আজ এখানে সমবেত হইয়া আমরা ইঁহাদের—শুধু ইঁহাদেরই বা বলি কেন, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ এবং আরও অনেকের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি। মঠ ও মিশন ইঁহাদের নিকটও কম ঋণী নহে—মঠ মিশনের বর্ত্তমান প্রসার, সংগঠন ও উন্নতির জন্য ইঁহারাও কম করেন নাই। আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে এই সম্মেলনের উপর ইঁহাদের সকলের, সর্ব্বোপরি আমাদের গুরুমহারাজের মঙ্গলাশিস বর্ষণ হউক, আমি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বাগ্রে ইহাই প্রার্থনা করিতেছি।

আমি তোমাদের নিকট কিরূপে এই মহাসম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য—অর্থাৎ কিসে সমুদয় আশ্রম ও প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে সহযোগিতা ও সদ্ভাব বর্দ্ধন হয়, তৎসম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিচার করিয়া একটা কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দেশ করিতে চাহি না। আমি আমার জীবনের অধিকাংশকাল মঠ-মিশনের সম্পর্কে থাকিয়া যাহা বুঝিয়াছি, আমার সেই সামান্য অভিজ্ঞতা হইতে সাধারণ ভাবে দুই চার কথা বলিব এবং তোমাদের আলোচনা ও ভাবের আদান প্রদানের ফলে যাহাতে এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য অন্ততঃ কতকটাও সাফল্যমণ্ডিত হয়, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎও সহায়তা করিতে পারিলে নিজেকে ধন্য মনে করিব।

ত্রিশ বর্ষ পূর্ব্বে যখন ভারত ও ভারতেতর দেশের রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নানাবিধ কার্য্যাবলী ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ছিল, যখন লোকে শুধু

এইটুকুমাত্র জানিত যে, স্বামী বিবেকানন্দ একজন হিন্দুধর্ম্মের প্রচারক আর তিনি চিকাগোর ধর্ম্মমহাসভায় সনাতন ধর্ম্মের জয়পতাকা উড়াইয়াছেন, তখন হইতেই স্বামিজী ক্রান্তদর্শী ঋষির দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, সমগ্র জগতে যুগচক্র পরিবর্ত্তনের সময় আসিয়াছে এবং তাঁহার শ্রীগুরুর মহাশক্তিশালী উপদেশবাণী সমগ্র মানবজাতির উপর এক অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়া এই যুগচক্র পরিবর্ত্তনে বিশেষভাবে সহায়তা করিবে। যে দিন তাঁহার গুরু অপূর্ব্ব ভাবাবেশে বিভোর হইয়া তাঁহার দিবারাত্র সমাধিতে বিভোর হইয়া থাকিবার প্রার্থনার উত্তরে বলিয়াছিলেন, 'সমাধি ত ছোট কথা—জগৎ দুঃখে শোকে পাপে কাতর, মলিন আর তুই সমাধির সুখে বিভোর থাক্‌বি? নে—দ্বাদশবর্ষ কঠোর সাধনা করে যা উপলব্ধি করেছি, আজ তোকে তা সব মুক্তহস্তে দিয়ে ফকির হলাম।'—এইরূপে যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যকে তাঁহার সমগ্র সাধনার ফল প্রদান করিয়া তাঁহাকে জগতের ইতিহাসের এক মাহেন্দ্রক্ষণে সমগ্র জগতে ধর্ম্মসংস্থাপনার যন্ত্রস্বরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন—কেবল শ্রীভগবানকে সর্ব্বভূতে দর্শন করিয়া 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' জীবন উৎসর্গ করিতে, সমগ্র জগতের সুখের জন্য নিজ ব্যক্তিগত সুখশান্তি বিসর্জ্জন দিতে শিখাইয়াছিলেন—সেই চিরস্মরণীয় দিনের কথা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল।

স্বামিজী তাঁহার শ্রীগুরুর মহাসমাধির কিছুকাল পরেই সমগ্র জগতের সর্ব্ববিধ কল্যাণের উদ্দেশ্যে—কালবশে নানা আবর্জ্জনাস্তূপের চাপে নির্জ্জীবপ্রায় সহস্রযুগসঞ্চিত উহার অপূর্ব্ব ভাবরাশিতে নবপ্রাণ সঞ্চারের উদ্দেশে—তাঁহার দেশবাসীর জন্য এক নূতন ভাবধারার উৎস ছুটাইলেন। তাঁহার নিজ জীবনে যে নানারূপ অভূতপূর্ব্ব অনুভূতি ও অভিজ্ঞতারাশি সঞ্চিত হইয়াছিল—ঐ উৎস সেই সঞ্চিত ভাবধারার স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস। কোন্ কোন্ বিশেষ শক্তিপ্রভাবে তাঁহার দৃষ্টি এক অপূর্ব্ব নবীন দিব্যজগৎ দেখিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলে আমরা এই কয়েকটি বিষয় দেখিতে পাই:—(১) তাঁহার শ্রীগুরুর তাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী, (২) তাঁহার নিজের বহুবর্ষব্যাপী শিক্ষা ও কঠোর

সাধনা এবং তলব্ধ উপলব্ধিসমূহ, (৩) তাঁহার পাশ্চাত্যদর্শন ও ইতিহাসে এবং সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থে তুল্য ব্যুৎপত্তি, (৪) শ্রীগুরুর অলৌকিক জীবনের অহরহঃ অনুধ্যান এবং উহার দিব্যালোকে ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা-সমূহের সমাধান ও শাস্ত্রসমূহের সত্যতা প্রত্যক্ষীকরণ, এবং (৫) নিজ মাতৃভূমির সর্ব্বত্র ভ্রমণের ফলে প্রাচীন ভারতের সহিত বর্ত্তমান ভারতের তুলনা—বর্ত্তমান ভারতের নরনারী কিরূপে জীবনযাপন করে, তাহাদের আচারব্যবহার, তাহাদের বিশ্বাস, তাহাদের অভাব, তাহাদের চিন্তাপ্রণালী তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ। রাজা-প্রজা, সাধু-পণ্ডিত সকলের সঙ্গে সমভাবে মিশিয়া তিনি সমগ্র ভারতকে এক সমষ্টিরূপে উপলব্ধি করিলেন আর দেখিলেন, তাঁহার শ্রীগুরুর জীবন যেন এই মহাভারতের একটি পুঞ্জীকৃত, ঘনীভূত ক্ষুদ্র প্রতীকমাত্র। স্বামিজীর জীবনে ও কার্য্যে তাই এই গুরু, শাস্ত্র ও মাতৃভূমি—এই তিন বিভিন্ন সুর মিলিত হইয়া যেন এক অপূর্ব্ব সম্মিলিত স্বরলহরীর সৃষ্টি করিয়াছে। তাই তিনি সমগ্র জগৎকে এই তিন রত্ন বিলাইতে উদ্যোগী হইলেন।

পূর্ব্বকথিত অভিজ্ঞতাসমূহ অর্জ্জনের ফলে তিনি বুঝিতে পারিলেন—জগতের মধ্যে কোন্ কোন্ বিরোধসাধক ভেদকর শক্তি কার্য্য করিতেছে—যাহার বিনাশসাধন করিয়া সমন্বয়সাধনের জন্য এ যুগে অবতারের আবির্ভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল। জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মের ভিতর যে ভীষণ গোঁড়ামি প্রবেশ করিয়াছে, সেই দিকেই তাঁহার দৃষ্টি প্রথমে আকৃষ্ট হইল—শুধু তাহাই নহে, তিনি দেখিলেন, লোকের ধর্ম্ম জিনিষটা সম্বন্ধেই অতি সঙ্কীর্ণ ধারণা। প্রাচীন ঋষিগণ বিভিন্ন ধর্ম্মমতকে এক সত্য উপলব্ধির বিভিন্ন পথমাত্র বলিয়া মনে করিতেন—তিনি দেখিলেন, আজকাল এক ধর্ম্মাবলম্বী লোক অপর ধর্ম্মমতের সহিত যেন সদাসর্ব্বদা যুদ্ধ ও বিরোধ করিতে উদ্যত হইয়া আছে। কূপমণ্ডূকের মত এক সম্প্রদায়ের লোক নিজেদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ছাড়া আর কোনদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে না। দ্বিতীয়তঃ—ধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকের ধারণাই অতি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে—ধর্ম্ম যেন অন্য সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টাকে উহার সীমা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া নিজেই শিক্ষিত ও উদারহৃদয় ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে একটি

অবজ্ঞার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে লোকের ধারণা হইয়া গিয়াছে যে, ধর্ম্মের সঙ্গে বাস্তব জগতের—আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের—কোন সম্পর্ক নাই, সুতরাং উহা কেবল অরণ্যবাসী সমাজত্যাগী সন্ন্যাসীরই অনুষ্ঠেয়। লোকে ভাবিতেছে, বেদান্তের উচ্চতম উপদেশের সহিত কর্ম্মের সমন্বয় একেবারে হইতেই পারে না। কর্ম্ম ও উপাসনা—ত্যাগ ও সেবাধর্ম্মের ভিতর একটা আকাশ পাতাল ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে, আর এই ভ্রান্ত ধারণার ফলেই প্রধানতঃ আমাদের জাতীয় অবনতি ঘটিয়াছে। এইরূপ সঙ্কটমুহূর্ত্তে জগতে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাবের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল, যিনি জগতের সমক্ষে এমন ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবেন, যাহা বিজ্ঞানসঙ্গত হইবে এবং এমন বিজ্ঞানের প্রচার করিবেন, যাহা আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ স্পষ্টই দেখিলেন, তাঁহার শ্রীগুরুদেবই এইরূপ আদর্শ মানব। তাঁহার জীবনে সর্ব্বপ্রকার বিরুদ্ধ ভাবের অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছে। আপাতবিরুদ্ধ বিভিন্ন ধর্ম্মমতসমূহের অদ্ভুত মিলন তিনি তাঁহাতেই দেখিলেন। প্রথমতঃ, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাক্ষাৎ নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়া প্রমাণিত করিলেন যে, যে আদর্শ সর্ব্ব প্রকার দার্শনিক মতবাদের পারে অবস্থিত, তাহাতে উপনীত হইতে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত—এই ত্রিবিধ প্রধান ভারতীয় দার্শনিক মতবাদেরই ব্যাবহারিক উপযোগিতা আছে। তারপর প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম্মমতের অর্থাৎ সনাতন ধর্ম্মের শাক্ত, বৈষ্ণবাদি কয়েকটি শাখা এবং মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম্ম সাধন করিয়া একই লক্ষ্যে উপনীত হইয়া প্রমাণ করিলেন যে, বিভিন্ন প্রকৃতির উপযোগী এই সকল বিভিন্ন ধর্ম্মমতই সত্য ও প্রত্যেক-টিরই সার্থকতা আছে। প্রাচীন যুগে বৈদিক ঋষিগণ যে 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি' (সত্য একমাত্র—পণ্ডিতগণ সেই এক সত্যকেই নানাভাবে বলিয়া থাকেন)—এই মহামন্ত্র দিব্য দৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছিলেন, লোকে তাহা এতদিন ভুলিয়া গিয়াছিল। আজ শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে সেই সনাতন সত্যের পুনঃসাক্ষাৎ পাইয়া তাহারা ধন্য হইল। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম্ম—এই আপাত অত্যন্ত বিরোধী ভাবগুলির শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে অপূর্ব্ব

সমন্বয় দেখিয়া লোকে কৃতার্থ হইল। নির্ব্বিকল্প সমাধি যাঁহার মুষ্টির ভিতর—যিনি মনে করিলেই যখন তখন সমাধিস্থ হইয়া পড়িতে পারিতেন, তিনি আবার শ্রীভগবানের নাম মাত্র উচ্চারণে কাঁদিয়া বিহ্বল হইতেন। যিনি যোগমার্গের জটিল পথাবলম্বনে সত্যের সাক্ষাৎকার পাইয়াছিলেন, তিনি আবার তাঁহার অপূর্ব্ব সাধনার ফল উপযুক্ত অধিকারীকে বিতরণ করিতে যাইয়া কঠোর কর্ম্মব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ঐ ব্রতের উদ্যাপনে নিজ জীবনকে তিলে তিলে আহুতি দিয়াছিলেন। এই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন নরদেবের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার উপযুক্ত শিষ্যের হৃদয় তাঁহার প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হইল, তিনি স্পষ্টই দেখিলেন, স্পষ্ট বুঝিলেন, সমগ্র জগতে তাঁহার শ্রীগুরুর প্রতিভার দৃঢ় ছাপ পড়িলেই ভবিষ্যতে উহা নবীন জীবন লাভ করিবে—উহা পুনর্বার জাগিয়া উঠিবে।

প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ সঙ্ঘের কথা স্মরণ করিয়া এবং বর্ত্তমান উন্নতিশীল পাশ্চাত্য জগতে বহু ভ্রমণ করিয়া তথাকার আশ্চর্য্য সঙ্ঘবদ্ধ কার্য্যপ্রণালী অবলোকনের ফলে হয় ত শ্রীগুরুর উপদেশাবলী কর্ম্মজীবনে প্রয়োগ করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্রস্বরূপ মঠ ও মিশনের কল্পনা স্বামিজীর মনে জাগিয়া থাকিবে—তিনি হয় ত ভাবিয়া থাকিবেন—যদি কতকগুলি সুনির্দ্দিষ্ট সাধনপ্রণালী ও নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তবে এমন এক কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া উঠিবে, যাহা তাঁহার শ্রীগুরুদেবের জীবনের ছায়াস্বরূপ একটি বিরাট্ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ এক দিকে যেমন উচ্চদরের একজন ভাবুক ছিলেন, তদ্রূপ ঐ ভাবরাশিকে কর্ম্মজীবনে কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয়, তাহারও কৌশল তিনি জানিতেন—সুতরাং পাশ্চাত্য দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পরেই এমন এক মঠরূপ আদর্শ নির্ম্মাণের কল্পনা করিলেন, যাহাতে ভবিষ্যতে নরনারীগণ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও চিন্তার অবিকল প্রতিবিম্ব দর্শন করিবেন। এই কল্পনায় তাঁহার মনের মৌলিকতা ও সাহসিকতারই পরিচয় দেয়।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় মঠ স্থাপনার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তিনি 'মঠের নিয়মাবলী' নাম দিয়া তাঁহার যে ভাবরাশি লিপিবদ্ধ করেন, তাহার প্রথমেই আমরা এই কথাগুলি দেখিতে পাই :—

"শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত প্রণালী অবলম্বন করিয়া নিজের মুক্তি সাধন করা ও জগতের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণসাধনে শিক্ষিত হওয়ার জন্য এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। স্ত্রীলোকদিগের জন্যও ঐ প্রকার আর একটি মঠ স্থাপিত হইবে।"

ইহাই তাঁহার মঠ-স্থাপনার আদর্শের প্রথম ও মূল কথা। কথাগুলি অতি সামান্য বোধ হইতে পারে, কিন্তু গভীর প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, কথাগুলি অতি সারগর্ভ। মঠ ও মিশনের অঙ্গগণ যেখানে যেরূপে যতরূপ কার্য্য করিতেছেন, সেই বিরাট্ বিশালায়তন সমগ্র শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের—সমগ্র শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠানের—ইহাই মূল ভিত্তি—উহার একমাত্র অবলম্বন স্তম্ভ।

কথাগুলি আর একটু তলাইয়া দেখা যাক্। প্রথমেই দেখিতেছি, স্বামিজী এই একটি মাত্র বাক্যে নিজ মুক্তিসাধন ও জগতের কল্যাণসাধন—এই আপাতবিরুদ্ধ দুটি ভাবকে একত্র গ্রথিত করিয়াছেন। লোকে সাধারণতঃ মনে করে—ত্যাগ ও সেবা—কর্ম্ম ও উপাসনা কখন একত্র থাকিতে পারে না—একটি অপরটির বিরোধী—একটির প্রাবল্য অপরটির বিকাশের বিঘ্ন হইবে কিন্তু, স্বামিজী এই মঠ প্রতিষ্ঠা দ্বারা এই দুই আপাতবিরোধী ভাবদ্বয়ের সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্যক্তিগত মুক্তিসাধনের চেষ্টা কখনও সমগ্র মানবজাতির সেবার বিরোধী হইতে পারে না—আবার সেবা জিনিষটাকে সাধারণ ভাবে না দেখিয়া যদি সেবার চরমাদর্শের কথা ভাবা যায়, তবে যে ব্যক্তি আমাদের আত্মারূপ সত্যসূর্য্যের উপর পতিত কুজ্ঝটিকাবরণ ভেদ করিতে বদ্ধপরিকর, তাঁহার ভাবের সঙ্গে আদর্শ সেবকের ভাবের কোন পার্থক্য করা যায় না। যদি শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানের অর্থ হয়—জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সর্ব্ব-প্রকার ভেদের বিলোপ সাধন—আর যদি নিজ আত্মার সহিত সর্ব্বত্র

সর্ব্বভূতে অবস্থিত ব্রহ্মের ঐক্য সাধনই ইহার চরম লক্ষ্য হয়, তবে ইহা স্বভাবতঃই বুঝিতে পারা যায় যে, সাধক যখন উচ্চতম আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করেন, তখন তাঁহার সর্ব্বভূতের সেবায় কায়মনোবাক্যে সর্ব্বান্তঃকরণে আত্মসমর্পণ ছাড়া আর অন্যগতি হইতে পারে না। অজ্ঞানপ্রসূত ক্ষুদ্রভাব অতিক্রম করিয়া তিনি সমগ্র জগৎকে প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করেন। ইহাই তাঁহার চরম দিব্য আত্মত্যাগ। স্বামিজী চাহিতেন, তাঁহার মঠের অঙ্গগণ তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির জন্য শ্রীভগবানের হস্তে স্বেচ্ছায় যন্ত্রস্বরূপ হউক—যখন তাঁহার কার্য্য শেষ হইবে, তখন তাহারা দিব্য জ্ঞানজনিত পরমানন্দলাভের ভাগী হইবেই হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বারম্বার আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছেন, "নিজে মিষ্টি আমটি খেয়ে মুখ মুছে ফেলা অপেক্ষা অপর পাঁচ জনকে বিলি করে খাওয়া ঢের ভাল।"

আবার সাধারণ ভাবে দেখিলেও আমরা দেখিতে পাই—স্বামিজী এমন এক সঙ্ঘের—এমন এক প্রতিষ্ঠানের আদর্শ চিত্রিত করিতেছেন, যাহার অঙ্গগণ পূর্ণাবয়ব সমগ্র একটা ভাবসিদ্ধির যতদূর সম্ভব সুযোগ পায়—তাঁহার এই সঙ্ঘের আদর্শের মধ্যে এতটুকু অসম্পূর্ণতা নাই, উহা সর্ব্বপ্রকার ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ। তাঁহার চিত্রিত এই সঙ্ঘের আদর্শের কথা ভাবিলে যথার্থই মনে হয়, আমাদের স্বামিজী একজন কত বড় আচার্য্য ছিলেন। তাঁহার মতে তাঁহার মঠের প্রত্যেক সাধককে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্ম—এই প্রসিদ্ধ সাধনচতুষ্টয়কেই নিজ নিজ জীবনে সমষ্টি ভাবে সাধন করিতে হইবে—অবশ্য রুচি ও অধিকার-বিশেষে যাঁহার যে দিকে স্বাভাবিক ঝোঁক, তিনি সেই দিকে একটু বেশী জোর দিবেন—এই মাত্র। ইহাদের মধ্যে কোনটিকেই বাদ দিলে চলিবে না—তাহা হইলে সাধনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। তৎপ্রণীত মঠের নিয়মাবলী পাঠে আর একটু অগ্রসর হইয়াই দেখিব, তিনি মঠের অঙ্গগণকে একদিকে যেমন ধ্যান ধারণা উপাসনা করিতে উপদেশ দিতেছেন, অপর দিকে তদ্রূপ তাহাদের জন্য বিদ্যাচর্চ্চা ও কর্ম্মেরও ব্যবস্থা করিতেছেন। তৎকথিত সাধনপ্রণালীসমূহের মধ্যে

এই দুইটি ভাবের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধনের চেষ্টা সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। স্বামিজীর মতে মঠের কার্য্যাবলী যে সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ না থাকিয়া উদার ও ব্যাপকভাবে বহুবিধ কল্যাণকর পথে প্রধাবিত হওয়া উচিত, তাহা উক্ত নিয়মাবলীতে উল্লিখিত স্বামিজীর নিম্নলিখিত কথাগুলিতে স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিতেছে :—

"এই প্রকার মঠ সমস্ত পৃথিবীতে স্থাপন করিতে হইবে। কোন দেশে আধ্যাত্মিক ভাবমাত্রেরই প্রয়োজন—কোন দেশে ইহজীবনের কিঞ্চিৎ সুখস্বচ্ছন্দতার অতীব প্রয়োজন এই প্রকারে যে জাতিতে বা যে ব্যক্তিতে যে অভাব অত্যন্ত প্রবল, তাহা পূর্ণ করিয়া সেই পথ দিয়া তাহাকে ধর্ম্মরাজ্যে লইয়া যাইতে হইবে। ভারতবর্ষে প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য—নীচ শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বিদ্যা ও ধর্ম্মের বিতরণ। অন্নের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির ধর্ম্ম হওয়া অসম্ভব। অতএব তাহাদের নিমিত্ত অন্নাগমের নূতন উপায় প্রদর্শন করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য "

স্বামিজীর এই সুস্পষ্ট বাক্য হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, তিনি মঠের অঙ্গগণের জন্য যে সকল আধ্যাত্মিক সাধনার নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, জীবরূপী নারায়ণের সেবা তন্মধ্যে অন্যতম প্রধান সাধন। শ্রীরামকৃষ্ণভক্তগণ স্বামিজীকে তাঁহার জীবন ও উপদেশের ব্যাখ্যাতারূপে স্বীকার করিলে কেবল ধ্যান-ধারণা-সহায়ে ইহজীবনেই ভগবৎসাক্ষাৎ-কারপ্রয়াসী সাধকগণ যে কার্য্যগুলিকে তাঁহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালীর সম্পূর্ণ বহির্ভূত বলিয়া মনে করেন, এতদিন যে কার্য্যাবলী সাংসারিক কার্য্যমাত্র বলিয়াই বিবেচিত হইত, সেই ভাবের কার্য্য তাঁহাদিগকেও অবশ্যই অবলম্বন করিতে হইবে। শ্রীগীতা বলেন, শুধু কর্ম্মের মানুষকে উন্নত বা অবনত করিবার কোন শক্তি নাই—কি ভাবে মানুষ কার্য্য করিতেছে, তাহার দিকে দৃষ্টি করিতে হইবে এবং ঐ ভাবানুসারেই কর্ম্ম তোমাকে হয় বন্ধন ও অবনতির দিকে অথবা উন্নতি ও মুক্তির দিকে লইয়া যাইবে। আরও দেখ—একথাও যুক্তিসঙ্গত যে, যদি ভক্তি ও প্রেমের সহায়তায় সাধক শুধু একটি প্রতিমার মধ্যে ভগবৎসত্তার

উপলব্ধি করিতে পারে, তবে সেই পরিমাণ সরলতা, ভক্তি ও প্রেমসহায়ে যদি মানুষের উপাসনা করা যায়—চেতন মানুষ অবশ্য জড়বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠ—তবে নিশ্চিতই সে আরও সহজে তথায় ভগবৎ উপলব্ধি করিতে পারে। মানুষই যে ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক এবং নরনারায়ণের উপাসনাই যে জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা—তাহাতে আর কি সন্দেহ থাকিতে পারে ?

এই ত স্বামিজীর সাধনার আদর্শের মূল সূত্র। এই মূল সূত্র অবলম্বনে আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া স্বামিজী মঠের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে একটি কথা বলিতেছেন—তাঁহার মনে নিম্নোক্ত কার্য্যপ্রণালী ধীরে ধীরে অবলম্বন করিতে পারিলে তাঁহার ভাব অনেকটা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে। স্বামিজী বলিতেছেন,—

"এখন উদ্দেশ্য এই যে, এই মঠটিকে ধীরে ধীরে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে। তাহার মধ্যে দার্শনিক চর্চ্চা ও ধর্ম্মচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে একটি পূর্ণ টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট করিতে হইবে। এইটি প্রথম কর্ত্তব্য। পরে অন্যান্য অবয়ব ক্রমে ক্রমে সংযুক্ত হইবে।"

কি প্রকাণ্ড বিরাট কল্পনা।

প্রাচীন গতানুগতিক ধর্ম্মের আদর্শ এই যে, উহাতে কর্ম্মের একেবারে স্থান নাই—কই, এখানে ত ঐ আদর্শের সহিত আপোষ করিবার চেষ্টার বিন্দুমাত্র চিহ্নও দেখা যাইতেছে না। স্বামিজী তাঁহার স্বদেশবাসীকে যে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, এখানেই তাহার বিশেষত্ব। প্রাচীন কালে এইরূপ প্রতিষ্ঠানগুলির যে অনিবার্য্য শোচনীয় পরিণাম দাঁড়াইয়াছে, মঠেরও যাহাতে সেই অধোগতি না হয়, তজ্জন্য স্বামিজী ইহার অধ্যক্ষগণকে এই বলিয়া সাবধান করিতেছেন :—

"অতএব এই মঠে যাঁহারা এক্ষণে অধ্যক্ষ আছেন বা পরে অধ্যক্ষ হইবেন, তাঁহারা সর্ব্বদা যেন এইটি মনে রাখেন যে, এই মঠ কোন মতেই বাবাজীদিগের ঠাকুরবাটীতে পরিণত না হয়।

"ঠাকুরবাটী দ্বারা দুই চারিজনের কিঞ্চিৎ উপকার হয়, দুই দশজনের

কৌতূহল চরিতার্থ হয়। কিন্তু এই মঠের দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণ সাধিত হইবে।”

স্বামী বিবেকানন্দ এই পূর্ব্বোক্ত ভাবকে ভিত্তি করিয়াই এই মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন।

যে মঠ এইরূপ উচ্চাদর্শরূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত, যাহাতে ইহার ইষ্টদেবতা ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন প্রতিফলিত, তাহা যে উদারতার মূর্ত্ত বিগ্রহস্বরূপ মাত্র, তাহাতে কি আর কিছু সন্দেহ থাকিতে পারে? সমগ্র মানবজাতি জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্মের অপূর্ব্ব সমন্বয়স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের ন্যায় একটি জীবন আর দেখে নাই। সুতরাং যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্রের পূর্ণ আদর্শের ছাঁচে নিজেদের চরিত্রগঠনে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল মঠের ভাবে ভাবিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। সেই কারণেই স্বামিজী বলিতেছেন :—

“জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্মের সমবায়ে চরিত্র গঠিত করা এই মঠের উদ্দেশ্য এবং তন্নিমিত্ত যে সকল সাধন করা প্রয়োজন, সেই সকল সাধনই এই মঠের সাধন বলিয়া পরিগৃহীত হইবে।”

তাই তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন :—

“অতএব সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, এই সকল অঙ্গের যিনি একটিতেও ন্যূনতা প্রদর্শন করেন, তাঁহার চরিত্র রামকৃষ্ণরূপ মথায় প্রকৃষ্টরূপে দ্রুত হয় নাই।

“আরও ইহা মনে রাখা উচিত যে, নিজের মুক্তিসাধনের জন্য যিনি চেষ্টা করেন, তদপেক্ষা যিনি অপরের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেন, তিনি মহত্তর কার্য্য করেন।”

ইহাই এই মঠের বিশেষত্ব।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে লোকে মনে করিত, এক-প্রকার সাধনপ্রণালীই মঠবিশেষে অনুষ্ঠিত হইতে পারে—লোকে শুধু যে ইহা স্বাভাবিক ভাবিত, তাহা নহে—ইহা অনিবার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত—এই ত্রিবিধ প্রধান ভারতীয় দার্শনিক তত্ত্বকেই এক অনন্ত ব্রহ্মসত্তারই ত্রিবিধ বিভিন্ন

অনুভূতিরূপে উপলব্ধি করিয়া ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক অনুভূতির বজ্রদৃঢ় ভিত্তির উপর এমন এক মঠ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর করিয়াছেন, যথা হইতে চরম নিরপেক্ষ সত্যের উপলব্ধির উপায়স্বরূপ এই ত্রিবিধ দার্শনিক মতেরই সমান সার্থকতা সাহস সহকারে উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হইতে পারে। একদিকে বেশী ঝোঁক দিবার ফলে মঠের ভিতর কতকগুলি দোষ প্রবেশ করা অনিবার্য্য—তাহা যাহাতে না ঘটে, তদুদ্দেশ্যে স্বামিজী মস্তিষ্ক হৃদয় ও হস্ত—ইহাদের পরিচালনার উপর সমান জোর দিতেন তিনি জানিতেন, যদি কর্ম্মের ভিতর ধর্ম্মভাবের প্রেরণা না থাকে, যদি ঐ সঙ্গে ধ্যানধারণা, সদসদ্বিচার ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধন অনুষ্ঠিত না হয় তবে ঐ কর্ম্ম প্রাণহীন সমাজসেবা কার্য্যে মাত্র পর্য্যবসিত হয় উচ্চ ভাব ও আদর্শের সহিত অসম্বদ্ধ এইরূপ প্রাণহীন জড়যন্ত্রের ন্যায় কার্য্যের দ্বারা কেবল বন্ধনের পর বন্ধনই আনয়ন করে। যখন আমাদের হৃদয় নির্ম্মল হয় এবং হৃদয় তাহার পূর্ণতম বিকাশের অবকাশ পায়, তখনই হাত প্রকৃত লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতে পারে সেইরূপ কেবল বিচার ও শাস্ত্রচর্চ্চা শুষ্ক অসার বুদ্ধির ব্যায়াম মাত্রে পরিণত হয়, যদি না তজ্জনিত সিদ্ধান্তসমূহ কর্ম্মজীবনে প্রকাশ পায় সেইরূপ যদি ভক্তির সহিত বিচার ও কর্ম্মের যোগ না থাকে, তবে উহা নিরর্থক ও অনেক সময় মহা অনিষ্টকর ভাবুকতা মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। সত্যকে জানা, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে উহার অস্তিত্ব অনুভব করা এবং জীবনের সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বকার্য্যে উহার প্রকাশ উপলব্ধি করাই সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মোপলব্ধি- প্রকৃত পক্ষে উহা সেই একই অনুভূতির তিনটি প্রকারভেদ মাত্র। তাঁহার মতে তিনিই আদর্শ সন্ন্যাসী, যিনি যখন ইচ্ছা, গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইতে সমর্থ হইবেন, আবার পর মুহূর্ত্তে শাস্ত্রের জটিল অংশের ব্যাখ্যা করিতে প্রস্তুত হইবেন সেই সন্ন্যাসীই আবার সমান উৎসাহে বাগানের কাজ করিবেন এবং তদুৎপন্ন দ্রব্য মাথায় লইয়া বাজারে গিয়া বিক্রয় করিয়া আসিবেন।

মঠের কার্য্য কি ভাবের হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে স্বামিজীর নিম্নলিখিত স্পষ্ট উপদেশ রহিয়াছে :—

"বিদ্যার অভাবে ধর্ম্মসম্প্রদায় হীনদশা প্রাপ্ত হয়। অতএব সর্ব্বদা বিদ্যার চর্চ্চা থাকিবে।

"ত্যাগ এবং তপস্যার অভাবে বিলাসিতা সম্প্রদায়কে গ্রাস করে; অতএব ত্যাগ এবং তপস্যার ভাব সর্ব্বদা উজ্জ্বল রাখিতে হইবে।

"প্রচারের দ্বারায় সম্প্রদায়ের জীবনীশক্তি বলবতী থাকে, অতএব প্রচারকার্য্য হইতে কখনও বিরত থাকিবে না।"

আবার -

"সঙ্কীর্ণ সমাজে ধর্ম্মের গভীরতা ও প্রবলতা থাকে, ক্ষীণবপু জলধারা সর্ব্বাধিক বেগশালিনী। উদার সমাজে ভাবের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গভীরতা ও বেগের নাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

"কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সমস্ত ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া এই রামকৃষ্ণশরীরে সমুদ্র হইতেও গভীর ও আকাশ হইতেও বিস্তৃত ভাবরাশির একত্র সমাবেশ হইয়াছে।

"ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, অতি বিশালতা, অতি উদারতা ও মহা প্রবলতা একাধারে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে এবং ঐ প্রকারে সমাজও গঠিত হইতে পারে। কারণ, ব্যষ্টির সমষ্টির নামই সমাজ।"

অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় বিশাল ও উদারভাবাপন্ন পুরুষ জগতে দুর্লভ। কিন্তু যদি মঠের বিভিন্ন অঙ্গগণ শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁহাদের আদর্শস্বরূপ রাখেন এবং তাঁহাদের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন সাধনপথ অবলম্বন করিলেও তাঁহাদিগের প্রত্যেককে শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গরূপে বিবেচনা করা হয় এবং সকলকেই তাঁহাদের ব্যক্তিগত উন্নতি ও ভাব প্রকাশের সমান সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়, তবে এই অভাব অনেকটা পূরণ হইতে পারে এবং মঠেরও অখণ্ড ও সঙ্ঘবদ্ধ ভাব অনেকটা রক্ষা করা যাইতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক্ষণে স্থূলদেহে বর্ত্তমান না থাকিতে পারেন, কিন্তু যতদিন এই উদারভাব অক্ষুণ্ণ

থাকিবে, ততদিন মঠ নিশ্চয়ই তাঁহার সান্নিধ্য অনুভব করিবে। স্বামিজীও বলিয়াছেন,—

"এই সঙ্ঘই তাঁহার অঙ্গস্বরূপ এবং এই সঙ্ঘেই তিনি সদা বিরাজিত। একীভূত সঙ্ঘ যে আদেশ করেন, তাহাই প্রভুর আদেশ। সঙ্ঘকে যিনি পূজা করেন, তিনি প্রভুকে পূজা করেন এবং সঙ্ঘকে যিনি অমান্য করেন, তিনি প্রভুকে অমান্য করেন।"

এইরূপ উদারভাবের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের ভিতর বিশ্লিষ্ট হইবার—বিরোধ বাধিবার কতকগুলি উপাদান থাকিতে পারে—ইহা আপাত দৃষ্টিতেই বোধ হইবে। আর মনের অমিল প্রবল হইলেই বাহিরে বিরোধ বাধে এবং ঐ অমিল যত বাড়িতে থাকে, বিরোধও ততই বাড়িতে থাকে। সেই কারণেই স্বামিজী উদ্দেশ্যের একতাই সঙ্ঘের অখণ্ডতারক্ষার পক্ষে—ঐক্যবন্ধনের পক্ষে প্রধানতম উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মঠের সকল অঙ্গগণেরই স্বামিজীর মঠের অখণ্ডতা সম্বন্ধীয় এই ভাবটির কথা পুনঃ পুনঃ চিন্তা ও আলোচনা করা এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনে উহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। স্বামিজী বলিয়াছেন,—

"প্রীতি, অধ্যক্ষদিগের আজ্ঞাবহতা, সহিষ্ণুতা ও একান্ত পবিত্রতাই ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে একতা রক্ষার একমাত্র কারণ।"

বাস্তবিকই যদি আমরা স্বামিজীর আদেশ পালনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি, তবে আমাদের মঠ মিশনের মধ্যে দলাদলি ও বিরোধরূপ বিপৎপাতের কোন আশঙ্কা নাই।

তার পর দেখা যায়, অন্যান্য বিষয়ে উচ্চপ্রকৃতি হইলেও মানযশের আকাঙ্ক্ষারূপ দুর্ব্বলতা ছাড়াইয়া উঠা বড় কঠিন—মহাজনগণও উহার প্রলোভনে অনেক সময়ে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। এই মানযশের আকাঙ্ক্ষায় পরস্পরের প্রতি ঈর্ষ্যাভাব জাগিয়া উঠে—ইহাতেই অবশেষে সঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া যায়।

তাই স্বামিজী বলিতেছেন,—

"আমাদের ঠাকুর মানের জন্য আসেন নাই, আমরা তাঁহার দাস,

আমরাও মান ভোগের আকাঙ্ক্ষা নহি। কেবল নিজে পবিত্র থাকিয়া অন্যকে পবিত্রতা শিক্ষা দিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

"এই মঠের প্রত্যেক অঙ্গেরই ভাবা উচিত যে, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে তিনি যেন শ্রীভগবানের মহিমা প্রকাশ করেন। তিনি যেখানেই যান বা যে অবস্থাতেই থাকুন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিনিধি, এবং লোকে তাঁহার মধ্য দিয়াই শ্রীভগবানকে দর্শন করিবে

"এই ভাবটি সদা মনে জাগরূক থাকিলে আর বেচালে পা পড়িবে না।"

রামিজীর উপরোক্ত আদেশ প্রাণপণে পালনের চেষ্টা করিলে মঠের বিভিন্ন অঙ্গ ও মঠভক্ত বিভিন্ন আশ্রম ও সমিতি সমূহের মধ্যে উদ্দেশ্যের একতা সাধিত হইবে এবং তাহাতেই পরস্পরের মধ্যে সহানুভূতি, সদ্ভাব ও সহযোগিতা বর্দ্ধিত হইবে। যে মহাতরঙ্গের প্লাবন সমগ্র মানবজাতির মধ্যে বর্ত্তমান গভীর অবসাদ ও অবনতি মুছাইয়া ফেলিতে ছুটিয়াছে, সেই তরঙ্গের শীর্ষদেশে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব অবস্থিত। আমরা সর্ব্বাবস্থায় সকল কার্য্যে যেন তাঁহার সর্ব্ববিরোধ সমন্বয়কারী, মহামিলন সাধক পূতচরিত্র সদা সর্ব্বদা অনুধ্যান করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হই।

সমগ্র মঠের ভিতর অধ্যক্ষ ও সেবকগণের মধ্যে প্রগাঢ় প্রীতির সম্বন্ধ থাকা উচিত। সেবকগণের উচিত—সর্ব্বদা অধ্যক্ষগণের আদেশ পালনে প্রাণপণে প্রস্তুত থাকা, তদ্রূপ অধ্যক্ষগণ যেন প্রাণে প্রাণে বুঝেন, আমরা অধ্যক্ষ নহি, আমরা এই সেবকগণের—কর্ম্মিগণের সেবকমাত্র, তাহাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র। অধ্যক্ষের গুণপনার উপরই সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানবিশেষের সাফল্য ও সিদ্ধি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। আমাদের প্রকৃতিতে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কার্য্য করিবার শক্তির একান্তাভাব। ইহাই আমাদের জাতীয় প্রকৃতির বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্পূর্ণ ঈর্ষ্যাহীনতাই কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কার্য্য করিয়া তাহাতে সফলতা লাভ করিবার গূঢ় সঙ্কেত। অধ্যক্ষ বা নেতার সর্ব্বদা তাঁহার অনুবর্ত্তী ও

সহযোগী সেবক ভ্রাতৃগণের মতামত গ্রহণ করিয়া তদনুসারে নিজ কার্য্য প্রণালী নিয়মিত করা এবং সর্ব্বদা সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া চলা কর্ত্তব্য। স্বামিজী অধ্যক্ষগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "কর্তৃত্ব করিতে কখনও যাইও না—যে—সকলের সেবায় প্রস্তুত, সেই যথার্থ কর্তৃত্ব করিবার উপযুক্ত। 'শিবদাস ত সর্দ্দার।' অপরকে পরিচালিত করিতে, অপরের উপর কর্তৃত্ব করিতে, মার্কিনেরা যাহাকে bossing বলে, তাহা করিতে যাইও না। সকলের দাস হও। তুমি যদি নেতার আসন গ্রহণ করিয়া আপনাকে একটা মস্ত বড় নেতা বলিয়া দেখাইতে চেষ্টা কর, তবে কেহ তোমার সাহায্যার্থ আসিবে না। যদি কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে চাও, তবে আগে নিজের অহংকে নাশ করিয়া ফেল। আবার কোন কাজে সফল হইবার একটি উপায়—প্রথমেই বড় বড় কাজের মতলব না করা—ধীরে ধীরে আরম্ভ কর—দেখ, কতটা কাজে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইতেছ—তার পর আরও অগ্রসর হও।' প্রত্যেক সেবককে কি ভাবে অধ্যক্ষের আদেশ পালন করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে স্বামিজী একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন—"যদি অধ্যক্ষ আদেশ করেন—ঐ কুমীরটাকে ধর গিয়া—তবে আগে গিয়া উহাকে ধর, তার পর তর্ক করিও।" স্বামিজী গভীর দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন—আজকাল ভারতে যদি কোন গুরুতর পাপ রাজত্ব করিতে থাকে, তবে তাহা আমাদের দাসসুলভ প্রকৃতি- সকলেই চায় হুকুম করিতে—হুকুম তামিল করিবার লোকের অভাব। আর প্রাচীন যুগে যে অদ্ভুত ব্রহ্মচর্য্য প্রথা ছিল, তাহার অভাব হইয়াছে বলিয়াই এটি ঘটিয়াছে। প্রথমে হুকুম তামিল করিতে শিখ। সর্ব্বদাই গোড়ায় আজ্ঞাবহ ভৃত্যের কাজ করিতে শিখ তবেই ঠিক ঠিক প্রভু হইতে পারিবে। সেবককে জীবনের মমতা পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বদা অধ্যক্ষের আজ্ঞা পালনে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

স্বামিজীও বলিয়াছেন—

"আজ্ঞাবহতাই কার্য্যকারিতার প্রধান সহায়। অতএব প্রাণভয় পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া আজ্ঞা পালন করিতে হইবে। সকল

দুঃখের মূল ভয়। ভয়ই মহাপাপ। সেই ভয় একেবারে ছাড়িতে হইবে।"

মঠের অঙ্গগণের মধ্যে ও মঠের বিভিন্ন শাখার মধ্যে পরস্পর সহযোগিতা বর্দ্ধনের জন্য স্বামিজী আরও কতকগুলি সুন্দর কথা বলিয়া গিয়াছেন :—

"অপরের নামে গোপনে নিন্দা করা ভ্রাতৃভাব বিচ্ছেদের প্রধান কারণ। অতএব কেহই তাহা করিবে না। যদি কোন ভ্রাতার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার থাকে • একান্তে তাহাকেই বলা হইবে

"তাঁহার সেবক বা সেবকের সেবকদের মধ্যে কেহই মন্দ নহে। মন্দ হইলে কেহ এখানে আসিত না অতএব কাহাকেও মন্দ ভাবিবার অগ্রে 'আমি মন্দ দেখি কেন?' প্রথম ভাবা উচিত।'

সঙ্ঘবিশ্লেষণপ্রয়াসী মঠের অঙ্গের উদ্দেশে স্বামিজীর সাবধানবাণী এখনও আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে :—

"সংহতিই অভ্যুত্থানের প্রধান উপায় ও শক্তি-সংগ্রহের একমাত্র পন্থা। অতএব যে কেহ কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা এই সংহতির বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিবেন, তাঁহার মস্তকে সমস্ত সঙ্ঘের অভিশাপ নিপতিত হইবে এবং তিনি ইহপরলোক উভয় হইতে ভ্রষ্ট হইবেন।"

এবার অন্য একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে চাই। আজকাল রামকৃষ্ণসঙ্ঘের কার্য্য রামকৃষ্ণ মঠ বা আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন—এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহাতে অনেকের মনে একটা গোলমাল ঠেকে—আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মূলতঃ রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনে কোন পার্থক্য নাই—কার্য্যের সুবিধার জন্যই এই দুইটি পৃথক্ নামের সৃষ্টি করা হইয়াছে। সাধারণতঃ অনেকের বিশ্বাস—মঠ ধ্যান ধারণা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদির স্থান আর সেবাকার্য্যটা মিশনের ভিতর ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কার্য্যতঃ, অনেক ক্ষেত্রে সেইরূপ হইয়াছে বটে, কিন্তু এ সম্বন্ধে যে কতকগুলি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে সেইগুলি দূর করা আবশ্যক।

আমি ইতিপূর্ব্বেই স্বামিজী মহারাজের কথিত মঠের আদর্শ ও কার্য্য-

প্রণালী সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছ, তাহা স্মরণ করিলে বুঝিবে, তাঁহার মতে মঠে যেমন এক দিকে ভক্তি পূজা উপাসনা, তদ্রূপ অপর দিকে কর্ম্মেরও স্থান আছে, এক দিকে যেমন ধ্যান ধারণা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার স্থান আছে, অপর দিকে সমাজসেবারও তদ্রূপ স্থান আছে। পূর্ব্বেই আমি দেখাইয়াছি, স্বামিজী বেলুড় মঠকে একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন—তাহাতে ধর্ম্ম ও দর্শনচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে একটি 'টেকনিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট' করিবার কথা বলিয়াছেন। তিনি জীবিত থাকিতে এই সংঘকে মঠ ও মিশন নাম দিয়া দুটি বিভাগ করিবার কোন প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহার আদর্শাবলী কর্ম্মজীবনে প্রয়োগ করিবার জন্য তিনি প্রথম বার আমেরিকা হইতে ফিরিবার কিছু পরেই ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্যগণকে লইয়া একটি সমিতি স্থাপন করেন, উদ্দেশ্য—সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য সকলে মিলিয়া একটা সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা। ঐ সমিতির তিনি নামকরণ করেন রামকৃষ্ণ মিশন। ক্রমে ইহার উন্নতি ও কার্য্যের প্রসার হইতে লাগিল এবং নানা শাখা-প্রশাখা বাড়িতে লাগিল—পরিশেষে কার্য্যের সুবিধার জন্য ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহাকে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২১ আইন অনুসারে রেজিষ্টারি করা হইল। তদবধি কেবল আইন বজায় রাখিবার জন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভিতর একটা নাম মাত্র পার্থক্য রাখা হইতেছে। প্রকৃত পক্ষে ধরিতে গেলে সাধারণের সুবিধার জন্য এই মঠেরই একটি অংশবিশেষের নাম রাখা হইয়াছে রামকৃষ্ণ মিশন। শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের প্রত্যেক অঙ্গই—তিনি যে-কোন কার্য্যক্ষেত্রে থাকিয়াই কর্ম্ম করুন না কেন—স্বামিজী যাহাকে প্রকৃত পক্ষে রামকৃষ্ণ মঠ বলিয়া মনে করিতেন, তাহারই অঙ্গীভূত। সুতরাং বর্ত্তমান মঠ ও মিশনের কার্য্য বলীর ভিতর একটা কাল্পনিক ব্যবধানের সৃষ্টি করিবার চেষ্টা স্বামিজীর ভাবের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ এবং সেই হেতু ঐ ধারণার ভিত্তিই ভ্রমপূর্ণ ও যত দিন উহা আমাদের মন হইতে সমূলে উৎপাটিত না হয়, ততদিন আমাদের কল্যাণ নাই। মঠ ও মিশনের আদর্শের মধ্যে পার্থক্য দেখিবার চেষ্টাটাই অন্যায় ও

দূষণীয়—উহাতে অনেক বিপদ্ আছে। মঠের সকল অঙ্গেরই প্রতি স্বামিজীর আদেশ এই—নিজে সৎ হও এবং অপরকেও সৎ হইবার জন্য সাহায্য কর। আর আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি এই আদর্শটি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্ম—এই চতুর্ব্বিধ প্রচলিত সাধনমার্গ সম্মিলিতভাবে সাধন করিতে হইবে, ইহাই উপদেশ করিয়া গিয়াছেন—অবশ্য প্রকৃতিভেদে যে সাধকের যে দিকে বিশেষ ঝোঁক সেই দিকটাই প্রধান ভাবে অবলম্বন করিবার অনুমতিও দিয়াছেন। সুতরাং মঠ ও মিশনের আদর্শের মধ্যে বিরোধের কোন অবকাশ নাই। বালু ও তাহার শির প্রকৃত পক্ষে এক বস্তু হইলেও কেবল বাক্যবিন্যাসের ফলে যেমন একটা কাল্পনিক পার্থক্যের ভাব আমাদের মনে আনয়ন করে—মঠ ও মিশনের মধ্যে ভেদ আবিষ্কারের চেষ্টাও তৎসদৃশ। সুতরাং এই সঙ্ঘের মধ্যে যাহারা সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছে, তাহারাও হিমালয়ের গুহায় থাকিয়া তপস্যায় নিযুক্ত সঙ্ঘের অঙ্গগণ হইতে কোন অংশে কম নহে—অবশ্য যদি সকলেই স্বামিজী কথিত আদর্শটিকে স্বীকার করিয়া লয়। যাহারা কিছুকালের জন্য কর্ম্মজীবন হইতে একেবারে অবসর লইয়া কেবল ধ্যান ধারণা স্বাধ্যায়াদিতে নিযুক্ত থাকিয়া আপনাদিগকে কর্ম্মজীবনের অধিকতর উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করে, তাহাদিগকেও আমরা মঠের বিশেষ মূল্যবান্ অঙ্গ বলিয়া ভাবিয়া থাকি—সঙ্ঘের উন্নতি ও জীবনীশক্তি অব্যাহত রাখিবার জন্য এইরূপ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী সাধকেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে। মঠ যেন একটি সুন্দর পুষ্পগুচ্ছ—জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্ম্মরূপ নানা বর্ণের সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা উহা নির্ম্মিত—এই বিভিন্ন বর্ণের সমবায়ে উহা সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধ হইয়াছে।

বন্ধুগণ, তোমাদিগকে আমার যাহা বলিবার ছিল—সব বলিলাম। হে শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ, আমার যে সামান্য অভিজ্ঞতা আছে, তাহা হইতে তোমাদিগকে বলিতেছি, যতদিন আমাদের এই সঙ্ঘ ভগবদ্ভাবে অনুপ্রাণিত থাকিবে, ততদিনই ইহা টিকিবে। প্রীতি, উদারতা, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতাই আমাদের সঙ্ঘের ভিত্তি। যদি স্বার্থপরতা

ইহার মজ্জায় প্রবেশ করে, তবে মানুষের প্রণীত আইন কানুনে ইহাকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। এই মঠ তোমাদিগকে সেই আদর্শ পূর্ণতা লাভ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিতেছে এবং সর্ব্ববিধ সুবিধা করিয়া দিতে সদা প্রস্তুত। তোমরা যদি মঠের সম্পূর্ণ অধীন থাকিয়া সকলেই ঐ পূর্ণতালাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর তবেই তোমরা এই সংঘের জীবনকে দীর্ঘতর ও স্থায়ী করিবার সহায়তা করিবে। স্বামীজী মঠের জন্য বুকের রক্ত দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আত্মা এখনও এখানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই মঠ শ্রীরামকৃষ্ণের স্থূল দেহ। যে সকল মহাত্মা আমাদের পূর্ব্বেই ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এখনও সূক্ষ্ম শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগকে সর্ব্ববিধ উপায়ে সাহায্য করিতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। আমাদিগকে এখন সব পালগুলি তুলিয়া দিতে হইবে। শ্রীভগবানের কৃপাবায়ু সদা বহিতেছে—পালগুলি সব তুলিয়া দিলে ঐ কৃপাবায়ু অচিরেই আমাদিগকে আমাদের গন্তব্য সেই চরম লক্ষ্যে নিশ্চিত লইয়া যাইবে।

ধর্ম্ম সাধনাই ভারতের মহান্ জীবনব্রত। জগৎকে আমাদের যদি কিছু দিবার থাকে, তবে একমাত্র এই ধর্ম্মধন। স্মরণাতীত কাল হইতে আধ্যাত্মিক ভাবের বন্যা এই ভূমি হইতেই প্রবাহিত হইয়া সমগ্র জগতের সভ্যতার গতি নিয়মনে সাহায্য করিয়াছে। আমাদের এই হতভাগ্য জাতির উপর বিগত দশ শতাব্দী ধরিয়া নানা দুর্দ্দৈবরূপ ঝঞ্চা বহিয়া যাইলেও যে আমরা বাঁচিয়া আছি, তাহার কারণ, ধর্ম্মই আমাদের জীবনের মেরুদণ্ড স্বরূপ। আমাদের ব্যক্তিগত বা সঙ্ঘবদ্ধ জীবনে আমরা যত প্রকার বিভিন্ন আদর্শ ও কার্য্য লইয়া থাকি না কেন—শ্রীভগবান্‌ই আমাদের সকল কার্য্যের মধ্যবিন্দুস্বরূপ। এখানে প্রকৃত মহত্ত্ব ধর্ম্মের মানদণ্ডেই তুলিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ গীতায় তাঁহার অবতারের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই তাঁহার আবির্ভাব হইয়া থাকে, এই যে অব্যর্থ নিয়মের ইঙ্গিত করিয়াছেন—সেই নিয়মেই শ্রীভগবান্ এই যুগে

ধর্ম্মের লুপ্ত আদর্শ পুনরুদ্ধারের জন্য আবার আবিভূর্ত হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বেও শত শত অবতার ও যুগাচার্য্য অন্ধকারের মধ্যে আলোক দেখাইতে, জাতীয় অবসাদ দূর করিয়া আমাদিগকে তুলিতে আসিয়াছেন। কিন্তু যে তম-অমানিশা আমাদিগকে বর্ত্তমান যুগে ঘেরিয়াছে, তত্তুলনায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব অন্ধকারগুলিকে—যাহা দূর করিতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবতারগণের আগমন প্রয়োজন হইয়াছিল—আলোকই বলা যাইতে পারে। স্বামিজী বেলুড় মঠ স্থাপনার কিছু পূর্ব্বে 'হিন্দুধর্ম্ম কি?' নামক যে ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি বলিতেছেন,—

"কিন্তু ঈষন্মাত্রযামা গতপ্রায়া বর্ত্তমান গভীর বিষাদরজনীর ন্যায় কোনও অমানিশা এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতন সমস্ত গোষ্পদের তুল্য।"

তাই বলি, আমাদিগকে এবং সমগ্র জগৎকে তমোময়ী জড় শক্তির দৃঢ় বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য শ্রীভগবান তাঁহার অপার করুণাবশে আবার পূর্ণভাবে আবিভূর্ত হইয়াছেন।

প্রথমবার আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে কলিকাতাবাসিগণ স্বামিজীকে যে অভিনন্দন প্রদান করেন, তদুত্তরে তিনি তাঁহার শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশে এক স্থলে বলিতেছেন,—

"আমরা জগতের ইতিহাসে শত শত মহাপুরুষের জীবনী পাঠ করিতেছি। এখন আমরা যে আকারে সেই সকল জীবনী পাইতেছি, তাহাতে শত শত শতাব্দী ধরিয়া শিষ্যপ্রশিষ্যগণের পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধনরূপ কলম চালানোর পরিচয় পাওয়া যায়। সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া ঐ সকল প্রাচীন মহাপুরুষগণের জীবনচরিতকে ঘসিয়া মাজিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া মসৃণ করা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি যে-জীবন আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যাঁহার ছায়ায় আমি বাস করিয়াছি, যাঁহার পদতলে বসিয়া আমি সব শিখিয়াছি, সেই রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবন যেরূপ উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত, আমার মতে আর কোন মহাপুরুষের তদ্রূপ নহে।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবে যে ধর্ম্মবন্যা জগৎকে প্লাবিত করিয়াছে, উহা প্রবলবেগে সমাজের উপর পতিত হইবার পূর্ব্বে সমাজের সর্ব্বত্র

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাবর্ত্তের আবির্ভাব দেখা গিয়াছিল। যখন ঐ মহাবন্যা আসিতেছিল, তখন উহার অস্তিত্বই কাহারো চক্ষে পড়ে নাই, উহাকে কেহ ভাল করিয়া দেখে নাই, উহার গূঢ়শক্তি সম্বন্ধে কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই—কিন্তু উহা ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া বাড়িতে লাগিল—ক্রমে প্রবলকায় হইয়া যেন অন্য ক্ষুদ্রতর জলাবর্ত্তগুলিকে গ্রাস করিয়া ফেলিল—নিজ অঙ্গে মিলাইয়া লইল। এইরূপে সুবিপুলকায় ও প্রবল হইয়া মহাবন্যারূপে পরিণত হইল এবং সমাজের উপর এত প্রবল বেগে পড়িল যে, কেহই উহার গতিরোধ করিতে পারিল না।

সেই শ্রীরামকৃষ্ণ—সেই বিরাট্ পুরুষ—জগৎ যাঁহার ন্যায় মহান্ পুরুষ আর দেখে নাই—তিনি তোমাদের পশ্চাতে রহিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা মহৎ মহৎ কার্য্য করিয়াছিলেন—তোমাদিগকেও আরও মহত্তর কার্য্য সব করিতে হইবে। আমাদের প্রত্যেককে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, জগতের অবশিষ্ট সকলে তাহাদের কার্য্য করিয়া চুকিয়াছে—জগতের পূর্ণতা সাধনের জন্য যেটুকু কাজ বাকি রহিয়াছে, তাহা আমাকেই করিতে হইবে। এই দায়িত্বভার আমাদের স্কন্ধে লইতে হইবে।

প্রাচীন বৌদ্ধ মঠসমূহ সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা দ্বারা জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য অন্তরের সহিত চেষ্টা করিয়াছিলেন—তাঁহারা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনে অনেকটা সফলকামও হইয়াছিলেন। লিপিবদ্ধ ইতিহাসের যুগ হইতেই দেখা যায়, বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ তাঁহাদের সঙ্ঘসমূহের সাহায্যে মানবকল্যাণের জন্য যতদূর করা সম্ভব, তাহা করিয়াছেন। যদি বর্ত্তমান প্রধান কতকগুলি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ও দর্শন শাস্ত্র সমূহের অজ্ঞাত ইতিহাস কখনও লিখিত হয়, তবেই জগৎ জানিবে যে, এই নির্ভীক বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ইহাদের উন্নতি ও পরিপুষ্টিসাধনে কতদূর সহায়তা করিয়াছেন। যতদিন এই সমস্ত বৌদ্ধমঠে শ্রীবুদ্ধের সময়ের আদর্শ পবিত্রতা ও ত্যাগের ভাব অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন এই বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ যেখানেই গিয়াছেন, তথায়ই তাঁহাদের প্রভাবের গতি কেহ রোধ করিতে পারে নাই। কিন্তু যখন তাঁহাদের সেই পবিত্রতা ও ত্যাগের ভাব হ্রাস হইয়া আসিল,

তখনই শ্রীবুদ্ধের ধর্ম্মে অবনতির চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। ইতিহাস হইতে আমাদের এই প্রথম শিক্ষা লইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের পরবর্ত্তী ইতিহাসে আমরা সময়ে সময়ে দেখিতে পাই, কোন কোন ব্যক্তিবিশেষ আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম শিখরে আরূঢ় হওয়া সিদ্ধাবস্থা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাঁহার প্রতিবেশী জনগণের জন্য কখনও ভাবেন নাই। তিনি নিজে যে একটা মহান আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই আদর্শ সামাজিক জীবনে প্রতিফলিত হইবার সুযোগ্য আধার না পাওয়াতে তাঁহার অন্তর্দ্ধানের পর কয়েকবর্ষ গত হইতে না হইতে উহা লুপ্ত হইয়া গেল। ইতিহাস হইতে আমাদিগকে এই দ্বিতীয় শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। আবার, গত কয়েক শতাব্দীর ভিতর আমাদের দেশে বহুসংখ্যক মঠ ও আশ্রমের অভ্যুদয় দেখা যায়। যদিও উহারা অতি অল্পসংখ্যক সংসারত্যাগী পুরুষকে তাঁহাদের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উন্নতির সাহায্য করিয়া তাঁহাদের উপকার সাধন করিয়াছে, কিন্তু তাহারা সমগ্র সমাজের কোন কল্যাণ সাধনে সমর্থ হয় নাই, কারণ, সমগ্র মানবজাতির সেবাধর্ম্মকে তাহারা তাহাদের আধ্যাত্মিক সাধনপ্রণালীর অন্তর্ভুক্ত করে নাই। ইহাই ইতিহাসের তৃতীয় শিক্ষা।

স্বামিজী তাঁহার মঠের আদর্শ দিবার পূর্ব্বে ইতিহাসের এই পূর্ব্বোক্ত তিনটি শিক্ষাই উত্তমরূপে অনুধাবন করিয়াছেন। করিয়া—তিনি 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—নিজ আত্মার মুক্তিসাধন এবং জগতের কল্যাণসাধন রূপ সর্ব্বোচ্চ আদর্শের জন্য জীবন বিনিয়োগ—ইহাই আমাদের করিতে বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ, তোমরা সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে উক্ত উচ্চ আদর্শ জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছ—তোমাদের সকলের উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তোমরা এই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নিজেদের ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রলোভন যতই প্রবল হউক, সমুদয়কে মন হইতে সবলে অপসারিত করিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করিতেছ না। আর আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ

যিনি আমাদের জীবনের আলোক ও পথপ্রদর্শক—তিনি তোমাদের পশ্চাতে থাকিয়া—তোমাদের মধ্য দিয়া কার্য্য করিতেছেন। তোমরা যাহা কিছু করিতেছ, তাহার পশ্চাতে তাঁহার মঙ্গল হস্ত রহিয়াছে। কেবল তাঁহার কৃপায়ই এত অল্পকালের মধ্যে তোমাদের কার্য্য এত সফলতা লাভ করিয়াছে। যতদিন তোমাদের তাঁহাতে বিশ্বাস থাকিবে, যতদিন তোমরা নিজদিগকে তাঁহার হস্তের যন্ত্রস্বরূপ ভাবিবে, ততদিন জগতের কোন শক্তিই—তাহা যত বড় হউক না কেন, তোমাদিগকে তোমাদের স্থান হইতে এতটুকু হঠাইতে পারিবে না। আমাদের প্রভুতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তোমাদের প্রত্যেকেই বলিতে পার—"আমি আমার পায়ে দৃঢ় থাকিয়া আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে অস্খলিতপদে দাঁড়াইয়া সমগ্র জগতের ভিতর একটা নাড়াচাড়া দিব।" আমি তোমাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে খুব দৃঢ়তার সহিত এইকথা বলিতেছি যে, সাময়িক অসিদ্ধিতে বিচলিত বা নিরুৎসাহ হইও না। বার বার অকৃতকার্য্যতা চরম সিদ্ধির সোপানপরম্পরা মাত্র। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপর অবিচলিত বিশ্বাসের সহিত কার্য্য কর, পরিণামে তোমাদের জয় নিশ্চিত। আমি কেবল প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহার উপর যেন তোমরা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইতে পার। ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণের মত, নেয়াইএর উপর নিক্ষিপ্ত হাতুড়ির মত, লক্ষ্যনিক্ষিপ্ত তরবারির মত অব্যর্থসন্ধান হও। বাণ যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, সে কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করে না—হাতুড়ি উহার উদ্দিষ্ট স্থানে না পড়িলে বিরক্ত হয় না, তরবারিও যদি যোদ্ধার হস্তে ভাঙ্গিয়া যায়, সেও বিলাপ করে না। কিন্তু তথাপি নির্ম্মিত, ব্যবহৃত ও ভগ্ন হইবার সময় একটা আনন্দ আছে—আবার উহাদের ব্যবহার ফুরাইলে অব্যবহার্য্য বস্তুরূপে পরিত্যক্ত হইবার কালেও সেই একই রূপ আনন্দ।

আমি তোমাদের সকলের উপর ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি—যেন তিনি তোমাদিগকে এই জীবনেই সত্য উপলব্ধির জন্য উপযুক্ত বল ও সাহস সম্পন্ন করেন।

এই মহাসম্মেলনের বাতাসে প্রেম ও শুভেচ্ছার স্রোত খেলিতে

থাকুক একণে ভারতের প্রাচীন মহর্ষিগণ উচ্চারিত বেদবাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি :—

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীনঃ সন্ত্বোষধীঃ মধু নক্তমুতোষসি
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা
মধুমান্নো বনস্পতি র্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ
ওঁ মধুঃ ওঁ মধুঃ ওঁ মধুঃ।

হোক বায়ু মধুময়— নদী যেন মধু বয়,
ওষধিরা হোক মধুময়।
নিশি দিবা মধুময়, ধূলি যাহা ভূমে রয়—
দ্যৌষ্পিতা হোন মধুময়।
মধুমান বনস্পতি হোক আমাদের প্রতি
মধুমান্ হোন দিবাকর।
আমাদের গাভীগণ মাধ্বী হোক সর্ব্বক্ষণ
মধু হোক সর্ব্ব চরাচর
ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু

নবযুগের সন্ন্যাস *

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের সপ্তাহকাল ব্যাপী প্রথম মহাসম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। মহাসম্মেলনের মিলিত সিদ্ধান্ত সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ ইতিহাস নিয়ন্ত্রিত করিবে, অতএব এই পবিত্র অনুষ্ঠানের দায়িত্ব ও গুরুত্ব আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ ও অনুভব করিব।

---

* মহাসম্মেলনের সাধারণ-সভায় 'আনন্দবাজার পত্রিকার' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বক্তৃতা।

৫ই এপ্রিল, ১৯২৬ খৃঃ।

"বারংবার এই ভারতভূমি মূর্চ্ছাপন্না হইয়াছিলেন এবং ভারতের ভগবান আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইঁহাকে পুনরুজ্জীবিতা করিয়াছেন"— ভারতবর্ষের ইতিহাস স্বামী বিবেকানন্দকে এই রহস্যের বার্ত্তা দিয়াছিল। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও সিদ্ধির মধ্যে তিনি পুনরুত্থানের মহাবীর্য্য প্রত্যক্ষ করিলেন। তিনি দেখিলেন, মানব-সভ্যতাকে এক স্তর হইতে আর এক উন্নততর স্তরে লইয়া যাইবার জন্য "সর্ব্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্ব্বভাবসমন্বিত, সর্ব্ববিদ্যাসহ, যুগাবতার" আসিয়াছেন। বেদান্ত-ভেরী-নিনাদে যুগপ্রবর্ত্তক আচার্য্য আমাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, "হে মানব, মৃতের পূজা ছাড়, অমর আমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি * * * বৃথা সন্দেহ, দুর্ব্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষা-দ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র পরিবর্ত্তনের সহায়তা কর।"

"মৃতের পূজা নহে—জীবন্তের পূজা" এই কথাটুকুর মধ্যেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মহান উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের পূজাকে কেন্দ্র করিয়া, প্রাচীন ধারার ন্যায় দেবায়তন তুলিয়া, বিশিষ্ট পদ্ধতির অবতারণা করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ অনায়াসেই একটি বৃহৎ সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতে পারিতেন। সাধারণ মানুষের সীমাবদ্ধ মনকে বাঁধিয়া রাখিবার এই সহজ প্রাচীন পদ্ধতির কুফল তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা কোন বিশিষ্ট পদ্ধতি দিলেন না, দিলেন মহান আদর্শ এবং সেই আদর্শের পূর্ণ অভিব্যক্তি। সেই কারণে জাতীয় জীবনের পুনরুত্থানের ভাব আজ নানাকেন্দ্র হইতে বিঘোষিত হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবধারায় জাগ্রত ভারত ভারতের চিত্তে নবযুগের প্রতি কর্ত্তব্যবোধ জাগ্রত করিতেছে। সাম্প্রদায়িক অতি-নির্দ্দিষ্টতার যে সাংঘাতিক অকল্যাণ, তাহা সঙ্ঘে কোনদিনই স্থান পায় নাই। এক উদার অসাম্প্রদায়িক সার্ব্বভৌমিক আদর্শকে জীবন্ত রাখিবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। সকল দেশের সকল ধর্ম্মের সকল মতের মানুষই এখানে মনুষ্যত্বের দাবীতে মিলিবার সুযোগ পাইয়াছেন।

কিন্তু, বাহিরের এই অনির্দ্দিষ্টতার পশ্চাতে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থিরভূমি

রহিয়াছে সেটি হইতেছে—নবযুগের নূতন সন্ন্যাস। এই সন্ন্যাস অতীত যুগের সংসার বা ইহলোকনিন্দুক আত্মপরায়ণ মোক্ষসাধনা নহে, পরন্তু, সমগ্র জাতির কল্যাণ সাধনার মধ্যেই ব্রহ্মের প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করিবার জন্য গার্হস্থ্যের সহিত সঙ্ঘের মধ্যে সমান আসন গ্রহণ করিয়াছে তাই আজ আমরা এতগুলি মানুষ একত্র হইয়া আদর্শ মনুষ্যত্বের সাধক, সংরক্ষক ও প্রচারক সঙ্ঘরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্যই আসিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই তথাপি তাঁহারা এ জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বিশেষভাবে সেই জাতির অধঃপতন ও দুর্গতি দূর করিবার জন্যই আসিয়াছিলেন, এই কথাটা আমাদের সর্ব্বাগ্রে চিন্তা করিতে হইবে। জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পতিত, অসহায়, দুর্ব্বল হিন্দু-সংজ্ঞায় অভিহিত নানা সম্প্রদায় ও শ্রেণীতে বিভক্ত মনুষ্য-সমষ্টির মধ্যে এই যে সার্ব্বভৌমিক মনুষ্যত্বের স্বরূপ সগৌরবে বিকশিত হইল, ইহার কি নিগূঢ় রহস্য তাহা আজ পর্য্যন্তও আমরা কি সম্যকরূপে বুঝিয়াছি? স্বামী বিবেকানন্দ 'রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করিয়া ত্যাগ ও সেবার ভিত্তির উপর সজীব ও সক্রিয় প্রচারশীল হিন্দুধর্ম্মকে যেদিন স্থাপন করিলেন, সেদিনের সেই শুভসঙ্কল্পটিকে বীর্য্যের দ্বারা প্রবল, পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা নির্ম্মল করিয়া তুলিবার জন্য একাল পর্য্যন্ত আমরা কি করিয়াছি, আজ তাহা বিচার করিবার দিন।

সঙ্ঘ স্থাপনের পূর্ব্বে, শ্রীরামকৃষ্ণ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন একটি সন্ন্যাসী পরিচালিত শক্তিকেন্দ্র। বাহিরের সমস্ত কর্ম্মপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই শক্তিকেন্দ্র হইতে জ্ঞান-কর্ম্মে ত্যাগ-ধর্ম্মে বিবিধ সম্বলসম্পদ ছড়াইয়া পড়িবে, এই মহতী কল্পনা কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে, আজ তাহা হিসাব করিয়া দেখিবার দিন।

পূণ্যস্মৃতি স্বামী প্রজ্ঞানন্দজী 'ভারতের সাধনায়' বলিয়াছেন, "গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়েই ঠাকুরের আশ্রয় পাইয়াছে, তাঁহার করুণা উভয়ত্রই সমভাবে বর্ষিত,—কেহ কম পাইবার কেহ বেশী পাইবার দাবী

রাখে না। কিন্তু তিনি যাহাকে সংসার ছাড়াইয়া, গৃহ সমাজ ছাড়াইয়া সন্ন্যাসী করেন, তাহার একটা বিশেষ ভার, বিশেষ দায় আছে, যে দায় দেশের জন্য, জগতের জন্য স্ব-প্রতিষ্ঠিত আদর্শের সংরক্ষণ ও প্রচার। এই দায় পূরণের যোগ্যতা যতদিন থাকিবে, ততদিন তৎপ্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসের বিলোপ নাই বিনাশ নাই। আবার যতদিন এই দায় পূরণে তাঁহার প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত সন্ন্যাসী জীবনে প্রকটিত হইবে, ততদিন যোগ্যতারও অভাব হইবে না।"

নবযুগের সন্ন্যাসের এই আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ স্বীয় জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন এবং সেই আদর্শ অব্যাহত রাখিবার জন্যই বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 'এই মঠ কোনমতেই বাবাজীদের ঠাকুর-বাড়ীতে পরিণত না হইয়া', যাহাতে মানুষ-গঠনোপযোগী একটি 'সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বিশ্ব-বিদ্যালয়'রূপে জ্ঞান, ধর্ম্ম, লৌকিক ও আধ্যাত্মিক বিদ্যাচর্চ্চার কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠে, এবং এখান হইতে সর্ব্বত্যাগী, দেশসেবক ব্রতধারিগণ যাহাতে ভারতের প্রতি পল্লি-নগরীতে উপনিষদের বীর্য্যপ্রদ বলপ্রদ ভাবনিচয় বহন করিয়া লইয়া যান, মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের উদারবাণী প্রচার করেন ইহাই ছিল স্বামিজীর মঠ-স্থাপনের উদ্দেশ্য। এই আদর্শ কতটা সফল হইয়াছে এবং যোগ্য কর্ম্মী ও উপযুক্ত অর্থের অভাবে কতটা সফল হইতে পারে নাই, সে বিচারের আমি অধিকারী নহি। যাঁহারা মানবসেবাব্রতে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া সঙ্ঘের কার্য্যে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারাই এ প্রশ্নের মীমাংসা করিবেন।

আমরা আজ সঙ্ঘকে কয়েকজন সন্ন্যাসীর জীবনের মধ্য দিয়া দেখিব না, তাহা হইলে উহা আমাদের নিকট সীমাবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইবে। ভবিষ্যৎ ইতিহাসের সামগ্রীরূপে ইহাকে দেখিলেই যথার্থরূপে দেখা হইবে। তখন আমরা দেখিব, ভারতবর্ষ তাহার গভীরতম পতন হইতে উঠিয়া আসিবার জন্য প্রতিনিয়ত যে গূঢ় চেষ্টা করিতেছে, এই সঙ্ঘের সৃষ্টির মধ্যে তাহার পরিচয় রহিয়াছে। কোন অট্টালিকা সম্বন্ধে একথা বলা চলে যে ইহা যেমন দেখিতেছ, তেমনি, প্রয়োজনের সমস্ত তাগিদ

পূরণ করিয়া আপন সম্পূর্ণতায় ইহা স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত, কিন্তু একটি বীজ সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। তাহার মধ্যে সচেতন প্রাণশক্তির যে মহিমময় রহস্য আছে, তাহার ইতি বা ইয়ত্তা করিবে কে? ভবিষ্যতের সেই বিপুল সম্ভাবনাকে আজ আমরা সাধকের ধ্যাননেত্রে সঙ্ঘের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পাই—যুগান্তের অন্ধকার পট বিদীর্ণ করিয়া যে আলোক আজ আসিয়াছে, আমাদের মনের সমস্ত দ্বার বাতায়ন তাহার সম্মুখে অসঙ্কোচে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিতে চাই,—এখনো আগত ও অনাগত মানবমহত্ত্বের পুরোহিতগণ জয়শঙ্খধ্বনিতে যে কল্যাণবার্ত্তা ঘোষণা করিয়া ম্রিয়মাণ জাতিকে শ্রেয়ঃলাভের পথে পরিচালিত করিতেছেন ও করিবেন সেই বিজয়যাত্রায় নির্ভয়ে যোগদান করিতে চাই।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে একাল পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কার্য্য যেভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহা যে পর্য্যাপ্ত নহে, এই মহা-সম্মেলন সেই কথাই আজ আমাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছে। সঙ্ঘ-নায়কগণ এই মহা-সম্মেলন আহ্বান করিয়া সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ও গৃহী উভয় শ্রেণীর কর্ম্মীকেই তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য একাগ্রচিত্তে স্মরণ করিতে উপদেশ দিতেছেন এবং ব্যাপকভাবে সমগ্র দেশবাসীর নিকট এই অশেষ কল্যাণের নিদান জাতীয়-প্রতিষ্ঠানের পরিপুষ্টি ও বিকাশের সহায়তার আবেদন উপস্থিত করিয়াছেন। কর্ম্মীর অসচ্ছলতা-প্রযুক্ত অথবা যোগ্য কর্ম্মীর অভাবে সঙ্ঘ এ পর্য্যন্ত যে সকল নির্দ্দিষ্টকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই, সেগুলি কোথায় কি ভাবে আরম্ভ করা যাইতে পারে, সেজন্য সঙ্ঘের ছোট বড় সকল কর্ম্মীকেই স্ব স্ব মতামত ব্যক্ত করিয়া মিলিত-সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। অতএব এই শুভ-অবসরে সঙ্ঘের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, যিনি আমাদের আচার্য্য ও গুরু, তাঁহার নিকট হইতে দায়স্বরূপ আমরা কি কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তাহার সাফল্যের জন্য মানবকল্যাণব্রতী বর্ত্তমান সঙ্ঘ-নায়কগণের উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে আমরা প্রস্তুত হইয়াছি কি-না, তাহা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

আপনারা সকলেই জানেন, আচার্য্যদেব পুনঃপুনঃ কহিয়াছেন,—এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ। তমোহ্রদে নিমজ্জমান লক্ষ কোটী নরনারীর

উদ্ধার সাধনের ব্রত গ্রহণ করিয়া নবীন ভারত গঠন করিবেন যাঁহারা—তাঁহাদিগকেই তিনি বারম্বার আহ্বান করিয়াছেন। মহত্ত্ব ও পৌরুষের অবতার বিবেকানন্দ সমগ্র জাতিটাকে হীনতার পঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিবার জন্য যে একদা তাঁহার বলিষ্ঠ বাহুদ্বয় নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাহার নিগূঢ় রহস্য আজ সাধকের ধ্যাননেত্রে আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে। বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম বা আত্মতত্ত্ব প্রচার করিয়া, উপধর্ম্মের উৎপাতে কুসংস্কারগ্রস্ত সমাজ-জীবনের পঙ্গুত্ব ঘুচাইয়া, অগ্রসর-গতিসঞ্চারের যে পথ স্বামিজী নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, আশঙ্কা হয়, আমরা যে তাহা ঠিক ঠিক বুঝিয়াছি, এখনো তাহা আচরণ দ্বারা প্রমাণ করিতে পারি নাই। সমাজ-সংস্কারকরূপে নহে, বিধানদাতারূপে নহে, কেবল বীর্য্যপ্রদ উপনিষদের তত্ত্বগুলি 'ছাত্রের অধ্যয়নাগার হইতে মৎস্যজীবীর কুটীর পর্য্যন্ত' সমভাবে প্রচার করিবার জন্য, সমাজের সর্ব্বনিম্নস্তরে মুক্তির বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য, সঙ্ঘের নিকট স্বামী বিবেকানন্দ চাহিয়াছিলেন—একদল ব্রতধারী চরিত্রবান যুবক; আর তাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, "মূলদেশে অগ্নি সংযোগ কর, অগ্নি ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ দেশে উঠিতে থাকুক, একটি অখণ্ড ভারতীয় জাতি গঠন করুক।"

স্বামিজী আমাদিগকে তথাকথিত সমাজ-সংস্কার হইতে বিরত থাকিতে আদেশ দিয়াছেন। স্বামিজীর এই অভিপ্রায়টি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে না পারিয়া অনেকে সামাজিক কুসংস্কারের আনুগত্য স্বীকারই বুঝিয়া থাকেন। তখন তাঁহারা বিস্মৃত হন যে, সমাজ ও লোকাচারের সহিত আপোষ করিবার কাপুরুষোচিত মনোবৃত্তি স্বামিজী সর্ব্বদা বর্জ্জন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। সঙ্ঘের যাঁহারা গৃহীসেবক তাঁহাদের অধিকাংশই গতানুগতিকতার মধ্যেই আত্মসমর্পণ করেন। ছুঁৎমার্গ পরিহার, সর্ব্ববর্ণীয়ের আধ্যাত্মিক সত্যে সমান অধিকার-স্বীকার ও সমর্থন, এক বর্ণের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদান ইত্যাদি সামাজিক সমুন্নতি-সাধনের কার্য্য কেবল সন্ন্যাসীর নহে—সঙ্ঘের গৃহী-ভক্তগণেরই সর্ব্বাগ্রে পালনীয়। কিন্তু,

পূরণ করিয়া আপন সম্পূর্ণতায় ইহা স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত, কিন্তু একটি বীজ সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। তাহার মধ্যে সচেতন প্রাণশক্তির যে মহিমময় রহস্য আছে, তাহার ইতি বা ইয়ত্তা করিবে কে? ভবিষ্যতের সেই বিপুল সম্ভাবনাকে আজ আমরা সাধকের ধ্যাননেত্রে সঙ্ঘের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পাই—যুগান্তের অন্ধকার পট বিদীর্ণ করিয়া যে আলোক আজ আসিয়াছে, আমাদের মনের সমস্ত দ্বার বাতায়ন তাহার সম্মুখে অসঙ্কোচে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিতে চাই;—এখনো আগত ও অনাগত মানবমহত্ত্বের পুরোহিতগণ জয়শঙ্খধ্বনিতে যে কল্যাণবার্ত্তা ঘোষণা করিয়া ম্রিয়মাণ জাতিকে শ্রেয়ঃলাভের পথে পরিচালিত করিতেছেন ও করিবেন সেই বিজয়যাত্রায় নির্ভয়ে যোগদান করিতে চাই।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ হইতে একাল পর্য্যন্ত রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কার্য্য যেভাবে চলিয়া আসিতেছে, তাহা যে পর্য্যাপ্ত নহে, এই মহা-সম্মেলন সেই কথাই আজ আমাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছে। সঙ্ঘ-নায়কগণ এই মহা-সম্মেলন আহ্বান করিয়া সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ও গৃহী উভয় শ্রেণীর কর্ম্মীকেই তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য একাগ্রচিত্তে স্মরণ করিতে উপদেশ দিতেছেন এবং ব্যাপকভাবে সমগ্র দেশবাসীর নিকট এই অশেষ কল্যাণের নিদান জাতীয়-প্রতিষ্ঠানের পরিপুষ্টি ও বিকাশের সহায়তার আবেদন উপস্থিত করিয়াছেন। কর্ম্মীর অসচ্ছলতা-প্রসূক্ত অথবা যোগ্য কর্ম্মীর অভাবে সঙ্ঘ এ পর্য্যন্ত যে সকল নির্দ্দিষ্টকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই, সেগুলি কোথায় কি ভাবে আরম্ভ করা যাইতে পারে, সেজন্য সঙ্ঘের ছোট বড় সকল কর্ম্মীকেই স্ব স্ব মতামত ব্যক্ত করিয়া মিলিত-সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। অতএব এই শুভ-অবসরে সঙ্ঘের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, যিনি আমাদের আচার্য্য ও গুরু, তাঁহার নিকট হইতে দায়স্বরূপ আমরা কি কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তাহার সাফল্যের জন্য মানবকল্যাণব্রতী বর্ত্তমান সঙ্ঘ-নায়কগণের উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে আমরা প্রস্তুত হইয়াছি কি-না, তাহা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

আপনারা সকলেই জানেন, আচার্য্যদেব পুনঃপুনঃ কহিয়াছেন,—এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ। তমোহ্রদে নিমজ্জমান লক্ষ কোটী নরনারীর

উদ্ধার সাধনের ব্রত গ্রহণ করিয়া নবীন ভারত গঠন করিবেন যাঁহারা—তাঁহাদিগকেই তিনি বারম্বার আহ্বান করিয়াছেন। মনুষ্যত্ব ও পৌরুষের অবতার বিবেকানন্দ সমগ্র জাতিটাকে হীনতার পঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিবার জন্য যে একদা তাঁহার বলিষ্ঠ বাহুদ্বয় নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাহার নিগূঢ় রহস্য আজ সাধকের ধ্যাননেত্রে আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে। বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম বা আত্মতত্ত্ব প্রচার করিয়া, উপধর্ম্মের উৎপাতে কুসংস্কারগ্রস্ত সমাজ-জীবনের পঙ্গুত্ব ঘুচাইয়া, অগ্রসর-গতিসঞ্চারের যে পথ স্বামিজী নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, আশঙ্কা হয়, আমরা যে তাহা ঠিক ঠিক বুঝিয়াছি, এখনো তাহা আচরণ দ্বারা প্রমাণ করিতে পারি নাই। সমাজ-সংস্কারকরূপে নহে, বিধানদাতারূপে নহে, কেবল বীর্য্যপ্রদ উপনিষদের তত্ত্বগুলি 'ছাত্রের অধ্যয়নাগার হইতে মৎস্যজীবীর কুটীর পর্য্যন্ত' সমভাবে প্রচার করিবার জন্য, সমাজের সর্ব্বনিম্নস্তরে মুক্তির বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া যাইবার জন্য, সঙ্ঘের নিকট স্বামী বিবেকানন্দ চাহিয়াছিলেন—একদল ব্রতধারী চরিত্রবান যুবক; আর তাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, "মূলদেশে অগ্নি সংযোগ কর, অগ্নি ক্রমশঃ ঊর্দ্ধ দেশে উঠিতে থাকুক, একটি অখণ্ড ভারতীয় জাতি গঠন করুক।"

স্বামিজী আমাদিগকে তথাকথিত সমাজ-সংস্কার হইতে বিরত থাকিতে আদেশ দিয়াছেন। স্বামিজীর এই অভিপ্রায়টি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে না পারিয়া অনেকে সামাজিক কুসংস্কারের আনুগত্য স্বীকারই বুঝিয়া থাকেন। তখন তাঁহারা বিস্মৃত হন যে, সমাজ ও লোকাচারের সহিত আপোষ করিবার কাপুরুষোচিত মনোবৃত্তি স্বামিজী সর্ব্বদা বর্জ্জন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। সঙ্ঘের যাঁহারা গৃহীসেবক তাঁহাদের অধিকাংশই গতানুগতিকতার মধ্যেই আত্মসমর্পণ করেন। ছুঁৎমার্গ পরিহার, সর্ব্ববর্ণিয়ের আধ্যাত্মিক সত্যে সমান অধিকার-স্বীকার ও সমর্থন, এক বর্ণের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদান ইত্যাদি সামাজিক সমুন্নতি-সাধনের কার্য্য কেবল সন্ন্যাসীর নহে—সঙ্ঘের গৃহী-ভক্তগণেরই সর্ব্বাগ্রে পালনীয়। কিন্তু,

দুঃখের বিষয় তাঁহারা স্বামিজীকে যে পরিমাণ ভক্তি করেন, তাঁহার উপদেশ পালনে সে পরিমাণ আগ্রহ প্রদর্শন করেন না। অনেকে অনাবশ্যক দৈন্যবশতঃ মনে করেন, স্বামিজীর উদার আবেগময়ী উপদেশ,—দীন-দরিদ্র পদদলিতের উদ্ধার সাধনের সকাতর মিনতি, কেবল সন্ন্যাসীর জন্য—গৃহীর জন্য নহে। এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার আবশ্যক হইয়াছে। গৃহীদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে, তাঁহাদিগকেই দেশাচার লোকাচারের ক্ষুদ্র গণ্ডির বাহিরে আসিয়া স্বামিজীর ঈপ্সিত 'এক মহাবলশালী সমাজের সৃষ্টি' করিতে হইবে, যাহা আচণ্ডাল সর্ব্বজাতি এমন কি ম্লেচ্ছাদি বাহ্যজাতিকেও কুক্ষিগত করিয়া সনাতন-ধর্ম্মের আদর্শ রক্ষার জন্য সমষ্টিশক্তির পীঠভূমিতে পরিণত হইবে।

বহু শতাব্দীর সুপ্তিশয্যা হইতে পুনরুত্থিত ভারতবর্ষের সেবা, সজ্ঞানে ও সচেতন ভাবে কে বা কাহারা করিবেন? "যে কেহ ইহাতে বিশ্বাস করিবে সেই প্রভুর কৃপায় মহাবীর্য্য ও ওজস্বিতা লাভ করিবে"—স্বামিজীর এই আশীর্ব্বাণী যে উচ্চ নীচ, গৃহী সন্ন্যাসী নির্ব্বিশেষে সকলকেই আহ্বান করিতেছে। বন্ধুগণ, আসুন আমরা সকলে প্রস্তুত হই। মুহূর্ত্তের ইন্দ্রজাল দ্বারা সহজে এই কার্য্য সাধিত হইবে না। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই দুঃসাধ্য উদ্দেশ্য, নিষ্ঠাপূত শ্রদ্ধার সহিত বহন করিবার যে শক্তি, ত্যাগ ও তপস্যার দ্বারা গুরু-নির্দ্দিষ্ট উপায়ে আমরা তাহা অর্জ্জন করিব। এই মহাসম্মেলন আমাদের সমস্ত বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত সামর্থ্য ও অধ্যবসায়কে যে ঐক্যের মধ্যে ডাক দিয়াছে, সে আহ্বান আজ যদি আমাদের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিয়া থাকে, তবেই আমরা ধন্য হইলাম। ধন্য হইলাম—কেন না নিজের অপূর্ণতার দুঃখ, তুচ্ছতার গ্লানি সকলের মিলন-সলিলে ধুইয়া নির্ম্মল হইলাম। সেই নির্ম্মল হৃদয়, মন ও বুদ্ধিকে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে নিবেদন করিয়া দিয়া, আমরা যদি একত্রে নর-নারায়ণের মন্দির-দ্বারে জীবনের অর্ঘ্যহস্তে দাঁড়াই, তবেই শুনিব "নবীন ভারতের ত্রৈলোক্য-কম্পনকারী উদ্বোধনধ্বনি—ওয়াহ গুরুজিকী ফতে।"

কথাপ্রসঙ্গে

মহাসম্মেলন

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের মহাসম্মেলন সমাপ্ত। এই ধর্ম্মাধিবেশনে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ধর্ম্মাদর্শের আলোচন ও তাহার বাস্তবজীবনে পরিণতির উপায় চিন্তিত হইয়াছে। শ্রীবিবেকানন্দের ধর্ম্ম ছিল বেদান্ত, এই সহানুভূতি পূর্ণ অপূর্ব্ব ধর্ম্ম তাঁহার মত বিশ্ব-প্রেমিকেরই উপযুক্ত। ইতিহাস প্রমাণ করে উক্ত শব্দটি অপরাপর ধর্ম্মে কেবল কথার কথা। ইহার সার্থকতা দৃষ্ট হয় কেবল বেদান্তে,—যে শাস্ত্র বলেন পাপ, পাপী বা পতিত বলিয়া কিছু নাই—ঐ সকল নির্ব্বাণের পথে বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। অতি বড় ধার্ম্মিকও হয় ত একটা বিশেষ অবস্থায় দাড়াইয়া, প্রাপ্ত চরম সত্যের কিঞ্চিৎ আভাসকে ভিত্তি করিয়া জগৎ গড়িতে যাইতেছেন—কিন্তু তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন, কাল আর একটা অভিজ্ঞতা আসিয়া তাঁহার বর্ত্তমান আদর্শের স্থান অধিকার করিবে, তখন পূর্ব্ব জ্ঞান্ গরিমার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে লজ্জিত হইতে হইবে।

যদি প্রত্যেক ব্যক্তির আদর্শ বিভিন্ন হয় আর যদি প্রতি আদর্শই জলধারার ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল, তাহা হইলে কোন্ সাগরের আনন্দনীরে সকল ধর্ম্ম-নদীর সঙ্গম হইবে। প্রত্যেক-বুদ্ধের ন্যায় মাত্র আত্মসিদ্ধিই কি আমাদের উদ্দেশ্য ? জগতের সুখ দুঃখে একটুও বেদনা অনুভব না করিয়া আত্মতৃপ্তির হোমানলে দয়াকেও কি 'স্বাহা' করিয়া দিতে হইবে ? —অসম্ভব। কেবল ব্যক্তিত্ব লইয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। অসহায় শিশু মাতৃস্তন্যে যে বাহ্য প্রকৃতির সহানুভূতি পাইয়াছে, তাহা তাহাকে পরিশোধ করিতেই হইবে। তুমি নিজের দোষ যেমন ক্ষমা করিয়া থাক অপরের দোষকেও তেমনি ক্ষমা করিতে শিক্ষা কর।

জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভের চেষ্টার ফল সমাজ এবং মৃত্যুর পরপারে অজ্ঞাত রাজ্যে সন্ধানের ফল ধর্ম্ম। প্রতি সমাজই মনে

করিতেছে তাহারই একমাত্র বাঁচিবার অধিকার আর সব ধ্বংস হউক। ঠিক ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তাহাই। সবল দুর্ব্বলের খরচায় নিজেদের পুষ্টি সাধন করিতে চায়—মূক, বেদনা জানাইতে অক্ষম, অক্লান্ত কর্ম্মীর দিক হইতে সমাজও কখনো বিচার করে নাই, ধর্ম্মও কখনো বিচার করে নাই। নীরব কর্ম্মই তাহাদের উদ্দেশ্যহীন সাধনার সমাপ্তি। তবে মাঝে মাঝে দুই চারিটি জীবদুঃখে বিগলিত হৃদয় অতি-মানব যুগান্তরে উদিত হন ও অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বীয় বাহুবলে অধিকার করিয়া আচণ্ডালে তাহা বিতরণ করেন। সে পর্য্যায়ে কয়েকটি নাম মাত্র আমরা উল্লেখ করিতে পারি—রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, শঙ্কর—ইহাদের ধর্ম্ম ছিল বেদান্ত, কিন্তু প্রচার করিয়াছিলেন তাহার একদেশ। আর, আজ সেই সর্ব্বাদর্শের পূর্ণ প্রকট আমরা দেখিতে পাই—রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দে।

শ্রীরামকৃষ্ণ, মানব মনের ব্রহ্মসঙ্গমে সহস্রমুখী ভাবধারার ঐক্য-স্থান জ্ঞানগঙ্গার সন্ধান পাইয়া বলিয়াছিলেন—'যত মত তত পথ।' ঈশ্বর হইতেই সব ধর্ম্ম উঠিয়াছে তাঁহাতেই সব শেষ হইয়াছে। ধর্ম্ম অনুভূতির বস্তু। স্থিতপ্রজ্ঞের ভাষা রূপের মধ্য দিয়া তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দেয়। সম্প্রদায় সমাজ বা মতবাদ তাহা বুঝিতে খানিক সাহায্য করে, তাহারা উপায় মাত্র—উদ্দেশ্য নহে। উপায় যখন উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায় তখন 'লেন দেনের' কারবার উপস্থিত হইয়া ধর্ম্ম ব্যবসায়ে পরিণত হয়। সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরুগণ স্বামিজীর এই কয়েকটি কথা প্রণিধান করিবেন—

"Will a majority of votes make men more religious, or a minority less spiritual? Religion is the relation between one's soul and God It lies in realisation, not in words, or in the reading of books, or in gaining religious bodies or in the performance of drill-like rituals. All this is militarism or mercantilism of religion, not religion itself" ধর্ম্ম অর্থে ঈশ্বর ও জীবে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন—সেখানে

সমাজ বা দলের স্থান কোথায়? অষ্ট পাশ মুক্ত হইয়া সত্যকে ধরিয়া থাকাই ধর্ম্ম। ব্যক্তিগত মতের উপর কাহারও আধ্যাত্মিকতা নির্ভর করে না। সব সময় লোকমত মানিয়া ধর্ম্ম করিতে গেলে সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। কেহ কাহারও সব দিকের খবর জানে না, অবস্থা ও মনের ভাব অবগত না হইয়া ভাসমান কতকগুলি অভিজ্ঞতা হইতে লোকে মতামত প্রকাশ করিয়া থাকে। উহার কোনও মূল্য নাই। এই জন্যই সত্য রাজ্যের পথিক ক্রুশে বিদ্ধ হন।

সেই জন্য কাহারও বিশ্বাস নষ্ট করা উচিত নয়। পার ত তাহাকে সাহায্য কর। ঠিক তাহার মত হইয়া তাহার স্থানে দাঁড়াইয়া তাহাকে সত্য পথ দেখাও। তোমার মতবাদের বোঝা তাহার ঘাড়ের উপর চাপাইয়া তাহাকে পিষিয়া মারিও না। হিরণ্যকশিপু-প্রচারকেরা প্রহ্লাদকে মারিয়া ফেলিয়া নিজের মত ঠিক রাখিতে চাহেন। এইরূপ প্রচারকের দ্বারা জগতের কল্যাণ কখনও হয় নাই—উৎপীড়নই হইয়াছে। অতএব স্মরণ রাখিতে হইবে, ধর্ম্মে বিরোধ নাই, তাহারা স্বারাজ্য-নগরে উপস্থিত হইবার বিভিন্ন অবস্থা। ঈশ্বরেচ্ছায় আরও অসংখ্য ধর্ম্মমত জগতে আসিবে, তাঁহার ভাবের অনন্ত খেলা এখনও শেষ হয় নাই।

এই উদার ভাবকে ভিত্তি করিয়াই স্বামী বিবেকানন্দের সংঘ স্থাপন এবং এই 'অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়ের' রক্ষা ও স্থিতি কল্পে বর্ত্তমান মহা-সম্মেলন এবং শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের সতর্ককারী অভিভাষণ।

*　*　*　*

*　*　*　*

পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দের অভিভাষণ

বিগত ১লা এপ্রিল বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে মহাসম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ তাঁহার নাতিদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করেন। অভিভাষণের প্রথমেই তিনি বলেন, "যখনই কোন নূতন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, তখনই

দেখা যায়, সমাজ এবং সমগ্র মানব জাতি উহার মূল তত্ত্বগুলি মানিয়া লইবার পূর্ব্বে প্রথমে লোকে উহার বিরুদ্ধে দাড়ায়, শেষে তৎসম্বন্ধে উদাসীনতা অবলম্বন করে। * * এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের শেষে সর্ব্ব সাধারণের সম্মতিক্রমে উহা সমাজে পরিগৃহীত হইয়া থাকে আর এইরূপে সমাজে পরিগৃহীত ও আদৃত হইবার উপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হওয়াতে তখন দলে দলে উহাতে লোক প্রবেশ করিতে থাকে।”

ইতিহাস আলোচনা করিয়া তিনি দেখান যে, এই ‘মিশন’ প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় এবং কিছুকাল পর পর্য্যন্ত মানবের চিরাচরিত অন্ধ-ধর্ম্ম-বিশ্বাস ইহার অগ্রগমনের কিরূপ বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল, এই ক্ষীণবপু ভাব-প্রবাহের গতি-পথে বিশাল বিরাট অচলায়তনের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে কিরূপ প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতিহত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিল, এবং কিরূপে ইহা ধীরে নিভৃতে শক্তি সঞ্চয় পূর্ব্বক তটাবগাহী জাহ্নবী সম্মুখে ঐরাবতের ন্যায় সমস্ত বাধা বিপত্তি চূর্ণ বিচূর্ণ এবং পৃথিবীর যাবতীয় বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ ভাব সমূহকে আত্মস্থ ও একাঙ্গীভূত করিয়া নিজ আদর্শাভিমুখে অপ্রতিহত ভাবে আজ ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু, স্বামিজী ইহাও উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই যে, সংগ্রামই সংঘের জীবন, উহাতেই তাহার প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয় এবং সংগ্রামের অবসানে বৃথা আত্মগরিমা ও কর্ম্মহীনতা আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। এই সাধারণ-সত্যের উপর নির্ভর করিয়া স্বামী সারদানন্দ আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন জন্ম হইতে পারি-পার্শ্বিক অবস্থার সহিত অবিরাম যুদ্ধ করিয়া আজ যে নিরাপদ স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আজ যে তাহার ভাবরাশি দিকে দিকে বিস্তার লাভ করিতেছে, এই বিস্তারের ফলে তাহার ভাবের গভীরতা কমিয়া আসিয়াছে কি-না, যৌবনের দীপ্ত উৎসাহ আজ বার্দ্ধক্যের স্থবিরতায় ও নামযশোলিপ্সায় পর্য্যবেশিত হইয়াছে কি-না। তিনি বলিয়াছেন, “বিগত ত্রিশবর্ষ ধরিয়া আমাদের মিশন যেরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছে, ইহা ভাবিতে গেলে যদিও আশ্চর্য্য হইতে হয়, ঐ সঙ্গে সঙ্গে গভীর-

ভাবে এ প্রশ্নটিও আপনাআপনি আসিয়া পড়ে যে, এই বিস্তারের ফলে কি আমাদের আন্দোলনের প্রথমাবস্থায় যে প্রবল ত্যাগের ভাব ও আদর্শের উপর প্রবল অনুরাগ ছিল, তাহা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, অথবা যে কার্য্য আমরা প্রথমে আদর্শের উপর তীব্র অনুরাগবশে ঐ আদর্শের জয় ঘোষণার জন্য করিতাম, তাহা বর্ত্তমানে আমাদের নামযশোলিপ্সা, ক্ষমতাপ্রিয়তা ও নিজ নিজ পদ গৌরবের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি বশতঃ দাসত্ব ও বন্ধনে পরিণত হইয়াছে।” যদি ঐরূপ হইয়াই থাকে তাহা হইলে এই স্বাভাবিক বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায় কি? স্বামী সারদানন্দজী তাহারও ইঙ্গিত করিয়াছেন, “আদর্শটিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাক, কারণ, সেই আদর্শের ভিতরেই প্রত্যেক আন্দোলনের সঞ্চিত শক্তি—কুণ্ডলিনী নিহিত থাকে।” সাধকের কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইলে সিদ্ধি যেরূপ তাহার করতলগত হয় তদ্রূপ কোন সংঘের আদর্শবিশেষ যদি উহার সভ্যগণের হৃদয়ে সদা জাগরূক থাকে তাহা হইলে সেই সংঘের সাধনা চিরদিন সাফল্যকেই বরণ করে। যদি সংঘের কোন অঙ্গ ক্ষণ কালের জন্য নিজ উদ্দেশ্য হারাইয়া ফেলে, পথ ভুলিয়া যায়, আদর্শের উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ একদিন না একদিন তাহাকে পথ প্রদর্শন করিবেই। আদর্শের কষ্টিপাথরে নিজের জীবন ঘষিয়া লও, তাহা হইলে উহার মধ্যে কতখানি খাদ আছে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে এবং সাধনা, ত্যাগ ও তপস্যার আগুনে পোড়াইয়া পুনরায় উহাকে খাঁটি করিয়া লইতে সক্ষম হইবে। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে আর একটি গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন:—“যদি আমরা তাঁহাদের (শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীস্বামিজীর) কার্য্য করিতে অন্য ভাব লইয়া অগ্রসর হই, এবং তাঁহাদের কার্য্য করিতে নির্ব্বাচিত হইয়া এতদিন উহা করিতে পারিয়াছি বলিয়া যদি আমরা অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠি, তবে আমরা—সেই কর্ম্মক্ষেত্র হইতে একেবারে অপসারিত হইয়াছি এবং আমাদের স্থানে কার্য্য করিবার জন্য অপরে নির্ব্বাচিত হইয়াছে—দেখিয়া শীঘ্রই আমাদিগকে শোকের

অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইবে।' প্রত্যেকেরই জীবনে এমন একটা সময় আসা খুবই স্বাভাবিক যখন সে পথকেই লক্ষ্য বলিয়া ভ্রম করিতে পারে। আমরা শ্রীভগবানের দাস। আমাদিগকে ধন্য করিবার জন্য তিনি তাঁহার কাজ আমাদের দ্বারা করাইয়া লইতেছেন, আমরা তাঁহার কাজ করিবার অধিকার পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি, অপরেও ঐরূপে কৃতার্থ হউক—এই ভাব যতদিন আমাদের থাকিবে ততদিন জগতে খুব বড় বড় কাজ করিয়াছি ভাবিয়া আমাদের অহঙ্কৃত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না, বা অন্যকেও ঐরূপ করিতে দেখিলে আমরা 'শোকের অশ্রু বিসর্জ্জন' করিব না। আমরা যেন সংঘের স্রষ্টা ও আদিগুরু স্বামী বিবেকানন্দের সেই কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখি,—'প্রভু ইচ্ছা করিলে তাঁহার কাজের জন্য আমার মত লক্ষ লক্ষ বিবেকানন্দ তৈরী করিতে পারেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যপ্রণালী অধিকতর শৃঙ্খলিত এবং ইহার অঙ্গগণের মধ্যে পরস্পরের একপ্রাণতা দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য এই মঠ ও মিশনের মহাসম্মেলন—ইতিহাসে কিছু নূতন নহে। অতি প্রাচীনকালে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ ও মহম্মদের শিষ্যগণ স্বস্ব সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে সময়ে সময়ে এইরূপ সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহাদের মধ্যে উদ্দেশ্যের যে একতানতা সাধিত হইয়াছিল তাহা তত্তৎ সম্প্রদায়বিশেষকে অবনতি হইতে বহু দিন রক্ষা করিয়াছিল। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের এই মহাসম্মেলন, যদি ইহার প্রত্যেক অঙ্গের হৃদয়ে লক্ষ্যের উপর একান্ত অনুরাগ ও পরস্পরের মধ্যে অকপট প্রীতির ভাব অধিকতর বর্দ্ধিত করিতে পারে তবে এই সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হইল—বলিতে পারা যায়। বাল্যকালের সেই "একোদর ভিন্নগ্রীবা" নামক গল্পটি আমরা সকলকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি। একটি পক্ষীর দুইটি মুখ ছিল। একটি মুখ অন্য মুখের সহিত কলহ করিয়া তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য বিষ পান করিল—ফলে ঘটিল সেই পক্ষীর মৃত্যু। সংঘের উদ্দেশ্য ও অঙ্গগণের জীবনাদর্শ যদি পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া

চলে তবে মৃত্যুর হাত হইতে উভয়েই পরিত্রাণ পাইবে, নতুবা সভ্যগণকে নিজের ও সংঘের সমাধিমন্দির নিজের হাতেই রচনা করিতে হইবে, ইহা যেন আমাদের মনে থাকে। ইহারই বিষয় উল্লেখ করিয়া আচার্য্য স্বামী সারদানন্দ উপসংহারে বলিয়াছেন,—"স্মরণ রাখিও—এইরূপেই আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী সংঘ সমূহের উন্নতি সাধনের চেষ্টা হইয়াছিল—আমরাও সেই প্রাচীন, বারম্বার পরীক্ষিত পথে ভ্রমণ করিবার জন্যই তোমাদিগকে অহ্বান করিতেছি। * * * সুতরাং এই কার্য্যপ্রণালী কিছু নূতন নহে—কিন্তু যাঁহারা এক্ষণে নিজেদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইহা প্রয়োগ করিতে যাইতেছেন, তাঁহাদের অকপটতা ও লক্ষ্যের একতানতার উপরই এই প্রণালী প্রয়োগের সফলতা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। অতএব তোমরা স্বেচ্ছায় যে কার্য্যসাধনে উদ্যোগী হইয়াছ, তাহা শ্রীপ্রভুর কৃপায় যতদিন না সমাপ্ত হইতেছে, ততদিন প্রাণপণে খাটিতে থাক—আমাদের নেতা আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় 'উঠো, জাগো, যতদিন না লক্ষ্যে পঁহুছিতেছ, ততদিন অনলস ভাবে অগ্রসর হইতে থাক' এই কথাগুলি বলিয়া আমি তোমাদের প্রত্যেককে উহাতে নিযুক্ত হইতে আহ্বান করিতেছি।"

পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দের অভিভাষণ

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দের অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন-মহাসম্মেলনের সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ তাঁহার অভিভাষণ স্বামী পরমানন্দকে পড়িবার জন্য আদেশ করিলে তিনি অতি মধুর কণ্ঠে সমবেত প্রতিনিধিবর্গের সম্মুখে তাহা পাঠ করেন। ভারত ও ভারতেতর দেশের প্রতিনিধিগণকে সাদরে আহ্বান করিয়া পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজী তাঁহার অভিভাষণের প্রথমেই বলেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস—এই মহাসম্মেলনে তোমরা যে সকল বিভিন্ন আশ্রমের প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছ, সেই আশ্রম সমূহ হইতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কার্য্যাবলী সম্বন্ধে পরস্পরকে পরিচিত করিতে ও পরস্পরের ভাবের আদান প্রদান করিয়া নিজ নিজ আশ্রমের কার্য্যাবলীর পুষ্টিসাধনে সমর্থ হইবে আর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে কয়েকজন

সাক্ষাৎ শিষ্য এখনও স্থূলশরীরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাঁহাদের মুখ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজ জীবনে যে আধ্যাত্মিক আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহাও শুনিতে পাইবে—ঐ আদর্শের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইবার ফলে ঐ সংঘের মধ্যে যে উদ্দেশ্যের একতানতা, সাহচর্য্য ও সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন—তাহা দিন দিন বর্দ্ধিত হইবার অনেক পরিমাণে সহায়তা করিবে।” তারপর, কোন্ কোন্ বিশেষ শক্তিপ্রভাবে আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টি এক অপূর্ব্ব নবীন দিব্য জগৎ দেখিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং কি কি উচ্চতম শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বামিজী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি সংক্ষেপে বলেন, “১ তাঁহার শ্রীগুরুর তাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী, (২) তাঁহার নিজের বহুবর্ষব্যাপী শিক্ষা ও কঠোর সাধন, এবং তল্লব্ধ উপলব্ধি সমূহ, (৩) তাঁহার পাশ্চাত্য দর্শন ও ইতিহাসে এবং সংস্কৃত শাস্ত্র-গ্রন্থে তুল্য ব্যুৎপত্তি, ৪ শ্রীগুরুর অলৌকিক জীবনের অহরহঃ অনুধ্যান এবং উহার দিব্যালোকে ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যাসমূহের সমাধান ও শাস্ত্র সমূহের সত্যতা প্রত্যক্ষীকরণ, এবং ৫) নিজ মাতৃভূমির সর্ব্বত্র ভ্রমণের ফলে প্রাচীন ভারতের সহিত বর্ত্তমান ভারতের তুলনা—বর্ত্তমান ভারতের নরনারী কিরূপে জীবন যাপন করে, তাহাদের আচার ব্যবহার, তাহাদের বিশ্বাস, তাহাদের অভাব, তাহাদের চিন্তাপ্রণালী তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ।” স্বামিজী কঠোর সাধনা সহায়ে শাস্ত্রনিহিত যে সনাতন সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তদীয় শ্রীগুরুদেবে যাহার মূর্ত্ত প্রকাশ দেখিয়াছিলেন সেই পরম ও চরম সত্যের দিকে মানবসাধারণকে অগ্রসর করাইবার যন্ত্রস্বরূপে তিনি এই ‘মিশন’ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। স্থূলবুদ্ধি মানবকে স্থূল শিক্ষা দানে ক্রমশঃ সূক্ষ্মে লইয়া যাইতে হয়, তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে জলপান করাইয়া আধ্যাত্মিক উপদেশ দিলে তাহার ভবিষ্যতে অমৃতত্ব লাভের সম্ভাবনা থাকে নতুবা ভবযন্ত্রণার নিবৃত্তি হওয়া দূরের কথা পিপাসার কষ্টও লাঘব হয় না, তাই স্বামী বিবেকানন্দ এই বুভুক্ষিত ও অশিক্ষিত ভারতবাসীর অন্ন ও শিক্ষা সমস্যা সমাধানের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘে

একটি কর্ম্মবিভাগ স্থাপন করিয়াছেন—তাহাই 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন।' এই 'মিশনের' সহিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার ও ভারতীয় বিভিন্ন শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের অচ্ছেদ্য যোগসূত্র রহিয়াছে তাহা না বুঝিয়া অনেকেই বলিয়া থাকেন, 'ধর্ম্মের সহিত কর্ম্মের সামঞ্জস্য হয় না—সংসারই যদি ছাড়িলে তবে আবার ঘর বাড়ী বাঁধিয়া এত কর্ম্মকাণ্ডের অভিনয় করিতেছ কেন?' প্রাত্যহিক জীবন ও সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সহিত ধর্ম্মকে নিঃশেষে ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই অধিকাংশ লোক ধর্ম্মহীন পশু-জীবন যাপন করে, কিন্তু ধ্যান ধারণার মত নিত্য অনুষ্ঠিত কর্ম্মকেও ভগবৎ কৃপালাভের সাধনাস্বরূপ গ্রহণ করা যায়, ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত হইয়া কর্ম্ম করিলে তদ্দারা চিত্তশুদ্ধি হয় গীতার এই ধর্ম্মকর্ম্মসমুচ্চয় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য স্বামিজী শ্রীরামকৃষ্ণ 'মঠের' সহিত 'মিশন'কেও অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত করিয়াছেন। এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া পূজ্যপাদ সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন, "লোকে ভাবিতেছে, বেদান্তের উচ্চতম উপদেশের সহিত কর্ম্মের সমন্বয় একেবারে হইতেই পারে না কর্ম্ম ও উপাসনা—ত্যাগ ও সেবাধর্ম্মের ভিতর একটা আকাশ পাতাল ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে, আর এই ভ্রান্ত ধারণার ফলেই প্রধানতঃ আমাদের জাতীয় অবনতি ঘটিয়াছে * * * শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণ স্বামিজীকে তাঁহার জীবন ও উপদেশের ব্যাখ্যাতারূপে স্বীকার করিলে ধ্যান ধারণা সহায়ে ইহ জীবনেই ভগবৎ সাক্ষাৎকার প্রয়াসী সাধকগণ যে কার্য্যগুলিকে তাঁহাদের জীবন যাত্রা প্রণালীর সম্পূর্ণ বহির্ভূত বলিয়া মনে করেন, এতদিন যে কার্য্যাবলী সাংসারিক কার্য্যমাত্র বলিয়াই বিবেচিত হইত, সেই ভাবের কার্য্য তাঁহাদিগকেও অবশ্যই অবলম্বন করিতে হইবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এখানে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত—এই আপাতবিরোধী বিভিন্ন প্রকারের তিনটি সাধনা পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মঠের অঙ্গগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন,—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই ত্রিবিধ দার্শনিক তত্ত্ব এক অনন্ত

ব্রহ্মসত্তারই ত্রিবিধ বিভিন্ন অনুভূতি মাত্র, শুধু তাহাই নহে, যে-কোন সাধকের জীবনে এই ত্রিবিধ বিভিন্নভাব বিভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইতে পারে. ইহার যে-কোন একটি ভাবকে বর্জ্জন করিলে ধর্ম্মের অঙ্গহানি এবং ধর্ম্মজীবন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় তাই শ্রীস্বামিজী সর্ব্বমত ও সর্ব্বভাবের সামঞ্জস্য ভূমিরূপে এই মঠ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তানগণ তৎপ্রদর্শিত সাধনাবলম্বনে অনন্ত ব্রহ্মসত্তার ত্রিবিধ বিভিন্ন ভাবকে নিজ জীবনে উপলব্ধি পূর্ব্বক মানবসাধারণকে ঐ ভাবে ভাবিত হইবার জন্য সহায়তা করিবে। স্বামিজী জানিতেন, 'যদি কর্ম্মের ভিতর ধর্ম্মভাবের প্রেরণা না থাকে, যদি ঐ সঙ্গে ধ্যান ধারণা, সদসদ্বিচার ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধন অনুষ্ঠিত না হয়, তবে ঐ কর্ম্ম প্রাণহীন সমাজ সেবা কার্য্যে পর্য্যবসিত হয়, সেইরূপ কেবল বিচার ও শাস্ত্রচর্চ্চা শুষ্ক অসার বুদ্ধির ব্যায়ামে মাত্র পরিণত হয়, যদি না তজ্জনিত সিদ্ধান্ত সমূহ কর্ম্মজীবনে প্রকাশ পায়। সেইরূপ যদি ভক্তির সহিত বিচার ও কর্ম্মের যোগ না থাকে, তবে উহা নিরর্থক ও অনেক সময় মহা অনিষ্টকর ভাবুকতা মাত্রে পর্য্যবসিত হয়।' তাই তাঁহার মতে তিনিই আদর্শ সন্ন্যাসী, যিনি যখন ইচ্ছা, গভীর ধ্যানে-নিমগ্ন হইতে সমর্থ হইবেন, আবার পরমুহূর্ত্তে শাস্ত্রের জটিল অংশের ব্যাখ্যা করিতে প্রস্তুত হইবেন। সেই সন্ন্যাসীই আবার সমান উৎসাহে বাগানের কাজ করিবেন এবং তদুৎপন্ন দ্রব্য মাথায় লইয়া বাজারে গিয়া বিক্রয় করিবেন।

অনেকের ধারণা আছে, 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন' অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ন্যায় আর একটি সম্প্রদায় মাত্র ; সমাজের সহিত ইহার কোন যোগসূত্র নাই, সমাজ সংস্কারের দিকে ইহার মোটেই লক্ষ্য নাই। পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ এই ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্য তাঁহার অভিভাষণের এক স্থানে বলিয়াছেন, "এক দিকে (মঠে) যেমন ধ্যান ধারণা, অধ্যয়ন-অধ্যাপনার স্থান আছে, অপর দিকে সমাজ সেবারও তদ্রূপ স্থান আছে।" কিন্তু মনে রাখা উচিত—এই সমাজ সেবা ধ্বংসমূলক নহে, গঠনমূলক-ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। তাহাও

আবার কেবল সমাজ সেবার জন্যই অনুষ্ঠিত হয় না—ধর্ম্মোপলব্ধির অন্যতম সাধনারূপে পরিগৃহীত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কোন রাষ্ট্রীয় সমিতির ন্যায় কেবল আইন কানুন, আদেশ ও আজ্ঞাবহতারূপ কঠোর নীতির (Policy) উপর সংস্থাপিত নহে। যদি ভবিষ্যতে তাহা হয় তবে এই সংঘরূপ মহামহীরুহের নবকিশলয়দল নীতির Policy তাপে শুকাইয়া একদিন ঝরিয়া পড়িবে। এই বিপদ হইতে সতর্ক থাকিবার জন্য সংঘের পিতৃতুল্য স্বামী শিবানন্দজী তাঁহার সন্তানগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "সমগ্র মঠের ভিতর অধ্যক্ষ ও সেবকগণের মধ্যে প্রগাঢ় প্রীতির সম্বন্ধ থাকা উচিত। সেবকগণের উচিত সর্ব্বদা অধ্যক্ষগণের আদেশ পালনে প্রাণপণে প্রস্তুত থাকা, তদ্রূপ অধ্যক্ষগণ যেন প্রাণে প্রাণে বুঝেন, আমরা অধ্যক্ষ নহি, আমরা এই সেবকগণের কর্ম্মিগণের সেবকমাত্র, তাহাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। * * * প্রীতি, উদারতা, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতাই আমাদের সংঘের ভিত্তি। যদি স্বার্থপরতা ইহার মজ্জায় প্রবেশ করে তবে মানুষের প্রণীত আইন কানুনে ইহাকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।"

পূজ্যপাদ সভাপতি মহাশয় তাঁহার দীর্ঘ অভিভাষণে এমন অনেক অমূল্য কথা বলিয়াছেন যাহা আমরা বিস্মৃত না হইলে ভবিষ্যতে অনেক বিপদ হইতে সংঘকে রক্ষা করিবে।

সংঘ-বার্ত্তা

মহাসম্মেলনের কার্য্য-বিবরণী

শ্রীভগবানের কৃপায় এবং শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দের আন্তরিক চেষ্টায় ও বেলুড় মঠের অন্যান্য সাধুবৃন্দের বিশেষ সহযোগিতায় বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহাসম্মেলন আশাতীতরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে একটি বিরাট দরবারী টেণ্টের নিম্নে মহা-

সম্মেলনের অধিবেশন স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। পত্রপুষ্পে সুশোভিত ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের এবং আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ ও পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দের আলেখ্যত্রয় যেন মূর্ত্ত হইয়া মহাসম্মেলনের উদ্দেশ্য সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য সকলকে শুভাশীর্ব্বাদ করিতেছিলেন। সম্মুখে উপবিষ্ট পূতশান্ত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণকে দেখিয়া মনে হইতেছিল—সংঘের মঙ্গলকামনায় তাঁহাদের ব্যাকুল হৃদয়ের মৌন মিনতি যেন শ্রীভগবানের চরণে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আত্মনিবেদন করিতেছিল। ব্রহ্মচারী সত্যচৈতন্য কর্ত্তৃক চিত্রিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কার্য্যপ্রসার জ্ঞাপক ভারতের ও ভারতেতর দেশের খণ্ডাংশ লইয়া একটি বৃহৎ মানচিত্র বক্তৃতা মঞ্চের পশ্চাতে প্রলম্বিত হইয়া সকলকে ইহাই স্মরণ করাইয়া দিতেছিল যে, কতিপয় তরুণ যুবককে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া শ্রীভগবান তাঁহার যুগধর্ম্মের বাণী কিরূপ অপ্রতিহতগতিতে ও অভাবনীয়রূপে দেশ-বিদেশে বহন করিতেছেন।

১লা এপ্রিল, ১৮ চৈত্র বৃহস্পতিবার শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে 'শতরুদ্রী যাগ' শেষ হইবার কিয়ৎক্ষণ পরে মহাসম্মেলনের কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রাতে ৭টার সময় পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ, আচার্য্য স্বামী সারদানন্দ মহারাজ, পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দজী প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের প্রাচীন সন্ন্যাসিগণ অধিবেশন-সভায় প্রবেশ করিলে সকলে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গাচার্য্য শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র সেনের সাহচর্য্যে স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ ও স্বামী রামানন্দ উদ্বোধন সংগীত গান করিবার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সম্মেলন-সভাপতি যথারীতি আসন গ্রহণ করিলে প্রথমে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ ইংরাজী ভাষায় লিখিত তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। তৎপরে স্বামী বিজয়ানন্দ উহার বঙ্গানুবাদ পাঠ করিলে মহাসম্মেলনের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের সুদীর্ঘ ইংরাজী অভিভাষণ তাঁহার আদেশে স্বামী পরমানন্দজী পাঠ করেন। স্বামী বিজয়ানন্দ পূর্ব্ববৎ উহার বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর বিভিন্ন কেন্দ্রের উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের মধ্য

সেইজন্য গঙ্গাহীন দেশে থাকিতে চাহিতেন না। তাই বুঝি মা গঙ্গা তাঁহাকে নিজের কোলে টানিয়া লইলেন।

স্বামী শুভানন্দ মহারাজ একজন আদর্শ কর্ম্মী ছিলেন। কাশী সেবাশ্রম তাঁহার নিষ্কাম কর্ম্মের উজ্জ্বল স্মৃতি-স্তম্ভ। আশ্রম-গৃহের প্রত্যেক ইষ্টকফলকে এবং মৃত্তিকার প্রতি রেণুতে স্বামী শুভানন্দের শোণিত বিন্দু মিশিয়া রহিয়াছে এবং চিরকাল তাহা থাকিবে; আশ্রমের মৌন বাথা রুদ্ধকণ্ঠে চিরকাল তাঁহারই জয় ঘোষণা করিবে।

নিষ্কাম কর্ম্ম ব্যতীত স্বামী শুভানন্দের জীবনের অন্য একটি দিক ছিল। যতদিন তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন ততদিন কর্ম্মই ছিল তাঁহার পূজা। পরে, যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন তখন হইতে তিনি নিজেকে সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মকোলাহলের বাহিরে রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। ইদানীং অধিকাংশ সময় তিনি নির্জ্জনে ধ্যান ধারণায় অতিবাহিত করিতেন। জগতের চিরাচরিত কর্ম্ম-প্রণালী হইতে ভারতের কর্ম্ম-কৌশল সম্পূর্ণ পৃথক্। 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্' এই ভগবদ্বাক্য এখানে কর্ম্ম-জীবনের নিয়ামক। এই সনাতন আদর্শ পুরোভাগে রাখিয়া স্বীয় কর্ম্ম-জীবন নিয়ন্ত্রিত করাই স্বামী শুভানন্দের সাধনা ছিল। তাঁহার পুণ্য স্মৃতি দেশের কর্ম্মময় জীবন ও তাহার উদ্দেশ্যের সহিত যোগ-সূত্র স্থাপনে সহায়তা করুক—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

স্বামী সচ্চিদানন্দ

স্বামী শুভানন্দের অকালে শরীর ত্যাগজনিত শোকাবেগ কথঞ্চিৎ উপশম হইতে না হইতেই আর একটি নিদারুণ আঘাত শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডলীর উপর নিপতিত হইয়াছে। অধুনাতন শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ সন্ন্যাসী, স্বামী সচ্চিদানন্দ মহারাজ (বুড়োবাবা) গত ৯ই বৈশাখ প্রাতে ৮—২০ মিনিটের সময় ৮৬ বৎসর বয়ঃক্রমে কাশীধামে শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের চরণে মিলিত হইয়াছেন। তাঁহার সন্ন্যাসি-জীবনের প্রথমাবস্থায় তিনি কিছুকাল পরিব্রাজক ভাবে বিনা সম্বলে ভারতের সর্ব্বত্র পায়ে হাঁটিয়া পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তৎপরে বেলুড় মঠের যাবতীয় কর্ম্ম তত্ত্বাবধান করিবার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইলে দীর্ঘ-

কাল অতি দক্ষতার সহিত তিনি ঐ কার্য্য সম্পাদন করেন। জীবনের শেষ কয়েকবৎসর তিনি কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে বাস করিতেছিলেন। মিশনের তরুণ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ মহারাজ পুত্রাধিক স্নেহ ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং সর্ব্বাবস্থায় তাঁহাদের কঠোর জীবনপথের অগ্রগামী নায়ক ছিলেন। এতাদৃশ প্রবীণ সন্ন্যাসীকে হারাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ সত্যই আজ ক্ষতিগ্রস্ত। শ্রীভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

বিগত ২রা মে, পরম পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ মান্দ্রাজ এবং স্বামী পরমানন্দ, স্বামী দয়ানন্দ ও স্বামী অখিলানন্দ আমেরিকা যাত্রা করিয়াছেন।

* * *

আগামী ৩০শে মে অপরাহ্নে বেলুড় মঠে বুদ্ধোৎসব হইবে। সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্ভব কি ?

যে সময় বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন মহাসম্মিলনের অধিবেশন হইতেছিল ঠিক সেই সময় কলিকাতায় হিন্দু ও মুসলমানের দাঙ্গাও চলিতেছিল, তাই কোন কোন বন্ধু আমাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—'মিশন' এই ব্যাপারে হিন্দুদের পক্ষে যোগদান করেন নাই কেন? তাঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিবার জন্য আমরা বলিতে চাই,—হিন্দু ও মুসলমানগণ বর্ত্তমানে যে উপায়ে শান্তি আনয়নের চেষ্টা করিতেছে, ঐরূপ হানাহানি কাটাকাটি করিয়া অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে শান্তি কখনও আসা সম্ভব কি না—ইহার আলোচনা করিলে আমাদের মনে হয় যে, রক্তপাত দ্বারা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়া কখনও মানসিক

শান্তি আসিতে পারে না, এবং মানসিক শান্তি না আসিলে বাহিরের শান্তিও আশা করা যায় না। আশা করা যায় না বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকাও যে ভাল তাহাও আমরা বলিতেছি না। আমরা জানি যে, এই সংগ্রামপরায়ণ উভয় সম্প্রদায়ের সম্মুখে সসস্ত্র আমাদের অগ্রসর হইতেই হইবে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-বাহিনী যে দেবসেনানীর অঙ্গুলী সঞ্চালনে পরিচালিত তাঁহার অস্ত্র হইতেছে—পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মমত বা পথ সমভাবে সত্য এই বিষয়ের দৃঢ় ধারণা ও প্রচার, এবং রাগদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকল ধর্ম্মমতাবলম্বীদিগের প্রতি হৃদয়ের সহানুভূতি ও প্রেম, এই অস্ত্রে সজ্জিত করিয়া তিনি তাঁহার বাহিনীকে কর্ম্মের আহবে প্রেরণ করিয়াছেন। দৃঢ় হস্তে ঐ উভয় অস্ত্র ধরিয়া উদ্দেশ্য সাধনার জন্য তাহারা লড়িয়া মরিবে, ফলাফল প্রভুই বলিতে পারেন।

সকল ধর্ম্মের সত্যতায় দৃঢ় বিশ্বাস না হইলে বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের প্রতি প্রেম জন্মিতে পারে না এবং প্রেম না জন্মিলে ভালবাসায় কাহাকেও বুকভরা আলিঙ্গন দিতে পারা যায় না। প্রেমেই একত্ব আসিয়া দ্বৈতবোধের নাশ করে এবং দ্বৈতবোধ নষ্ট হইলে ভয় হিংসা দ্বেষ চিরতরে অপসারিত হয়, তখনই—কেবল তখনই ঐক্য আসিতে পারে, তৎপূর্ব্বে নহে ইহা আমরা বারংবার বলিয়াছি এবং চিরকাল বলিব। হিন্দু-মুসলমান, শুধু হিন্দু-মুসলমান কেন জগতের যাবতীয় যুযুৎসু সম্প্রদায়ের মধ্যে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি বিরাট্ অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতে চান, এবং আনন্দের বিষয় দেশ-বিদেশে কোন কোন মনীষীর ভিতর ঐরূপ একটা চেষ্টার আভাষও আজ কাল দেখা যাইতেছে কিন্তু, তাঁহাদের সহিত শ্রীভগবানের পদানুগ-আমাদের পার্থক্য এই যে, তাঁহারা গড়িতে চান বাহিরের দিক হইতে আর আমরা গড়িতে চাই ভিতরের দিক হইতে। তাঁহারা ভিতরের আগুন ছাই চাপা দিয়া তদুপরি মিলন-মঞ্চ নির্ম্মাণের প্রয়াসী তাই সময়ে সময়ে উহা ধূমায়িত হইয়া উঠে, আর আমরা—মানবের অন্তর্নিহিত বাড়বানল শ্রীভগবানের অলৌকিক

তপস্যালব্ধ জ্ঞানধারায় নির্ব্বাপিত করিয়া তাহার উপর মতাসমন্বয়ের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক। এই ধ্রুব বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, আমাদের চালক যুগকর্ত্তা ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিতে আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছি এবং এই বিশ্বাসের অমোঘ শক্তি প্রভাবে সমগ্র জগতের ভেদমূলক ভ্রান্ত ধারণাকে আমরা প্রবল ভাবে নাড়া দিতে চাই। যুগাবতার কোন সম্প্রদায় বিশেষ, কোন জাতি বিশেষ বা কোন দেশ বিশেষের জন্য আসেন নাই, তিনি আসিয়াছেন সমগ্র মানবসমষ্টির জন্য। সাধনার অগাধ সিন্ধু মন্থন করিয়া সমন্বয়ের যে সুধাভাণ্ড তিনি তুলিয়াছেন প্রত্যেক ব্যষ্টির এবং প্রত্যেক জাতির তাহাতে সম্পূর্ণ সমান অধিকার আছে, আমরা প্রত্যেককেই উহা গ্রহণ করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি।

আজ কাল জগতের এবং ভারতের যে সমস্ত জটিল সমস্যার উদয় হইয়াছে 'হিন্দু-মুসলমানের মিলন' তাহার অন্যতম। স্বার্থত্যাগ ভিন্ন কোন মহাকার্য্য সাধিত হয় না, তাই এই মহাকার্য্য সাধনের জন্য উভয় সম্প্রদায়ের কর্ম্মিবৃন্দকেই কঠোর ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। এই ত্যাগের মূলে ধ্বংসনীতি থাকিবে না, থাকিবে গঠন নীতি। ভেদের জন্মদাতা অজ্ঞানের মূলোৎপাটন করিবার জন্য যে সাধনার প্রয়োজন সেই অগাধ সাধনসলিলে তাহাদিগকে ডুব দিতে হইবে। জিজ্ঞাসা করি, তাহার জন্য এই উভয় জাতিই কি প্রস্তুত আছ? এই মহামিলনের সাগর তীরে দাঁড়াইয়া তোমরা কি শুধু লহরীই গণিবে, উপলখণ্ডই কুড়াইবে অথবা উহাতে ডুব দিয়া অর্থরত্নে নিজ নিজ চিত্ত ভরিয়া লইবে? যদি তাহা চাও তবে জাতির কল্যাণের জন্য উমানাথ মহেশ্বরের মত কঠোর তপস্যা কর—সিদ্ধি করতলগত হইবে, নতুবা উপলখণ্ড কুড়াইয়াই তোমাদের ঘরে ফিরিতে হইবে এবং সেই তুচ্ছ উপলখণ্ডের অধিকার জন্য তোমরা যে কলহের সৃষ্টি করিবে উহা হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবে কে?

বর্ত্তমানে এই দুই সম্প্রদায় পরস্পর যতই বিবাদ করুক না কেন, কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ইহাদের মিলন একদিন হইবেই হইবে।

পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ এক সময় আমাদের বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর এসেছিলেন, এই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ মিটাবার জন্য। তিনি গোঁড়া হিন্দু হয়েও মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা নিয়ে নমাজ পড়তেন ও সাধন করতেন। কেন জান? এই বিরোধ মিটাবার জন্য। তাই বলি, যতই ঠাকুরের এই উদার ভাব দেশে প্রচার হবে, ততই এই দেশের কল্যাণ। আমাদের জাতীয়তা হিসাবেও মহাকল্যাণ। তিনি আধ্যাত্মিক জগতে সূক্ষ্ম রাজ্যে এই দুই বড় জাতির মিলন করে গেছেন এইবার স্থূল জগতে একদিন না একদিন তার প্রকাশ হবেই, বিশ্বাস কর। তাঁর সকল প্রকার সাধনার ভিতরই একটা গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর এই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণের ভিতর যে মহান উদ্দেশ্য রয়েছে একদিন না একদিন এই অধম পতিত জাতি তা বুঝতে পারবে।"

শ্রীভগবানকে নানা রূপে ও নানা ভাবে দর্শন, আস্বাদন এবং জগতের সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি বিদূরিত করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিভিন্ন সাধনাবলম্বনে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সব ধর্ম্ম মতই সত্য এবং আন্তরিক অনুষ্ঠিত হইলে সব ধর্ম্ম মতের সাহায্যেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, তাই তিনি বলিতেন, "ছাতের উপর উঠ্‌তে হলে মই, বাঁশ, সিঁড়ি ইত্যাদি নানা উপায়ে যেমন উঠা যায়, তেমনি এক ঈশ্বরের কাছে যাবার অনেক উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্ম্মই এক একটি উপায়। ঈশ্বর এক—তাঁর অনন্ত নাম ও অনন্ত ভাব, যার যে নামে ও যে ভাবে ডাকতে ভাল লাগে, সেই নামে ও সেই ভাবে ডাকলে তাঁর দেখা পায়।"

জগতের অগ্রগামী সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ভাব এবং কার্য্যাবলী সেই যুগের অবতার-জীবনে বহু পূর্ব্ব হইতেই আসিয়া দেখা দেয়। কোন যুগের অবতার জীবনকে, তাঁহার আবির্ভাবের ভবিষ্যৎ বহু শত বর্ষের উন্নত চিন্তাধারার এবং কল্যাণ বিধায়ক কর্ম্ম সমূহের ভাণ্ডার ও বীজ স্বরূপ বলা যায়। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে—অধ্যাত্মিক

চরম সত্যের দিক দিয়া যখন হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের মিলন সাধিত হইয়াছে তখন ভবিষ্যতে সেই মিলন স্থূল ভাবে আমরা নিশ্চিত এক দিন দেখিতে পাইব।

হতাশ না হইয়া, ধৈর্য্য ধরিয়া যুগাবতার শ্রীভগবানের বাক্যে ও কার্য্যে আমরণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাঁহার মহাসমন্বয় বাণী নিজ জীবনে উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যক্তিগত ভাবে গভীর সাধনার প্রয়োজন। তাহা হইলে আমরা প্রাণে * প্রাণে বুঝিতে পারিব ভগবান এক, সত্য এক, কিন্তু তাঁহাকে পাইবার পথ অনন্ত, যে যে-পথের পথিক তাহার নিকট সেই পথই শ্রেষ্ঠ; তাঁহার করুণা লাভই জীবনের চরম সার্থকতা এবং উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া মতের বা পথের শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া কলহ করা অজ্ঞতা মাত্র।

শ্রীশ্রীমায়ের কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১২)

মা, বলরাম বাবুর বাড়ীতে ছাতে বসিয়া একদিন ধ্যান করিতে করিতে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। হুঁস আসিতে বলিয়াছিলেন, "দেখলুম, কোথায় চলে গেছি। সেখানে সকলে আমায় কত আদর যত্ন কোরছে। আমার যেন খুব সুন্দর রূপ হয়েছে। ঠাকুর রয়েছেন সেখানে। তাঁর পাশে আমায় আদর কোরে বসালে। সে যে কী আনন্দ বোলতে পারি না। একটু হুঁস হতে দেখি যে, শরীরটা পড়ে রয়েছে। তখন ভাবছি,—কি কোরে এই বিশ্রী শরীরটার ভিতর ঢুকবো? ওটাতে আবার ঢুকতে মোটেই ইচ্ছা হচ্ছিল না। অনেক পরে তবে ওটাতে ঢুকতে পারলুম ও দেহে হুঁস এলো।"

বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাড়ীতে একদিন সন্ধ্যার পর মা, আমি ও গোলাপ দিদি ছাতে পাশাপাশি বসিয়া ধ্যান করিতেছিলাম, আমার ধ্যান শেষ হইলে দেখি, মা তখনও এক ভাবে বসিয়া আছেন—স্পন্দহীন—সমাধিস্থ। অনেকক্ষণ পরে হুঁস আসিলে পর মা বলিতে লাগিলেন, "ও যোগেন, আমার হাত কই পা কই?" আমরা মায়ের হাত ও পা টিপিয়া দেখাইতে লাগিলাম—এই যে পা এই যে হাত তবুও দেহটা যে রয়েছে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মা উহা বুঝিতে পারেন নাই।

বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে এক দিন সকালে ধ্যান করিতে করিতে মায়ের সমাধি হইল। সমাধি কিছুতেই আর ভাঙ্গে না। আমি

অনেকক্ষণ নাম শুনাইলাম, তাহাতেও সমাধি ভাঙ্গিল না। শেষে যোগেন স্বামী আসিয়া নাম শুনাইবার পর, সমাধির একটু উপশম হইলে ঠাকুর সমাধি ভঙ্গের সময় যেরূপ বলিতেন মা সেইরূপেই বলিলেন—"খাব"। কিছু খাবার, জল ও পান তাঁহার সম্মুখে দেওয়া হইলে, ঠাকুর ভাবাবেশে যেরূপে খাইতেন মা সেইরূপে ঐ সকল একটু একটু খাইলেন। পানটি পর্য্যন্ত ঠাকুর যে ভাবে সরু দিকটা কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া খাইতেন মাও ঠিক সেই ভাবে খাইলেন। তখন তাঁহার ভাব ভঙ্গি খাওয়া দাওয়া সবই হুবহু ঠাকুরের মত হইয়াছিল। আমরা দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। ভাব সম্পূর্ণ উপশম হওয়ার পর মা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার উপর ঐ সময় ঠাকুরের আবেশ হইয়াছিল। যোগেন স্বামী মায়ের ঐরূপ ভাবাবস্থার সময় কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া ঠাকুর যেরূপ উত্তর দিতেন ঠিক সেইরূপ উত্তর পাইয়াছিলেন।

ঠাকুরের দেহ রক্ষার কয়েকদিন পরেই রাম দত্ত প্রভৃতি গৃহী ভক্তেরা ভাড়া চুকাইয়া দিয়া কাশীপুরের বাগান বাড়ী হইতে বাসা উঠাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সেইজন্য ঐ ঘটনার চারদিন পরে মাকে দক্ষিণেশ্বরের নহবতের ঘরে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। সঙ্গে গোলাপ দিদি ও বাবুরাম মহারাজের মা তাঁহার সহিত কয়েকদিন থাকিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তাহার পর মা তীর্থ দর্শন মানসে যোগেন মহারাজ, কালী মহারাজ, লাটু মহারাজ, লক্ষ্মী দিদি প্রভৃতির সঙ্গে কাশী আসেন। কাশীতে আট দশ দিন থাকিবার পর বৃন্দাবনে আসিয়া কালাবাবুর কুঞ্জে প্রায় এক বৎসর ছিলেন। ঠাকুরের দেহ যাবার দুই এক সপ্তাহ পূর্ব্বেই আমি বৃন্দাবন গিয়াছিলাম। বৃন্দাবনে আমার সহিত দেখা হইতেই মা শোকাবেগে—"যোগেন গো" বলিয়া আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ঠাকুরের দেহ ত্যাগের পর আমার সহিত তাঁহার এই প্রথম দেখা। বৃন্দাবনে মা প্রথম প্রথম খুব কাঁদিতেন। একদিন ঠাকুর আমাকে দেখা দিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ গা তোমরা এত কাঁদছো কেন? এই তো আমি রয়েছি, গেছি কোথায়? এই যেমন এ ঘর আর ও ঘর।"

বৃন্দাবনে থাকিবার সময় পত্রপুষ্পে সাজাইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে একদিন একটি শবদেহ লইয়া যাইতেছিল। মা উহা দেখিয়া বলিলেন, "দেখ দেখ, মানুষটি কেমন বৃন্দাবন প্রাপ্ত হয়েছেন। আমরা এখানে মর্‌তে এলুম তা একদিন একটু জ্বরও হলো না! কত বয়স হয়ে গেল বল দেখি, আমার বাপকে দেখেছি। ভাশুরকে দেখেছি।" আমরা শুনে হাসি ও বলি, "বল কি মা, বাপকে দেখেছ! বাপকে আবার কে দেখে না?" এমনি ছেলে মানুষের মত কথা মা তখন বলিতেন। প্রথম প্রথম যেমন ঠাকুরের জন্য খুব কাঁদিয়াছিলেন, শেষে কিন্তু ঠাকুর তেমনি আনন্দে মাকে ভোরপুর করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখন মাকে দেখিলে যেন একটি বালিকা বলিয়া মনে হইত। নিত্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঠাকুর দর্শন করিতেন। একদিন রাধারমণ দেখিতে গিয়া মা দেখিয়াছিলেন—যেন নবগোপাল বাবুর স্ত্রী রাধারমণের পাশে দাঁড়াইয়া হাওয়া করিতেছেন। তাই দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া মা আমাকে বলিলেন, "যোগেন, নবগোপালের পরিবার বড় শুদ্ধ। আমি এই রকম দেখলুম।"

বৃন্দাবনে ঠাকুর একদিন মাকে দেখা দিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি যোগেনকে স্বামী যোগানন্দকে এই মন্ত্র দাও।" প্রথম দিন মা ঐ দর্শন মাথার গোলমালে হইয়াছে মনে করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনও ঐরূপ দেখিয়া গ্রাহ্য করেন নাই। তৃতীয় দিন ঐ দর্শন আবার উপস্থিত হইলে মা ঠাকুরকে বলেন, "আমি তার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কই না, কি করে মন্ত্র দিই।"

ঠাকুর বলিলেন, "তুমি মেয়ে-যোগেনকে (আমাকে) বলো, সে থাক্‌বে।"

মা আমার দ্বারা যোগানন্দ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার মন্ত্র হইয়াছে কিনা। যোগানন্দ স্বামী বলিলেন, "না মা, বিশেষ কোন ইষ্ট মন্ত্র ঠাকুর আমায় দেন নাই। আমি নিজের রুচিমত একটি নাম জপ করি।" ঐ কথা জানিয়া মা তাঁহাকে একদিন মন্ত্র দিলেন। ঠাকুরের ছবি ও দেহাবশেষ রক্ষিত কৌটা সম্মুখে রাখিয়া মা পূজা

করিতেছিলেন। তিনি যোগানন্দ স্বামীকে ডাকাইয়া বসিতে বলিলেন। পূজা করিতে করিতে মায়ের ভাবাবেশ হইল, সেই ভাবাবেশেই মা মন্ত্র দিলেন। এমন জোরে মন্ত্র বলিলেন যে পাশের ঘর হইতে আমি উহা শুনিতে পাইলাম।

বৃন্দাবন হইতে মার সহিত আমরা সকলে হরিদ্বার গিয়াছিলাম; যোগানন্দ স্বামী সঙ্গে ছিলেন। পথে রেল গাড়ীতে যোগেন মহারাজের ভীষণ জ্বর হয়। আমি তাঁহাকে বেদানা খাওয়াইতেছিলাম। মা দেখিয়াছিলেন,—আমি যেন ঠাকুরকেই উহা খাওয়াইতেছি। যোগেন স্বামী জ্বরে বেহুঁস হইয়া দেখিয়াছিলেন—ভীষণ এক মূর্ত্তি সম্মুখে আসিয়া বলিতেছে, 'তোকে দেখে নিতুম কিন্তু কি করবো, পরমহংস দেবের আদেশ, এখনই আমাকে চলে যেতে হবে একদণ্ড আর থাক্‌তে পারছি না।' লাল পেড়ে কাপড় পরা একটি স্ত্রীলোককে দেখাইয়া বলিল, 'এই মাগীকে কিছু রসগোল্লা খাওয়াস।' আশ্চর্য্যের বিষয় ঐ দর্শনের পরই তাঁহার জ্বর ছাড়িয়া গেল। পরে হরিদ্বার হইতে আমরা জয়পুর গিয়াছিলাম। সেখানে গোবিন্দজী দর্শন করিয়া অন্যান্য বিগ্রহ দেখিতে দেখিতে হঠাৎ এক মন্দিরের পার্শ্বের এক মূর্ত্তি দেখিয়াই যোগানন্দ স্বামী বলিয়া উঠিলেন, "এই মূর্ত্তিকেই রসগোল্লা খাওয়াতে বলেছিল।" আবার সাম্‌নে রসগোল্লার একটি দোকানও দেখা গেল। তখন আট আনার রসগোল্লা কিনিয়া ঐ মূর্ত্তিকে ভোগ দেওয়া হইল; এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে উহা মা শীতলার মূর্ত্তি।

তাহার পর মা কলিকাতায় ফিরিলেন এবং বলরাম বাবুর বাড়ীতে কয়েকদিন থাকিয়া কামারপুকুর গিয়াছিলেন। সেখানে প্রায় এক বৎসর থাকিবার পর ভক্তেরা তাঁহাকে বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে প্রায় ছয়মাস আনিয়া রাখেন (১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ)। পরে কার্ত্তিক মাসে ভাড়া বাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতার বলরাম বাবুর বাড়ীতে দুই এক দিন থাকিয়া মা শ্রীক্ষেত্রে (পুরী) যাত্রা করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে চাঁদবালি বড় জাহাজে, চাঁদবালি হইতে কটক ক্যানাল-ষ্টিমারে, এবং কটক হইতে গরুর গাড়ীতে পুরী যাওয়া হয়। শরৎ,

রাখাল মহারাজ, যোগানন্দ স্বামী প্রভৃতি মায়ের সঙ্গে পুরী গিয়াছিলেন। পুরী গিয়া বলরাম বাবুদের "ক্ষেত্রবাসীর মঠে" অগ্রহায়ণ মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত থাকা হইয়াছিল। সামনের রোয়াকওয়ালা পাকা ঘরটিতে মা থাকিতেন। ঠাকুর জগন্নাথ দেখেন নাই বলিয়া মা কাপড়ের ভিতর ঠাকুরের ছবি লইয়া একদিন ঠাকুরকে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করাইলেন।

জগন্নাথ দর্শন করিয়া মা বলিয়াছিলেন, "জগন্নাথকে দেখলুম যেন পুরুষসিংহ, রত্নবেদীতে বসে রয়েছেন, আর আমি দাসী হয়ে তাঁর সেবা কোরছি।" পুরী হইতে ফিরিয়া মা, মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীতে তিন চারি সপ্তাহ থাকিয়া আঁটপুর যান—সঙ্গে বাবুরাম, নরেন, মাষ্টার মহাশয়, সান্ন্যাল আরও সব ছিলেন। সেখানে ছয় সাত দিন থাকিবার পর গরুর গাড়ীতে তারকেশ্বর হইয়া মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতির সঙ্গে তিনি কামারপুকুর গেলেন। কামারপুকুরে প্রায় এক বৎসর থাকিয়া দোলের পূর্ব্বে মা পুনরায় কলিকাতা আসেন এবং মাষ্টার মহাশয়ের কম্বুলিয়াটোলার বাড়ীতে মাসখানেক থাকেন। তারপর বলরাম বাবুর শেষ অসুখের সময় তাঁহার দেহত্যাগ কাল পর্য্যন্ত তিনি বলরাম বাবুর বাড়ীতে ছিলেন। পরে, বেলুড়ে শ্মশানের কাছে ঘুসুড়ীর বাড়ীতে জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত (১৮৯০ খৃঃ) ছিলেন। সেখানে তাঁহার রক্ত আমাশয় হওয়ায় বরাহনগরে সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে তাঁহাকে রাখিয়া চিকিৎসা করান হয়। তথায় কিছুদিন থাকিয়া তিনি বলরাম বাবুর বাড়ী আসেন এবং দুর্গা পূজার পর কামারপুকুর হইয়া জয়রামবাটী যান। তারপর আষাঢ় মাসে বেলুড়—নীলাম্বর বাবুর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে (১৮৯৩ খৃঃ) আসেন ও পরবর্ত্তী মাঘ ফাল্গুনে কৈলোয়ার যাইয়া দুই মাস তথায় থাকেন। কৈলোয়ার হইতে তাঁহার মা ও ভাইদের সহিত মা পুনরায় কাশী-বৃন্দাবন গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া মাষ্টার মহাশয়ের কলুটোলার বাড়ীতে প্রায় এক মাস ছিলেন। তারপর দেশে যান। এবার দেশ হইতে ফিরিয়া বাগবাজার গঙ্গার ধারের গুদামওয়ালা বাড়ীতে পাঁচ ছয়

মাস ছিলেন—এই বাড়ীতে নাগ মহাশয় মাকে দর্শন করেন। পুনরায় দেশে যাইয়া প্রায় দেড় বৎসর পরে মা ফিরিয়া আসিয়া গিরীশ বাবুর বাড়ীর সাম্‌নের বাড়ীতে থাকেন। এই বাড়ীতেই নিবেদিতা মার সহিত প্রায় তিন সপ্তাহ বাস করিয়াছিলেন। তারপর গিরীশ বাবুর বাড়ীর নিকটে ১৬নং বোস্‌পাড়া লেনে যেখানে নিবেদিতা প্রথম স্কুল করিয়াছিলেন সেই বাড়ীতে ছিলেন। ইহার পর বাগবাজার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে (রামকৃষ্ণ লেনের সম্মুখে) আসিয়া তিনি থাকেন। সেখানে শরৎ মহারাজ ছিলেন। তারপর মা দেশে যান। পুনরায় গিরীশ বাবুর বাড়ীর ৺দুর্গাপূজা উপলক্ষে কলিকাতা আসিয়া বলরামবাবুর বাড়ীতে ছিলেন। দেশে ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া মা তখন খুব রোগা হইয়া গিয়াছিলেন। পরে আবার দেশে গিয়া 'উদ্বোধনে'র নূতন বাড়ী হইলে তথায় আসিয়াছিলেন। তারপর কোঠার, মাদ্রাজ, বাঙ্গালোর, রামেশ্বর প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি 'উদ্বোধনে' ফিরিয়া আসেন এবং অল্প কয়েকদিন পরে দেশে গিয়া রাধুর বিবাহ দেন। প্রায় এক বৎসর পর জয়রামবাটী হইতে কলিকাতায় (উদ্বোধনে) আসিয়াছিলেন। 'উদ্বোধন' হইতে কার্ত্তিক মাসে (১৯১২ খৃঃ) মা কাশী গেলেন ও প্রায় তিন মাস কাশীতে থাকিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

মাকে বাল্যকালে প্রায়ই রান্না করিতে হইত। তাঁহার মা বিশেষ কারণ বশতঃ যখনই রান্না করিতে পারিতেন না মা-ই তখন রান্না করিতেন। মা বলিতেন, "আমি রাঁধতুম, বাবা ভাতের হাঁড়ী নামিয়ে দিতেন।" ইদানীং আত্মীয়স্বজন ও ভক্ত-সেবাতেই মায়ের কাল কাটিত।

রামকৃষ্ণ মিশন *

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, সমবেত সাধু মহাশয়গণ, উপস্থিত ভদ্র-মহোদয় ও ভদ্র-মহিলাগণ,—

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আপনাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হইয়াছি। মিশনের উদ্দেশ্য, কার্য্য-প্রণালী ও কি উপায়ে মিশনের কার্য্যের বিস্তার ও উন্নতি হয় তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই আমার অভিপ্রায়। এই মহতী সভায় যোগদান করিতে পারিয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি। প্রাচীন রাজগৃহে সুদূর অতীতের প্রথম বৌদ্ধ সঙ্ঘের মহাসম্মেলনের সহিতই ইহার তুলনা হইতে পারে;—কারণ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে আমি যুগপ্রবর্ত্তক বলিয়া বিশ্বাস করি। সত্যের সন্ধান তাঁহাদের নিকট হইতেই পাইয়াছি। হিন্দু নামে গৌরব বোধ করিয়া যে ধন্য হইতে পারিয়াছি সে তাঁহাদেরই কৃপায়। হিন্দুর ধর্ম্মে প্রাণ সঞ্চার করিয়াছেন তাঁহারাই। হিন্দু যদি আবার উঠিতে চায় তাহা হইলে তাঁহাদেরই পতাকাতলে হিন্দুকে দাঁড়াইতে হইবে। যিনি যে পরিমাণে তাঁহাদের নিকট হইতে প্রেরণা পাইবেন তাঁহার ধর্ম্ম সেই পরিমাণে জীবন্ত ও জাগ্রত। তাঁহাদেরই শক্তির কেন্দ্র এই মঠ ও মিশন। এই কেন্দ্র যদি সুস্থ ও সবল থাকে তাহা হইলে জাতির জীবনও সতেজ হইয়া উঠিবে, হিন্দু আবার সদর্পে মস্তক উত্তোলন করিয়া জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে এবং তাহার যুগ যুগান্তরের আধ্যাত্মিক সম্পদ্ জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিতরণ করিয়া সমগ্র

---

* রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রথম মহাসম্মেলনের সাধারণ-সভায় ফরিদপুর, রাজেন্দ্রকলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ মিত্রের বক্তৃতা। ৩রা এপ্রিল (১৯২৬)

মানব জাতির মহা কল্যাণ সাধনে কৃতকার্য্য হইবে। ভারত এই কার্য্যেরই সাধন অতীত যুগে করিয়াছে। পরস্বাপহরণ-কলঙ্কে ভারত কখনও কলঙ্কিত হয় নাই।

লক্ষণ খুবই আশাপ্রদ। সিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভার পর মাত্র বত্রিশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে; কিন্তু, ইহারই মধ্যে আমেরিকায় কতকগুলি বেদান্তসমিতি এবং এমন কি একটি হিন্দুমন্দির পর্য্যন্ত স্থাপিত হইয়াছে। বৌদ্ধ যুগের পর বিদেশে প্রচার কার্য্য হিন্দুর এই প্রথম। প্রায় দেড় সহস্র বৎসরের মধ্যে ভারতের ইতিহাসে এত বড় ব্যাপার সংঘটিত হয় নাই। পাশ্চাত্য জগতের বহু মানব রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-মত গ্রহণ করিয়াছেন এবং স্বামিজীর পর তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ ও শিষ্যবৃন্দ মহোৎসাহে পাশ্চাত্য জগতে ভারতের সনাতন বাণী প্রচার করিতেছেন। এই যে বিদেশে প্রচার কার্য্য ইহাই স্বামিজীর Foreign policy। এই কার্য্যের আন্তর্জাতিক প্রভাব যে কিরূপ কার্য্যকরী তাহা যাঁহারা মিশনের মুখপত্র ও রিপোর্টগুলির সহিত পরিচিত তাঁহারাই অবগত আছেন।

এত অল্প সময়ের মধ্যে ধর্ম্মের এরূপ প্রচার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি গোচর হয় না। এ ধর্ম্ম প্রচারের পশ্চাতে রাজশক্তি নাই, যাহা খৃষ্টধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পশ্চাতে বিদ্যমান ছিল। বাহিরের কোন সাহায্যের অপেক্ষা ইহাকে আদৌ করিতে হয় নাই। ইহা নিজের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। ইহার অন্তর্নিহিত শক্তিই ইহার প্রসার বৃদ্ধি করিতেছে। যে মহাশক্তি পূর্ব্ববর্ত্তী অবতার পুরুষদের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া যুগে যুগে এই ভারতভূমিকে মূর্চ্ছিত অবস্থা হইতে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিল সেই মহাশক্তিই এই অধঃপতিত ভারতকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিবার জন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ রূপে অবতীর্ণ। এই মহাশক্তির কেন্দ্র রামকৃষ্ণ মঠ, যেখানে তেজস্বী, চরিত্রবান ও বিদ্বান ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী গঠিত হয় এবং যাহা রামকৃষ্ণ-মিশনকে অবলম্বন করিয়া সর্ব্ববিধ লোকহিতকর কার্য্যে অগ্রসর ও ব্রতী। মঠ ও মিশনের ইহাই সম্বন্ধ। মিশনের প্রাণ—মঠ এবং দেশের প্রাণ—

এই মিশন। মঠ ও মিশনের আদর্শ যতদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে ততদিন দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ইহাই স্বামিজীর Domestic policy। তাঁহার Foreign policy ও Domestic policy উভয়কে যুক্ত করিয়া যাহা হয় তাহাকেই স্বামিজী তাঁহার Plan of Campaign নামে অভিহিত করিয়াছেন। মঠের বিষয় আলোচনার ভার সর্ব্বত্যাগী শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসিবৃন্দের। আমার আলোচ্য বিষয় মিশন।

যদিও আমার আলোচ্য বিষয় মিশন, তথাপি মঠ কিংবা আশ্রমগুলি সম্বন্ধে এইটুকু বলিতে পারি যে, এই অনুষ্ঠানগুলি অতি উত্তমরূপে চালিত হইতেছে। এখানে স্বদেশ-বিদেশে প্রচার কার্য্যের জন্য উপযুক্ত সন্ন্যাসী গঠিত হইতেছে। এখানকার সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট মাসিক-পত্র 'উদ্বোধন', ইংরাজী ভাষায় উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র Prabuddha Bharat ও Vedanta Kesari এবং সাপ্তাহিক পত্র The Morning Star, হিন্দী ভাষায় 'সমন্বয়' মলায়ালম্ ভাষায় 'প্রবুদ্ধ কেরলম্' ও তামিল ভাষায় 'রামকৃষ্ণ বিজয়ম্' নামক পত্রিকা নিয়মিতরূপে বিশেষ দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতেছেন। ইহা ব্যতীত ইঁহারা একটি বিশাল সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছেন, যাহা আলোচনা করিয়া ধর্ম্ম-পিপাসু মানবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতেছে। মঠ ও আশ্রমগুলিতে বিদ্যা-চর্চ্চা উত্তমরূপে হয় এবং যে Library বা পুস্তকালয় আছে তাহা আয়তনে ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে এবং আশা করি, কিছুদিনের মধ্যেই এ পুস্তকালয়গুলি এত বৃহদাকার ধারণ করিবে যে, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ জ্ঞানালোচনার জন্য কোনই অভাব বোধ করিবেন না। প্রধান মঠ ও আশ্রম ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এ পর্য্যন্ত ১৭টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রধানতম তিনটি—বেলুড় মঠ, মান্দ্রাজ মঠ ও মায়াবতী অদ্বৈত-আশ্রম। ভারতের বাহিরে New York, San Francisco, La Crescenta ও Bostonএ চারিটি আশ্রম, আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি শাখা-আশ্রম ও Federated Malay Statesএ Kuala Lumpur নামক স্থানে একটি আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। আমেরিকায় বিস্তার কেন্দ্র Boston

হইতে Message of the East নামক একটি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র এবং বেদান্ত বিষয়ক বহু পুস্তক প্রকাশিত হয়। এ পর্য্যন্ত মোটের উপর যাহা হইয়াছে তাহাতে প্রত্যেক ভারত সন্তানই আনন্দ ও গৌরব বোধ করিবেন। তথাপি আরও অনেক হওয়া আবশ্যক। নতুবা দেশের ও জগতের মহা অভাব দূর হওয়া অসম্ভব। চাই—আরও কর্ম্মী—চাই আরও অর্থ।

তারপর মিশন—যাহা আমার আলোচ্য বিষয়। মঠ ও আশ্রমগুলি কেবল সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের জন্য এবং এখানকার কর্ম্মীরা সকলেই সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী, কিন্তু মিশনের কার্য্য সর্ব্বসাধারণের। সন্ন্যাসিগণ ত্যাগ ও সেবার আদর্শ সম্মুখে ধারণ করিয়া মিশনের কার্য্যে সাধারণের সহযোগিতা করেন মাত্র, সাধারণকে কর্ম্মকুশলতায় নিজেদের দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষিত করেন এবং মিশনের কার্য্য যাহাতে সুশৃঙ্খলায় ও যথাযথভাবে সাধিত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন। সমস্ত জাতিটা যাহাতে চরিত্রবান ও নিঃস্বার্থব্রতে ব্রতী হইয়া উঠে মিশনের লক্ষ্য সেই দিকে। এই মিশনের লোকহিতকর কার্য্যের দুইটি প্রধান বিভাগ—একটি রুগ্নকে স্বাস্থ্যদান, ক্ষুধিতকে অন্নদান ও বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান; অপরটি যুবক ও বালকবালিকাগণকে শিক্ষাদানের সহিত ধর্ম্মদান এবং দরিদ্র ছাত্রদিগকে সাহায্য দান। প্রথম বিভাগের মধ্যে আবার দুই প্রকারের প্রতিষ্ঠান—স্থায়ী ও অস্থায়ী। প্রধান স্থায়ী অনুষ্ঠানগুলি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত এবং সংখ্যায় ১২টি। ইহাদের মধ্যে কাশী—সেবাশ্রম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অস্থায়ী অনুষ্ঠানগুলি অপ্রত্যাশিত দৈব দুর্ঘটনার সময় স্থাপিত হয় এবং ঐ সমস্ত দুর্ঘটনা-ঘটিত দুঃখের অবসান হইলেই সেগুলির কার্য্য শেষ হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা ও ঝঞ্ঝা-পীড়িত মানবকে রামকৃষ্ণ মিশন এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলির দ্বারা যে কি প্রকার সাহায্য করিয়া থাকে তাহা সংবাদপত্র পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে মুসলমান ও ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতে এইরূপ মহৎ কার্য্য

অপর কাহারও দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই। এ কার্য্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গতপ্রাণ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী দ্বারা হওয়াই সম্ভবপর। এখন রামকৃষ্ণ মিশনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া অন্য অনেকেও এই সমস্ত কার্য্যে অবতীর্ণ হইতেছেন—ইহা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই।

রামকৃষ্ণ মিশনের দ্বিতীয় কার্য্য—সাধারণ শিক্ষার সহিত ধর্ম্মদান। শিক্ষাও একরূপ নহে। সাধারণ শিক্ষালয়ে যেরূপ কেবল পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয়, রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষালয়ে তাহা হয় না। পুস্তকের শিক্ষাকে জীবন্ত করা হয় এবং তদ্ব্যতীত ব্যায়াম, কৃষি ও শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়, যেন ছাত্রেরা ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হইয়া উপার্জ্জনক্ষম হইতে পারে। অনাথদিগের জন্য স্কুল ও ছাত্রাবাস আছে। দরিদ্রদিগের জন্য এবং সমাজে অবজ্ঞাতদের জন্য নৈশ-বিদ্যালয় ও অবৈতনিক বিদ্যালয় আছে। কলিকাতায় একটি Students' home আছে। শিক্ষা বিষয়ক সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শিক্ষানুষ্ঠান মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত। প্রায় আড়াই লক্ষ মুদ্রা-ব্যয়ে ইহা স্থাপিত হইয়াছে। দেওঘরের বিদ্যাপীঠও বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। রামকৃষ্ণ-মিশন কর্ত্তৃক স্থাপিত বালক ও যুবকদিগের জন্য নানা প্রকারের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২টি।

বালিকা বিদ্যালয় মাত্র তিনটি—প্রাতঃস্মরণীয়া ভগিনী নিবেদিতা কর্ত্তৃক স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয় এবং কলিকাতার বাহিরে ইহার দুইটি শাখা—একটি বালীতে ও একটি কুমিল্লায়। এই বালিকা-বিদ্যালয়গুলি হিন্দু নারীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং এখানে বাংলা শিক্ষা ব্যতীত উচ্চ ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হয়। এইরূপ আরও অনেক বালিকা বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা আছে। জাতীয় উন্নতির পক্ষে হিন্দুভাবে উচ্চ স্ত্রী-শিক্ষা যে কতদূর আবশ্যক তাহা স্বামী বিবেকানন্দ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া এই কার্য্যের জন্যই ভগিনী নিবেদিতাকে বিশেষভাবে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। হিন্দু সমাজে বালিকাদের বিবাহের বয়স যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে সেই পরিমাণে স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষা সম্ভবপর হইবে। সুখের বিষয় বালিকাদের বিবাহের

বয়স ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। স্ত্রীলোক মাত্রকেই যে বিবাহ করিতে হইবে এ ধারণাও অনেকের দূর হইতেছে এবং অতিশয় সুখের বিষয় এই যে, কয়েকটি উচ্চ-শিক্ষিতা ব্রহ্মচারিণীও দেশের স্ত্রীজাতির উন্নতি-কল্পে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। বালিকা বিদ্যালয়ের কথা বলিলেই বিশেষভাবে শ্রীশ্রীসারদা-মন্দিরের উল্লেখ করিতে হয়। এখানে উপযুক্ত হিন্দু শিক্ষয়িত্রী গঠিত হইতেছে।

স্বামিজীর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার আদর্শানুযায়ী একটি বিশ্ববিদ্যালয় ন্যূনকল্পে একটি কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরাকালে যেরূপ নালন্দা, তক্ষশীলা, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলা ছিল সেইরূপ শিক্ষায়তনের চিত্র তাঁহার মানস-পটে উদিত হইত। আমি কয়েক মাসের জন্য একবার কাশ্মীর যাই। সেখানে গিয়া শুনিলাম—কাশ্মীরে ঐরূপ উচ্চাঙ্গের একটি বিদ্যায়তন স্থাপনের চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের মহারাজা এই কার্য্যের জন্য তাঁহাকে ভূমি-দান করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু সেখানকার অনৈক বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন পাদ্রী সাহেবের প্রতিকূল আচরণে মহারাজার ঐ ইচ্ছা ব্যর্থ হইয়াছিল। রেসিডেণ্ট সাহেব, পাদ্রী সাহেবের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, দেশের দেখা কর্ত্তব্য যে ঐরূপ একটি উচ্চাঙ্গের বিদ্যায়তন শীঘ্র স্থাপিত হয়। অত্যন্ত ব্যয়-সাধ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই। এরূপ বিদ্যায়তন প্রচার-কার্য্যের বিশেষ সহায়ক। স্বামিজী অতি অল্প বয়সেই আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। নতুবা আরও কত কি যে তিনি করিয়া যাইতে পারিতেন তাহা আমাদের চিন্তার অতীত। কিন্তু, কেবল চিন্তা করিলে কি হইবে? তাঁহার সন্তানদিগকে তাঁহার অসমাপ্ত কার্য্য যতদূর সাধ্য অগ্রসর করিতেই হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ-মিশন স্থাপন করেন ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে। প্রায় ত্রিশ বৎসরের মধ্যে মিশনের কার্য্য যেরূপ সফলতা-মণ্ডিত হইয়াছে তাহা খুবই আশাপ্রদ। যাহা হইয়াছে তাহা খুবই উত্তম। দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন তাঁহার সন্তানগণ ও গুরুভ্রাতাগণ। কিন্তু,

আরও অনেক বাকী। ১৯২৫ সালের জুলাই মাসের রিপোর্টে দেখা যায় যে, ভারতের ভিতর মিশনের অন্তর্ভুক্ত মঠ বা আশ্রম ১৭টি, স্বাস্থ্যদান ও অন্নদানের স্থায়ী প্রতিষ্ঠান ১২টি এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ১৬টি—মোট সংখ্যা ৪৫টি। ইহার পরে আরও ২।৪টি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়া থাকিতে পারে। তথাপি অনেক বাকী। সমস্ত ভারতবর্ষকে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠানে ছাইয়া ফেলিতে হইবে। বিদেশ হইতে শুনি—ক্রমাগত ডাক আসিতেছে। ইয়ুরোপের বিভিন্ন দেশ ও উপনিবেশ হইতেও ডাক আসিতেছে। কিন্তু, কর্ম্মীর অভাবে ইয়ুরোপ ও উপনিবেশগুলিতে প্রচার কার্য্য হইতেছে না। অতএব আরও কর্ম্মী চাই—আরও অর্থ চাই। সমস্ত জগৎকে ভারতের আধ্যাত্মিকতায় প্লাবিত করিতে হইবে। বেদান্ত-দুন্দুভি সর্ব্বত্র ধ্বনিত করিতে হইবে। ইহাই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের লক্ষ্য। হিন্দুধর্ম্ম মানেই বেদান্ত এবং এই বেদান্তের জীবন্ত ভাষ্য ছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। পূর্ব্ববর্ত্তী অবতারগণ সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ আসিতে পারে; তাঁহাদের জীবনের কতটা ইতিহাসমূলক এবং কতটা কল্পনামূলক এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে; কিন্তু ইঁহাদের সম্বন্ধে সেরূপ প্রশ্ন উঠা অসম্ভব, কারণ তাঁহাদের শিষ্যগণ এখনও বর্ত্তমান। বৌদ্ধধর্ম্ম মানে যেমন বুদ্ধানুসরণ, খৃষ্টধর্ম্ম মানে যেমন ঈশানুসরণ, হিন্দুধর্ম্ম মানে সেইরূপ হিন্দুর ঋষিগণের ও অবতারগণের অনুসরণ এবং যেহেতু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ আসিতে পারে না, সেই হেতু তাঁহাদের অনুসরণকারীদের হিন্দুধর্ম্ম যেরূপ জীবন্ত হইতে পারে অপর কোন অবতারের বা মহাপুরুষের অনুসরণকারীদের হিন্দুধর্ম্ম সেরূপ জীবন্ত হইতে পারে না। ভারতের ইতিহাসে পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষগণ যেমন বেদান্তের বাণী বহন করিয়া আসিয়াছিলেন ইঁহারাও তাহাই করিয়াছেন। হিন্দু যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হউন না কেন—দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা অদ্বৈতবাদী হউন—শৈব, শাক্ত বা বৈষ্ণব হউন—বেদান্তের কোন একটা ভাষ্যের উপরেই সে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জীবনে দেখি যে পরস্পর বিবদমান বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য—অথচ ইহা কেবল

পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের ধর্ম্ম নহে ; ইহা জীবনের ধর্ম্ম, সাধনা ও সিদ্ধির ধর্ম্ম। যাঁহার যাহা ইষ্ট তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে, অথচ ইঁহাদের প্রতি যাঁহাদের শ্রদ্ধা তাঁহারা ইঁহাদের জীবনালোকে স্ব স্ব ইষ্টের প্রতি অধিকতর নিষ্ঠাবান হইবেন। কেবল হিন্দু নয়—খৃষ্টান ও মুসলমান পর্য্যন্ত ইঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইলে ভাল খৃষ্টান ও ভাল মুসলমান হইতে পারিবেন, সমস্ত গোঁড়ামি দূর হইবে। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম বেদান্তের একটা না একটা শাখার মধ্যে পড়িতে বাধ্য। হিন্দুও যে পরিমাণে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে বুঝিবেন, হিন্দুরও সেই পরিমাণে কূপ-মণ্ডূকতা দূর হইবে, হিন্দুও সেই পরিমাণে সামাজিক আচার ব্যবহারে উদার-ভাবাপন্ন হইবেন। ইহাই হিন্দু-ধর্ম্মের স্বরূপ এবং ইহাই Universal religion। Universal religion মানেই Hinduism। Universal religion মানে এক নিশ্বাসে ঈসা, মুসা, শাক্য ও চৈতন্যের নাম উচ্চারণ নহে। Universal religion মানে খিচুড়ি-জাতীয় কোন পদার্থ নহে। Hinduism মানে পাঁচটা ধর্ম্মের মধ্যে একটা ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম মানেই Hinduism এবং Hinduism মানেই ধর্ম্ম। এই Hinduismএর পূর্ণ বিকাশ আমরা বর্ত্তমান যুগে দেখি—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে। তাঁহাদের অনুসরণ করিলেই Universal religion অনুসরণ করা হইল। মানুষ মানুষকে চায় এবং মানুষের ভিতর দিয়াই মানুষ পরম তত্ত্বে উপনীত হয়। সেইজন্যই অবতার পূজা ; সেইজন্যই Prophet এ শ্রদ্ধা। সেইজন্যই Hero-worship। কেবল বাহ্য পূজা করিলে হইবে না, মানস পূজা চাই। Heroর আদর্শে জীবন গঠন করা চাই। এই Hinduism বা Universal religionএর মূর্ত্ত বিগ্রহ বর্ত্তমান যুগে—রামকৃষ্ণ। এই Hinduismএর গৈরিকধারী যোদ্ধা ও সৈনিকাগ্রণী বর্ত্তমান যুগে—স্বামী বিবেকানন্দ। হিন্দুর বক্ষঃপট সাহসে তাঁহারা শতগুণ বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন। পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে আর কোন জগদ্গুরুর আবির্ভাবের সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হয় না, কারণ, জগদ্গুরু ক্ষণে ক্ষণে আবির্ভূত হন না। চাই—হিন্দুর এখন

সেই উৎসাহ, সেই বিক্রম, সেই উত্তম যাহা ছিল বৌদ্ধ প্রচারকের, আদি খৃষ্টানের ও আদি মুসলমানের। তরবারির শক্তিতে হিন্দু উঠিতে চায় না, আত্মার শক্তিতে হিন্দু বিশ্ব-বিজয়ী হইতে চায়। এই সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কার্য্য। আত্মার দৈন্য দূর করিতে হইবে। হিন্দুকে বুঝাইতে হইবে যে সে সিংহ শাবক, শশক নহে। সে যে নিজকে শশক বলিয়া মনে করে সেটা মায়ার কার্য্য। এই মায়াজালকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে হইবে। হিন্দুর সর্ব্ব প্রকার দৈন্য দূর করা রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্য। আর্থিক দৈন্য, সামাজিক দৈন্য, রাষ্ট্রীয় দৈন্য সমস্তই দূর করিতে হইবে রামকৃষ্ণ মিশনকে; অথচ তথাকথিত Social reformer বা Political agitatorএর কার্য্য-প্রণালী মিশন গ্রহণ করিবে না। মিশন, জাতিকে শিক্ষায় দীক্ষায় আদর্শ হিন্দুতে পরিণত করিবে, হিন্দুকে স্বাবলম্বী ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান করিয়া তুলিবে।

রাজনীতি কিংবা সমাজসংস্কার মিশনের মূল-নীতি নহে। এ জাতি যদি উঠিতে চায় তাহা হইলে ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই ইহাকে উঠিতে হইবে। ইহাই স্বামী বিবেকানন্দের সিদ্ধান্ত এবং এ সিদ্ধান্ত ঋষির অন্তর্দৃষ্টিসঞ্জাত। তিনি ধ্যাননেত্রে যে প্রবুদ্ধ-ভারত দেখিয়াছিলেন সে দৃষ্টি ব্যর্থ হইবার নহে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বিশ্বাসীকে এ বিশ্বাসে বিশ্বাসবান হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে এবং মিশন এ বিশ্বাসে বিশ্বাসবান্।

অন্তর্দৃষ্টিশূন্য সমাজসংস্কারক ও রাজনৈতিক আন্দোলনকারীর কার্য্যের ফল আমরা চক্ষের উপর দেখিতেছি। ক্ষণিক উত্তেজনা-বশে একটা গোলমালের সৃষ্টি করিয়া নানাপ্রকার অনুষ্ঠানে হাত দেওয়া হয়, কিন্তু একটাও সফল হয় না—সমস্ত অনুষ্ঠানের উপরেই যেন বড় বড় অক্ষরে লেখা—বিফলতা। এখন Constructive work, Village organisation ইত্যাদি কথা শুনা যাইতেছে। যদি কৃতকার্য্য হয় খুবই উত্তম; ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? কিন্তু যেহেতু উদ্দেশ্য রাজনৈতিক, সেহেতু এগুলির

অদৃষ্টে কি আছে বলা যায় না। মিশনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। প্রকৃত Constructive work এর সূত্রপাত প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বামিজী করিয়া গিয়াছেন। মিশন তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে চলিতেছে, নীরবে তাঁহারই পতাকা বহন করিতেছে, কার্য্যের ক্ষেত্র ক্রমেই বিস্তৃত হইতেছে। ভগবান আশীর্ব্বাদ করুন যেন শীঘ্র আরও অনেক বিস্তৃতি লাভ করে। রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য ব্যক্তি-সংস্কার অর্থাৎ মানুষ গড়া; স্বামিজী যাহাকে Man making বলিতেন। ধর্ম্মের ভিতর দিয়া যদি মানুষ গড়িয়া উঠে তাহা হইলে অর্থনৈতিক সংস্কার, সমাজসংস্কার ও রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কার আপনা আপনিই হইবে। 'Seek ye first the Kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you.'

রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য, মিশনের যে প্রতীক স্বামিজী পরিকল্পনা করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতেই উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। প্রতীকের অর্থ এই যে—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম ও যোগের একত্র সমাবেশ করিতে হইবে। স্বামিজী যাহাকে Practical Vedanta বলিয়াছেন, মিশনের উদ্দেশ্য সেই Practical Vedantaর সাধনা। অরণ্য ও গিরিগুহার বেদান্তকে দৈনন্দিন জীবনে কার্য্যকরী করিতে হইবে। এই জন্যই নূতন সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সৃষ্টি। এইরূপ সন্ন্যাসী সঙ্ঘ বৌদ্ধযুগে ভারতে ছিল ও পরে মধ্য যুগে ইয়ুরোপে ছিল এবং তাঁহাদের দ্বারা জগতের যে কত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। যে লোকহিতকর কার্য্য ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, যাহার ভিত্তি মাত্র Utilitarianism তাহা দ্বারা কোন প্রকৃত মঙ্গলময় কার্য্য সাধিত হয় না। সেরূপ লোকহিতকর অনুষ্ঠান একটা যন্ত্র-বিশেষ; যন্ত্র প্রাণহীন। লোকের প্রতি "দয়া" শব্দ পর্য্যন্ত স্বামিজী ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার মন্ত্র ত্যাগ ও জীবকে শিব-জ্ঞানে সেবা। এ মন্ত্র বৌদ্ধযুগে ছিল না। এ মন্ত্র মধ্যযুগের ইয়ুরোপে ছিল না। এ মন্ত্র ভারতেই ছিল বটে; কিন্তু ইহার প্রয়োগ সেরূপ ব্যাপকভাবে হয় নাই। "জীবে দয়া" ইহার তুলনায়

খুব ছোট কথা। এ মন্ত্রের প্রয়োগ বিশাল-হৃদয় স্বামিজীই ব্যাপকভাবে সর্ব্বাগ্রে করিয়াছেন। সর্ব্বত্যাগ না হইলে আত্মোৎসর্গ হয় না, আত্মোৎসর্গ না হইলে সেবা হয় না। মিশনের কর্ণধার তাই সন্ন্যাসী। ইঁহাদের উচ্চ আদর্শ অনেকের ধারণার অতীত হইলেও ইঁহাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া অনেকে সেবা-ধর্ম্ম পালন করিতে পারিবেন। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হইবে। শুদ্ধ চিত্তে জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হইয়া মানবকে মুক্তির অধিকারী করিবে। নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা মানুষ নিজেরই উপকার করে। নারায়ণ যে দরিদ্রের বেশে, মূর্খের বেশে আমাদের দ্বারস্থ, সেজন্য দরিদ্র ও মূর্খের প্রতি প্রকৃত সেবকের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতারই উদয় হয়। কি সুন্দর কথাই স্বামিজী বলিয়াছেন :—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা
খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন
সেবিছে ঈশ্বর॥"

পাশ্চাত্য জগতের যে চিত্ত-বিক্ষেপকারী চাঞ্চল্যপূর্ণ কর্ম্ম তাহা কর্ম্মযোগ নহে—তাহার নাম কর্ম্মভোগ। প্রকৃত কর্ম্মযোগী যিনি, তিনি Emersonএর ভাষায় বলিতে গেলে Must keep his head in solitude and hand in society। রামকৃষ্ণ মিশন ইহাই করিতেছে। মধ্যে মধ্যে নির্জ্জন বাস ও নির্জ্জন সাধনার একান্ত আবশ্যক। মানুষ সর্ব্বদা কর্ম্ম করিতে পারে না, সর্ব্বদা ধ্যান করিতে পারে না, সর্ব্বদা গ্রন্থ-পাঠ ও জ্ঞানালোচনা এবং সর্ব্বদা পূজা ও জপ করিতে পারে না। পরমহংসদেব আমাদিগকে একঘেয়ে হইতে নিষেধ করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের মন্ত্র তাই জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম ও যোগের একত্র অনুশীলন।

রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য মহৎ, কর্ম্ম-কুশলতা ও কার্য্য-প্রণালী প্রশংসার্হ। মিশন যাহা করিয়াছে তাহাতে সকলেই চমৎকৃত। কেন্দ্রের সহিত শাখা-সমূহের সুন্দর যোগ রহিয়াছে। যে দুই চারিটি অনুষ্ঠান

স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করিতেছে শুনিতে পাই, আশা করি শীঘ্রই তাহারা কেন্দ্রের সহিত যুক্ত হইবে। মিশনের হিসাব-নিকাশ নির্দ্দোষ। এরূপ হিসাব-নিকাশ গভর্ণমেণ্টের হিসাব-বিভাগ ভিন্ন বড় একটা দৃষ্টি গোচর হয় না। মিশনের কার্য্যে যে প্রাণ আছে, যে হৃদয়ের স্পন্দন আছে তাহার তুলনা নাই। তথাপি আরও অনেক করিবার আছে। ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিতে হইবে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নাম জয়যুক্ত করিতে হইবে। হিন্দুধর্ম্মের নব-জাগরণ আনয়ন করিতে হইবে। হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক বলিয়াই বোধ হইতেছে। ইহা দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত হইবে বলিতে পারি না। ধর্ম্মস্থান ঠিক্ না হইলে যতই মহাসভা ও যতই সংগঠনের আন্দোলন হউক না কেন, হিন্দুজাতির উত্থান অসম্ভব। ভারতবর্ষ যতদিন আবার নিজ পদভরে মস্তক উত্তোলন করিয়া না দাঁড়ায়, দেশের সর্ব্বপ্রকার দৈন্য যতদিন না দূর হয় ততদিন রামকৃষ্ণ মিশনের বিশ্রাম নাই, রামকৃষ্ণ মিশন এই জন্যই স্থাপিত।

চাই আরও কর্ম্মী—চাই আরও অর্থ; কিন্তু, সর্ব্বাগ্রে চাই কর্ম্মী। কর্ম্মী হইলে অর্থের অভাব হইবে না। তাই স্বামিজী বলিয়াছেন:— Money is nothing For the last twelve years of my life I did not know where the next meal would come from but money and everything else I want must come because they are my slaves and not I theirs money and everything else must come Must—that is the word Where are the men? That is the question কী জোরের কথা। চাই বহু দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, মেধাবী যুবক যাঁহারা মিশনের কার্য্যভার সানন্দে গ্রহণ করিবেন, যাঁহাদের কর্ণ-কুহরে যুগপ্রবর্ত্তকের বাণী সতত ধ্বনিত হইবে, 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' মন্ত্রের যাঁহারা একনিষ্ঠ সাধক হইবেন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বামিজী এইরূপ এক সহস্র যুবক চাহিয়া ছিলেন। এখনও বোধ হয় সে এক সহস্র যুবক তাঁহার কার্য্যে যোগদান করে নাই—কারণ তাঁহার কার্য্যে ক্ষণিক উত্তেজনা নাই, আছে সংযতচিত্তে

জীবনব্যাপী কঠোর সাধনা। স্বামিজীর ডাকই যে ভারত মাতার ডাক, স্বামিজীর ডাকই যে ভারতের ভগবানের ডাক—একথা ভারতের যুবকবৃন্দকে উত্তমরূপে ধারণা করিতে হইবে। এখন কার্য্যের পরিধি বিস্তৃত হইয়াছে—আরও অনেক বিস্তৃত করিতে হইবে। কার্য্য কেবল ভারতে নয়, ভারতের বাহিরে এসিয়া, ইয়ুরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও উপনিবেশ সমূহে সিংহ-বিক্রমে চালাইতে হইবে। এখন আর এক সহস্র কর্ম্মীতে চলিবে না, পাঁচ সহস্র কর্ম্মীর আবশ্যক। সমগ্র ভারতের লোক-সংখ্যা ত্রিশ কোটী। ইহা হইতে কি পাঁচ সহস্র বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ ও মেধাবী যুবক রামকৃষ্ণ মিশন আশা করিতে পারে না? লোক-সংখ্যা হ্রাস হওয়ার কোনই আশঙ্কা নাই। আর কীট পতঙ্গের মত কতকগুলি লোক জন্মিলেই বা কি, আর না জন্মিলেই বা কি? মানুষের মত মানুষই যদি না হইল তাহা হইলে সে-মানুষ লইয়া কি হইবে?

পাঁচ সহস্র উপযুক্ত কর্ম্মীর আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু, পাওয়া যায় না কেন? স্বামিজীর জীমূত মন্ত্রেও চেতনা নাই কেন? অন্তরায় তাহা হইলে নিশ্চয়ই আছে। এ অন্তরায়গুলি দূর করিতে গৃহী ও সন্ন্যাসী সকলেই অধিকারী। বিশেষ যাঁহারা শিক্ষক-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন এবং সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রের সম্পাদক, তাঁহাদের প্রভাব এ বিষয়ে বিশেষ কার্য্যকরী। প্রথম অন্তরায় এই যে Ethical ideal বা জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অধিকাংশ যুবকের কোন স্পষ্ট ধারণাই নাই। ধর্ম্মবুদ্ধি বা Moral sense সম্বন্ধে অধিকাংশ যুবক সচেতন নহে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, বিবাহ ও চাকরী, ওকালতী বা ডাক্তারী ছাড়া আর যে কিছু করিবার আছে এ বিষয়ে অনেকেরই জ্ঞানের একান্ত অভাব। ব্রহ্মচর্য্যের যে কোন আবশ্যকতা, ইহা না হইলে যে মানব জীবনে ও পশুর জীবনে কোনই পার্থক্য নাই, একথা অনেকের হৃদয়ে উদিতই হয় না। দ্বিতীয় অন্তরায়—শ্রদ্ধাহীনতা, গুরুতর বিষয়কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা—Carlyle যাহাকে লক্ষ্য করিয়া পুনঃ পুনঃ Persiflage শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তৃতীয় অন্তরায়, Artএর

নামে লালসাময় গরলপূর্ণ তরল সাহিত্যের অবাধ প্রচার। চতুর্থ অন্তরায়—আলস্য, বাজে গল্প এবং বাজে ক্রীড়া কৌতুকে আসক্তি। পঞ্চম অন্তরায়—পাশ্চাত্য জগতের কুশিক্ষা যে, সন্ন্যাস Anti-social. ইহা সম্পূর্ণ বিকৃত ও ভ্রান্ত আদর্শ। যুবকদিগেরই বা দোষ কি? যখন উচ্চাসন হইতেই শুনা যায় যে, বিদ্যা ও অবিদ্যার সমন্বয়টাই হইতেছে Philosophy of our people এবং এই Philosophy সমর্থনের জন্য উপনিষদের শ্লোক পর্য্যন্ত যখন উদ্ধৃত করা হয় তখন আর কি উত্তর দিব? তখন উপনিষদের বাণী উদ্ধৃত করিয়াই বলিতে হয়—'অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া, অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥' এই পাঁচটি অন্তরায় ব্যতীত আর একটি অন্তরায় হইতেছে আধ্যাত্মিকতার নামে AEsthetic sentimentalityর ঢক্কা-নিনাদ যাহা শুনিয়া শুনিয়া কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইয়াছে। জিনিষটা আবার এতই 'Respectable' হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহার বিরুদ্ধে কথা বলিতে যাওয়াই একটা দুঃসাহসিকতা।

এই যে অন্তরায়গুলির কথা বলিলাম এগুলি উৎকট সামাজিক ব্যাধি। এ ব্যাধির বিরুদ্ধে গৃহী সন্ন্যাসী সকলেরই তুমুল সংগ্রাম ঘোষণা করা কর্ত্তব্য। বিশেষ যাঁহারা শিক্ষক ও সম্পাদক তাঁহাদের ইহা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা না হইলে কর্ম্মী পাওয়া যাইবে না। রুচির পরিবর্ত্তন আবশ্যক। দুষ্ট সাহিত্য ও দুর্ব্বলতার সাহিত্যকে নির্ব্বাসিত করিয়া সৎ সাহিত্য ও বলপ্রদ সাহিত্যকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। উত্তমরূপে বুঝাইতে হইবে যে, হিন্দু যদি বাঁচিতে চায় তাহাকে আবার নূতন করিয়া হিন্দু হইতে হইবে, তাহাকে বীর হইতে হইবে এবং তাহা হইতে হইলে যুগাবতার রামকৃষ্ণের চরিত গভীর মনযোগের সহিত পর্য্যালোচনা করিতে হইবে এবং সে অপূর্ব্ব চরিত্র, অপূর্ব্ব সাধনা ও অপূর্ব্ব সিদ্ধি বুঝিতে হইলে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী ও বক্তৃতাবলী পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে হইবে—কারণ, বিবেকানন্দের ভিতর দিয়া না গেলে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা

অসম্ভব। বিবেকানন্দকে বাদ দিয়া রামকৃষ্ণে উপনীত হইতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। রামকৃষ্ণে উপনীত হওয়ার অর্থই হিন্দুর নবোত্থান, হিন্দুর নব জাগরণ। এই নবোত্থানের অর্থ ও এই নবোত্থানে রামকৃষ্ণের স্থান সম্বন্ধে স্বামিজী মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় যাহা বলিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করি :—

"এই নবোত্থানে, নব বলে বলীয়ান মানবসন্তান, বিখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যা সমষ্টীকৃত করিয়া ধারণা ও অভ্যাস করিতে সমর্থ হইবে ; এবং লুপ্ত বিদ্যারও পুনরাবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে ; ইহার প্রথম নিদর্শনস্বরূপ শ্রীভগবান, পরম কারুণিক, সর্ব্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্ব্বভাব-সমন্বিত, সর্ব্ববিদ্যা-সহায় যুগাবতাররূপ প্রকাশ করিলেন।

অতএব এই মহাযুগের প্রত্যূষে সর্ব্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্তভাব, যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্ম্মে নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চনিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে।

এই নব যুগধর্ম্ম, সমগ্র জগতের বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান ; এবং এই নব যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শ্রীভগবান পূর্ব্বগ শ্রীযুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর ও ধারণা কর।

মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না। গতরাত্রি পুনর্ব্বার আসে না। বিগতোচ্ছ্বাস সেরূপ আর প্রদর্শন করে না। জীব দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। হে মানব, মৃতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে জীবন্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি। গতানুশোচনা হইতে বর্ত্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি। লুপ্তপন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে, সদ্যোনির্ম্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি ; বুদ্ধিমান, বুঝিয়া লও।"

রুদ্রাধ্যায়ের পরিচয়*

আমাদের আলোচ্য বিষয়টি হইতেছে বেদ। বর্ত্তমান সভায় বিস্তৃত ভাবে সমগ্র বেদের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে, তাই আমাদের এই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মহাসম্মেলনের উদ্বোধন-কৃতারূপে বেদের যে অংশ অবলম্বনে একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। ঐ অংশটি শুক্ল যজুর্বেদের অন্তর্গত—উহার নাম রুদ্রাধ্যায়। সমগ্র বেদের প্রতিপাদ্য যে কর্ম্ম, ভক্তি (উপাসনা) এবং জ্ঞান, সেই তিনটি বিষয়ই এমন সামঞ্জস্য ভাবে এই অধ্যায়ে অন্তর্নিবিষ্ট রহিয়াছে যে এই একটি অধ্যায়ের পরিচয় দিলেই সমগ্র বেদের মূলসূত্রগুলির পরিচয় দেওয়া হইবে; এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রচারিত জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়বাদ যে বেদের অন্তর্ভূত, লক্ষ্য করিলে তাহাও সহজেই উপলব্ধি হইবে।

পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামী দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে যখন এই বেলুড়মঠে আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন তখন তিনি এই বঙ্গদেশে যাহাতে বেদ চর্চ্চা হয় তন্নিমিত্ত অত্যন্ত সমুৎসুক হইয়া উঠেন। তৎকালে মঠের গ্রন্থাগারে বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি বিশেষ না থাকায় ঐ গ্রন্থগুলি যাহাতে সংগৃহীত হয় এবং অধ্যাপক রাখিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলে তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্বামিজী যখন যে বিষয়টি ধরিতেন তখন তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত যেন তিনি সে বিষয়ের একজন অদ্বিতীয় প্রচারক। বেদ প্রচার বিষয়েও তাহাই ঘটিয়াছিল। সেই সময়ে একদিন তদীয় গুরুভ্রাতা পূজনীয় প্রেমানন্দ স্বামী তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—স্বামিজী, তুমি যে বেদ বেদ করছ, তোমার বেদে

---

* রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন মহাসম্মেলনের সাধারণ সভায় (৫ই এপ্রিল) পঠিত।

কি আছে বল্‌তে পার? উত্তরে স্বামিজী তাঁহাকে বেদে কি আছে না আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া অন্ততঃ দুই ঘণ্টা-ব্যাপী বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়াছিলেন যে বেদ আলোচনার প্রভাবে সত্য সার্ব্বভৌমিক উদার ধর্ম্মের প্রতি সকলের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে।

পরমেশ্বরের অভিপ্রায় দুর্ব্বোধ্য। সহসা স্বামিজীর দেহত্যাগ হওয়ায় তাঁহার যে শেষ ইচ্ছা ছিল—বঙ্গদেশে বেদ চর্চ্চা হয় তাহা এখনও ঠিক কার্য্যে পরিণত হয় নাই। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা, আমরা স্বামিজীর এই শেষ ইচ্ছা যেন কার্য্যে পরিণত করিতে পারি। এক্ষণে আমরা উক্ত রুদ্রাধ্যায়ের পরিচয় দিব।

রুৎ জ্ঞানং রাতি দদাতি ইতি রুদ্রঃ অর্থাৎ রুদ্র শব্দের অর্থ জ্ঞানদাতা। পরমাত্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়া তদভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন ইহা শ্রুতি-প্রমাণ হইতে জানা যায়। শ্রুতিটি এই 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ'। জীব বহির্ম্মুখী চিত্তবৃত্তি লইয়া সকলের অন্তর্নিহিত সেই পরমাত্মাকে সর্ব্বান্তররূপে সংদর্শন করিতে পারে না, কেবল অমৃতত্বকাম ভাগ্যবান্ বিরল কোন কোন ব্যক্তি চিত্তবৃত্তি রোধ করিয়া তাঁহাকে প্রথমতঃ স্বীয় হৃদয়ে ও তৎপরে সর্ব্বগতরূপে সর্ব্বত্র অনুভব করিয়া থাকেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মা সর্ব্বানুস্যূত হইয়া সর্ব্বজগতে সর্ব্ব বস্তুরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন, এই তত্ত্ব লাভ করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি কৃতকৃত্য হন। তাঁহার আয়ত দৃষ্টি, উন্মুক্ত আকাশের ন্যায় নির্ব্বাধ চিদাকাশে পরমাত্মার পরমপদকে বিষয়ীভূত করে। তখন তিনি প্রজ্ঞা-দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া শিবদ জ্ঞানময় পরমাত্মাকে সর্ব্ব কল্যাণের নিদান পরম সচ্চিৎ শিব-স্বরূপে অবলোকন করেন। তিনি যে কেবল তাঁহাকে চিৎ স্বরূপে শিব স্বরূপে অনুভব করিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া যান এমন নহে, ব্যুত্থিত দশায় চিৎ সমুদ্রে ভাসমান হইয়া হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া প্রাণের আবেগে 'পুরুষ এবেদং সর্ব্বং' 'ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং' 'আত্মৈবেদং সর্ব্বং' 'ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা' 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—'তিনিই এই সব' 'এই সবই তিনি' এই ভাবে তাঁর পরিচয় দিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠেন। এইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তির আকুল প্রাণের অভিব্যক্তিই এই রুদ্রাধ্যায়। ইহা শুক্ল-

যজুর্বেদের ষোড়শ অধ্যায়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যজুঃ মন্ত্র বলিতে 'অনিয়ত পাদাক্ষর' অর্থাৎ গদ্যাত্মক মন্ত্রগুলিকেই বুঝায়। রুদ্রাধ্যায়ে কতকগুলি ঋক্ মন্ত্রও আছে। সেগুলি বৈদিক গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দে রচিত। অবশিষ্টগুলি যজুঃ মন্ত্র। অধ্যায়ের প্রথম হইতে ষোড়শটি মন্ত্র ঋক্ অর্থাৎ গদ্যে রচিত। পরে ৩০টি মন্ত্র যজুঃ অর্থাৎ গদ্যে রচিত। তৎপরে ১৭টি মন্ত্র ঋক্ এবং অধ্যায়ের শেষ তিনটি মন্ত্র যজুঃ। সর্ব্বসমেত অধ্যায়টিতে ৬৬টি কণ্ডিকা আছে। এই রুদ্রাধ্যায় তৈত্তিরীয় সংহিতা অর্থাৎ কৃষ্ণ-যজুর্বেদেও পরিদৃষ্ট হয়—তবে শুক্ল-যজুর্বেদের সহিত তাহার স্থলে স্থলে মন্ত্রগত বৈষম্য আছে।

কাশীধামে ৺বিশ্বনাথের মন্দিরে ভক্তগণ আসিয়া শিবের এই মহামহিম্নঃ স্তব পাঠ করিয়া থাকেন। আমরা এক্ষণে এই রুদ্রাধ্যায়টি সরলভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিব। অধ্যায়টি সমগ্র পাঠ করিলে দেখা যায় সপ্তদশ মন্ত্র 'নমো হিরণ্যবাহবে সেনান্যে দিশাং চ পতয়ে নমঃ' ইত্যাদি ক্রমে সপ্ত চত্বারিংশ মন্ত্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্র 'নমঃ' 'নমঃ' এই প্রকার পুনঃ পুনঃ নমস্কার বচন। এই অত্যাদর সূচক বারংবার নমস্কার বচন দেখিলে মনে হয়, ভক্ত শ্রীভগবান্‌কে নিরন্তর নমস্কার করিয়াও যেন প্রাণে তৃপ্তি পাইতেছেন না। সেই নমস্কারে তাঁহার অলং প্রত্যয় অর্থাৎ যথেষ্ট হইয়াছে এই প্রকার বোধ হইতেছে না। অথর্ববেদের ভাষায় বলিতে হয়—"নমঃ সায়ং নমঃ প্রাতর্নমো রাত্র্যা নমোদিবা" (১১শ কাণ্ড ১ম অনুবাকে ৬ষ্ঠ সূক্তে) অর্থাৎ হে রুদ্র! সায়ং কালে তোমায় নমস্কার, প্রাতঃকালে তোমায় নমস্কার, রাত্রি কালে তোমায় নমস্কার। দিবাভাগেও তোমায় নমস্কার। অথবা ঐ বেদের একোনবিংশকাণ্ডে প্রথম অনুবাকে নবম সূক্তের ভাষায় বলিতে হয়, "স্বস্তি নো অস্ত্বভয়ং নো অস্তু নমোঽহোরাত্রাভ্যামস্তু" 'হে পরমাত্মন্! আমাদের কল্যাণ হউক, সংসারভয় বিদূরিত হউক তোমায় নিরন্তর নমস্কার'। এই প্রাণ ঢালা নমস্কারই শ্রীভগবানের পরা পূজা। এই নমস্কারেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। এই নমস্কারের মহিমাব্যঞ্জক একটি ঋক্ আমরা উদ্ধার করিতেছি "নম ইদুগ্রং নম আ-

বিবাসে নমো দাধার পৃথিবীমুতস্থাং। নমো দেবেভ্যো নম ঈশ এষাং কৃতং চিদেনো নমসা বিবাসে॥" (ঋগ্‌বেদ অ ৪।অ ৮। ব ১২)।

'নমস্কারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমি নমস্কারের পরিচর্য্যা করি। এই নমস্কারই পৃথিবী ও দ্যুলোক ধারণ করিয়া রহিয়াছে। অতএব দেবগণের উদ্দেশে নমস্কার করি। তাঁহারা নমস্কারে বশীভূত হন। আমাদের আচরিত দুরিত নমস্কারের দ্বারাই ধ্বংস করি। এই নমস্কারই আত্মসমর্পণ যোগের ভিত্তি। একমাত্র এই নমস্কারের দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।' তাই শ্রীভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন 'মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু, মামেবৈষ্যসি'—'আমার উপাসনা কর। আমাকে নমস্কার কর আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।' নবম অধ্যায় ৩৪ শ্লোক) ভক্তির চরম অবস্থায় বাহ্যপূজা এই নমস্কারে আসিয়া পর্য্যবসিত হয়।

এক্ষণে আমরা মূলের ভাষায় সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যপূর্ণ কাব্যরসের অপূর্ব্ব প্রস্ফুরণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। যে স্থলে ঋষি-কবি সাগর তীরে দণ্ডায়মান হইয়া প্রেমভরে গাহিতেছেন আমরা সেই স্থলটি উদ্ধৃত করিয়া অনুবাদ দিতেছি—

"নমঃ পার্য্যায় চ বার্য্যায় চ নমঃ প্রতরণায় চোত্তরণায় চ
নমস্তীর্থ্যায় চ কূল্যায় চ নমঃ শাষ্প্যায় চ ফেণ্যায় চ।
নমঃ সিকত্যায় চ প্রবাহ্যায় চ নমঃ কিংশিলায় চ ক্ষয়ণায় চ
নমঃ কপর্দ্দিনে চ পুলস্তয়ে চ নম ইরিণ্যায় চ প্রপথ্যায় চ॥"

শুক্ল-যজুর্বেদসংহিতা ১৬শ অধ্যায় ৪২।৪৩ মন্ত্র।

'হে শম্ভো, তুমি সাগরের পরপারে বিদ্যমান তোমায় নমস্কার, তুমি সাগরের এ পারেও বিদ্যমান তোমায় নমস্কার; তুমি বৃহৎ অর্ণবপোতে বিদ্যমান তোমায় নমস্কার; তুমি ক্ষুদ্র তরীতেও বিদ্যমান তোমায় নমস্কার। তুমি সাগর গর্ভে বিদ্যমান তোমায় নমস্কার; তুমি সাগরের কূলে বিদ্যমান তোমায় নমস্কার। তুমি তীরস্থ শষ্প্‌রাজিতে বিদ্যমান তোমায় নমস্কার; তুমি সাগরের ফেণরাশিতে বিদ্যমান তোমায় নমস্কার; তুমি ঐ সৈকতে বিদ্যমান তোমায় নমস্কার; তুমি ঐ সাগরসঙ্গতা নদীপ্রবাহে বিদ্যমান তোমায় নমস্কার। তুমি ঐ

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলখণ্ডে বিদ্যমান তোমায় নমস্কার, তুমি ঐ জলরাশির স্থির প্রদেশে বিদ্যমান তোমায় নমস্কার।'

হে জটাধারিন্, হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্ তুমি তৃণশূন্য উষরভূমিতেও বিদ্যমান তোমায় নমস্কার, আবার তুমি ঐ পথস্থ পয়ঃপ্রণালীতেও বিদ্যমান তোমায় নমস্কার।' এবম্প্রকার বর্ণনাগুলি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির সরল সপ্রেম দৃষ্টিতে জগৎ কেমন পরমাত্মার রঙে অনুরঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে তাহারই চিত্র স্বরূপ।

এক্ষণে দেখা যাক্ দার্শনিক দৃষ্টিতে এই বর্ণনাগুলির তাৎপর্য্য এবং মূল্য কি। প্রথমতঃ দ্বৈতবাদিগণের দিক্ হইতে বলা যাইতে পারে যে, এ বর্ণনাগুলি তাঁহাদের ভাবের আদৌ বিরোধী নহে। কারণ দ্বৈতবাদিগণ ভক্ত। তাঁহারা পরম সৌন্দর্য্যের নিধি শ্রীভগবান্‌কে উপাস্যরূপে, সর্ব্বদা প্রাণের নিকটে রাখিয়া তিনি ও আমি ভিন্ন অতএব তাঁহার উপাসনা করিয়া প্রাণ জুড়াই ; জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র সর্ব্ববস্তুতে তাঁহার স্পর্শ অনুভব করিয়া সৌন্দর্য্য-সাগরে মগ্ন থাকি এটা তাঁহাদের প্রাণের কথা। সুতরাং তিনিই সর্ব্বান্তর্য্যামী-রূপে সকল আধারে রহিয়াছেন, তাঁহাকে নমস্কার। এই ভাবে তাঁহাকে ভজনা করিতে তাঁহাদের মতে কোন বাধা হয় না। তাঁহারা অনায়াসে এই রুদ্রাধ্যায় মঙ্গলময় পরমাত্মার উপাসনায় বিনিয়োগ করিয়া সুখী হইতে পারেন।

আবার অদ্বৈতবাদিগণও এই বর্ণনায় তাঁহাদের ভাবের অবিরোধী ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির ব্রহ্মরস পানের প্রশান্ত চিত্র মাত্র বুঝিয়া, স্বয়ং পরম আনন্দে চিৎ সমুদ্রে মগ্ন হইতে পারেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মসত্তাতিরিক্ত যখন সত্তা নাই, সমস্তই যখন তাঁহাতে অজ্ঞান কল্পিত, তখন জগতের সকল বস্তু ও ব্যক্তিই চিৎ সমুদ্রে নিমজ্জিত। এই সকল বস্তু ও ব্যক্তির অন্তরে ও বাহিরে চিন্মাত্রই বিদ্যমান। 'চিৎ'ই যেন তত্তদ্, আকারে আকারিত হইয়াছেন। এই 'চিৎ'ই 'সৎ' ও 'আনন্দ' স্বরূপ। বাস্তবিক এই সচ্চিদানন্দ কোন কালেই কোন আকার ধারণ করেন না, কেবল জীবকে অজ্ঞান হইতে প্রবুদ্ধ করিবার নিমিত্ত

জননীর ন্যায় হিতৈষিণী শ্রুতিদেবী কৃপা করিয়া 'চিৎ' এতচ্চরাচররূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করেন। বাস্তবিক চিৎ সদা উন্মুক্ত, আকাশের ন্যায় চিরব্যাপক ও অসংশ্লিষ্ট। মিথ্যা উপাধিগত দোষে দুষ্ট নহেন। তাই এই রুদ্রাধ্যায়ে দেখিতে পাই 'নমো বঞ্চতে পরিবঞ্চতে' প্রতারকদিগকে নমস্কার, 'স্তেবানাং পতয়ে নমঃ' গুপ্ত চোরদিগের সর্দ্দারকে নমস্কার, 'তস্করাণাং পতয়ে নমঃ' প্রকাশ্য দস্যুদিগের দলপতিকে নমস্কার ইত্যাদি উপাধি দোষে অসংপৃক্ত আত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই নমস্কার উক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই উপাধি তত্ত্বটি বুঝাইবার নিমিত্ত আমরা বর্ত্তমান যুগের ত্রিকালদর্শী কবি ও সমাহিত ঋষি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 'মুখোসের' দৃষ্টান্তটি ব্যবহার করিব। তিনি পরমাত্মার সৌন্দর্য্য সাগরে সতত সমাহিত থাকিতেন এবং ব্যুত্থিত দশায় দেখিতেন—জগৎ সেই চিদানন্দে ভরিয়া রহিয়াছে তাই সেই অবস্থায় বলিতেন, "ওগো, দেখ্‌ছি কি জান, সচ্চিদানন্দ রামই যেন এক একটি মুখোস পরে সেজে রয়েছেন।" এক্ষণে তাঁহার এই সরল অথচ গভীর ভাবব্যঞ্জক দার্শনিক কথাটি বিশ্লেষণ করিয়া বোঝা যাক্। মুখোস পরা ব্যক্তি যেমন মুখোসের দোষ গুণে লিপ্ত নহে অথচ বালকেরা মুখোস পরা ব্যক্তি দেখিয়া মুখোসটি ভীতিপ্রদ হইলে ভয়ে কাতর হয় এবং হাস্যজনক হইলে উচ্চহাস্য করিয়া থাকে অথচ সেই ব্যক্তি যেমন স্বয়ং উহা দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না পরন্তু সাক্ষিরূপে অবস্থান করে, সেই প্রকার চিদানন্দ ব্রহ্ম মায়ার মুখোস পরিধান করিয়া দৃশ্যমান জগদ্রূপে প্রকাশ পাইতেছেন অথচ জগতের দোষ গুণে লিপ্ত নহেন। জীব সেই ব্রহ্মের এই মুখোস পরা রূপ দেখিয়া অজ্ঞান বশতঃ সুখী বা দুঃখী হইয়া থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মের এই আবরণ উন্মোচন করিয়া, তিনি যথার্থতঃ যাহা সেই চিদানন্দের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মায়াশবলিত ব্রহ্মকে সম্বোধন করতঃ বলেন—

"নমস্তক্ষভ্যো রথকারেভ্যশ্চ বো নমো নমঃ কুলালেভ্যঃ
কর্মারেভ্যশ্চ বো নমো নমো নিষাদেভ্যঃ পুঞ্জিষ্ঠেভ্যশ্চ বো

নমো নমঃ শ্বনিভ্যো মৃগয়ুভ্যশ্চ বো নমঃ।"

(শু, যজুঃ ১৬শ অধ্যায় ২৭ কণ্ডিকা)।

হে মঙ্গলময় পরমাত্মন্ 'তুমিই সূত্রধার তোমায় নমস্কার, তুমি রথকার তোমায় নমস্কার, তুমি কুম্ভকার তোমায় নমস্কার, তুমি কর্ম্মকার তোমায় নমস্কার, তুমি চণ্ডাল তোমায় নমস্কার, তুমি পক্ষী ঘাতক ব্যাধ তোমায় নমস্কার, তুমি সারমেয়-সাথী শিকারী তোমায় নমস্কার, তুমি মৃগয়াকারী তোমায় নমস্কার।' বর্ত্তমান যুগের দার্শনিক মনীষী শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীর গ্রন্থাদিতে যে 'দরিদ্র-নারায়ণ' 'মূর্খ-নারায়ণ' 'চণ্ডাল-নারায়ণ' প্রভৃতি বাক্য দেখা যায় সকলে জানিয়া রাখুন তাহারও মূল এই বেদ। তিনি বেদ-মূলক সনাতন ধর্ম্মের অদ্বিতীয় প্রচারক ছিলেন। কেবল বর্ত্তমান যুগের উপযোগী করিয়া সেই সনাতন ধর্ম্মকে আধুনিকের ভাষায় আধুনিক ভাবে আমাদিগের নিকট প্রচার করিয়াছেন। তাই অনেক স্থলে তাঁহাকে বলিতে দেখা যায় "সনাতন বেদই আমাদের একমাত্র শাস্ত্ররূপে পরিগৃহীত হইবে।" একথা তিনি স্পষ্ট করিয়াই মঠের নিয়মাবলীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক এই পর্য্যন্ত রুদ্রাধ্যায়ের যে সামান্য পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহাতেই দেখা যায় যে, উপাসক ভক্তগণ এবং সমদর্শী জ্ঞানিগণ সকলেই স্ব স্ব ভাবানুসারে এই অধ্যায় লইয়া উপভোগ করিতে পারেন। দ্বৈতবাদী ভক্তগণ তাঁহাকে আপন হইতে পৃথক্ সর্ব্বান্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বত্র দেখিয়া এই রুদ্রাধ্যায়ের দ্বারাই শ্রীভগবানের শ্রীচরণে প্রণত হইয়া সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিবেন। আর অদ্বৈতবাদী জ্ঞানিগণ তাঁহাকে নিজের প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মা রূপে অনুভব করিয়া তাঁহাতে মিশিয়া আত্মহারা হইয়া যাইবেন। এইরূপে সকলের প্রাণের পিপাসা মিটাইয়া দিলেও, ভক্তিতত্ত্ব কেমন সমুজ্জল ভাবে এই রুদ্রাধ্যায় মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছে তাহাও দেখিবার বিষয়। সাধারণের ধারণা, ভক্তি পৌরাণিক যুগের সৃষ্টি, বেদে উহার স্থান নাই। কারণ তাঁহাদের মতে বেদে 'ভক্তি' এই শব্দটিই তো বড়

দেখা যায় না—অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 'যস্য দেবে পরাভক্তিঃ এই ভক্তি কথাটি পাওয়া যায়। একথার উত্তরে বলিতে হয় তাঁহাদের ধারণা অমূলক, কারণ ভক্তি শব্দটির প্রয়োগ যথেষ্ট না থাকিলেও, ভক্তি তত্ত্বের প্রাণ যে ভগবন্নমস্কার ভগবন্নির্ভরতা তাহা তো ভূরি ভূরি দেখা যায়। এই অধ্যায়টিই তো তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মনে হয়, বেদের এই ভক্তিতত্ত্বই মহাভারত আদি পুরাণে বিশেষতঃ গীতা মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া "নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব" "নমো নমস্তেঽস্তু সহস্র কৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে," ইত্যাদি বাক্যে বেদের ভক্তিতত্ত্বের প্রতিধ্বনি মাত্র করিয়াছে।

তাহার পর আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার এই যে, ভক্তের হৃদয়ে ভক্তি দৃঢ় করিবার জন্য শ্রীভগবানের সাকার বিগ্রহের ধারণাও এই রুদ্রধ্যায়ে পরিস্ফুটরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রথমতঃ প্রথম মন্ত্রটিতে দেখা যায় তাঁহার দুই খানি বাহু যথা 'নমস্তে রুদ্র মন্যব উতো ত ইষবে নমঃ। বাহুভ্যামুত তে নমঃ।' 'হে রুদ্র তোমার ক্রোধকে নমস্কার, তোমার বাণকে নমস্কার। তোমায় বাহুযুগলকে নমস্কার।'

পরে দ্বিতীয় মন্ত্রটিতে দেখা যায় তিনি যে বিগ্রহবান্ দেবতা তাহার পরিচয়, যথা—

"যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাঽপাপকাশিনী।
তয়া ন স্তন্বা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি।"

'হে কৈলাসবাসিন্ রুদ্র! তোমার উগ্রমূর্ত্তি পরিহার করিয়া সুখসেব্য পাপাপনোদনকারী মঙ্গলময় মূর্ত্তি আমাদিগের অভিমুখে প্রদর্শন কর।'

সপ্ত চত্বারিংশৎমন্ত্রে দেখা যায়—তাঁহার রূপ গাঢ়, রক্তবর্ণ—

"দ্রাপে অন্ধসস্পতে, দরিদ্র নীল লোহিত।"

'হে রুদ্র, তুমি পাপীদিগকে কুৎসিত গতি প্রদান কর, তুমি সোমের পালক, তুমি অদ্বিতীয় এবং তুমি নীলকণ্ঠ ও রক্তবর্ণ।' তৎ-পরবর্ত্তী মন্ত্রে দেখা যায়—তিনি কপর্দ্দী অর্থাৎ জটাধারী—"ইমা রুদ্রায়

তবসে কপর্দ্দিনে ক্ষয়দ্বীরায় প্রভরামহে মতীঃ।" 'যিনি জটাধারী এবং শূরগণের নিবাস স্থল সেই মহান্ রুদ্র দেবতাকে আমরা আমাদিগের বুদ্ধি সমর্পণ করি।' তৎপরের মন্ত্রে দেখা যায়—তাঁহার শরীর মঙ্গলময়—

"যাতে রুদ্র শিবা তনূঃ—তয়া নো মৃড় জীবসে।"

'হে রুদ্র, তোমার যে মঙ্গলময়ী তনু তাহা দ্বারা আমাদিগের জীবন সুখী কর।'

৫১ মন্ত্রে দেখা যায়—তিনি ব্যাঘ্রত্বক্ পরিহিত ও পিনাকধারী—

"মীঢুষ্টম শিবতম শিবো নঃ সুমনাভব।
পরমে বৃক্ষ আয়ুধং নিধায় কৃত্তিং বসান আচর পিনাকং বিভ্রদাগহি।"

'হে অভিলষিত প্রদাতা, হে মঙ্গলময় আমাদিগের উপর প্রসন্ন ও হৃষ্টচিত্ত হও। তোমার ত্রিশূলাদি অস্ত্র উন্নত বৃক্ষে স্থাপন কর। ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিত হইয়া ধনুঃ মাত্র ধারণ করিয়া আমাদিগের সমীপে এস।'

সপ্তম মন্ত্রে দেখা যায়—তিনি নীলকণ্ঠ ও গাঢ় রক্তবর্ণ—"অসৌ যোঽবসর্পতি নীলগ্রীব বিলোহিতঃ।" ঐ নীলকণ্ঠ ও গাঢ় রক্তবর্ণ দেবতা যিনি আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছেন।'

৫২ মন্ত্রে—তাঁহাকে বিলোহিত বলা হইয়াছে। "বিকিরিদ্র বিলোহিত নমস্তে অস্তু ভগবঃ।" 'যিনি উপদ্রব হইতে রক্ষা করেন, যিনি গাঢ় রক্তবর্ণ তাঁহাকে নমস্কার।'

উপরি ধৃত মন্ত্র বচন হইতে দেখা যায়, রুদ্রকে কপর্দ্দী (জটাধারী) কৃত্তিং বসানঃ (ব্যাঘ্রত্বক্ পরিহিত) পিনাকং বিভ্রদ্ (পিনাকী—ধনুর্দ্ধারী) বিলোহিতঃ (গাঢ় রক্তবর্ণ) নীলগ্রীবঃ (নীলকণ্ঠ) ইত্যাদি রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। রুদ্রের এইরূপ রূপ বর্ণনা আমাদিগকে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত শিবের ধ্যান-বিশেষের স্মরণ করাইয়া দেয়। তন্ত্রসারে নীলকণ্ঠ শিবের ধ্যানে দেখিতে পাই—

"বালার্কাযুত তেজসং ধৃতজটাজূটেন্দু খণ্ডোজ্জ্বলং
—ব্যাঘ্রত্বক্পরিধানমব্জনিলয়ং
শ্রীনীলকণ্ঠং ভজে—।"

ইহা হইতে অনুমান হয় তন্ত্রশাস্ত্রও বেদ মূলক। এবং তন্ত্রোক্ত সাকার উপাসনা, বেদ হইতেই আসিয়াছে। বেদ নিরাকার নির্গুণ তত্ত্বের ন্যায় সমভাবে সাকার সগুণ ঈশ্বরের উপাসনার প্রচার করিয়া থাকেন। আর সাকার মূর্ত্তিতে যে শ্রীভগবানের উপাসনা হয় তাহা এই রুদ্রাধ্যায়ে সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। শ্রীভগবান্‌কে সকল কল্যাণের নিদান জানিয়া ভক্ত প্রাণের সকল অভাব অভিযোগ তাঁহারই নিকট জ্ঞাপন করেন, তাহাও আমরা নিম্নোক্ত মন্ত্রগুলিতে দেখিতে পাই—

প্রার্থনা হইতেছে "মীঢ় স্তোকায় তনয়ায় মৃড"—'হে কামনা কল্পতরু —অভিলাষ-পূরণ-কারিন, আমাদিগের সন্তান সন্ততিকে সুখী কর।' "আসাং প্রজানামেষাং পশূনাং মাভে র্মা রোঙ্ মোচনঃ কিঞ্চনামমৎ" 'হে রুদ্র এই প্রজাগণের এই পশুগণের ভয় হরণ কর ইহাদিগকে সকল পীড়া হইতে রক্ষা কর।'

"যথা শমসদ্দ্বিপদে চতুষ্পদে
বিশ্বং পুষ্টং গ্রামে অস্মিন্ননাতুরম্।"

'হে রুদ্র, আমাদিগের পুত্রাদি আত্মীয়স্বজন এবং গবাদি পশু সকল কল্যাণভাজন হউক, আমাদিগের বাসগ্রাম নিরাপদ হউক এবং প্রতিবেশীগণ হৃষ্ট পুষ্ট হউক' ইত্যাদি প্রার্থনাগুলি গীতা কথিত অর্থার্থী ভক্তের পরিচয় প্রদান করে।

যে ভগবান্ ভক্তহৃদয়ের সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া তাহাকে স্বরূপ জ্ঞান দানে, গীতোক্ত চতুর্বিধ ভক্তের শেষ শ্রেণীভুক্ত জ্ঞানী পদবাচ্য করেন, এক্ষণে সেই ভগবানের নিকট প্রণত হইয়া আমরা রুদ্রাধ্যায়ের শেষ পরিচয় প্রদান করিব।

"নমঃ শংভবায় চ ময়োভবায় চ, নমঃ শঙ্করায় চ
ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।"

'যাঁহা হইতে পরম কল্যাণ নিঃশ্রেয়স উপস্থিত হয় তাঁহাকে নমস্কার, যাঁহা হইতে সাংসারিক অভ্যুদয় হয় তাঁহাকে নমস্কার, যিনি ঐহিক ও পারত্রিক সুখ বিধান করেন তাঁহাকে নমস্কার,

যিনি স্বয়ং শিবস্বরূপ তাঁহাকে নমস্কার, যিনি ভক্তকেও শিবস্বরূপ করিতে পারেন তাঁহাকে নমস্কার ।'

—ওঁ—

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ ।

শক্তিক্ষিপ্ত

দাঁড়াইতে চাহি আজ অনন্ত বিজয়ে,
অপার শকতি গর্ব্বে, ভীম অভ্যুদয়ে,
দৃপ্ত দর্পে, ক্ষিপ্ত প্রাণে ; নম্রতা, বিনয়,
মিনতি, ক্রন্দন, আর ভ্রূকুটির ভয়—
সব দলি সর্ব্বজয়ী যেন প্রভঞ্জন ;
পিছে টানে যেই দুঃখ, যে ক্লেশ বেদন,
তারে অন্তরের শক্তি-তরবারে কাটি,
অভাব-দীনতা-মাথে মেরে শক্তি-লাঠি,
দুঃখ-দুঃশাসন-বক্ষ চিরিয়া চিরিয়া
বীভৎস আনন্দে মাতি নাচিয়া নাশিয়া,
আমারে করিতে শক্তিমান বলবান
কার কাছে ভিক্ষা চাই ?—ভৈরব সমান
একা মোর চিত্তে জাগে দুর্ব্বার দুর্জ্জয় ;
ধরণী শ্মশান করি প্রক্ষেপি প্রলয় ।

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত ।

আকাশ ও তাহার স্পন্দন*

শূন্য কিসের দ্বারা পূর্ণ? গ্রহ-নক্ষত্রের মাঝখানে যে অবকাশ সেখানে কি আছে? বাতাস হতে পারে না। বায়ুমণ্ডল ত কিছুদূর গিয়েই শেষ। তারপর আর কিছুই টের পাওয়া যায় না, কেবল বিষম শীত। কিপ্‌লিং বলেন, উহাই আকাশ। ও জিনিষটা একেবারে চরম ঠাণ্ডা। আমরা পৃথিবীর ওপর ফারেনহাইট তাপ যন্ত্রের ৫০০° উত্তাপ পর্য্যন্ত সাধারণতঃ দেখতে পাই। এর বেশী তাপ হলে অনেক ধাতুও গলে যায়। আর উত্তাপ-যন্ত্রের নীচে দিকের ৫০০° শীত হচ্চে আকাশের উত্তাপ। দেশ (Space) এই আকাশ নামক পদার্থ দিয়ে পরিপূর্ণ। আমরা সাধারণতঃ যাকে জড়-পদার্থ বলি আকাশ জিনিষটা তা নয়। এ জিনিষটা সমস্ত দেশ সম্পূর্ণ জুড়ে রয়েছে, তার মধ্যে একটুও ফাঁক নেই। এর মত সর্ব্বব্যাপী পদার্থ জড়-জগতে আর দেখা যায় না।

এখন জগৎকে বুঝতে গেলে এই আকাশের সঙ্গে কি সম্বন্ধ এবং এর কার্য্যকারিতাই বা কি আমরা একটু বিচার করে দেখব। মানুষ এমন অকৃতজ্ঞ যে, যে জিনিষটা নইলে সে এক মুহূর্ত্তও বাঁচতে পারে না, সে জিনিষটাকে সে অস্বীকার করে, বা তার বিষয় একটু চিন্তাও করে না। সাধারণতঃ লোকে বলে থাকে যে, আমাদের এমন কোনও ইন্দ্রিয় নেই যা দিয়ে এটাকে আমরা সামনাসামনি প্রত্যক্ষ করতে পারি। কিন্তু আমরা এর স্থূল পরিণাম-গুলো খুব জানতে পারি; বাতাসটাকে যেমন আমরা সামনাসামনি প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, কিন্তু এর নানা রকমের কাজ দেখে আমরা এটাকে বুঝতে পারি। পৃথিবীর চারি পাশে যে বায়ুমণ্ডল রয়েছে শিশুকে

---

* অলিভার লজের The Ether and its Vibrations নামক প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

না বোঝালে সে বুঝতে পারে না। আমরা বাতাসটাকে বুঝি তার প্রকার (Modification) দেখে—যেমন ঝড়। কিম্বা যদি একটা লম্বা গোল-মুখ কাঁচপাত্রের (Jar) মধ্যে একটুকরো জ্বলন্ত কাগজ ফেলে দিয়ে সেটাকে খানিকটা খালি করে ফেলা যায়, তা হলে তার মুখটা হাত দিয়ে চেপে ধরলেই বায়ুমণ্ডলের চাপ বেশ অনুভব করা যায়। বায়ুমণ্ডলের এত বড় চাপটা এমন সমান ভাবে আমাদের দেহের ওপর রয়েছে এবং তাতে আমরা এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে সেটা আমরা বুঝতেই পারি না। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারগুলো জানতে গেলেও একজন গ্যালিলিও, টরিকেলি বা প্যাসকেলের দরকার। তারপর দেখ, এ সব পরীক্ষা ছাড়াও আমরা বাতাসের আর একটা প্রকার সর্ব্বদা অনুভব করছি যেগুলোকে আমরা গোলমাল, শব্দ বা সঙ্গীত আখ্যা দিয়ে থাকি। কিন্তু শব্দ-বিজ্ঞান না জেনেও মানুষ চিরকাল সঙ্গীত শুনে এসেছে, আকাশকে বাহক রূপে না জেনেও লোকে ছবি দেখে আসছে।

ঝড়ই হচ্ছে বাতাসকে বোঝবার প্রকৃষ্ট উপায়। সেই রকম আকাশের একটা ঝড় দেখবার জন্য অনেক চেষ্টা হচ্ছে। পৃথিবী অনেকখানি জায়গা নিয়ে প্রচণ্ড গতিতে আকাশের মধ্য দিয়ে ছুটেছে, কাজেকাজেই আকাশের একটা স্রোত আমাদের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। আমরা তার কিছুই অনুভব করতে পারছি না এবং যে সকল অতি সূক্ষ্ম যন্ত্র তৈরী হয়েছে তাতেও কিছু সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। সেই জন্য সন্দেহও হয়ে থাকে আকাশের মত কোনও কিছু বাহক (Medium) আছে কি না। আবার আকাশটাকে একেবারে শূন্যও (Vacuum) করে ফেলা যায় না, সেই জন্য বাতাসের মত তার চাপও অনুভব করা অসম্ভব। একটা সাধারণ চাপ যন্ত্র বলে দেয় যে বায়ুমণ্ডলের চাপ প্রতি বর্গফুটে এক টন, কিন্তু আকাশের চাপ জানবার কোনও যন্ত্র নেই, অথচ তার চাপ বাতাসের তুলনায় অনন্তগুণে অধিক। এই চাপটা বাতাসেরই মত এমন সমান ভাবে আমাদের ওপর রয়েছে এবং তাতে আমরা এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে

আমরা তা একেবারে বুঝতে পারি না। যেমন গভীর সমুদ্রের মাছ জলের অস্তিত্বটা বুঝতেই পারে না। আকাশ সম্বন্ধে আমাদেরও ঠিক সেই অবস্থা

কিন্তু ওর স্পন্দন (Vibration) আমরা অনুভব করতে পারি। একটা জ্বলন্ত আগুনের সামনে হাত ধরলে যে উষ্ণতা আমরা অনুভব করি তা বাতাসের নয়, বাতাস ঠাণ্ডাই থাকে, বাতাস Radiation দ্বারা গরম হয় না। যা আমরা অনুভব করছি আকাশের স্পন্দন বশতঃ। এই স্পন্দন এসে আমাদের ত্বকে আঘাত করায় উত্তাপ নামক বেদনার Feeling আমাদের অনুভব হয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা আকাশের স্পন্দনও অনুভব করি না, আকাশের স্পন্দন ত্বক যন্ত্রে (Tactual Nerves) যে উত্তাপ-স্পন্দনের সৃষ্টি করে সেইটিই আমাদের বেদনা (Feeling) হয়। যদি আমরা রোদে গিয়ে দাঁড়াই না হলে একটু মন সংযোগ করলেই আকাশের চাঞ্চল্য আমরা বুঝতে পারি। এরই সংঘাত আমাদের চামড়া কাল করে এবং পর্ব্বত শিখরে আমাদের গায়ে ফোসকা করে দ্যায়। আবার আমাদের দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ বৃদ্ধি করে সর্দ্দিগর্ম্মীর কারণ হয়।

সূর্য্য যে আকাশে আলোক-তরঙ্গের (অর্চ্চিঃ-সন্তান সৃষ্টি করে, তাকে আসতে হয় ৯২০ লক্ষ মাইল অতি শীতল আকাশের মধ্য দিয়ে। এই দূরত্ব অতিক্রম করতে তার লাগে ৮ মিনিট। তারা পৃথিবীতে এসে পৌঁছে অনেক রকমে নিজেদের অস্তিত্বের পরিচয় দেয়। তাদের স্পন্দনের দ্বারা ছায়া-চিত্রের রাসায়নিক জিনিষগুলোকে কালো করে গাছের পাতারা এরই সাহায্যে মাটির রসকে খাদ্য ও 'কলায়' (Tissue) পরিণত করে। সমস্ত উদ্ভিদ-জগৎ আকাশের সাহায্যে বেঁচে আছে। তারা নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করে এই আকাশ থেকে। কোন কোন গাছ এই শক্তি বহু বর্ষের জন্য সঞ্চয় করে রাখে এবং পরে যা কয়লায় বা কাঠে পরিণত হয়ে যখন পোড়ে তখন সেই সুপ্ত-শক্তির (Dormant energy পুনঃ প্রকাশ পায় এবং যেখানকার জিনিষ তা সেখানে গিয়েই মিশে।

ত্বকের সব জায়গায় এই আকাশের আলোক-স্পন্দন এসে আঘাত করে। কিন্তু প্রাণীদেহের একটা জায়গা কেবল সেটাকে বিশেষ করে ধরতে পারে। সেই জায়গাটাকে আমরা চক্ষু বলে থাকি। চক্ষু কেবল বাইরের জিনিষই দেখতে পায় তার রূপের যে বাহক (Medium) এবং তার স্পন্দন, বা যন্ত্রের (Optical Nerves) কিছুই জানতে পারে না। এই স্পন্দনের মধ্যে বাস করেও লোকে সে বিষয়ে অজ্ঞান। ঘটছে এই পর্য্যন্ত, তার বেশী কিছু বিশ্লেষণ করে কেউ দেখতে চায় না। বহু পূর্ব্বে প্রাচ্যে কয়েকটি মনীষীর নজর একবার এদিকে পড়েছিল, কিন্তু সে সব ধারণা অস্পষ্ট। বর্ত্তমানে, উনিশ শতাব্দীর প্রথমে প্রতীচ্যের জনকয়েক লোক আকাশের আবিষ্কারে প্রযত্ন আরম্ভ করেন। এর পর কতকগুলো যা তা মত বেরুল বা একটা অনুমান আর একটা মত নিয়ে কেটে দেওয়া হল, কিন্তু তার পর বিদ্যুৎ ও চৌম্বক-শক্তি নিয়ে আলোচনা করতে করতে এখন এটাকে আর অস্বীকার করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এখন এর সাহায্যে আমরা তার ছাড়াও সংবাদ পাচ্ছি (Radio Telegraphy)। এদিয়ে গাড়ী কল চালন হচ্ছে, আমেরিকায় এর সাহায্যে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হয়। এর মধ্যে বাস করে, এর সাহায্য নিয়ে এটাকে অস্বীকার করা এখন পাগলামি।

আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধেও ঠিক তাই। আমরা সে রাজ্য সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ এবং কালা। আমাদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে আমরা সুখী। আমাদের অনেকেই পশুর চাইতেও অধম দৃষ্টি। খাওয়া দাওয়ার বেশী, লোকের নজর আর চলে না। উচ্চ বিষয় সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতে এলে তাদের ঘৃণা করাটা একটা সভ্যতা। জ্ঞানের অগ্রদূতদের ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেওয়াটা তাঁদের একটা ব্যবসায়। তাঁরা জানেন না জ্ঞানের রাস্তা কত দুর্গম, কত কষ্ট করে এগুতে হয়, কত মিথ্যা সংস্কার এবং জড়তার সঙ্গে লড়াই করতে হয়। তবে, হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত করা, যা তা বকা বা শিশুর মত যা তা বিশ্বাস করা উচিত নয়।

সত্য কোন মতবাদ বা অন্ধ-জ্ঞানকে অপেক্ষা করে না। সে সদা জাগ্রত, তা তুমি যেমন করেই নিজের মনকে প্রবোধ দাও, তাতে তোমার সুখ সুবিধা হোক আর নাই হোক। লোকে মনে করত তারাগুলো পৃথিবীর মত একটা কিছু, কিন্তু তা বলে তাদের সূর্য্যত্ব নষ্ট হয়নি। জ্ঞানের রুদ্র-মূর্ত্তি দেখে খরগোসের মত চোখ বুজে বেশ পালিয়েছি বল্লে চলবে না। সে তোমার স্বার্থ আসক্তির স্বপ্ন কুঞ্জে বজ্র নিক্ষেপ করবেই করবে, তোমাকে সকল কুসংস্কার থেকে মুক্তি দেবেই। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের চাইতে আমাদের জ্ঞান ঢের বেড়েছে আবার আমাদের ছেলেরা আমাদের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের মতবাদ শুনে হাসবে। তাতে দুঃখ কি? জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার ত ফুরিয়ে যায়নি। তুমি যে সত্য জেনেছ তা প্রকাশ কর। লোকে হয় ত তখন নাও বুঝতে পারে, পরে বুঝবে। তোমার জ্ঞানটাও যে অপ্রতিহত সত্য তাও নয়, জ্ঞান-সৌধের একটা সিঁড়ি মাত্র। সাধারণে উচ্চ-চিন্তা ধারণা করতে পারে না, অনুশীলনের দ্বারা তারা পরে ধারণা করতে শিখবে। ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে চোখের জল ফেল না, নির্জ্জনে এবং বিশ্বাসে নিজের শক্তি বাড়াও।

কথাপ্রসঙ্গে

হিন্দু-মুসলমান ও ভারতীয় সভ্যতা

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ' রূপ সমন্বয়বাণী ধারণা ও প্রচার দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের বহু শতাব্দী সঞ্চিত বিদ্বেষ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইতে পারে—ইহা আমাদের বিশ্বাস, অন্য দিক দিয়াও এই মিলন সম্ভব কি-না সে সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিতে চাই।

প্রতিদানের অপেক্ষা না রাখিয়া মানুষ যদি মানুষকে কেবল সাহায্যই করিয়া যায়, দুঃখে বিপদে সর্ব্বাবস্থায় যদি তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়, তবে এমন লোক খুব অল্পই আছে যে উপকারীর অপকার সাধনে অগ্রসর হয়। মানবেতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত যদিও আছে তথাপি, বিপদে সাহায্য পাইয়া আজন্মের শত্রুতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহা শত্রুও যে মহাবান্ধবে পরিণত হয়—এরূপ ঘটনাও বিরল নহে। আঘাত পাইয়া আঘাত করা, অনিষ্টকারীর অনিষ্টাচরণ খুবই স্বাভাবিক, আবার শত্রুর প্রতি মিত্র ব্যবহারও তেমনি অনন্যসাধারণ। জগতের বিভিন্নদেশ হইতে ভারত চিরকাল বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছে এখনও সে তাহার বিশেষত্ব জগতে দেখাইতে পারে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে। কতকগুলি মুসলমান হিন্দুধর্ম্মকে অসম্মান ও হিন্দু-জীবন বিপন্ন করিতেছে ইহা অতি সত্য কথা কিন্তু, হিন্দুগণ তৎপরিবর্ত্তে তাহাদিগকে সুশিক্ষা দিতে পারে কি-না, ইহাই আমরা জানিতে চাই। আমাদের দেশে শিক্ষার অত্যন্ত অভাব, আবার হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের শিক্ষার অভাব আরও বেশী। উচ্চশিক্ষা মানুষকে মহৎ ও উদার করে, তথা শিক্ষাহীন মানুষ অনাচারী ও গোঁয়ার হয়। মুসলমানদের এই ধর্ম্মান্ধতা ও গোঁয়ারতুমির পশ্চাতে শিক্ষাহীনতা বা কুশিক্ষা পুঞ্জীভূত রহিয়াছে ইহা মিথ্যা নয়। এই শিক্ষাহীনতার সুযোগ লইয়া কতকগুলি লোক তাহাদের মনে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়া দেয় এবং সেই আগুনে তাহারা অন্যকেও পোড়ায়—নিজেরাও পুড়িয়া মরে। এই কদর্য্য কাজের জন্য নিজেদের লাঞ্ছনার একশেষ হইলেও তাহারা উহা হইতে বিরত হয় না, ইহাই বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক।

দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া হিন্দু-মুসলমান কেহই কখনও শান্তি পাইবে না। পাশাপাশি দুইটি বাড়ীতে যদি মারাত্মক শত্রুতা থাকে তাহা হইলে বিপদের আশঙ্কায় দিবা রাত্রির মধ্যে কেহই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারে না।

যখন চিরকাল পাশাপাশি উভয়কেই থাকিতে হইবে তখন যাহাতে উভয়েই শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে পারে তাহারই চেষ্টা করা

বিধেয়। এই চেষ্টা করার অর্থ—হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর জনসাধারণের ভিতর সুশিক্ষার বিস্তার। যে শিক্ষা মানুষকে নিজের ও দশের জন্য ভাবিতে শিখায়, অন্যের বিপদে আপদে সহানুভূতি সম্পন্ন করে, তাহাকে উদার করিয়া নিজের সীমাবদ্ধ গণ্ডি হইতে তাহার মনকে জগতের অসীম ক্ষেত্রে লইয়া যায়—আমরা সেইরূপ শিক্ষার কথাই বলিতেছি। এইরূপ শিক্ষা বিস্তার কল্পে কোনরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না, অর্থেরও আবশ্যকতা নাই। নগরে পল্লীতে, দেশে বিদেশে, জীবনের ধরনায় সকল সম্প্রদায়ের অন্ধধর্ম্মবিশ্বাসিগণের হৃদয়ে বিস্তার মন্দির গড়িয়া তুলিতে হইবে। শুধু জীবনের ধরনায় নয়, অবমাননাকেও বরণ করিবার সাহস থাকা চাই। বিকারী রোগীর সেবা করিতে যাইলে সেবককে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়. যাহারা সাম্প্রদায়িক কলহের সৃষ্টি করিতেছে তাহাদের মস্তিষ্কের সাময়িক বিকার ঘটিয়াছে সুতরাং তাহাদের নিকট সমন্বয়ের বাণী লইয়া গেলে তাহারা যে সহজে তোমায় ছাড়িয়া দিবে এরূপ মনে হয় না। তথাপি তাহাদিগকে শুনাইতে হইবে, হিন্দু—ভারতের মস্তিষ্ক এবং মুসলমান—ভারতের বাহু, এই বাহু ও মস্তিষ্কের সাহচর্য্যে ভারতীয় 'নেশন' বা জাতি গঠন করিতে হইবে। ভারতীয় 'নেশন' বলিতে শুধু হিন্দু বা শুধু মুসলমান বুঝায় না। উহাতে বুঝায় হিন্দু ও মুসলমানের সমন্বয়ে একটি বিরাট জাতি-সংঘ। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য, ব্রাহ্ম, জৈন, শিখ, আর্য্যসমাজী ও অদ্বৈতবাদী-সন্ন্যাসী সকলেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া যেমন বিরাট হিন্দুজাতি গঠন করিয়াছে, সেইরূপ মুসলমান, পার্শী ও ভারতীয় খৃষ্টানকে লইয়া ভারতীয় 'নেশনের' প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য।

হিন্দুর জমী মুসলমান চাষ করে, মুসলমানের দ্রব্য হিন্দু ক্রয় করে, শ্রমের বিনিময়ে হিন্দুর অর্থে মুসলমানের দিনাতিপাত হয়, হিন্দু কাপড় বুনে মুসলমান তাহা পরে, হিন্দুর যানবাহন মুসলমান চালায়, মুসলমান রাজমিস্ত্রী হিন্দুর গৃহনির্ম্মাণ করে এইরূপে পরস্পরের সাহায্যে যে দুইটি জাতির সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, তাহাদের মধ্যে কেহ কাহাকেও বাদ দিয়া থাকিতে পারে না। শুধু হিন্দু-মুসলমান কেন?

বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর যাবতীয় দেশে সর্ব্ববিধ জাতির মধ্যে ভাব ও বস্তুর যে আদান প্রদান চলিতেছে—যে জাতি উহা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবে—তাহারই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান ভারতে হিন্দুকে বাদ দিয়া মুসলমান এবং মুসলমানকে বাদ দিয়া হিন্দুর জীবন ধারণ কল্পনা—আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই আত্মঘাতী বিকৃত বুদ্ধি, হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মন হইতে মুছিয়া ফেলা প্রয়োজন। তৎপরিবর্ত্তে দেশের সর্ব্বসাধারণের ভিতর এই বুদ্ধি জাগাইতে হইবে যে, বিরাট ভারত-শরীরের হাত পা কাটিয়া পঙ্গু না করিয়া উহাদের সমবেত চেষ্টায় একটি অত্যদ্ভুত সভ্যতার সৃষ্টি করা নিতান্ত আবশ্যক। এই সভ্যতা হিন্দু বা মুসলমান-সভ্যতা নহে—ইহা ভারতীয় সভ্যতা। হিন্দু-সভ্যতার গৌরব আছে, মুসলমান রাজত্বকালে ভারতে মুসলমান সভ্যতারও অপূর্ব্ব বিকাশ হইয়াছিল—এই দুইটি প্রাচীন সভ্যতা যদি মিলিত হয় তবে সেই মিলন হইতে যে সর্ব্বতোমুখী অত্যদ্ভুত নবীন সভ্যতার উদ্ভব হইবে—সেইরূপ সভ্যতার উৎকর্ষ আর কোন দেশে কখনও হয় নাই।

এইরূপ ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ সাধনে, সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি-শূন্য 'মানব-সেবার' প্রয়োজন। কিন্তু, ত্যাগ ব্যতীত কোনরূপ সেবার অনুষ্ঠানই চলিতে পারে না। স্বামিজী বহুপূর্ব্বে এই কথাই বলিয়াছেন, "The National Ideals of India are Renunciation and Servicc—ত্যাগ ও সেবা ইহাই ভারতের জাতীয় আদর্শ।

তুমি যে সম্প্রদায়েরই লোক হও 'মতুয়ার বুদ্ধি' বর্জ্জন করিয়া ত্যাগ ও সেবার ভাবে ভারতীয় সভ্যতার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিতে পার। তোমার ব্যক্তিগত সাধনপথ যাহাই হউক, হে ভারতবাসি! বর্ত্তমান যুগ—ভারতীয় সভ্যতা-প্রতিষ্ঠা-যজ্ঞে তোমাকে সাদরে আহ্বান করিতেছে।

শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার-বিচার

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এস্থলে দেখা যাইতেছে বেদাধ্যয়ন ও সদাচার দ্বারা দ্বিজগণ শূদ্র হইতে পৃথক্ হইতেছেন। ব্রাহ্মণের লক্ষণ সম্বন্ধে বজ্রসূচি উপনিষদে অতি সুন্দর ভাবে কথিত হইয়াছে। যথা—

"যঃ কশ্চিৎ আত্মানম্ অদ্বিতীয়ং জাতিগুণক্রিয়াহীনং * * করতলামলকবৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষীকৃত্য কৃতার্থতয়া কামরাগাদিদোষরহিতঃ শমদমাদিসম্পন্নঃ * * মাৎসর্য্যতৃষ্ণাশোকমোহাদিরহিতঃ দম্ভাহংকারাদিভিঃ অসংস্পৃষ্টচেতা বর্ত্ততে, এবমুক্তলক্ষণ যঃ স এব ব্রাহ্মণঃ ইতি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসানাম্ অভিপ্রায়ঃ।"

তাহার পর জন্ম বা জাতি যে ব্রাহ্মণের লক্ষণ নহে তাহার প্রমাণ উক্ত বজ্রসূচি উপনিষদেই দেখা যায়—

"তর্হি জাতির্ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ? ন। তত্র জাত্যন্তরজন্তুষু অনেকজাতিসম্ভবা মহর্ষয়ঃ বহবঃ সন্তি। ঋষ্যশৃঙ্গঃ মৃগ্যাঃ, কৌশিকঃ কুশাৎ, জাম্বুকো জম্বুকাৎ, বাল্মিকী বল্মিকাৎ, ব্যাসঃ কৈবর্ত্তকন্যাকায়াম্, শশপৃষ্ঠাৎ গৌতমঃ, বশিষ্ঠঃ উর্ব্বশ্যাম্, অগস্ত্যঃ কলসেজ্জাতঃ, ইতি শ্রুতত্বাৎ। এতেষাং জাত্যা বিনাপি জ্ঞানপ্রতিপাদিতা ঋষয়ঃ বহবঃ সন্তি। তস্মাৎ ন জাতিঃ ব্রাহ্মণ ইতি।

অতএব ব্রাহ্মণাদি জাতি ভগবৎ সৃষ্ট বা গোত্বাদির ন্যায় নিত্য হইতে পারে না; এতদ্দ্বারা বেশ স্পষ্ট ভাবেই জানা গেল। বস্তুতঃ একথা মহাভারতেও প্রকারান্তরে কথিত হইয়াছে, যথা—

জাতিরত্র মহাসর্প! মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্করাৎ সর্ব্ববর্ণাং দুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ॥
সর্ব্বে সর্ব্বাস্বপত্যানি জনয়ন্তি সদা নরাঃ।
বাঙ্‌মৈথুনমথো জন্মমরণং চ সমং নৃণাম্॥

যদমার্ষং প্রমাণং চ যে যজামহ ইত্যপি ।

তস্মাৎ শীলং প্রধাকষ্টং বিদুর্থে তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

এতদ্দ্বারা বুঝা যায় ব্রাহ্মণাদি জাতি নিয়ত নহে, ইহা ব্যবহার মাত্র। যেহেতু সকল বর্ণের মনুষ্য সকল বর্ণের স্ত্রীতে সর্ব্বদাই অপত্য উৎপাদন করিয়া থাকে ইত্যাদি। আর এই কারণে চরিত্রই ব্রাহ্মণত্বাদির জ্ঞাপক।

তাহার পর গুণকর্ম্মই যে প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বাদির জ্ঞাপক ইহাও মনু এবং মহাভারতে দেখা যায়। যথা যুধিষ্ঠির-বাক্য—

কৃতকৃত্যাঃ পুনর্ব্বর্ণাঃ যদিবৃত্তং ন বিদ্যতে ।

সংকরস্তত্র নাগেন্দ্র বলবান্ প্রসমীক্ষিতঃ ॥

অর্থাৎ সংস্কারাদি অনুষ্ঠিত হইলেও যদি অনুকূল চরিত্র পরিলক্ষিত না হয়, যদি হিংসা দ্বেষাদি বিদূরিত না হয় তবে সে স্থলে সংকর-দোষই প্রবেশ লাভ করিয়াছে বুঝিতে হইবে।

শূদ্রেতু যম্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে ॥

ন বৈশূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ ।

যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প ! বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ ॥

অর্থাৎ শূদ্রের যাহা লক্ষণ তাহা দ্বিজে থাকিতে পারে না॥ শূদ্রও শূদ্র নহে, ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ নহে যে স্থলে এই চরিত্র দেখা যাইবে সেই স্থলে ব্রাহ্মণ বুঝিবে।

অতএব দ্বিজকুলে যাঁহার জন্ম তাঁহার যদি তদুচিত গুণ থাকে তবেই তিনি দ্বিজ, অন্যথা তিনি দ্বিজ নহেন। তাঁহাকে যে জন্ম হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বলা হয় তাহা প্রকৃত ব্রাহ্মণত্বাদির জ্ঞাপক নহে। বস্তুতঃ উত্তম ব্রাহ্মণাদির সৃষ্টির জন্য ব্রাহ্মণত্বাদিকামী-বংশবিশেষে জন্ম হইতেই ব্রাহ্মণাদির অধিকারাদি শাস্ত্রে ঘোষণা করা হইয়াছে। শূদ্রকুলে জাত ব্যক্তি দ্বিজত্বকামী হইলে যে, সে জন্মে তাহাকে সে অধিকার দেওয়া পাপ বা অধোগতির কারণ—ইহা ঘোষণা করা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে। জন্মের মূল্য ক্ষেত্রের সমান; কর্ম্মের মূল্য বীজের সমান। অতএব গুণ-কর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া জাতির উপর জোর দেওয়া সঙ্গত নহে।

যদি বলা যায়, তাহা হইলে কাহাকে উপনীত করিবে, কাহাকেই বা করিবে না? দ্বিজকুলে জাতকে উপনীত করিবে এরূপ ব্যবস্থা থাকিলে এই নির্ণয় কত সহজ হয়?

ইহার উত্তর এই যে, যে ব্রাহ্মণত্বাদিকামী বা যাহার পিতামাতা তাদৃশ কামনাসম্পন্ন সেই বালককে উপনীত করিবে। এজন্য কুল শীল দেখিয়া জ্যোতিষশাস্ত্র দ্বারা পূর্ব্বজন্মের সংস্কার অনুকূল কিনা ইহা নির্ণয় করিয়া যে সমর্থ বা উপযুক্ত হইবে তাহাকেই উপনীত করিতে হইবে। ইহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। সুতরাং সকল দ্বিজসন্তানকে উপনীত করিতে হইবে না, অথবা সকল শূদ্র সন্তানকে প্রত্যাখ্যান করিবারও আবশ্যকতা নাই। অবশ্য এরূপ করিলে অধিকাংশ দ্বিজসন্তানই যে দ্বিজ হইবে এবং অল্প শূদ্রই যে দ্বিজ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর ইহার ফলে যে ক্রমে দ্বিজ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। গুণ-কর্ম্ম দেখিয়া উপনয়ন দিবার রীতি পুরাকালেও ছিল দেখা যায়, যথা—

কবষ ঐলুষ ঋষি দাসীপুত্র হইলেও ব্রাহ্মণোচিত শিক্ষাদি লাভ করিয়াছিলেন এবং পরে ব্রাহ্মণ বলিয়াও গণ্য হইয়াছিলেন ইহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২।১৯, কৌশিতকী ব্রাহ্মণ ১২।১।৩ গ্রন্থে দেখা যায়। ঋগ্বেদেও একজন কবষ ঋষি আছেন। ইঁহারা খুব সম্ভব অভিন্ন ব্যক্তি।

সত্যকামকে গুণ কর্ম্ম দেখিয়া ব্রাহ্মণ নির্ণয় করা হইয়াছিল। তাঁহার জননী জবালা নিজ গোত্র জানিতেন না। পুত্র গুরুগৃহে যাইবেন বলিয়া গোত্র জিজ্ঞাসা করিলে ইনি বলেন—ইহা আমি জানি না, আমি নানা প্রকারে সেবাকারিণী পরিচারিণীরূপে যৌবনে তোমায় লাভ করিয়াছি, আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম এই মাত্র আমি জানি। গুরু গৌতম সত্যকামের এই কথা শুনিয়া বলিলেন এরূপ সত্য অব্রাহ্মণে বলিতে পারে না, অতএব আইস তোমায় উপনীত করিতেছি ইত্যাদি। এস্থলে গুণগত ব্রাহ্মণত্বই যে লক্ষ্য তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।

যদি বলা যায়, এস্থলে সত্যকামের সত্যকথন দেখিয়া সত্যকামের

ব্রাহ্মণ জন্ম নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহা হইলে বলিব, না তাহা নহে। কারণ, গুণ-কর্ম্ম জন্মের প্রতি অব্যভিচারী কারণ হইতে পারে না। যেহেতু দ্রোণাচার্য্য বিশ্বামিত্র বিদুর ধর্ম্মব্যাধ ও শম্বুকাদিতে তাহার ব্যাভিচার দেখা যায়। পক্ষান্তরে গুণ-কর্ম্ম পূর্ব্বজন্মের সংস্কার নির্ণয়ের অব্যভিচারী কারণ বলিয়া এস্থলে সত্যকথন রূপ গুণ-কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণানুকূল সংস্কারেরই নির্ণয় করা হইয়াছে, বলিতে হইবে। জন্মও তাহারই জ্ঞাপক মাত্র বলিয়া লোকে জন্মের অনুসন্ধান করে মাত্র, অতএব জন্ম নির্ণয়ের জন্য গৌতম তাঁহার গোত্র জিজ্ঞাসা করেন নাই। যদি জন্ম নির্ণয় করাই তাঁহার অভিপ্রায় হইত তাহা হইলে তিনি অপর পাঁচজনকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন, অথবা ধ্যানস্তিমিত লোচন হইয়া যোগবলে তাহা স্থির করিতেন এবং তাহাই আখ্যায়িকা মধ্যে উক্ত হইত। কিন্তু, তাহার উল্লেখাদি না থাকায়, ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার মাত্রই গৌতম এস্থলে অনুমান করিয়া সত্যকামকে উপনীত করিলেন বলিতে হইবে।

যদি বলা যায় গৌতম গোত্র প্রশ্ন করিয়া ব্রাহ্মণত্ব নির্ণয় করিলে ব্রাহ্মণত্ব গোত্রসম্বন্ধি হওয়ায় জন্ম নির্ণয়ই সম্ভব। তাহা হইলে বলিব ব্যভিচারী হেতুর দ্বারা যে নির্ণয়, সে নির্ণয়ই নহে। একজন মূর্খ ব্যভিচারী হেতুর দ্বারা সাধ্য নির্ণয় করিতে পারে এবং সময় সময় তাহা সত্যও হইতে পারে কিন্তু, ঋষি গৌতম তাহা করিবেন কেন? অতএব এস্থলে জন্ম সম্বন্ধে সন্দেহই ছিল, কেবল ব্রাহ্মণোচিত পূর্ব্বজন্মের সংস্কার নির্ণয় হওয়ায় তাহাকে উপনীত করা হইল। আর জন্ম দ্বারাও যখন ইহাই নির্ণেয় তখন জন্মনির্ণয় কখনই সম্ভব নহে। অতএব গুণ-কর্ম্মগত বর্ণই শাস্ত্রীয় অধিকারের কারণ, জাতিগত বর্ণ কারণ নহে।

(ক্রমশঃ) শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

পল্লী সংগঠন*

কোথায়ও কিছু সংগঠনের বিষয় বিবেচনা করতে গেলে, ভগবান বিশ্বকর্ম্মারূপে কি ভাবে তাঁর বিশ্ব গঠন করছেন তা থেকে হয় তো আমরা কিছু কিছু শিক্ষার আভাস পেতে পারি। বর্ত্তমান জীব-বিজ্ঞানে জীবসৃষ্টির ভিতর দিয়াও কতকটা সংগঠনরহস্য-প্রণালীর ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

জীব-বিজ্ঞানে আমরা দেখতে পাই, প্রথম সৃষ্টি Protoplasm বা জীবকোষ। এদের জীবনে কোন জটিলতা নাই, খাদ্যদ্রব্য শরীরের যথা তথা দিয়া শরীরে প্রবেশ কোরে শরীরের পুষ্টিসাধন করে। এদের বংশ বৃদ্ধি করতে হলে একটি জীবকোষ বিভক্ত হয়ে দুটি হয়ে যায় এবং এই উপায়ে এদের বংশ বৃদ্ধি হয়। কিন্তু সৃষ্টি এ রকম সরলভাবে আরম্ভ হলেও ক্রমশঃ জটিল হতে আরম্ভ হল। যখন একটি জীবকোষ বিভক্ত হয়ে বংশ বৃদ্ধি করতো তখন স্ত্রীপুরুষ ভেদ ছিল, কিন্তু এই জীবকোষ থেকে উৎপন্ন জীব ক্রম-বিকশিত হয়ে ক্রমে উন্নততর শরীর যন্ত্রের অধিকারী হতে লাগলো ও তাদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের ভেদও দেখা দিতে লাগলো। এই স্ত্রী-পুরুষ ভেদের মধ্যে জৈবিক উন্নতির পন্থায় এই আভাস পাওয়া যায় যে, সংগঠনকার্য্য একের দ্বারা সম্পূর্ণ হয় না, একের সহিত অন্য একের প্রাণের আদান প্রদানই সৃষ্টি বা সংগঠনের শ্রেষ্ঠ উপায়।

সৃষ্টিকার্য্যের মধ্যে আবার আমরা অনেক স্থলে অযথা জটিলতা দেখ্‌তে পাই। যেমন একই ফুলে গর্ভ-কেশর ও পরাগ-কেশর দুই আছে, কিন্তু প্রায়শঃই এক সময়ে দুটির পুষ্টি হয় না। যদি এক

---

* শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন-মহাসম্মেলনের সাধারণ সভায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকারের বক্তৃতা—৮ই এপ্রিল ১৯২৬ খৃঃ।

সময়ে এ দুটিই পরিপুষ্ট হোত তাহলে আর ফুল ফুটবারই প্রয়োজন হোত না, এক ফুল হতেই দুই পরাগের মিশ্রণে অনায়াসেই ফলের উৎপত্তি হোত। এই যে মধুমক্ষিকা বা প্রজাপতি আকর্ষণের জন্য পুষ্পের বিচিত্র বর্ণ সৌন্দর্য্যের বিকাশ, এক ফুলের পরাগ অন্য ফুলের গর্ভ-কেশরে সংযোগের জন্য কত না বিচিত্র উপায়, এর কিছুই দরকার হোত না, অতি সহজেই বংশ বিস্তারের কাজ সম্পন্ন হয়ে যেত। সে রকম হলে সৃষ্টির কাজ সহজ আর সরল হোত বটে, কিন্তু মাধুর্য্য লোপ পেয়ে যেত।

বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যে আর একটি বিষয়ের আভাস আমরা পাই। সেটি হচ্ছে, কোন আগন্তুক মহান ব্যাপারের নানাভাবে নানাদিকে পূর্ব্বসূচনা ও পূর্ব্বায়োজন। পৃথিবীতে মানবরূপী শ্রেষ্ঠ জীবের আবির্ভাবের পূর্ব্বায়োজন কত ভাবেই না হয়েছিল, বৈজ্ঞানিকগণ তার তথ্য কিছু কিছু জানেন। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যখন জলরাশি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, তখন পৃথিবী থেকে কতকটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে চন্দ্র হয়ে গেল। আর সেই বিচ্ছিন্ন স্থানের গহ্বরটি চারিধার হতে জল এসে পূর্ণ করে মহাসাগরের সৃষ্টি হল। এবং জল একত্রে জমা হওয়ার জন্য জলের মধ্য হতে মানবের আবাসভূমি স্থল মাথা তুল্‌লে। তখন পৃথিবীর বাতাসও কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড (Carbon dioxide) বাষ্পে পূর্ণ ছিল। স্থল জেগে উঠ্‌লে তাতে মহামহীরুহ সমূহের উৎপত্তি হতে থাক্‌লো, আর সেই বিশাল বৃক্ষগুলি সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে তাদের শরীরের উপাদানরূপে কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড Carbon dioxide, টেনে নিতে লাগলো, তাতে বায়ু মানবের শ্বাস প্রশ্বাসের উপযোগী বিশুদ্ধ হয়ে উঠ্‌লো এবং বৃক্ষের ভিতরেও সূর্য্যরশ্মির তাপ ভবিষ্যৎ যুগে মানবের প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে সঞ্চিত ও সংরক্ষিত হতে থাকলো এবং পরে সেগুলি পাথুরিয়া কয়লায় পরিণত হল।

বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে তৃতীয় একটি বিষয়ও আমরা কতকটা অনুভূতিতে পাই। সেটি এই যে, জগৎস্রষ্টা সৃষ্টি কার্য্যে নিজেকে

দান করেছেন, আর সেই দানের আনন্দে তিনি নিত্য আনন্দময়। এই যে আপনাকে দান করে গড়ে তুলবার আনন্দ, এ আনন্দটিও তিনি গঠন-সাধনার সাধকের মধ্যে দান করেছেন। এই আনন্দ সর্ব্বত্র সৃষ্টি কার্য্যের সাধনায় ওতপ্রোত ভাবে রয়েছে। শিল্পী, ভাস্কর, কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সন্ন্যাসী বা গৃহী সকলেই নিজ নিজ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে এই আনন্দের অধিকারী। যেখানে যত কঠোর সাধনা, সেখানে তত আনন্দ, আবার যেখানে সাধনা যত সরস যত আনন্দময় সেখানে সৃষ্টিও তত সজীব। এই সৃষ্টি সাধনের চেষ্টার মধ্যে কত যে অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে বৈজ্ঞানিক তার তথ্য ভাল করেই জানেন। নিম্ন শ্রেণীর জীবের দৃষ্টিশক্তি ছিল না, সে দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছে, শ্রবণশক্তি ছিল না শ্রবণশক্তি পেয়েছে। এই রকম অতি অদ্ভুত বিকাশ সৃষ্টি কার্য্যের গবেষণায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়।

তাই আমরা, গঠন কার্য্যের সাধকের যে দুইভাবের সাধনা দৃষ্ট হয়—এক, কেবল কর্ত্তব্যবোধে সাধনা ও অপরটি, সাধনার মধ্যে প্রাণের যোগ—এই দুই সাধনার শেষেরটির সৃষ্টিই সজীব ও সরস বলে বুঝতে পারি। রামকৃষ্ণ মিশন এ দেশে এই প্রাণের যোগ-সাধনা পথের পথ-প্রদর্শক। মিশনের কর্ম্মপথে যাত্রার পুরোভাগে,—

"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"

এই বাণী গৈরিক পতাকায় উড্ডীন হয়েছে। "জগদ্ধিত" ও "আত্মমোক্ষ" এখানে পরস্পর যুক্ত। এ দান কেবল দান নয়, আদান ও প্রদান। রামকৃষ্ণ মিশন জগৎকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন, জগতের হিতে আত্মদানই আত্মমোক্ষের হেতু, আবার দান যদি নিজেকে রিক্ত, নীরস বা নিরানন্দ না করে ববং আনন্দেরই হেতু হয়, তবেই সে-দানে জগতের প্রকৃত হিত সম্ভব, নতুবা নয়। গড়ে তুলবার জন্য প্রাণ দেওয়া চাই, কেবল কর্ত্তব্য বোধে নয়। প্রাণদানের জন্য প্রাণের যে আপনা হতে ব্যাকুলতা জাগে সে তারই প্রেরণায়। মোট কথা এই যে, এত কথার সার এককথায় বলতে গেলে এই বলতে

হয়, এই আত্মদানের কঠোর সাধনাতেই যে আনন্দের অনুভূতি তাই মোক্ষ, এ ভিন্ন মোক্ষ আর কি হতে পারে ?

গঠনকার্য্যের মধ্যে আর একটি শিক্ষা আছে, সেটি সাহস। অর্জ্জুনের উপর ধর্ম্মরাজ্য গড়ে তুলবার ভার ছিল, কিন্তু ধনুক ধরেই তাঁর মনে নানা ইতস্ততঃ ভাব, নানা দ্বিধা এল। ভগবান এক কথায় তা খণ্ডন কর্‌লেন, সে কথাটি এই যে :—

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥"

গীতা। ২য় অধ্যায়। ৩ শ্লোক

এই এক কথার মধ্যে ভগবদ্গীতার সব কথাই রয়েছে। ক্লৈব্য ছাড়, হে সাধন পথের যাত্রী সাহসী হও। পারি কি হারি এ দ্বিধাও ছাড়। ভগবান অর্জ্জুনকে এই যে ক্লৈব্য-ত্যাগের উপদেশ দিয়েছেন, জীববিজ্ঞানেরও ইহাই সার কথা। জীবতত্ত্বের আলোচনায় দেখা যায় যে, প্রাণীর প্রথমে সাহসের উদয় হলে তারপর নৈতিক মনোবৃত্তির বিকাশ হয়।

প্রত্যেক গঠন কার্য্যের মধ্যেই অনেক দ্বিধার, অনেক ইতস্ততের বিষয় আছে। কিন্তু প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে এ সব বাধা যতই দুর্লঙ্ঘ্য হোক না কেন, লঙ্ঘন করে যেতে পারা যায়। অনেক বিষয়ে সমাজ অন্তরায় হয়, ব্যবহারিক ধর্ম্মশাস্ত্র অন্তরায় হয়, আইনও অন্তরায় হয় কিন্তু করতে হবেই এই দৃঢ় ইচ্ছার কাছে সে সব বাধা গুঁড়ো হয়ে যায়। এই যে ম্যালেরিয়ায় পল্লী উৎসন্ন হয়ে যাচ্ছে, পল্লীবাসীরা যদি মনে করে 'আমাদের বাঁচ্‌তে হবেই, ম্যালেরিয়া তাড়াতে হবেই' তা হলে তার জন্য তারা সব রকম অসাধ্য সাধন করতে পারে। ম্যালেরিয়ার জন্য গ্রামের সংস্কারে অর্থের দরকার বটে, কিন্তু সাহস, উদ্যম ও সামর্থ্যের তার চেয়ে বেশী দরকার। গ্রামের কোনও কিছু সংস্কার করতে গেলে সর্ব্বাগ্রে জমীদারের মত প্রয়োজন। তুমি মর বা বাঁচ যাই হোক, কিন্তু জমীদার মত না দিলে কোনও কিছুর সংস্কারে হাত দেওয়ার তোমার স্বত্ব নাই। ভূস্বামী ভূমির

উপস্বত্ব ভোগ করেন বটে এবং নিজের সর্ব্বতোভাবে স্বত্বরক্ষা সম্বন্ধে তাঁর সজাগ দৃষ্টিও আছে, কিন্তু প্রজা রক্ষার সম্বন্ধে সব সময়েই প্রায় তাঁরা উদাসীন। ম্যালেরিয়া তাঁদের নিজেদের ভোগ করতে হয় না, কেন না তাঁরা প্রায়ই পল্লীতে বাস করেন না। প্রজা উৎসন্ন গেলেও তাঁদের ক্ষতি নাই বরং অনেক স্থলে লাভ, কেন না এক প্রজা উৎসন্ন হয়ে গেলে জমীদার সেই জমী নূতন প্রজাকে বর্দ্ধিত খাজনায় বিলি করতে পারবেন এবং সেই সঙ্গে 'নজর'ও তাঁর লাভ হবে। মনে ভাবুন, কোন গ্রামে অনেকগুলি ডোবা, আর একটি মাত্র পূর্ব্বকালের বড় পুষ্করিণী, সেটি সবার এজমালী, অনেক দিন সংস্কার না হয়ে তার জল দূষিত হয়ে উঠেছে, অথচ সেই জলটুকুই সমস্ত গ্রামবাসীর প্রাণ। ডোবাগুলি ভরাট বা সংস্কার না করলে সেগুলি ম্যালেরিয়ার ভাণ্ডার হয়ে থাক্‌বে। কিন্তু ভরাট করতে গেলেই প্রথমে যাঁর জমীতে ডোবা তিনি আপত্তি তুল্‌বেন। সংস্কার করতে গেলেও আপত্তি উঠ্‌বে, কেন না একের ডোবা অন্যে কোন্ স্বত্বে সংস্কার করে? পুকুরটি সম্বন্ধেও ঐরূপ নানা অসুবিধা। এজমালী পুকুরের মালিকগণের হয় তো অনেকেই সহরবাসী, কারুর মত হলেও হয় তো আবার অনেকের মত হবে না। গ্রামে যদি কলেরা আরম্ভ হয় পুকুরে কাপড় কাচায় বাধা দিবার কাহারও একার স্বত্ব নাই, কাজেই পুকুরটি কলেরা বীজাণুতে পূর্ণ হলেও নিবারণের কোন উপায়ই নেই।

জল নিকাশের অভাবে পচা জল জমে দুর্গন্ধ ও মশার সৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু খাল কাটতে গেলে যাঁর জমী দিয়ে খাল কাটতে হবে তাঁর মত না হলে হয় না, এবং দয়া করে তিনি যে মত দেবেন সে আশাও খুব কম। কিন্তু যাদের বাঁচ্‌তে হবে তাঁদের ম্যালেরিয়া তাড়াতে হবেই, জল নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবেই। দুর্গন্ধ ডোবা বোঁজাতেই হবে, পুষ্করিণী সংস্কার কর্‌তেই হবে, আইনতঃ স্বত্বের দিকে তাকিয়ে কাপুরুষের মত মরলে চল্‌বে না। প্রজার আইনতঃ স্বত্ব কতটুকুই বা আছে? একটা গাছ কাট্‌তে গেলেও জমীদারের হুকুম চাই। প্রজা

বিনা হুকুমে কোঠাবাড়ী তুলতে পারে না, পুকুর কাটাতে পারে না, এমন কি অনেক জায়গায় এমনও শোনা যায় যে ছেলে মেয়ের বিয়েতে 'নজর' দিয়ে আগে জমীদারের মত নেওয়া চাই, প্রজা এতই মুখাপেক্ষী। বস্তুতঃ মুখাপেক্ষা ছেড়ে প্রজা যদি আত্মনির্ভরশীল সাহসী হয় তবে জমীদার ও প্রজা উভয় পক্ষেরই শুভ। জল নিকাশ সম্বন্ধ এখানে আমি গুটিদুই তিন ঘটনার উদাহরণ দিতে পারি। মালদহ জেলায় চাঁচলের রাজা বাহাদুরের জমীদারীতে একটি বিল ছিল। এই বিলের বিস্তার এক মাইল কি তারও বেশী। চাঁচলের জমীদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে থাকার সময় জমীটি উদ্ধার করবার জন্য বিলের বাঁধ কেটে দেওয়া হয় এবং জল বাহির হয়ে গেলে সেই জমী, কোর্ট অব ওয়ার্ডস প্রজাকে বিলি করে দিলেন। তাতে জমীদারের কিছু অর্থাগম হল বটে, কিন্তু প্রজার বিশেষ কোন লাভ হল না। কারণ, বর্ষার সময় জল বেড়ে সমস্ত জমীই জলে ভেসে যেতে লাগ্‌লো তাতেও জমীর ফসলের ক্ষতি, আবার সে জল হঠাৎ সরে গিয়ে জমী একেবারে শুক্‌না হয়ে যাওয়ায় তাতেও ফসলের খুবই ক্ষতি হতে লাগ্‌লো। প্রজারা তখন আবার বাঁধ দিতে সঙ্কল্প করলে, এবং তারা নিজেই উদ্‌যোগী হয়ে নিজেদের দায়িত্বে বাঁধ বেঁধে ফেল্‌লে। ফলে, এক মাইল দীর্ঘ ও প্রস্থ একটি সুন্দর জলপূর্ণ হ্রদের সৃষ্টি হল, হ্রদের পাশের জমীগুলিও সরস হয়ে অধিক উর্ব্বরা হল এবং হ্রদের জলেও মৎস-কর আদায় হয়ে সম্পত্তির আয়েরও বিশেষ কিছু ক্ষতি হল না। অবশ্য চাঁচলের সদাশয় রাজা বাহাদুর এ বিষয়ে আপত্তি করেন নি, কিন্তু এমন স্থলে অন্যত্র জমীদারের আপত্তি হওয়ার খুবই সম্ভাবনা ছিল।

নদীর ঘোলা জলের প্লাবন ম্যালেরিয়ার একটি প্রতিষেধক। যদি বাঁধ বেঁধে এই প্লাবন রোধ করা যায়, তা হলে নদীর পালিমাটিযুক্ত জলে ধৌত হয়ে সে স্থানটি যে ভাবে রোগ-বীজ শূন্য হোত সেরূপ বিশুদ্ধির পথ বন্ধ হয়ে যায়। মালদহ জেলার সোহাগড় বাঁধটি এই ভাবে দেওয়া হয়েছিল। ৩০।৪০ বর্গ

মাইল স্থান প্রতি বৎসর ভাগীরথীর বন্যায় প্লাবিত হত। এজন্য সেখানে ম্যালেরিয়া ছিল না। এতটা স্থান জলা হয়ে পড়ে না থেকে যাতে প্রজাবিলি হয় জমীদার সেজন্য এই লোহাগড় বাঁধটি দিয়েছিলেন, এবং সেখানে প্রজা বসিয়েছিলেন। ফলে বাঁধের কাছের স্থানগুলিতে এতই ম্যালেরিয়া বেড়ে গেল, যে শতকরা ৮১ জনের প্লীহা বৃদ্ধি দেখা গেল, কিন্তু পাশাপাশি—গ্রামেই যেখানে বন্যার জল প্রবেশ করে সেখানে শতকরা ১৮ জনের বেশী লোকের প্লীহা নাই। গ্রামবাসীরা ক্রমে রোগের এই মারাত্মক বৃদ্ধির কারণ বুঝতে পারলে। প্রথমে গভর্ণমেণ্টের কাছে এ সম্বন্ধে অনেক আবেদন নিবেদন উপস্থিত করা হল, কিন্তু এ বিষয়ে নানারূপ জল্পনা ও বিবেচনাই হতে থাক্‌লো, সময় কেটে যেতে লাগলো কিন্তু কোন ব্যাবস্থাই হল না। তখন অগত্যা এক রাত্রে (আমি যখন মালদহে ছিলাম) প্রজারা রাতারাতি বাঁধটি কেটে দিল। তাতে বসতির কিছু ক্ষতি হল না, তবে কতকগুলি আবাদী জমী ডুবে গেল ও অনুপস্থিত ভূস্বামীদের আমবাগানগুলিরও হয় তো কিছু কিছু ক্ষতি হল, কিন্তু মোটের উপর রোগের হাত থেকে বেঁচে প্রজারা প্রাণ পেল, পুকুরগুলি জলে পূর্ণ হল এবং অনেক জমীও বেশী উর্ব্বরা হয়ে তার দাম বেড়ে গেল। কিন্তু আবার ঐ মালদহ জেলাতেই দ্বারবাসিনী বাঁধ নামে একটি বাঁধে বন্যার জল আটক রাখে। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড বা গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে এখনও চিন্তা বিবেচনাই চল্‌ছে এবং প্রজারাও ভীষণ ভাবেই ম্যালেরিয়ায় ভুগছে। বাঁধ কাটাবার বা অন্য কোন উপায়ে প্রতীকারের কোনও ব্যবস্থাই হয়ে ওঠে নি। তবে লোহাগড় বাঁধের মত এ স্থলেও যদি প্রজারা নিজে উদ্যোগী হয় তা হলে বোধ হয় এর সহজে মীমাংসা হয়ে যেতে পারে।

রেলওয়ের জন্যও অনেক স্থলে জলের বহতা বন্ধ হয়ে ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি হয়েছে ও তা বেড়ে গিয়েছে। নবাবী আমলের পুরাণো মালদহের নিকটে বেহুলার খাল নামে একটি খাল আছে, সেটি দিয়ে বর্ষার সময় নদীর জল প্রবেশ করে সহরের চারিধার ধুয়ে দিত, কিন্তু

রেলওয়ে লাইন যখন খালের উপর দিয়ে সোজা পথ করে চলে গেল, তখন খালের উপর সাঁকো করা ব্যয়সাধ্য মনে করে আড়াআড়ি খালের মাঝখানটি মাটি দিয়ে বুঁজিয়ে পথ তৈরী করাই রেলওয়ে কোম্পানী সঙ্গত মনে কর্‌লেন। কুড়ি বৎসর ধরে আবেদন নিবেদন চল্‌তে লাগলো। খালটি মজিবার উপক্রম হল। অবশেষে মালদহের একটি বড় বন্যার সময় রেলওয়ে কোম্পানী লক্ষ্য কর্‌লেন, যে লোকেরা রাতারাতি লাইনের কোন কোন স্থানে কতকটা খুঁড়ে বন্যার জল বের করে দিবার জন্য নিষ্ফল ভাবে চেষ্টা করেছে। তাই দেখে সম্ভবতঃ রেলওয়ে কোম্পানীর দয়ার উদ্রেক হল, তাঁরা ১৮ হাজার টাকা ব্যয়ে ঐ খালের মাটি কেটে একটি সাঁকো করিয়ে জল নিকাশের পথ করে দিলেন।

বড় বড় কাজে প্রজাদের সমবেত চেষ্টা ও দৃঢ় ইচ্ছা থাকলে যখন তারা অনেক স্থলে এই ভাবে বড় বড় কাজও সম্পন্ন করে তুলতে পারে, অথবা কর্‌বার নিষ্ফল চেষ্টাতেও গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌তে পারে, তখন তাদের নিজ গ্রামের ছোট ছোট সংস্কার বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত, তা হলে শীঘ্রই গ্রামের শ্রী ফিরে আসবে।

(ক্রমশঃ) ডাঃ শ্রীসরসীলাল সরকার।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষার প্রভাব

আমাদের বাংলায় যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার ঢেউ আসিয়া আমাদের সমাজকে ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়া ব্যতিব্যস্ত ও ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, যখন আমরা পাশ্চাত্যের এই নির্ম্মম অভিযানের সম্মুখে বাধা দিবার কিছুই পাইতেছিলাম না,—কেবল যেমন একদিকে অতীতের গৌরবের কতকগুলি কঙ্কাল লইয়া টানাটানি ও জাহির করিতেছিলাম তেমনি অপরদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার আপাতঃ মনোহর প্রভাবে একান্ত মুগ্ধ হইয়া তাহার অন্ধ অনুকরণ করিতেছিলাম তখন এমন একজন ব্যক্তি আমাদের দেশে আবির্ভূত হইলেন যিনি দেখাইয়া দিলেন যে আমাদের আর ভয় নাই, আর আমাদের পথহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে না, আমরা একেবারে নিরুপায় নয়, ইয়ুরোপ যেমন একদিকে দুর্জ্জয় শক্তি সম্পন্ন আমরাও তেমনি আর একদিকে অমিত শক্তিশালী, যেমন আমরা ইয়ুরোপ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতেছি তেমনি আমরা আমাদের সভ্যতা, আমাদের ধর্ম্ম লইয়া ইয়ুরোপ-আমেরিকাকে প্রবলভাবে আক্রমণ করিতে তাহাদের জয় করিতে পারি, এমন শক্তি আমাদের আছে। ইঁহার এই অপূর্ব্ব বাণীতে, এই তেজোগর্ভ উৎসাহ বাক্যে মৃতপ্রায় জাতির দেহে নবজীবনের সঞ্চার হইল। আমাদের দেশ কি, তাহার প্রাণ কোথায়, তাহার শ্রেষ্ঠতা কোথায় তাহা আমরা জানিলাম। কি করিয়া দেশকে নূতন বলে বলীয়ান করিতে হইবে তাহা আমরা শিখিলাম। প্রকৃত দেশভক্তি কাহাকে বলে তাহার সম্বন্ধে আমাদের জাতির হাতেখড়ি হইল। হিন্দু বলিয়া ভারতবাসী বলিয়া আমাদের অভূতপূর্ব্ব আত্মাভিমান জাগিয়া উঠিল। আমরা বুঝিলাম জগতে আমাদের একটা বিশেষ কাজ আছে, আর আমাদের নির্জীব ও পরমুখাপেক্ষী হইলে চলিবে না। এই বিশ্বাসে

আমরা অনন্ত শক্তি সম্পন্ন হইয়া উঠিলাম। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আমরা ধর্ম্ম, সামাজিক সমস্যা, রাজনীতি, ও সাহিত্য নূতন চক্ষে, নূতন ভাবে দেখিতে লাগিলাম। চারিদিকে একটা নবজীবনের সাড়া পড়িয়া গেল।

কিন্তু, আমাদের জাতীয় জীবনের উপর স্বামিজীর প্রভাব এখনও বিন্দুমাত্রও লুপ্ত হয় নাই। বৎসরের পর বৎসর ইহা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। ক্রমে ইহা জাতির জীবনের সহিত ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়াই চলিয়াছে। সেইজন্য মনে হয় ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় জীবনের নানাদিকে স্বামিজীর প্রভাব আরো অধিক দেখিতে পাইব। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধেই দুই একটি কথা বলি। ইয়ুরোপ এ যাবৎ Democracy (গণতন্ত্র) লইয়া বড়াই করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহার স্থায়িত্ব কিরূপে সাধন করা যায় তাহা এখনও আবিষ্কার করিতে পারে নাই, যতকিছু রাজনীতিক কৌশল উদ্ভাবন করিতেছে সবই বিফল হইয়া যাইতেছে। কারণ সমাজে—ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে স্বার্থ লইয়া অসংখ্য দ্বন্দ্ব বর্ত্তমান। ইয়ুরোপের Democracy আজ সত্যই নিতান্ত বিপন্ন। মনে হয়, এই নিতান্ত নিরাশ্রয় Democracyকে আশ্রয় দিতে ভবিষ্যতে ভারতই কেবল পারিবে, কারণ Democracyর মূলকথাই হইতেছে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি, তাহার ঐশ্বরিকতায় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বাণী ভারতের সভ্যতায় যেমন পাওয়া যায়, পাশ্চাত্য সভ্যতায় তেমন পাওয়া যায় না। কেবল অভাব ছিল এই বাণীকে চারিদিকে ছড়াইয়া দেওয়া—স্বামিজী সেই অভাব পূরণ করিয়াছেন। সেইজন্য মনে হয় বেদান্তকে ভিত্তি করিয়া যে Democracy উঠিবে তাহা জগতে সত্যই একটি আদর্শ Democracy হইবে। এই Democracyর ভিত্তি ত্যাগ মূলক হইবে বলিয়া, ইয়ুরোপের অর্থ-নীতিক সমস্যা যেমন তাহার Democracyর ভাগ্যগগণকে ঘনঘটাচ্ছন্ন করিয়াছে, সেই বিপদের সম্ভাবনা আমাদের দেশে থাকিবে না। তারপর, ইয়ুরোপের রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আর একটি কথা তুলি। Nationalism (দেশাত্মবোধ) ইয়ুরোপে তেমন সুন্দরভাবে বিকাশলাভ করিতে পারে নাই।

Nationalism ইয়ুরোপে একটি দেশের আর একটি দেশকে ঘৃণা করিবার, তাহাকে প্রবঞ্চনা করিবার, তাহার উপর দস্যুতা করিবার পথ খুলিয়া দিয়াছে। ম্যাজিনীর (Mazzini) আদর্শ অনুযায়ী Nationalism (দেশাত্মবোধ) Humanity (মনুষ্যত্ব) তে উঠিবার একটি ধাপ বলিয়াই গৃহীত হয় নাই। ইহা Humanityর পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইয়ুরোপের সভ্যতার মূল ভোগ ও স্বার্থপরতা বলিয়াই ইহা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ভারতের সভ্যতার মূল হইতেছে ত্যাগ ও নিঃস্বার্থতা সুতরাং ভারতবর্ষের Nationalism বিশ্বমানবতার অন্তরায় না হইয়া অনুকূলই হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,—"A *nation* in India will be a union of those whose hearts beat to the same spiritual tune—যাহাদের হৃদয়তন্ত্রী একই আধ্যাত্মিক সুরে বাঁধা সেই সকল ব্যক্তির একতায় ভারতে একটি (হিন্দু) জাতি গড়িয়া উঠিবে—এইকথাটির গভীর অর্থ আছে, এই কথাটি Nationalism এর একটি নূতন দিকের নির্দ্দেশ করে। এই কয়টি কথা শুধু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দিক হইতেই বলিলাম। স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা রাষ্ট্র বিজ্ঞানের নূতন খোরাক যোগাইবে এবং জগতে এমন একটি democracy, এমন একটি Nation প্রস্তুত করিবে যাহা জগতের ইতিহাসে পূর্ব্বে দেখা যায় নাই।

ভারতের জাতীয় জীবনের উপর স্বামিজীর প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। সেটি, হইতেছে এই—যদি ভারত কখনো জাগে তাহা স্বামী বিবেকানন্দের নির্দ্দেশমত কার্য্য করিয়াই হইবে। Political freedom (রাজনৈতিক স্বাধীনতা) পাওয়াই আমাদের জাতির একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা নয়। কিন্তু তাহাও যদি আমরা পাইতে চাই, বৈদেশিক শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে নিষ্ফল আক্রোশ প্রকাশ করিলেই হইবে না। যেখানে ভিত্তি নিতান্ত অগভীর সেখানে সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতে পারে না। এই বিশাল দেশের অসংখ্য নরনারী নিতান্ত অজ্ঞ, শত শত বৎসরের বৈদেশিক শাসনে ইহাদের মনুষ্যত্ব একেবারে বিলুপ্ত, অসংখ্য

ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত বলিয়া ইহারা পরস্পর হইতে একান্ত বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন। যখন ইহাদিগকে আমরা যেরূপে হউক শিক্ষিত করিতে পারিব, মানুষ করিতে পারিব, ইহাদিগকে সাম্প্রদায়িক স্বাধীনতা দিয়াও একই ধর্ম্মের সুবিস্তৃত ছায়ায় সমবেত করিতে পারিব, তখনই ভারতের ভাগ্যবিধাতা সুপ্রসন্ন হইবেন, তখনই জাতির মধ্যে এক অদ্ভুত শক্তি কার্য্য করিতে থাকিবে, তখনই ভারত যোগ্য আসনে অধিষ্ঠিত হইবে।

আন্তর্জাতিক (International) জীবনে স্বামিজীর শিক্ষার যে প্রভাব ভবিষ্যতে দেখা যাইবে তাহার তুলনায় জাতীয় জীবনের উপর যে প্রভাব এ পর্য্যন্ত যাহা দেখা গিয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহা দেখা যাইবে আশা করা যায়, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ইয়ুরোপ আমেরিকার Imperialism (সাম্রাজ্যবাদ) আজ জগৎকে অত্যাচারে অবিচারে, দলিত পিষ্ট এমন কি দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। শ্বেতজাতিরা দলবদ্ধ হইয়া জগৎকে শাসন ও শোষণ করিতেছে কৃষ্ণজাতিরা অন্ন বস্ত্রের জন্য, শান্তির জন্য, হাহাকার করিতেছে। আবার এই Imperialism (সাম্রাজ্যবাদ) Capitalismএর (মহাজনী বা ধনিক নীতি) সহিত ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ। পাশ্চাত্যের প্রত্যেক জাতিই যে জগতের শ্রেষ্ঠ স্থানগুলি অধিকার করিতে ব্যস্ত তাহার কারণ হইতেছে কতকগুলি বড় বড় কোম্পানি (Company) এবং ব্যাঙ্ক (Bank) ও কতকগুলি ধনী ব্যক্তির স্বার্থ। পাশ্চাত্যের প্রত্যেক জাতির দরিদ্রের এই সকল কার্য্যে কোন সহানুভূতি নাই। তাহারা যেমন দরিদ্র তেমনই আছে, অধিকন্তু তাহারা একদিকে সাম্রাজ্য অধিকারে ও সাম্রাজ্য রক্ষণে, অন্যদিকে Factory System এর স্থায়িত্বে অনিচ্ছুক যন্ত্ররূপেই নিয়োজিত হইতেছে। তাহারা এখন নিজেদের অবস্থা ও নিজেদের স্বার্থ অনেকটা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার ফল Communism এর সৃষ্টি ও Communistদের প্রভাব। কিন্তু Communismও এই জটিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে সমর্থ নয়, কারণ Communistic state দরিদ্রের স্বার্থপরতা লইয়াই ব্যস্ত থাকিবে; ধনী ও মধ্যবিত্তকে সমাজের ক্রীতদাসে পরিণত করিবে।

অধিকন্তু Communistরা বল প্রয়োগে সমাজ ওলট পালট করিয়া দিয়া নিজেদের স্বার্থসন্ধানে ব্যস্ত। এরূপ পথ নৈরাশ্যে একান্ত অন্ধ ব্যক্তিরই পক্ষে ঈপ্সিত হইতে পারে। Capitalism ও Imperialism যেমন বর্জ্জনীয়, Communismও সেইরূপ। বিশেষতঃ Communistic Stateও Imperialistic হইয়া উঠিতে পারে। তাহার পূর্ব্বলক্ষণ Russiaতে কিছু কিছু দেখা যাইতেছে। পাশ্চাত্যের এই Ismগুলি তাহাদের সমাজদেহের গলিত ক্ষতস্বরূপ। পাশ্চাত্যের সভ্যতা যে নিতান্ত বাহ্য ইহা তাহারই পরিচয়। পাশ্চাত্যের মানুষ যে এখনও প্রকৃত মানুষ হইতে পারে নাই সে যে এখনও পশুরই মত হিংস্র স্বার্থপর ও হৃদয়হীন, ইহা তাহারই ফল। জগতের শান্তি ও আমাদের আত্মরক্ষার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, আমাদের প্রাচীন সভ্যতার বাণী ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় শান্তিজলের মতই ছিটাইতে হইবে আর এই বাণীকে ভিত্তি করিয়া অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজনীতি, আন্তর্জাতিক ব্যবহার-শাস্ত্র প্রভৃতির আমূল সংস্কার করিতে হইবে, তবেই জগতে শান্তিমূলক সভ্যতা স্থাপিত হইবে, তবেই জগতে জাতিবিদ্বেষ ও শ্রেণীবিদ্বেষ জনিত বিষের ধ্বংস হইবে।

মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের উপরও স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবের কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। যেমন তিনি আমাদের জাতীয় সভ্যতার বিগ্রহ স্বরূপ, তেমনই তিনি মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর বিকাশ কত দূর সম্ভব তাহারও শ্রেষ্ঠ উদাহরণ স্বরূপ। শুকদেবের মতই তিনি নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল পবিত্র ছিলেন, ভীষ্মের মতই তিনি ব্রহ্মচর্য্যে অটল ছিলেন, বিদ্যায় তিনি বাণীর বরপুত্র ছিলেন, দধীচির মতই তিনি নিজেকে নির্ম্মমভাবে বলি দিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয় সংযম, ত্যাগ, নির্ভীকতায় তিনি যে আদর্শ দেখাইয়াছেন তাহা কত ব্যক্তির মধ্যে কিরূপ প্রবলভাবে কাজ করিতেছে তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? এইমাত্র বলিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে যে তাঁহার দেহত্যাগের পর হইতে যে সমস্ত সর্ব্বস্বত্যাগী দেশভক্ত বীরের আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহাদের অনেকেরই ব্যক্তিগত জীবনে এই আদর্শ সন্ন্যাসীর অদ্ভুত প্রভাব অলক্ষিতে অথচ

প্রবলভাবে কার্য্য করিয়াছে। ভবিষ্যতে তাঁহার শিক্ষা ও জীবনের দৃষ্টান্ত আরও কত আদর্শ মানব, আদর্শ ভারতবাসী ও আদর্শ হিন্দু সৃষ্টি করিবে তাহা কেবল ভারতের ভাগ্যবিধাতাই জানেন।

শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত, এম-এ।

মাধুকরী

ভিক্ষু আনন্দ

আনন্দ গোতম বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য এবং অনুচর ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মে ইঁহার স্থান অতি উচ্চ। আমরা অদ্য এই মহাপুরুষের বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব।

শুদ্ধোদনের এক ভ্রাতার নাম শুক্লোদন; আনন্দ এই শুক্লোদনের পুত্র। সুতরাং আনন্দ গোতমের পিতৃব্যপুত্র। ইনি গোতমের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পর গোতম পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। প্রথম কুড়ি বৎসর ইঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট অনুচর ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভিক্ষু ইঁহার পরিচর্য্যা করিত।

যখন গোতমের বয়স পঞ্চান্ন বৎসর, তখন তিনি একদিন ভিক্ষু-গণকে বলিলেন—"এতদিন নানা ভিক্ষু আমার পরিচর্য্যা করিয়াছে। এখন আমার বয়স অধিক হইয়াছে। ভিক্ষুগণের মধ্যে কি এমন কেহ নাই যে নিত্য আমার সঙ্গে থাকিতে পারে?"

সারিপুত্র বলিলেন, "আমি ভগবানের অনুচর হইতে ইচ্ছা করি।" গোতম তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না। ইহার পরে প্রধান প্রধান

শিষ্য সকলেই ঐ প্রকার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। তিনি কাহাকেও গ্রহণ করিলেন না। আনন্দ ঐ সময়ে নীরবে একপ্রান্তে উপবেশন করিয়াছিলেন। ভিক্ষুগণ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "আনন্দ, যাও, ভগবানের নিকট যাও, অনুচর হইবার জন্য প্রার্থনা কর।" গোতম বলিলেন, "না, না, ওভাবে তোমরা আনন্দকে উত্তেজিত করিও না; আনন্দ কি করিতে চাহে, তাহা আনন্দই ভাল জানে।"

তবুও ভিক্ষুগণ আনন্দকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তখন আনন্দ দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "ভগবান যদি আমার আটটি প্রার্থনা পূর্ণ করেন, তবে আমি ভগবানের অনুচর হইব।"

(১) ভগবান আমাকে সুন্দর বস্ত্র অর্পণ করিবেন না।

(২) লোকে ভগবানকে যে খাদ্য অর্পণ করিবে, তাহার অংশ আমি গ্রহণ করিব না।

(৩) আমার জন্য স্বতন্ত্র কুটীর নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না।

(৪) ভগবানকে যখন কেহ নিমন্ত্রণ করিবে, আমি সে নিমন্ত্রণে ভোজন করিব না।

(৫) আমি যে স্থলে নিমন্ত্রিত হইব, ভগবানও সেইস্থলে গমন করিবেন।

(৬) যাঁহারা ভগবানের দর্শনাভিলাষী হইয়া আগমন করিবেন, আমি তাঁহাদিগকে ভগবানের সমীপে লইয়া যাইতে পারিব।

(৭) আমার মন যখন চঞ্চল হইবে, বা কিছু জ্ঞাতব্য থাকিবে, তখন আমি ভগবানের সমীপে উপস্থিত হইতে পারিব।

(৮) ভগবান পূর্ব্বে একবার যে উপদেশ দিয়াছেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলে ভগবান তাহার পুনরুক্তি করিবেন।

ভগবান বলিলেন, "আনন্দ, আমি তোমার এই আটটি প্রার্থনাই পূর্ণ করিব।"

এই সময় হইতে আনন্দ পঁচিশ বৎসর ছায়ার ন্যায় বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিয়াছিলেন।

উপযুক্ত অনুচরই নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। আনন্দ ছিলেন নিরীহ,

নিঃস্বার্থ, কর্ম্মদক্ষ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার প্রকৃতি ছিল অতি মধুর।

কোমল প্রকৃতি

মহা পরিনির্ব্বাণের কিছুদিন পূর্ব্বে আনন্দ বিহারে প্রবেশ করিয়া 'কপি-শীর্ষ' অবলম্বন করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতেছিলেন—

"আমি এখনও শিক্ষার্থী, এখনও আমার অনেক করণীয় আছে। যিনি আমাকে অনুকম্পা করেন, যিনি আমার শিক্ষক, তিনি পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন।"

আনন্দকে না দেখিয়া ভগবান ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আনন্দ কোথায়?" তখন তাঁহারা সমুদায় ঘটনা বলিলেন। ইহা শুনিয়া ভগবান একজন ভিক্ষুকে আনন্দের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আনন্দ যখন নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন ভগবান তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া সান্ত্বনা করিলেন।

বুদ্ধের প্রশংসাবাণী

এই সময়ে বুদ্ধ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে আনন্দ! বহুকাল তুমি মৈত্রীপরিপূর্ণ, হিতকর, সুখকর, অদ্বয় এবং অপরিমিত কার্য্য, বাক্য এবং চিন্তা দ্বারা তথাগতের সমীপে বাস করিয়াছ। তুমি কৃতপুণ্য হইয়াছ।"

ইহার পরে বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ভিক্ষুগণ! আনন্দ পণ্ডিত এবং মেধাবী। তথাগতকে দর্শন করিবার জন্য কখন ভিক্ষুগণের উপযুক্ত সময়, কখন ভিক্ষুণীগণের, এবং কখন উপাসক বা উপাসিকা, বা রাজা, বা রাজার প্রধান আমাত্য বা অপর সম্প্রদায়ের নেতৃগণের বা অপর সম্প্রদায়ের শ্রাবকগণের উপযুক্ত সময়, আনন্দ তাহা জানে।

"হে ভিক্ষুগণ! আনন্দের চারিটি আশ্চর্য্য এবং অদ্ভুত গুণ। কোন চারিটি?

"যদি ভিক্ষুগণ আনন্দকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করে, তাহারা তাহাকে দেখিয়া আনন্দিত হয়, যখন আনন্দ ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করে, তাহারা তাহা শুনিয়া আনন্দিত হয় ; আর যদি আনন্দ তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করে, তবে তাহারা অতৃপ্ত হয়।

"এইরূপ যদি ভিক্ষুণীগণ, উপাসকগণ, উপাসিকাগণ আনন্দকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করে, তাহারা আনন্দকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হয়, আনন্দ যখন ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করে, তাহা তাহারা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হয়, আর আনন্দ যখন তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করে, তখন তাহারা অতৃপ্ত হয়।

"হে ভিক্ষুগণ! রাজচক্রবর্ত্তীর চারিটি আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত গুণ। যখন (১) ক্ষত্রিয়গণ (২) ব্রাহ্মণগণ (৩) গৃহপতিগণ বা (৪) শ্রমণগণ রাজচক্রবর্ত্তীকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করে, তাহারা তাঁহাকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হয়, তিনি যখন কথা বলেন, তখন তাহারা সেই কথা শুনিয়া আনন্দিত হয়, এবং তিনি যখন তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করেন, তখন তাহারা অতৃপ্ত হয়।

"হে ভিক্ষুগণ! আনন্দেরও এই প্রকার চারিটি গুণ।"

(প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩) শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ।

জিজ্ঞাসা

ভাত খাইবার পর আচমন করার বিধি আছে, কারণ হস্তাদি ময়লা হইয়া যায়। কিন্তু ভাতের সংস্পর্শে যদি কোন পরিষ্কার পদার্থ থাকে তাহাও স্পর্শ করিলে হাত সকৃড়ি অর্থাৎ অশুদ্ধ হয় এবং হাত ধুইতে হয়। এমন কি সকৃড়ি স্থানের সংস্পর্শে যদি একটি পরিষ্কার জলপাত্র থাকে, তবে সে জলে কোন কাজ হয় না, তাহা ফেলিয়া দিতে হয়। ইহার কারণ কি? এত সকৃড়ির বিচার বাংলাদেশেই বদ্ধমূল, ভারতের অন্য কোন স্থানে এরূপ নাই বলিলেই চলে। সুতরাং জিজ্ঞাসা করি—ইহা কি কোন শাস্ত্র সঙ্গত? কিংবা ইহা কেবল বাংলা দেশেরই নিজস্ব প্রথা। আর যদি বাংলাদেশের প্রথা হয় তবে কে, কোন্ সময় এবং কেন এরূপ সকৃড়ি-বিচার-প্রথা প্রচলন করেন?

শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত, বি-এস সি, এল টি।

সমালোচনা

গীতিগুচ্ছ—স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ সঙ্কলিত। মূল্য—কাপড়ে বাঁধা ১।• এবং কাগজে বাঁধা ১৲; প্রকাশক—স্বামী প্রশান্তানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, পাটনা।

শ্রীরামকৃষ্ণ সংগীত, বিবেকানন্দ সংগীত, গণপতি সংগীত, সরস্বতী সংগীত, কালী কীর্ত্তন, আগমনী, শিব সংগীত, হরি সংকীর্ত্তন, বাউল এবং নিরাকার ভজন প্রভৃতির সংগ্রহ পুস্তক। পুস্তকখানির বিশেষত্ব এই—শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে সকল গান গাহিয়া ও শুনিয়া মুহুর্মুহু সমাধিস্থ হইতেন এবং যে সকল গান স্বামী বিবেকানন্দের অতীব প্রিয় ছিল তাহা বিশেষ চিহ্ন দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বেলুড় ও অন্যান্য মঠে যে সকল ভগবদ্ভজন গীত হয় এই পুস্তকে পাঠক তাহার পরিচয় পাইবেন। পুস্তকটির কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম—বৃন্দাবন; সেবাশ্রমের ১৯২৪ সালের অষ্টাদশ সংখ্যক কার্য্য-বিবরণী আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। লিখিত বর্ষে ১৩৮ জন রোগী হাসপাতালে থাকিয়া আরোগ্য লাভ করে এবং মাত্র ১১ জনের মৃত্যু হয়। একজনকে গভর্মেণ্ট হাসপাতালে পাঠান হয় এবং দুইজন হাসপাতাল ত্যাগ করে। দাতব্য ঔষধালয়ে ১৮৪৩• জন রোগীকে ঔষধপথ্যাদি দেওয়া হয়। স্বগৃহে চিকিৎসিত হয় ২• জন। ৫ জন অন্তঃপুরচারিণীকে অর্থ সাহায্য করা হয়। সর্ব্বসমেত ১৮৬•৭ জন সাহায্য প্রাপ্ত হন। উক্ত বর্ষে রোগী-সেবা বাবদ জমা ৩৬৮৭৸৴১৫ এবং খরচ ৩৩৫৬৷৵৫। গৃহনির্ম্মাণকল্পে জমা ১•••৷৴১৫ এবং খরচ ৯৭১৴১৫।

আশা করি, দরিদ্র তীর্থবাসীর আশ্রয়স্থল এই আশ্রমটি সহৃদয় দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

সংঘ-বার্ত্তা

পোর্টলাণ্ড (ওরেগণ—পশ্চিম আমেরিকা) বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী প্রভবানন্দ টাকোমা (ওয়াসিংটন) থিয়োসফিক্যাল হলে ৮ই, ৯ই ও ১০ই ফেব্রুয়ারী 'ক্রমবিকাশ ও পুনর্জন্মবাদ', 'কর্ম্ম ও মুক্তি' এবং 'অবতারবাদ' সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতার পর প্রত্যহ অপরাহ্নে প্রশ্নোত্তর ক্লাসে স্বামিজী নানা জটিল বিষয়ের সদুত্তরদানে উপস্থিত সকলকে আনন্দিত করিতেন। কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া স্বামী প্রভবানন্দ তথায় একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন। আশা করি, তাঁহার আন্তরিক চেষ্টায় সমিতির কার্য্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে।

* * * *

বিগত ১৯শে ফেব্রুয়ারী আবাদান (পারস্য) 'বিবেকানন্দ সোসাইটি' কর্ত্তৃক ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবে একটি সার্ব্বজনীন ধর্ম্মসভায় নিম্নলিখিত বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল:— 'শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী'—বক্তা মিঃ সেন গুপ্ত; 'প্রলোভনের উন্মাদনা'—বক্তা মিঃ শ্রীরাম; 'স্বামী রামতীর্থের জীবনী'—বক্তা মিঃ কৃপারাম; 'শিখধর্ম্ম'—বক্তা মিঃ গুদ্দিং সিং; 'শিশুপালন'—বক্তা মিঃ মূলহোত্রা। সভাপতির উপসংহার বক্তৃতার পর প্রসাদ বিতরণ হইলে সভার কার্য্য শেষ হয়। সকল সম্প্রদায়ের হিন্দু, মুসলমান এবং বহু ভদ্রমহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

* * * *

দিল্লী—রায়সিনা ও টিমারপুর নামক দুইটি বিভিন্ন কেন্দ্রে যথাক্রমে ২৭শে, ২৮শে ফেব্রুয়ারী এবং ৬ই, ৭ই মার্চ্চ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহার মহান জীবন ও মহতী শিক্ষা সম্বন্ধে দুইটি পৃথক সভায় শ্রীমৎ স্বামী পরমানন্দ, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মৌলভি আবদুল মাজিদ প্রভৃতি বক্তাগণ

বক্তৃতা করিয়াছিলেন। টিমারপুর-সভায় শ্রীমান্ বসন্তকুমার ঘোষ 'প্রার্থনা' সম্বন্ধে ইংরাজীতে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, হিন্দুস্থানী, শিখ, সনাতনী, আর্য্য, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সর্ব্ববর্ণীয় পুরুষ ও মহিলাগণ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

* * * *

দিনাজপুর—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের আয়োজনে স্থানীয় ধর্ম্মমহাসভা-প্রাঙ্গণে মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শর্ব্বানন্দ গত ২১, ২২ ও ২৩শে এপ্রিল তারিখে 'উপাসনা' 'সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম' এবং 'কর্ম্ম ও জন্মান্তরবাদ' সম্বন্ধে তিনটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

* * * *

বিগত ২৫শে এপ্রিল স্বামী বাসুদেবানন্দ কর্ত্তৃক সৈয়দপুর (রংপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। তদুপলক্ষে তিনি 'সেবা', 'শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্ম্ম', 'গীতায় ভক্তিযোগ' এবং 'স্ত্রীশিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

বিগত ২রা মে গৌহাটী—শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে স্থানীয় 'কার্জ্জন হলে' শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ চৌধুরীর সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সভায় শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর কটকী 'সেবাধর্ম্ম ও রামকৃষ্ণ মিশন' সম্বন্ধে আসামী ভাষায় এবং স্বামী বাসুদেবানন্দ 'কর্ম্মজীবনে বেদান্ত' সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন। তৎপরে ৬ই মে তিনি 'অনুশীলন ও ধর্ম্ম' সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

ভ্রম সংশোধন—গত মাসের 'উদ্বোধনে' শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দের (বুড়োবাবা) শরীর ত্যাগের সময়—৯ই বৈশাখ প্রাতে ৮—২০ মিনিটের সময় এইরূপ লিখা হইয়াছিল, উহা সংশোধিত হইয়া ঐ দিবস রাত্রি ৮—২০ মিনিট হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দের সহিত কথোপকথন *

আমি অদ্য আপনাদের নিকট স্বয়ং বিবেকানন্দের বার্ত্তাবহরূপে উপস্থিত। প্রায় যুগদ্বয় অতীত হইল ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে স্বামী বিবেকানন্দ ঢাকা নগরীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তিনি ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ৺মোহিনীবাবুর বাটীতে অবস্থান করিতেন। যতদূর সম্ভব তাঁহার সঙ্গ করাই তৎকালে আমার লক্ষ্য ছিল। শত শত লোক তাঁহাকে দর্শন, তাঁহার সহিত আলাপ ও তাঁহার অমূল্য উপদেশাবলী শ্রবণ করার জন্য প্রতিদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। আমি তাঁহার সহিত বিশেষ কোন বিষয়ে তর্কবিতর্ক করি নাই। নীরবে বিভিন্ন শ্রেণীর শত শত লোকের সহিত তাঁহার প্রশ্নোত্তর শুনিয়াছি মাত্র। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দেখিয়া বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া যাইতাম। যে কোন ব্যক্তি কোন প্রশ্ন করিত, তাঁহার নিকট তাহারই সদুত্তর লাভ করিত এবং সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইত। প্রশ্নটি যতই কেন দুরূহ হউক না, উত্তর দিতে তাঁহার ক্ষণমাত্র বিলম্ব ঘটিত না। বোধ হইত যেন তাঁহার জিহ্বাগ্রে স্বয়ং সরস্বতী দেবী বিরাজমান। এক কথায় বলিতে গেলে, তৎকালে আমার মনে হইত যেন স্বামী বিবেকানন্দ সাক্ষাৎ মূর্তিমান অগ্নি!

আমি মাত্র দুই দিন তাঁহাকে দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম আমার নোটবুক হইতে উহা যথাযথভাবে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

---

* শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে, ১৩৩২ সনের ২৬শে পোষ রবিবার, (খ্রীঃ ১৯২৬ সনের ১০ই জানুয়ারি), ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনে পঠিত।